২য় বর্ষ ১-৬ সংখ্যা
৭-৯ "
৮ "
১১-১২ "

অগ্রহায়ণ ১৩১৮-আশ্বিন ১৩১৯
কার্তিক-পৌষ ১৩১৯
অগ্রহায়ণ ১৩১৯
ফাল্গুন ১৩১৯-চৈত্র ১৩১৯

নাই ১০ম সংখ্যা : মাঘ

বীরভূমি।

[নবপর্য্যায়]

দ্বিতীয় খণ্ড।

(অগ্রহায়ণ ১৩১৮ হইতে চৈত্র ১৩.৮ ও আশ্বিন ১৩১৯ হইতে চৈত্র ১৩১৯)

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

(নবপর্য্যায়)

২য় বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল। ১ম সংখ্যা।

গৃহী ও যোগী।

"নয়নে আনন্দ-আলো, প্রশান্ত বদন,—
যোগীবর, কিসে হেন চিত্তবিনোদন ?
অতুল করুণা-উৎস দেবতা-প্রতিম
জনক না দেখি তব ; মমতা অসীম,
ক্ষীরপ্রস্রবণসম, হৃদে বহে যাঁর
সে জননী শক্তিময়ী না দেখি তোমার ;
জীবনে প্রথম বন্ধু, সমান-শোণিত,
সে সোদর নাহি তব আচরিতে হিত ;
না দেখি তোমার সখা, উদার-হৃদয়
বিত্তের সহায়, আর চিত্তে বিনিময় ;
শরীরে চন্দনলেপ, নয়নে অমিয়া,
হৃদয়ে ত্রিদিবানন্দ, নাহি তব প্রিয়া,
স্নেহের জমাট-বাঁধা, প্রাণের সমান,
(দীপ হতে দীপ যথা), নাহিক সন্তান।"
যোগী কহে,—"কিসে চিত্তে সুখ নিরুপম ?—
আত্মতত্ত্বজ্ঞান, পিতা ; মাতা মোর, সত্য ;
সোদর আমারি ধর্ম্ম ; দয়া, সখা মম ;
শান্তিই রমণী মোর ; ক্ষমা সে অপত্য।"

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ।

আজ 'বীরভূমি' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। যে আদর্শের মঙ্গল-ঘট পুরোদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্কল্প বাণী উচ্চারণপূর্ব্বক আমরা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ কেবল মুহূর্ত্তের জন্য সেই মঙ্গলঘটের মহিমাময়ী মূর্ত্তি সম্ভ্রম ও ভক্তির সহিত অবলোকন করিতে হইবে, সেই সঙ্কল্পবাণী পুনর্ব্বার স্মরণ করিতে হইবে এবং অধিকতর দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত ব্রত পালনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই ব্রত উদ্যাপিত হইবার ব্রত নহে—এই সাহিত্য-ব্রতকে একটি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের মত সমগ্র হৃদয় ও মন দিয়া বরণ করিতে হইবে। ইহার অনুষ্ঠান নিবন্ধন কোনরূপ কৃতিত্ব বোধের অভিমান যেন আমাদের হৃদয়দেশ অধিকার না করে, ইহার পালনে যেটুকু আমাদের ঔদাসীন্য ও ত্রুটি, তজ্জন্য আমরা যেন নিজের কাছেই ধিক্কৃত ও লজ্জাপ্রাপ্ত হই।

অবশ্য-পালনীয় বুঝিয়া আমরা ব্রত গ্রহণ মাত্রই করিয়াছি—আমাদের এই সাহিত্য-সাধনার যিনি লক্ষ্য, যিনি আমাদের ইষ্টদেব তাঁহার মহিমা স্পষ্টরূপে ধারণা করিতেও আমরা অক্ষম। গত বৎসর আভাসে বলিয়াছিলাম "মনুষ্য-প্রকৃতির উৎসমূলে যে পরমতত্ত্ব অব্যক্তভাবে বিদ্যমান, যে তত্ত্বকে ব্যক্ত করিবার জন্য, পরিস্ফুটভাবে অনুভব করিবার জন্য, ব্যষ্টিভাবে মানব ও সমষ্টিভাবে সমাজ, সাধনা ও সভ্যতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, আমরা সেই বিশ্বজনীন মহাদর্শ স্বরূপ কল্যাণমূর্ত্তি পরমতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করি।" তাঁহার আশ্রয়ের অভিমুখে আমরা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহা জানিনা, আদৌ অগ্রসর হইতেছি কিনা তাহাও আমাদের নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই, তথাপি তাঁহাকে সাধ্যমত ধ্যান করিতে হইবে, সাহিত্যে, জীবনে ও সমাজে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে—আমরা কেবল মাত্র এই চেষ্টারই অধিকারী, আমাদের জীবন এই চেষ্টার মধ্যে সার্থকতা লাভ করুক।

আমরা ব্রত গ্রহণ মাত্রই করিয়াছি, পূজার অধিকার আজিও আমাদের হয় নাই—আমরা অর্ঘ্য আহরণ করিয়া পূজার ডালা সাজাইতেছি। এই অর্ঘ্য আহরণ নির্জ্জনে একা একা হয় না, ইহাতে সমবায় চাই, মুক্ত বায়ুতে হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ স্থাপনা চাই। ইহাতে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই, সম্প্রদায় ভেদ নাই, স্বার্থ-সংঘর্ষ নাই, দলাদলি নাই। ফুল সর্ব্বত্রই প্রস্ফুটিত হয়, সৌরভ ও সৌন্দর্য্য সকলেরই সমান নহে, কিন্তু অর্ঘ্যডালায় শতদলের পার্শ্বে

ক্ষুদ্র কুন্দকুসুমেরও স্থান আছে। রাজরাজেশ্বরের সযত্ন পালিত বিহার উদ্যানেও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, দরিদ্রের অভাব-মলিন পর্ণকুটিরের প্রাঙ্গন উজ্জ্বল করিয়াও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আবার যেখানে সৌরভ ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য মানবের ব্যাকুল ইন্দ্রিয়গুলি প্রতীক্ষা করে না, সেই জনমানবহীন বনপ্রদেশেও পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

এই অর্ঘ্যডালা সাজাইবার সময় দেখিতে হইবে কিছুই যেন উপেক্ষিত না হয়, কেহই যেন বাদ না পড়ে। দরিদ্র বনবাসী যেদিন দেখিবে তাহার চিরদিনের পরিচিত ও আদৃত বন ফুলগুলি পূজার ডালায় স্পর্দ্ধার সহিত স্থান লাভ করিয়াছে, সেদিন সে তাহার হীনতা ভুলিয়া যাইবে, তাহার হৃদয় গৌরবে নাচিয়া উঠিবে—সে আর তখন সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না,—সকলের সহিত তাহার যে সনাতন ঐক্য আছে, সেই ঐক্য অনুভব করিয়া সে তখন প্রাণের সহিত সকলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। আমরা বিচ্ছিন্নতায় ক্লিষ্ট, আমরা এক হইতে পারিতেছি না, এই আমাদের পাপ—সেই পাপেই আমাদের এত দুর্দ্দশা—সেই পাপের ফলেই আমাদের এই জাতির বিশ্বমানবের মহা সভায় একটা স্থান নাই। মিলনের জন্য শতদিকে শতপ্রকার চেষ্টা হইতেছে—হউক—সহস্র প্রকার—লক্ষ প্রকার চেষ্টা হউক—কিন্তু এই সাহিত্যসাধনার পবিত্র মন্দিরে মিলনভূমি যেমন প্রশস্ত ও সুলভ এমন আর কোথায়ও নহে। তাই বলিতেছি সাহিত্য-সাধকগণ, যাঁহাদের শক্তি আছে অথচ পথ পাইতেছেন না, ইচ্ছা আছে কিন্তু সহায় নাই, যাঁহারা হাসিতে হাসিতে কার্য্যে নামিয়া নানাপ্রকারে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিরুদ্যম হইয়াছেন, তাঁহারা মিলিত হউন, তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্য, তাঁহাদের সহায়তা করিবার জন্য, সকল প্রকারে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য আমরা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—তাঁহারা উত্থিত হউন, জাগ্রত হউন, আমাদের সহিত মিলিত হউন—আমাদের ক্ষেত্র এখনও অকর্ষিত, এখনও কাহারও দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই, আমাদের কর্ম্মভূমি বিপুল—এদিকে কেহ আসিলেন না কেহ যে আসিবেন তাহারও লক্ষণ দেখা গেল না—তাই আমরা বাধ্য হইয়া দুরূহ জানিয়াও, নিজেদের অক্ষমতা অথবা সহায়হীনতার বিষয় না ভাবিয়া এই নূতন ক্ষেত্রে বীজ বপনের প্রয়াসী। নূতন কর্ম্মীর দল জাগ্রত হউন, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র দেখুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতিরেকে জাতির উন্নতি অসম্ভব। আমাদের সাহিত্যের

গতি দেখিয়া গত বৎসর যাহা বলিয়াছিলাম, এবারেও তাহার দুইটি কথা পুনর্ব্বার জোর করিয়া বলিতে চাই। "নব্যবঙ্গের জাতীয় সাধনা, সাহিত্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সময়ে এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সব নূতনতর প্রয়োজন আমাদের পুরোবর্ত্তী হইয়াছে, যে এখন রাজধানীর বাহিরে মফঃস্বলে স্বাধীন সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখন এককে বহু হইতে হইবে,—ভবিষ্যতে বহুর মধ্য দিয়া এক, আপনার সত্তা পূর্ণতররূপে বুঝিতে পারিবেন। চেতন জীবের সমষ্টির বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি, অংশী বা সমষ্টির ধর্ম্ম চেতন ভাবে উপলব্ধি করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় তাহার অনুবর্ত্তন করে। বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ইহাই সত্ত্বগুণাত্মক। আমাদের দেশকে এই সাম্যে লইয়া যাইতে হইলে প্রত্যেক জেলাকে এখন স্বাধীনভাবে আত্ম-উপলব্ধি করিতে হইবে।"

আর একটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাও পুনরায় বলা প্রয়োজন। "এখনও সাহিত্যের যে অবস্থা তাহাতে ব্যবসায়ের উপকরণ স্বরূপে সাহিত্যকে ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। * * এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহিত মাতৃ ভাষার যে সম্বন্ধ তাহাতে বঙ্গসাহিত্যকে লইয়া দীর্ঘ কাল যাচক ভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের মনোযোগ এ দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে।"

পৃথিবীর ইতিহাসে এখন এক অভিনব যুগ আরম্ভ হইয়াছে—নিজেকে লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কাহারও বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—অন্যান্য সমস্ত জাতি যে সাধনার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—ঠিক সেই স্রোতে অন্ধভাবে তাহাদের যে অনুবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা নহে, তবে এই সাধনার স্রোতে যে স্বাস্থ্যকর বেগ ও পুষ্টি আছে তাহা সকল জাতিকেই, অবশ্য, আত্মপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগত আজ মিলিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মের, আত্মার সহিত দেহের, অন্তর্নিমগ্নতার সহিত বাহ্য পটুতার এই সম্মিলন উৎসব—মানব জাতির ইতিহাসে এক অভাবনীয় ব্যাপার! প্রতীচ্য জগতের আদর্শে জাপান পার্থিব মহত্ত্বের উন্নত শিখরে উঠিয়াছে, চীন ও পারস্য বিক্ষুব্ধ, তুরস্কও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতির সাহিত্যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহারা যেন বিশ্বমানবের সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে, অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা দেশের

নানা জাতি যাহা কিছু করিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যে সমস্তই পাওয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবী—তাহাদের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত—তাই তাহাদের কবি, তাহাদের দার্শনিক, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ কেমন নির্ভয়ে নব নব তত্ত্বের অমৃতরসে স্বদেশবাসী জনগণের হৃদয় ও মনের পুষ্টি সাধন করিতেছে—নব নব উদ্দীপনা জাগাইয়া, নব নব আশার স্বপ্ন উদ্বোধিত করিয়া স্বদেশবাসীগণকে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে। আবার নিজের দেশ সম্বন্ধেই বা তাহাদের আলোচনা কত! তাহারা স্বদেশকে ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের এই স্বদেশ প্রাণতাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য কত বড় বিরাট ও শক্তিশালী সাহিত্য কার্য্য করিতেছে সে সংবাদটাও রাখা দরকার। এই সমস্ত উন্নত জাতির সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতেছি কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, কি অনির্ব্বচনীয় অধ্যবসায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত শত সাহিত্য সেবক নিজের হৃদয়ের রক্ত দিয়া এই সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রাণদান করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। তাঁহারা কত অভাব, কত উপেক্ষা, কত অনাদর, দারিদ্র্যের কত তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। আজ যাহাদের সাহিত্য উন্নত, সাহিত্য সেবকগণ সম্মানিত ও বৈভবশালী তাহাদের এই সার্থকতার পশ্চাতে প্রতিবন্ধকতার সহিত যে প্রচণ্ড সংগ্রামের স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে যত্নের সহিত এখন তাহারই সংবাদ রাখিতে হইবে।

আমাদের সাহিত্যে এখন সেই নীরব ও আপাতঅবজ্ঞাত সাধনার প্রয়োজন। আমাদের দেশের সহিত, দেশবাসীগণের সহিত আমাদের পরিচয় কত অল্প! আমরা বলিয়া থাকি আমাদের অতীত খুব গৌরবময়, কিন্তু কৈ সে অতীত? তাহার সহিত আমাদের পরিচয় কতখানি? তাহার শোণিত আমাদের ভাব-জীবনের শিরা উপশিরায় কতটুকু প্রবাহিত হয়? বোধ হয় নব্য জার্ম্মানের চিন্তায় ও সাধনায় ভারতের দর্শন ও সাহিত্য যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে আমাদের নিজের সাহিত্যে তাহার কিছুই করে নাই। মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু এই তিনটি মহতী সভ্যতার উত্তরাধিকারীগণ আজ গঙ্গার এই পবিত্র উপত্যকায় একটা মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে—বিধাতার কৃপায় এ স্বপ্ন সফল হউক, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এই তিনটি সাধন প্রবাহের ত্রিবেণী সঙ্গম হইল কৈ?

আমরা ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, হেগেল দর্শনের অনুবাদ

করিতেছি, কিন্তু ঐ যে দরিদ্র কৃষক হলকর্ষণ করিতেছে, দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, মহাজনের ঋণে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে,—সে এই সাহিত্যের নিকট তাহার অন্তর্জীবনের কতটুকু উপজীব্য পাইতেছে? তাহার কি জীবনের এমন একটা দিক নাই সাহিত্য যাহা স্পর্শ করিতে পারে? এক দিন কি এই দেশেরই প্রাচীন সভ্যতা তাহার জীবনে সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই? সে কি গান গাহে না, সে কি কবি, পাঁচালী, মনসামঙ্গল, যাত্রা, কথকতা শোনে না, সে কি তর্ক করে না, উপদেশ দেয় না, বৃহত্তর জীবনের একটা ছায়াপাত কি তাহার হৃদয়ে হয় না? আমরা জানি বা না জানি, সেখানেও সাহিত্য আছে, তাহার চর্চ্চা আছে, সাহিত্যিকও আছে। সেখানে আমরা যাই না, যাইতে পারি না, যাইবার চেষ্টাও করি না। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে দেশের বৃহত্তর অংশটারই স্থান নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল বঙ্গ-সাহিত্যে "সাধারণের কৌতূহলের যুগ" আসিতেছে, সাহিত্য সবল হইবে, জাতীয় চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এখন দেখিতেছি চক্র বুঝি বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে "পৃষ্ঠপোষকতার যুগ" বুঝি আর শেষ হয় না! হায় আমাদের দুর্ভাগ্য!

সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত, তাহার প্রতিষ্ঠারও একটা বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে হইতেছে না, তাহা নহে, কিন্তু এই চেষ্টার মূলে ব্যবসায়বুদ্ধি অপেক্ষা একটা উন্নততর বৃত্তির প্রয়োজন। দেশের সকল লোককে স্বল্পাধিক পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতিমুখী গতির সহিত বাঁধিতে হইবে। দেশে কত লোক যথার্থ ও স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ লইয়া আসিতেছে, কিন্তু শিক্ষা, সদুপদেশ, সাহায্য ও সৎসংসর্গের অভাবে, অথবা চাতুর্য্যের অসৎ প্রতিযোগীতায় তাহাদের শক্তি বীজ বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত অজ্ঞাত কুসুমের অর্ঘ্য আহরণ করিয়া বঙ্গবাণীর পূজার ডালায় উপস্থিত করা প্রয়োজন।

সাধু সাহিত্য সেবক চাই, যথার্থ ত্যাগশীল ও পরার্থপর লোককে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনিতে হইবে, নগরের অসৎ প্রতিযোগীতার মধ্যে তাঁহাদের যাইতে দেওয়া হইবে না, তাঁহারা গ্রামে বসিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিবেন—অথচ দেশের ও জগতের উন্নতিমুখী গতির সহিত অসংশ্লিষ্ট থাকিবেন না—গ্রামবাসীগণ এই সমস্ত সাহিত্যিকগণের পুণ্য-প্রভাব অনুভব করিবে। এই জন্যই গত বৎসর বলিয়াছিলাম "বীরভূমেও সাহিত্যিক শক্তি বলিয়া একটা পদার্থ আছে, আজ

তাহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত; সেই শক্তি এই 'বীরভূমি'তে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হউক, এই 'বীরভূমি' বিশ্ব সাহিত্য ও সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের সহিত বীরভূম বাসীর সম্মিলিত সাহিত্য সাধনার প্রবাহের মিলনক্ষেত্র হইয়া পুণ্য প্রয়াগে পরিণত হউক, তাহা হইলেই আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।" কিন্তু এই সমস্ত পল্লীবাসী—সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবে কে? তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি? এই কার্য্যের জন্যই মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপনার প্রয়াস। এই আদর্শের প্রতি চাহিয়াই 'বীরভূমি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ 'বীরভূমি'র পালক নহে—'বীরভূমি'ই শিশু সাহিত্য পরিষদের জননী স্বরূপা।

অতীতের আলোকে ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও সহায় সম্বল হীন সাধনতরণী কর্ম্ম সমুদ্রে ভাসমান হইল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা যখন জাগিয়া উঠিবে, হিংস্র জলচরগণ যখন পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে, জলমগ্ন শৈল শ্রেণীর অজ্ঞাত ষড়যন্ত্র যখন আমাদের ধ্বংসের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবে, যখন আর ও সহস্র প্রকার বিঘ্নে আমরা অভিভূত হইব—তখন হে শাশ্বত সত্য, তোমারই মহিমাময়ী মূর্ত্তি যেন আমাদের হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠে—তোমারই আলোকে যেন আমরা পথ দেখিতে পাই—তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া যেন তোমারই অভয় ও সান্ত্বনা বাণী শুনিতে পাই।

প্রসাদী-সঙ্গীত।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর-কিরণ জগদ্ভাসক বটে, কিন্তু পথশ্রান্ত পথিকের নিকট উহার তপ্ত স্পর্শ বড়ই ক্লেশকর বলিয়া অনুভব হয়; আবার সেই তীব্রোজ্জ্বল রশ্মিজাল, যখন চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া, সুধারাশি অঙ্গে মাখিয়া, স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়, তখন তাহার অমিয়-স্পর্শে শ্রম-ক্লান্ত মানবের চিত্ত তৃপ্তির এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-রসে পরিপ্লুত হয়। দর্শন বিজ্ঞানের অনাবৃত অনলঙ্কৃত তত্ত্ব সমূহ ও জগতের যাবতীয় অনাবিষ্কৃত সত্যের প্রকাশক বটে, কিন্তু অজ্ঞান-বিজড়িত সংসার-ক্লিষ্ট জন-সাধারণের নিকট উহার দুর্ব্বোধ্যতা বড়ই কঠোর এবং অপ্রীতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার সেই সনাতন তত্ত্বরাশি যখন রসজ্ঞ সাধক ভক্তের কবিত্বপূ

দর্শনবিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিকতত্ত্ব প্রচার সম্বন্ধে কাব্য ও সঙ্গীতের তুলনা।

মানসমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া ভাবুকের ভাবরসে অভিসিঞ্চিত হইয়া কাব্যামৃতে বা সঙ্গীতের সুধাধারায় পরিণত হয়, তখন তাহা পরিতৃপ্ত হৃদয়ে সেবন করিয়া সকলেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাব-রসে বিমুগ্ধ হয় এবং সেই চিরন্তন সত্য সমূহের সন্ধান লাভে সমুৎসুক হয়। ভারতে প্রাচীন ঋষিগণ তপোপ্রভাবে যে সকল সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা শ্রুতি-রূপে নিবদ্ধ হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। কালক্রমে বৈদিক ভাষার ক্রম পরিবর্ত্তনের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য বিন্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল; সেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সমন্বয় বিধানার্থ ও কালানুযায়ী চিন্তাস্রোতের গতি অনুসরণ করিয়া মহর্ষি কপিল প্রমুখ ঋষিগণ সূত্রাকারে ষড়দর্শনের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই অমূল্য রত্নরাজি জ্ঞান সমুদ্রের অভ্যন্তরে বিচরণক্ষম সুধীবর্গেরই উপভোগ্য হইল। কালের আবর্ত্তনে এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত অধিকারী ভেদে সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিবার আবশ্যকতা হইল। এই সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হওয়াতে পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্র প্রণীত হইল। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ভক্ত, অভক্ত, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ শূদ্র, আর্য্য-অনার্য্য, সর্ব্বশ্রেণীর গ্রহণোপযোগী বিষয় সকল নিবদ্ধ হওয়াতে ইহাদের প্রভাব ভারতের সর্ব্বত্র অব্যাহতগতিতে পরিব্যাপ্ত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা সাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত হওয়াতে পুরাণ ও তন্ত্রের বিষয়গুলি প্রাদেশিক ভাষায় প্রচারিত হইতে লাগিল, জ্ঞানও প্রেমের প্রবল প্রবাহ দুরূহ সংস্কৃত ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া দীনহীন অজ্ঞ মানবেরও হৃদয়-ক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়া তুলিল। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেরও কথিত ভাষা ক্রম বিকাশ লাভ করিয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রথম বিকাশের যুগেই কবি কৃত্তিবাস ও কাশীদাস রামায়ণ ও মহাভারতের মহীয়ান চরিত্রগুলির সুস্পষ্ট চিত্র সহজ সুন্দর পয়ার ছন্দে অঙ্কিত করিয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে উপহার পাঠাইলেন। বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শ্রীমদ্ভাগবতের ভাব সাধনার নিগূঢ় রসে অভিষিক্ত হইয়া গীতি কবিতায়

শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া ষড়দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্র-শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা।

প্রাদেশিক ভাষায় শাস্ত্র প্রচার।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্য—সাহিত্যের প্রথম বিকাশ সময়েই উচ্চশ্রেণীর কবিগণের আবির্ভাব।

সকলেরই নিত্য অনুভূতির বিষয় সাংসারিক ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসার এমন একটা মহিমাময় আশ্রয় স্থান দেখাইয়া দিলেন, যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রেমস্বরূপ ভগবানকে সখ্য দাস্যমধুরাদিভাবের কোমল বন্ধনে আবদ্ধ করিবার আশায় ভক্তমাত্রেরই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বঙ্গে বৈষ্ণব ও শাক্ত উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিয়া আসিতেছিল সুতরাং শাক্ত কবিগণও আদ্যা-শক্তির অংশ বিশেষরূপে প্রকাশিতা মনসা চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনোপলক্ষে সুন্দর সুন্দর কাব্যগ্রন্থ রচনা করিলেন। কাব্য হিসাবে এই সকল গ্রন্থ অতিশয় উচ্চস্থান অধিকার করিলেও বৈষ্ণব কবিগণ অসামান্য প্রতিভাবলে ভাব রাজ্যে যেরূপ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, শাক্ত কবিগণ তদ্রূপ পারেন নাই, কারণ বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ভাবের বর্ণনায় হৃদয়ে যে গভীর প্রতিধ্বনি ও আবেগ উত্থিত হয়, মাহাত্ম্য বর্ণনায় তাহা হয় না। শক্তি-উপাসকগণ তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ কোন লীলার বর্ণনা নাই। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণোক্ত ভগবতীর লীলা অবলম্বনেই শাক্ত কবিগণ তাঁহাদের কাব্য রচনা করিতেন। তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালীতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্রী ভগবতীকে মাতৃভাবে উপাসনার কথা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত আছে বটে, কিন্তু কোন কোন ভাগ্যবান শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ব্যতীত, সকলে তাহা গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং নিত্য অনুভূত বাৎসল্যাদিভাবের ভিতর দিয়া বিশ্বজননীকে উপলব্ধি করিবার সাধারণ শাক্তগণের বড় একটা সুযোগ ছিল না। পরবর্ত্তীকালে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিশ্বের আদি জননীকে মাতৃভাবের মাঙ্গল্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর স্বভাব সুলভ লৌকিক মাতৃ-ভক্তির অভ্যন্তরে এক মহিমাময় ধর্ম্মভাবের সন্ধান দিয়াছেন এবং মনোহর পদাবলী রচনা করিয়া ভজন সাধনের এক অভিনব সহজ সুন্দর সরল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই কালীভক্ত সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত-নিচয়ই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

শাক্ত ও বৈষ্ণব কবি।

উপাস্যের মাহাত্ম্য বর্ণন ও মধুরাদি ভাব বর্ণনের তারতম্য।

মাতৃভাবে উপাসনা-প্রণালীর প্রথম প্রচারক—সাধক কবি রামপ্রসাদ।

এই ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতগুলি আমি সমালোচকের বিচার-প্রবণ চক্ষে দেখিতে শিখি নাই; যখন দুঃখ দৈন্যের গুরুভার আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে, যখন জরামৃত্যুর বিভীষিকা আসিয়া ঐহিক ভোগ সুখে[illegible]

স্থায়িত্বের বার্ত্তা মনের মধ্যে ঘোষিত করিয়া যায়, সেই শোক-তাপ নিরাশার সময়ের আশ্রয় ভূমি এই সাধক সঙ্গীতাবলী আমি পূজকের পূতনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। সুতরাং সমালোচনার মাপ কাঠিতে ইহাদের দোষ-গুণের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিব এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি নাই। সুধীগণ ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮—১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনাঢ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহার শিশুকালেই তাঁহাদের সমস্ত অর্থ সম্পত্তি অপহৃত হয় এবং রামপ্রসাদ মাতৃহীন হন। রামপ্রসাদ সেন সংসারী ছিলেন, তাঁহার দুইটি পুত্র দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল, ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। সংস্কৃত ও পারসীভাষায় সম্যক বুৎপত্তি লাভ করিয়া কবি রামপ্রসাদ প্রথমতঃ "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করেন।

প্রথম কাব্য—বিদ্যাসুন্দর।

এই কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাতে যে বিকৃতরুচির বর্ণনা আছে তাহা বঙ্গ সাহিত্যের কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেরই অনুরূপ, সাধক রামপ্রসাদের জীবনের সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই কাব্য রচনা কালে কবি সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ সময়োপযোগী কুরুচির মলিন স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই রুচিদুষ্ট বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ও আদি রসের আচ্ছাদনের ছিদ্র দিয়া রামপ্রসাদের জগজ্জননীর প্রতি নির্ভর ভাবের দিব্য আলোক ফুটিয়া বাহির হইয়াছে;

বিদ্যাসুন্দরের রুচিদোষের অভ্যন্তরে ও কবির নির্ভরভাবের পরিচয়।

গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবির সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্ত ১০০ শত বিঘা নিষ্কর জমী প্রদান করিলেন এবং 'কবিরত্ন' উপাধি দ্বারা তাঁহার যশোমুকুট রচনা করিলেন। তিনি রামপ্রসাদকে নবদ্বীপ যাইয়া তাঁহার রাজ-সভা শোভন করিবার নিমিত্ত বিস্তর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কবির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ভূমি ও উপাধি প্রদান।

কিন্তু কবি তাহাতে সম্মত হইলেন না। সাধনোন্মুখ কবি বুঝিয়াছিলেন যে রাজ সভায় সান্নিধ্যে থাকিলে তোষামোদ বৃত্তির সংক্রামক ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে। এই দিব্য দৃষ্টি প্রভাবেই তিনি

কবির রাজ সভায় যাইতে অসম্মতি।

ভবিষ্যৎ জীবনে সময়ের তীব্র স্রোতের বিপরীত দিকে সন্তরণ দিয়া সাধন রাজ্যের তীর ভূমিতে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচনা কালেই তিনি ২।১টী ভাবোদ্দীপক শ্যামা সঙ্গীত প্রণয়ন করেন এবং স্বীয় জীবনের সুরে মিলিত স্বরচিত সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া বহু পরিশ্রমের সামগ্রী উক্ত কাব্যের পৃষ্ঠায়ই প্রচার করিলেন ;—

বিদ্যাসুন্দর রচনায় ত্রুটির অনুভব ও সঙ্গীত রচনার সঙ্কল্প।

"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত"

বিদ্যাসুন্দরের পর রামপ্রসাদ "কালী কীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণ কীর্ত্তন" নামে দুই খানি গীতি কাব্য রচনা করেন ; এই গীতি কাব্যদ্বয় রচনা কালে রামপ্রসাদের মনে সংস্কৃত কাব্য দর্শনের ও বৈষ্ণবীয় কাব্য অধ্যয়নের প্রভাব যথেষ্ট ক্রিয়া করিতেছিল। "কালী কীর্ত্তনে" গৌরীর অনশন ব্রতে মেনকার স্নেহ প্রকাশ বর্ণনে "কুমার সম্ভব" এর পার্ব্বতী তপস্যার চিত্র হইতে ২।১টি শ্লোকের এক প্রকার পদ্যানুবাদই সংযোজিত করিয়াছেন ;—

"কালী কীর্ত্তন" ও 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব।

"স্বর্গ যদি মনে লয় পিতা তব হিমালয় ;
হিমালয় আলয় সবার।
কিম্বা বাঞ্ছা হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ
রতনে যতন করে কার॥"

ইহা পাঠ মাত্রেই কালিদাসের ;—

"দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথাশ্রমঃ
পিতুঃ প্রদেশাঃ তবদেব ভূময়ঃ।
অথোপযন্তার মলং সমাধিনা
ন রত্ন মন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"

এই শ্লোকটী স্বতঃই স্মৃতি পথে উদিত হয় ;—

কোথাও কোথাও বাঙ্গলা শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দ যোজনা করিয়া ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা ;—

"কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীনো
দীন দয়াময়ি দুর্গে ত্রাহি।
ভীম ভবার্ণবময়ুবু তারয়
কৃপাবলোকনে মাং পাহি॥"

আবার কোথাও সাংখ্য বেদান্ত হইতে পুরুষ প্রকৃতি কিম্বা জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণায়ক দৃষ্টান্ত, ছন্দে গাথিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যথা ;—

"স্ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা ?"
"প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর,
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর।
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা করে নয়, সকল অঙ্গময় বিরাজে যে যখন নিরখি॥"

এইরূপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সংস্কৃত শব্দ ও ভাবের বিন্যাস "কালী কীর্ত্তনের" প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গীতি কাব্যে রামপ্রসাদ বৈষ্ণব কবিগণের ভাষা ও ভাব গ্রহণে ও ত্রুটি করেন নাই।

বৈষ্ণবীয় প্রভাব।

"ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিনী রব উভয়নাদ
পদতল স্থল কমল নিন্দি নখ হিমকর-গঞ্জনা
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরু বিকচ হিমকরাকার
বিবুধ তটিনী বিদনীর, ছলে তনু রঞ্জনা।"

ইত্যাদি পাঠ করিলে অবিকল বিদ্যাপতির পদাবলী বলিয়াই মনে হয়। বৃন্দাবন লীলার অনুকরণে ভগবতীর গোষ্ঠ, রাস, বিচ্ছেদ, মিলন প্রভৃতি সমস্ত ভাবেরই বর্ণনা করিয়াছেন। এই অনুকরণে বর্ণনার প্রচুর পারিপাট্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু যেরূপ গোলাপ ফুলের গাছ চিত্রিত করিতে গিয়া সেই বৃক্ষের শাখায় পদ্ম ফুল অঙ্কনে চিত্রকর যতই চিত্র বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শন করুন না কেন, চিত্রকলাবিৎ অভিজ্ঞের নিকট উহা নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় ; তদ্রূপ বালিকা পার্ব্বতীর হস্তে বেণু ও পাচনবাড়ী অর্পণ করিয়া অলঙ্কারের ঝঙ্কারে ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পরিচ্ছদে তাহাতে নিখিল সৌন্দর্য্যের আরোপ করিলেও উহাতে কাব্য শিল্পীর পরিশ্রম অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে। রাম প্রসাদের সমসাময়িক তাঁহার প্রতিবেশী একজন সাধক ছিলেন, তাঁহার নাম অচ্যুত গোস্বামী, ইনি রামপ্রসাদের কাব্য ও সঙ্গীতের সমালোচনা করিয়া মাঝে মাঝে রহস্যপূর্ণ গান রচনা করিতেন। "কালী কীর্ত্তনে" গোষ্ঠ লীলার অভিনয় লক্ষ্য করিয়া তিনিও কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই, যথা ;—

"কালী কীর্ত্তন" কৃষ্ণলীলার অনুকরণেরচিত অস্বাভাবিক চিত্র।

"না জানে পরম তত্ত্ব,　　কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হ'য়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত,　　যশোদা যাইত,
গোপাল কি পাঠায় রে॥"

যাহা হউক, বৃন্দাবন-লীলার এই অনুকরণ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-বিহীন ছিল না

বৃন্দাবন লীলার অনুকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য — শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরোধ ভঞ্জন।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মিলন-ভূমি প্রস্তুত করাই রামপ্রসাদের লক্ষ্য ছিল। বিষ্ণু ও শক্তিকে, কালী ও কৃষ্ণে তত্ত্বতঃ যে কোন প্রভেদ নাই; "কালী কীর্ত্তনে" গোষ্ঠলীলা বর্ণনোপলক্ষে তাহা তিনি স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন;

"আগে ব্রজপুরে যশোদারে ক'রেছিলে ধন্যা,
এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার।
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥"

এই সাম্প্রদায়িক সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা তাঁহার সঙ্গীতেও লক্ষিত হয়,—

"প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন ক'রোনা দ্বেষাদ্বেষি॥"

"দ্বেষাদ্বেষি" ভঞ্জনের চেষ্টা ব্যতীত 'কালীকীর্ত্তন' রচনায় বৈষ্ণবীয় ভাবের অন্তর্নিবেশের আরও একটা সার্থকতা ছিল। নন্দ যশোদার বাল গোপালের

বৃন্দাবনের বাৎসল্য ভাব গিরিরাণীর বাৎসল্য ভাব বর্ণনার ভিত্তি ভূমি।

প্রতি বাৎসল্যভাব গিরিরাজ ও মেনকার গৌরীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ চিত্রেরই যে শুধু প্রধান অবলম্বন তাহা নহে। বৃন্দাবনের ঐ অপূর্ব্ব ভাব রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তিপূর্ণ চিত্তে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাধন মন্দিরের ভিত্তিরূপে উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে, স্নেহের পুত্তলি, অঞ্চলের নিধি বালিকা কন্যার শ্বশুরালয়ে গমন সময়ের

আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে বৈষ্ণবী ভাবের অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

বিচ্ছেদ এবং তাহার পুনরাগমনকালের মিলন চিত্রে যে বিচিত্র লৌকিক স্নেহ প্রকাশের ছবি অঙ্কিত হয় তাহা বৈষ্ণবীয় উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গীভূত ব্রজধামের ধঅত্যুন্নত বাৎসল্য-ভাব-জ্যোতির স্নিগ্ধ সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল

বলিয়াই কবির "আগমনী" ও "বিজয়া" সঙ্গীতগুলি ভাবুক ও সাধক উভয়েরই সমভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। "অভিজ্ঞান শকুন্তল কাব্যে" কবিকুল শিরোমণি কালিদাস শকুন্তলা বিদায় চিত্রে তনয়া বিশ্লেষ-জনিত করুণ রসের যে অপূর্ব্ব প্রস্রবণ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে যে মধুরতার বিমল উৎস ফুটাইয়াছেন, তাহা কাব্য জগতে অতুলনীয় হইলেও তাহার গতি পার্থিব ভাবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই ; কিন্তু সাধক কবি রামপ্রসাদের বিজয়া সঙ্গীতে অভিব্যক্ত গিরি রাণীর গৌরী-বিচ্ছেদে যে করুণ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, তাহা মানবীয় ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া এক উন্নততর মহিমাময় ভাবরাজ্য অভিষিক্ত করিয়াছে। উষার প্রাক্‌কালে বিহঙ্গম ধ্বনির ন্যায় বর্ষান্তে নির্ম্মল শারদীয় রজনীর শেষ ভাগে জগজ্জননী দশভূজার শুভাগমন সূচিত করিয়া যখন ভক্ত সাধকের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গীত হয় ;—

কন্যা বিদায় চিত্রাঙ্কনে কালিদাসের সহিত তুলনা।

"গিরি ! এবার আমার উমা এলে ;
আর উমা পাঠাব না।
বলে ব'লবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয় ;
এবার মায়ে ঝিয়ে ক'রব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না।
শ্রীকবি রঞ্জন কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ;
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ;
ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥"

তখন রামপ্রসাদের "আগমনী" সঙ্গীতগুলি যে কি অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তিতে মানব হৃদয়কে এক শান্তিময় দেবভূমিতে লইয়া যায় তাহা বাৎসরিক শারদীয় উৎসবের পূর্ব্বে বঙ্গবাসী মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন।

"কালী কীর্ত্তন"এ এবং আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে রামপ্রসাদ সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণবীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীত যাহা সচরাচর প্রসাদী সঙ্গীত বলিয়া কথিত হয় তাহাতে অভিব্যক্ত আদ্যাশক্তি ভগবতীর উপাসনা প্রণালী তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইলেও, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণোক্ত লৌকিক সম্বন্ধাশ্রিত বাৎসল্যাদি ভাবের

মাতৃভাবে উপাসনা পদ্ধতি তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধন পদ্ধতির অনুরূপ হইলেও ইহাতে বৈষ্ণবীয়ভাবের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান।

ভিতর দিয়া, জগৎকারণ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবার উপায় গৌণভাবে রামপ্রসাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

"কিবা কারিকরের আজব্ কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি।
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল
তা'রতলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥"

ইত্যাদি গান সমূহে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস যেরূপ তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র সাধন প্রণালী বৈষ্ণবীয় ভাব সাধনার অন্তর্ভূত করিয়াছেন, রামপ্রসাদ ও তদ্রূপ প্রচলিত শক্তি আরাধনা পদ্ধতির অভ্যন্তরে বৈষ্ণবীয় ভাবের প্রক্ষেপ দিয়া, মাতৃ ভাবে জগদ্ধাত্রীর উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং স্বীয় জীবনে ঐ ভাবে সাধনার অনুষ্ঠান সময়ে অন্তঃকরণ মধ্যে যে ভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে তাহাই মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়া সর্ব্ব সাধারণের উপলব্ধির এক বিচিত্র সামগ্রী রচনা করিয়াছেন। কোন পৌরাণিক সাধক জীবনের ইতিবৃত্তে আমরা মাতৃ ভাবে শক্তি আরাধনার উদাহরণ দেখিতে পাই না। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত সুরথ রাজার আদ্যাশক্তির উপাসনার সহিত রাম প্রসাদের মাতৃ ভাবের উপাসনার একটা পার্থক্য আছে। প্রহ্লাদ, নারদাদি ভক্তগণের ভগবদারাধনার সহিত, ব্রজধামের নন্দ, যশোদা, শ্রীদাম সুদাম, অথবা শ্রীরাধিকার ভাব সাধনার যে প্রভেদ, পূর্ব্ববর্ত্তী শাক্ত সাধকগণের সিদ্ধি লাভের উপায়, এবং রামপ্রসাদের শিশু সন্তানের আব্দার পূর্ণ ব্যাকুলতাময় ক্রন্দনাশ্রুর সাহায্যে জগজ্জননীর প্রসন্নত্ব লাভের চেষ্টার মধ্যেও সেই প্রভেদ বর্ত্তমান। পুত্র পতি বা বন্ধুভাবে ভগবানকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিবার বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় পুরাণে বর্ণিত আছে, কিন্তু জননী ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার কথা বৈষ্ণবীয় উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গত নহে, সুতরাং বৈষ্ণবীয় ভাব সাধনার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিয়া শাক্ত রামপ্রসাদ যে ইষ্ট দেবীকে লাভ করিবার জন্য মাতৃ-ভক্তি রূপ সুবর্ণ সূত্রের সন্ধান দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকতার নিদর্শন আছে, এই মৌলিকতার হিসাবে বাঙ্গালীর সঙ্গীত সাহিত্যে রামপ্রসাদের স্থান সর্ব্বোচ্চ।

বৈষ্ণব কবির তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ ও শাক্ত কবির বৈষ্ণবীয় ভাব অবলম্বন।

মাতৃ ভাবে উপাসনায় রামপ্রসাদের মৌলিকতা।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মধুর রসাত্মক পদ লহরী প্রেমোচ্ছ্বাসের অনুপম অভিব্যক্তি, কিন্তু সেই উন্মাদ কর প্রেম সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার অনধিকারীর অপবিত্র কর্ণে প্রবেশ করিলে, বৈরাগ্যসম্বল ভগবদ্ ভক্তি সুধারসের পরিবর্ত্তে লৌকিক আসক্তির বিষ রাশিও সিঞ্চিত করিতে পারে।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধুর রসাত্মক কবিতা সকলের পক্ষে হিতকর নহে।

রামপ্রসাদের মাতৃ ভাবের সরল সঙ্গীত, আকুলকণ্ঠে উচ্চারিত জননীর আহ্বান গীতি ভাষা ও ভাবের সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্য হিসাবে পূর্ব্বোক্ত পদাবলীর ন্যায় কবিতার রাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে না পারিলেও মাতৃভক্ত সাধকের এই জননী দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত আবেগময় সঙ্গীত তরঙ্গ, ভক্ত অভক্ত, সাধু অসাধু, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলের হৃদয়েই নির্ম্মল বৈরাগ্য পূর্ণ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করে। সুধাকরের অমিয়ময় কিরণধারা সেবনে যেরূপ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার, রামপ্রসাদী শ্যামা সঙ্গীতের আশ্রয় লইয়া জগন্মাতার নিকট আত্ম নিবেদন ও তদ্রূপ ছোট বড় সকলেরই তুল্য অধিকার। সাধক, পুরুষকার বলে পূর্ব্ব সংস্কারের সহিত সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, দরিদ্র কৃষক অন্নের সংস্থান চেষ্টায় দিবস ব্যাপী পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া, বিষয়ী বিষয় সম্ভোগ জনিত অবসাদ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, কিংবা পাপী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া মনের আবেগে যখন গান ধরে ;—

রামপ্রসাদের মাতৃ ভাবের সঙ্গীতের উচ্চ নীচ সকলেরই সমান অধিকার।

"মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করলে আমায় ছটা কলুর অনুগত ॥
মা শব্দ মমতা যুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দেমা চক্ষের ঠুলি দেখি তোর পদ জন্মের মত।
কুপুত্র অনেক হয় না, কুমাতা নয় কখন ত,—
রামপ্রসাদের এই আশা যেন অন্তে থাকি পদানত ॥

[illegible] পরাজয়, শত দুঃখ দৈন্য, শত অবসাদ, শত দহনের ভিতরে ও

সকলেই "মমতাযুত মা" শব্দের অভ্যন্তরে এমন এক অপার্থিব স্নেহ রসের আস্বাদ পায়, দুর্গতি নাশিনী পাপহরা দুর্গানামের জয় গানে এমন এক অভয় বাণী শুনিতে পায়, মহামায়ার মায়ার অন্তরালে এমন এক দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিঃ সন্দর্শন করে, সে জন্ম-জন্মান্তর-লব্ধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভের আশায় ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তির আকাঙ্খায়, পরিণাম দুঃখকর ক্ষণস্থায়ী বিষয়াসক্তির দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, পাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি বারি সেচন করিবার আশ্বাসে, অনন্ত করুণার নির্ঝর স্বরূপিনী জগদম্বার চিরপদানত থাকিবার ইচ্ছা মাতৃ ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় সকলেরই মনোমধ্যে ক্ষণ কালের নিমিত্ত জাগিয়া উঠে; তাই বলিতেছিলাম, জীবজগতে প্রকৃতির উপহার বায়ু ও আলোকের ন্যায় রামপ্রসাদের সঙ্গীত গুলি সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি, মাতৃস্নেহবৎ উহাতে সকল মানব সন্তানেরই তুল্য অধিকার।

সার্ব্বজনীন সাধনসম্বন্ধে প্রসাদী সঙ্গীত, প্রতিভার কাল্পনিক শক্তির পরিচয় স্থল নহে। ইহা গ্রন্থ অধ্যয়ন বা বহু দর্শনের ফল নহে, যশ ও প্রতিপত্তির সুবর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যও ইহা রচিত হয় নাই। ইহা সাধক কবির প্রাণে প্রাণে অনুভূত

প্রসাদী সঙ্গীতে ভক্তি যোগের ক্রম বিকাশ।

ভক্তিযোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ক্রম-অভিব্যক্তি, ইহা ভক্ত জীবনের আধ্যাত্মিক ইতিহাস। ইহা ভক্ত সন্তানের জননী চরণে আত্মনিবেদন ও প্রার্থনার অশ্রুজলে চির পবিত্র। এই শ্যামা সঙ্গীত রচনা কালে সাধক রামপ্রসাদ সাময়িক রুচির উজান স্রোতে সন্তরণ দিয়া, শাস্ত্রবিদ্যা ও লিপিচাতুর্য্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, লোকরঞ্জন ও রাজপ্রসাদের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের এক উর্দ্ধ রাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন। সেই রাজ্যের অধিষ্টাত্রী ইষ্টদেবী শ্যামা মার চরণ যুগলে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিয়া মা-সম্বল শিশুর বেশে কালীভক্ত রামপ্রসাদ কখনও করুণ ক্রন্দনে মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করিয়াছেন, কখনও মৃত্যু ভয় এবং বহির্মুখ প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন; কখনও দর্শনাকাঙ্খায় মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ক্লান্ত হইয়া অভিমানপূর্ণ গঞ্জনায় বাৎসল্যের অধিকার দাবী করিয়াছেন। আবার কখনও জগদম্বার করুণা লাভের গৌরবে উদ্দীপ্ত হইয়া অনন্ত শক্তি রূপিনী পরমেশ্বরীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া প্রতিকূল শক্তি সমূহকে সগর্ব্বে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভোগ্য বিষয়ে দোষ দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগ পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কনের

সহিত, নামে রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া মায়াতীত অবস্থায় চিন্ময়ীর স্বরূপাববোধ পর্য্যন্ত ভগবদনুরাগের ক্রম উৎকর্ষের বৃত্তান্ত আমরা এই সঙ্গীত গুলিতে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখিতে পাই।

বৈরাগ্য ও ভগবদনুরাগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

পরমানন্দ রূপ ইষ্ট লাভ এবং ত্রিবিধ দুঃখ রূপ অনিষ্ট নিবারণই যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতু। মানুষ যখন বিচার দ্বারা ধারণা করিতে পারে যে এই ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহার, বিষয় সেবা দ্বারা সাধিত হইবার নহে, সর্ব্ববিধ সুখ দুঃখের নিয়ামক ভগবৎ শক্তির আশ্রয় গ্রহণই উহার একমাত্র উপায়, তখনই তাহার চিত্তে ভগবদনুরাগের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়, সুতরাং ভক্তির প্রথম উন্মেষ সময়েই সাংসারিক ভোগ্য বিষয়ে দোষ দর্শন অনিবার্য্য। এই দোষদর্শন সময়ে বিষয়োন্মুখ মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না, অভ্যস্তপথে গমনশীল অশ্বের ন্যায় বিচার-বুদ্ধির শাসন মানিতে চাহে না, বহুকাল প্রবৃত্তির অধীনে থাকিয়া নিবৃত্তির নিকট বিক্রীত হইলেও গৃহ পালিত পশুর ন্যায় কিছুতেই তাহার বশীভূত হইতে চাহে না, পূর্ব্ব সংস্কার বশে সুখের আশায়, ধন, জন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয় সমূহের দিকে উধাও হইয়া ছুটিতে চায়, নিখিল সুখের নিদান স্বরূপ সর্ব্ব-দুঃখ-হরা বিশ্বজননী ভগবতীর শরণ গ্রহণই যে ইষ্ট সিদ্ধির এক মাত্র উপায়, তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। সুতরাং এই অবস্থায় বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত সাধকের দুর্দ্দমনীয় মনকে নানা রূপ প্রবোধ দিতে হয়।

ভোগ্য বিষয়ে দোষ দর্শন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামপ্রসাদ সংসারী ছিলেন, সংসারে পুত্র কন্যা পরিবৃত অবস্থাতেই তিনি সাধনা আরম্ভ করিয়া ছিলেন ; রাজানুগ্রহ ও কবি যশ, স্বজন স্নেহ ও ভোগেচ্ছা প্রবল শক্তিতে তাঁহাকে বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শ্যামা মায়ের চরণ ছায়া ব্যতীত, অন্য আশ্রয় অবলম্বনের পরিনাম কি! কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কার গুলি হৃত রাজ্য বিতাড়িত দস্যু রাজের ন্যায় সুযোগ পাইলেই তাঁহার হৃদয় সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত বারংবার তাঁহাকে সবলে আক্রমণ করিতেছিল। সুতরাং সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদেরও প্রথমাবস্থায় প্রবৃত্তির অনুচর বৃন্দের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। এই সংগ্রাম সময়ে ইন্দ্রিয় বর্গের পরিচালক মনকে বশীভূত রাখিবার জন্য কত ভাবে যে প্রবোধ দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল ভক্তি মূলক বৈরাগ্য পূর্ণ প্রবোধ বাক্য সঙ্গীতে অভিব্যক্ত করিয়া ভক্ত রামপ্রসাদ

নিজেই যে শুধু আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। পরবর্ত্তী ধর্ম্মার্থিগণের বৈরাগ্য সঞ্চয়ে যথেষ্ট সহায়তাও করিয়াছেন। যখন ভক্ত কণ্ঠে গীত হয় :—

"মন ক'রোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে ল'বে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্ম তনয়,　　ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হ'য়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁইতে শিবের দৈন্য দশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশা বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন ক'রোনা এ কথায় গোসা॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি　　করে পূরাইবে আশা॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া;
এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা॥
ওরে মনের মতন কর যতন;
রতন পাবে অতি খাসা॥"

তখন সকলেরই ক্ষণস্থায়ী বিষয়সুখের আশা ছাড়িয়া কৈবল্য দায়িনী মা অভয়ার চরণ যুগলে আশ্রয় প্রার্থনার আকাঙ্খা স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এই সরল সঙ্গীতের ছোট ছোট কথা এবং সর্ব্বজন বিদিত দৃষ্টান্তের মধ্যে সুক্ষ্মভাবে মনোভাব বিশ্লেষণের এমন এক বিচিত্র শক্তি নিহিত আছে যে উহা চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেই অন্তরস্থিত দুর্ব্বলতা গুলি অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত মিশ্রিত থাকিয়া আর আত্মপ্রবঞ্চনার সাহায্য করিতে পারে না। পরস্পর বিভক্ত হইয়া বিবেক বুদ্ধির লক্ষ্যীভূত হয়। হর্ষের মধ্যে বিষাদ আছে, সুখের ভিতর দুঃখের বীজ রহিয়াছে, ইহা যুক্তি বলে বুঝিলেও বিষয়োন্মুখ মন সহজে তাহা মানিতে চাহে না। অবুঝ বালকের ন্যায় সুখের আশায় গোঁসা করিয়া থাকে, এই গোঁসা ভাঙ্গিবার জন্য ডাকের কথা অবলম্বনে, কি সুন্দর প্রবোধ বাক্য রচিত হইয়াছে। আবার এই অবস্থায় কপট ভক্তির আশ্রয় লইয়া বিষয় সেবা ও ভগবদুপাসনা এই উভয় দিক বজায় রাখিবার নিমিত্ত মনের স্বাভাবিক ইচ্ছায়

প্রতিই বা কি তীব্র কটাক্ষ স্বল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই রূপে যখন যেরূপ দুর্ব্বলতা আসিয়া মনকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই তাহা লক্ষ্য করিয়া ভক্ত সাধক মনের আবেগ সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। যখন আলস্য অথবা নিরর্থক কর্ম্মের ইচ্ছা আসিয়া সাধন পথের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তখন পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্মহীনতা বা নিস্ফল কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচন অশ্রুতে হৃদয় সিক্ত করিয়া ভগবদ্ বিশ্বাসের বেড়া দিয়া হৃদয় ক্ষেত্রের সদ্ভাব শস্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাম-প্রসাদ গান ধরিয়াছেন।

সাধনসময়ে আলস্য অথবা বৃথা কর্ম্মে আসক্তি নিবারণ চেষ্টা।

"মনরে কৃষি কাজ জাননা।
এমন মানব জমী রইল পতিত
আবাদ কল্লে ফল্‌ত সোণা।
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেসেনা॥"

ইত্যাদি।

কখনও বিতাড়িত বিষয় তৃষ্ণা গুলি অতর্কিতভাবে আসিয়া মনের মধ্যে কোনরূপে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য সতর্ক সাধক মোহ নিদ্রাকে চিরতরে বিদায় দিবার আশায় গাহিয়াছেন;—

সর্ব্বসময়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

"জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেওনারে ভোলা মন ঘুমেতে হারাবে ধন॥
নবদ্বার ঘরে, সুখ শয্যা করে,
হইবে যখন অচেতন।
তখন আস্‌বে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ্;
হ'রে লবে সব রতন॥"

নিদ্রার সময় যখন মনের উপরে কর্তৃত্ব থাকে না তখনও যেন সংস্কার রূপ বিষয় বাসনা উদিত হইয়া বহু সাধনালব্ধ বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়ের অমূল্য রত্ন রাজি অপহরণ করিতে না পারে তজ্জন্য সাধকের সচেষ্টতার ভাব এই গানে অপূর্ব্বভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

অভ্যাস বলে নিদ্রা সময়ে মনোবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিলেও

সাধকের সমস্ত আশঙ্কা তিরোহিত হয় না। দেহাবসান সময়ে যখন সমগ্র ইন্দ্রিয় বর্গের ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। যখন চিন্তা শক্তির বিষয় নির্দ্ধারণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, তখন যদি পূর্ব্ব জীবনের কোন অশুভ মুহূর্ত্তে সঙ্কলিত কোন বিষয়াসক্তির ছবি চিত্তপটে উদিত হয় তাহা হইলে বহু যত্নের বহু পরিশ্রমের সাধন ভজন অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় বিচারশীল সাধকের মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়, তাই রামপ্রসাদ ইষ্ট চিন্তাকে স্বভাবে পরিণত করিয়া শেষের সেই শঙ্কট সময়েও প্রবুদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত গাহিয়াছেন ;—

শমন বিজয়।

"তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছেরে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর তারা নামের ঢাল।
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে কর্‌তে পারে জোর॥
কালী নামে নহবৎবাজে করি মহা জোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর॥"

এই ভাবে কালের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিবার চেষ্টায়, মৃত্যুভয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, নিদানকালে দৃঢ় চিত্ত থাকিবার সঙ্কল্পে বরাভয়প্রদায়িনী, সর্ব্বকলুষনাশিনী, শমনভয়নিবারিনী রাজরাজেশ্বরী, ইষ্টদেবী, মহেশ্বরীর শরণ গ্রহণে ব্যাকুলতা রামপ্রসাদের অনেক গানেই লক্ষিত হয়। কখনও শমনের নিকট কালীনাম করিবার সময় প্রর্থনা করিয়া গাহিয়াছেন ;

"তিলেক দাঁড়াওরে শমন।
বদন ভরে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী—
এসেন কি না এসেন দেখিরে।"

কখনও ব্রহ্মময়ী শ্যামা মায় বাৎসল্যের গর্ব্বে স্ফীত হয় হইয়া যম দূতেরে বিতাড়নের সুরে গাহিয়াছেন।

'দূর হ'য়ে যা যমের ভটা,
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।

বল গে যা তোর যম রাজায়ে
আমার মতন নে'ছে কটা
আমি যমের যম হইতে পারি ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা।"

আবার কখনও যোগ সাধনায় কথঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করিয়া আত্মপ্রসাদের ছন্দে গান ধরিয়াছেন ;—

"শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্দ দূরে গেছে॥
(ওরে) আমার ঘরের নবদ্বারে।
চারি শিব চৌকি রয়েছে॥" ইত্যাদি।

মৃত্যু সময়ের জন্য ব্যাকুলতার তাৎপর্য্য।

এই যে মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে ইহার একটা বিশেষ অর্থ আছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—

"যং যং বাপি স্মরণ, ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥"

অর্থাৎ "যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহ ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।"

এই ভগবদ্‌বাক্যে স্থির বিশ্বাসই সাধকগণের মৃত্যু সময়ে ইষ্ট চিন্তায় স্থিতি লাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্নের হেতু। শাস্ত্রজ্ঞ রামপ্রসাদেরও অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হওয়াতেই, আমরা তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের চিন্তায় ব্যাকুলতার নিদর্শন দেখিতে পাই।*

ক্রমশঃ।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

* কাঁথি সারস্বত সম্মিলনীতে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

সোণার বাঙ্গলা।

নমি তব পদ যুগে হে বঙ্গ জননি
সুজলা শ্যামলা তুই জননী মোদের।
ওই তোর পদ প্রান্তে চুমিয়া অবনী,
বহিতেছে উর্ম্মি মালা বঙ্গসাগরের।

মাথার কিরীট তোর—শুভ্র হিম রাশি
শ্যামলা ধরণী তোর হেম সিংহাসন,
ঐ হের অদূরেতে রহিয়াছে বসি
সুচিত্রিত রাজ ব্যাঘ্র তোমার বাহন।

তারকা খচিত নীল নির্ম্মল আকাশ
বিরাজিছে ঊর্দ্ধে যেন রাজ চন্দ্রাতপ,
চামর ব্যজন করে সদাই বাতাস,
রাজছত্র রূপে বট নিবারে আতপ।

কে আছে তোমার সম কহ গো জননি,
তব সম শ্যাম ক্ষেত্র বল আছে কার ?
লহরী লইয়ে কত শত তরঙ্গিনী
অবিরত তব বুকে করিছে বিহার।

কোথায় বিহগ এত প্রাণ খুলে গায়
কোন দেশে হয় এত রাশি রাশি ধান ?
কোন দেশে সন্তানেরা কহ এত পায়
স্নেহময়ী জননীর বুক ভরা টান ?

কোন দেশে ছায়া কহ এত সুশীতল
কোথা কহ ফুল ফল এত বা মধুর ?
কোথা আছে হেন স্নিগ্ধ নদী ভরা জল
কোথা করে বৃক্ষ ছায়া এত ক্লান্তি দূর ?

নয়নের মনোরম হে বঙ্গ কল্যাণি।
শ্যাম আস্তরণ ঢাকা পল্লী বাটী তোর,
পূজিবার তরে তোর রাঙ্গা পা দুখানি,
ঝরে ফুল গাছ হতে হইয়া [illegible]!

নির্ম্মল শারদ রাতে উজলি অম্বর,
কোন দেশে কত চাঁদে সাজে এত হাসি?
থরে থরে শোভা করি থাকে সরোবর
কোথা এত বিকশিত শতদল রাশি

ফুটন্ত জোছনা মাখা নীলাকাশ তল,
হেরি যবে পল্লীরাণি নৈশছবি তোর,
কিম্বা যবে দেখি তোর ছায়া নদী জল,
হৃদি খানি হয়ে উঠে আনন্দে বিভোর।

চঞ্চলা তটিনী যবে ধায় মৃদু তানে,
প্রভাত গগনে যবে উঠে হেম রবি,
পিক কণ্ঠ কল তান মিশে সমীরণে
এ সবার মাঝে আমি হেরি তোর ছবি।

হে বঙ্গ জননি তব তটিনীর জলে
হৃদয়ের ভালবাসা আছে গো লুকান?
কিম্বা তরু জাত তব সুমধুর ফলে
স্বরগের শোভা বুঝি আছে না মিশান?

নতুবা যখন থাকি দূরে গো জননি!
হেরিয়া তথায় শ্যাম কিশলয় দল,
কিম্বা যবে হেরি দূরে শ্যাম তরঙ্গিনী,
তব স্মৃতি করে কেন পরাণ বিকল?

তিনি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই তাঁহার অপরাধ। দশরথের ন্যায় পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলে তাহাকে বিড়ম্বনা সহ্য করিতেই হইবে। পিতার দোষে পুত্র দণ্ডিত হয়। দশরথের অপরাধ কি তাহা বলিতেছি।

রাজা দশরথের অনেক গুণ ছিল। তিনি সত্যসন্ধ, প্রজারঞ্জক, স্নেহশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি গুরুতর দোষ ছিল। প্রথম দোষ অবিমৃষ্যকারিতা। তিনি অনেক সময় বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিয়া ফেলিতেন। যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাহার ফল কি দাঁড়াইবে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেন না। এই দোষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কৈশোরে নিরপরাধ ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণ সংহার করেন; যৌবনে কৈকেয়ীকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হন; এবং বার্দ্ধক্যে প্রিয়তম পুত্র রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন।

সে অনেক দিনের কথা। দশরথ তখন যুবরাজ,—বালক মাত্র। বর্ষাকালের রাত্রি, ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন। দশরথ মৃগয়ার্থে বহির্গত হইলেন। সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, যেন কোন একটা হস্তী, জলে নিমজ্জিত হইয়া শব্দ করিতেছে। যেমন ধারণা হইল, অমনি শর নিক্ষেপ। ভাবিলেন না যে শব্দকারী হস্তী হইতে পারে মানুষও হইতে পারে। শরত্যাগের পর মুহূর্ত্তেই এক মানবের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। কম্পিত হৃদয়ে, দ্রুতপদে গিয়া দেখেন এক ঋষিকুমার তাঁহার বজ্রকঠিন শরে বিদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু হইয়াছে। হায়, তিনি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছেন! হস্তিভ্রমে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছেন! কিন্তু আর অনুতাপ করিয়া কি হইবে? অবিমৃষ্যকারিতার ফল এইরূপই হয়। পুত্রশোকে ঋষিকুমারের বৃদ্ধ জনকজননীর মৃত্যু হইল, ঋষি মৃত্যুকালে দশরথকে এই অভিসম্পাত দিলেন:—

"পুত্র ব্যসনজং দুঃখং তদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি॥"

ইহা অভিসম্পাত নহে; সূক্ষ্মদর্শী ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার পর যদি তিনি সাবধান হইতে পারিতেন, যদি তিনি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে অভ্যাস করিতেন তবে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার পুত্রশোকে শোচনীয় মৃত্যু ঘটিত না। আর একদিন তখন তিনি যুবাপুরুষ, তখন তিনি রাজা—দশরথ কোন দানবের সহিত যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত কলেবরে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হন। তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ী তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র

হইতে দূরে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার ক্ষতস্থান আরোগ্য করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। আরোগ্যলাভ করিয়া রাজা কৈকেয়ীর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেন ও তাঁহাকে যে কোন দুইটি বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভাবিলেন না, বুঝিলেন না যে, যে কোন বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিতে যাওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ কি হইতে পারে? রাণী এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করিতে পারেন, যাহাতে রাজার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। হইয়াছিলও তাহাই। যাহা হউক, রাজার দুর্ভাগ্য বশতঃ রাণী তৎকালে কোন বরই প্রার্থনা করিলেন না, ভবিষ্যতে করিবেন বলিলেন। দশরথ কিন্তু প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া রহিলেন।

ইহা ছাড়া দশরথের আর একটি দোষ ছিল; সেটি বহু বিবাহ। বহু বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্র যে সর্ব্বতোভাবে ইহার অনুমোদন করেন এমন বোধ হয় না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং," এই শাস্ত্র বাক্য হইতে বুঝা যায় পুত্রের জন্যই বিবাহ; যদি প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে পুত্র না জন্মায়, তবেই পুরুষ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে। ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। যতদূর জানা যায় রঘুবংশীয়েরা কখন অনর্থক দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতেন না। "প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্" দশরথ রঘুবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও তাঁহার বংশের চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মহাদোষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমা মহিষী কৌশল্যার সন্তান জন্মিল না বলিয়া তিনি যে অপর বিবাহ করিয়াছিলেন, এমন কথা বুঝা যায় না। সুতরাং একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া তিনি বিষম অনর্থ জালে জড়িত হইয়াছিলেন। ইহার পরিণাম রাম বনবাস।

সাধারণতঃ দেখা যায় যাঁহারা বহু বিবাহ করেন, পত্নীগণের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ কলহদ্বারা তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণ রণস্থলী হইয়া উঠে। কিন্তু এ বিষয়ে দশরথ সৌভাগ্যবান্ ছিলেন। তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে কলহ ছিল না। মহিষী-গণ সপত্নী পুত্রকে নিজ পুত্রের ন্যায়ই স্নেহ করিতেন। রামাভিষেক সংবাদ শুনিয়া কৈকেয়ী মন্থরাকে নিজকণ্ঠহার উপহার দিয়াছিলেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের মধ্যেও বেশ সদ্ভাব ছিল। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে বোধ হয়, বহু বিবাহ করায় দশরথের গৃহে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই। বোধ হয় যেন বহু বিবাহ করিয়াও দশরথ মহাসুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা কি হইতে পারে? বিধির বিধান যে অন্যরূপ। যাহা মন্দ তাহার ফল কি কখন ভাল হইতে পারে?

যদি মানবের কোন দোষ থাকে, তবে তাহাকে একবারে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। তুমি যতই দূরদর্শী হও, যতই সাবধান হও, কোন না কোন সময়ে সেই দোষে তোমাকে বিপন্ন হইতেই হইবে, দোষ যতই সামান্য হউক না কেন, সে কালে নিশ্চয়ই কুফল প্রসব করিবে। বহু বিবাহের যে সকল দোষ সাধারণতঃ লক্ষিত হয় দশরথের গৃহে সে সকল প্রকাশ না পাইলেও, এক কোণে একটা অনর্থের বীজ পড়িয়া ছিল সেটার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হয় নাই—এইটি দাসী মন্থরা।

নবপরিণীতা বধূ পিতৃগৃহ হইতে স্বামিগৃহে আসিলে পিতৃ পরিবারের প্রতি তাহার যে আকর্ষণ ছিল তাহা ত্যাগ করিতে হয় ও স্বামী পরিবারের প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট হইতে হয়। যে বধূ ইহা পারে না, সে শ্বশুর গৃহে নানা অশান্তির সৃষ্টি করে। এই জন্য স্বামীর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নববধূকে স্নেহ মমতা দ্বারা নিজের করিয়া লওয়া। স্বামীর স্নেহে, সপত্নীগণের সখিত্বে কৈকেয়ী দশরথের পরিবারবর্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ যে মন্থরা, তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে আনীতা দাসী—সে দশরথের পরিবারভুক্তা হইতে পারে নাই। সে কৈকেয়ীর দাসী, দশরথের পরিবারের দাসী নহে। দশরথের পরিবারের ভাল হউক তাহা তাহার কামনা নহে—কৈকেয়ীর ভাল হউক এই তাহার কামনা। তাই যখন সে রামের অভিষেক বার্ত্তা শুনিল তখনই সে ঈর্ষায় জ্বলিয়া গেল। কৌশল্যাপুত্র রাম তাহার কে? রাম রাজা হইলে তাহার লাভ কি? কিন্তু ভরত রাজা হইলে তাহার মাতার দাসী বলিয়া তাহার সম্মান বাড়িবে। এই ভাবিয়া সে কৈকেয়ীকে সপত্নী পুত্রের অভিষেকের কথা বলিল, কৈকেয়ী কিন্তু অতীব হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার কাছে রাম রাজা হইলেও যাহা, ভরত রাজা হইলেও তাহাই।

"রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।"

কৈকেয়ীর কাছে রামের সহিত ভরতের কোন পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু মন্থরার কাছে আছে, তাই সে নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা কৈকেয়ীকে নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মন্থরার পঙ্কিল কথায় তিনি ক্রমে রাম ও ভরতে পার্থক্য দেখিতে পাইলেন রামকে সপত্নীপুত্র বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল, রামের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিল; শেষে স্থির হইল যে রামের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে। হইলও তাহাই। রাম বনে গেলেন।

যদি দশরথ বহুবিবাহরূপ মহা পাপের অনুষ্ঠান না করিতেন, যদি আবার

কৈকেয়ী পিতৃগৃহ হইতে একটা দাসী না আনিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দশরথের সুখের সংসারে দুঃখানল জ্বলিত না।

দশরথের তৃতীয় দোষ, তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির অভাব। প্রথমেই ত তিনি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কৈকেয়ীকে যে কোন বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহার পর যখন কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা করিল, তখন তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে তিনি ধর্ম্মতঃ তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য কি না? অবশ্য তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য, নচেৎ রামকে বনে পাঠাইবেন কেন? কিন্তু এখানে তাঁহার একটা মহা ভুল হইয়া গেল। যদি কৈকেয়ী রামের বনবাস প্রার্থনা না করিয়া বলিত যে ছুরি দিয়া রামের সর্ব্বাঙ্গের মাংস একটু একটু করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তখন দশরথ কি করিতেন? তিনি ত সত্যভঙ্গের ভয়ে রামকে বনে পাঠাইয়াছিলেন. সত্য ভঙ্গের ভয়ে তাঁহাকে রামের মাংস কাটিয়া ফেলিতে হইত। এখন পাঠক বলুন দেখি দশরথের কাজটা ঠিক হইয়াছিল? আমিত বলিব ঠিক হয় নাই দশরথের উচিত ছিল কৈকেয়ীর কথা অগ্রাহ্য করা—তাঁহার বলা উচিত ছিল "আমি তোমার ওরূপ করিতে পারিব না। তোমার কথা শুনিলে আমার অধর্ম্ম হইবে, না শুনিলে ধর্ম্ম হবে।"

এক যুগের পর স্বয়ং ভগবান কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে স্পষ্ট ভাবে ঐরূপ কথাই ঠিক বলিয়া গিয়াছেন। অর্জ্জুন একটা বেয়াড়া রকম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কেহ যদি তাঁহাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলে, তবে তিনি তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন। যুধিষ্ঠির একদিন রাগ করিয়া তাঁহাকে ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন। আর কথা নাই। অমনি অর্জ্জুন তরবারি লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত। শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে কি কোন অন্যায় কাজ হইতে পারে? তিনি অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে "ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করাই তোমার অন্যায় হইয়াছিল—ঐ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া একটা মহাপাপ করিতে হয়; অতএব ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেই পুণ্য, পালনেই পাপ।" কিন্তু দশরথ এ কথাটা নিজে বুঝেন নাই বা অপর কেহ তাঁহাকে বুঝায় নাই। তাই সত্য রক্ষা দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করিতে গিয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনে দিয়া মহাপাপ অর্জ্জন করিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে হইল। পুত্রশোকে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

এই সকল কারণে রামচন্দ্রের বনবাস হইয়াছিল। খানকা এক ব্যক্তিকে

দণ্ড দেওয়া হয় না। যাহা হইবে তাহার একটা কারণ থাকা চাই। সুক্ষ্মদর্শী মহাকবিগণ জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিতে পারেন না। যদি কোন মহা কবির গ্রন্থে এরূপ নিয়মের ব্যতিচার দেখা যায় তবে বুঝিব যে তাহা কাঁচা হাতের লেখা—মহা কবির লেখা নহে। পাঠকগণকে এই কথাটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। আমি যখন সীতার বনবাসের কথা বলিব তখন এগুলি কাজে লাগিবে।

কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, রামের এই মহাদুঃখ হইয়াছিল বলিয়াই আপনি রামায়ণ পাইয়া পরম সুখী হইয়াছেন—দুঃখ হইতেই আপনি সুখ পাইতেছেন।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

কুরুক্ষেত্রে।

কি ধূসর,—কি উন্মুক্ত,—কি বিরাট এই প্রান্তর! দাঁড়াও, থেমে চল—; একটা জাতি একদিন এখানে যুদ্ধ করেছিল। না, সে শুধু যুদ্ধ নয়। একটা জাতি তার সমস্ত সাধনা নিয়ে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই সেই ধূলি! আর এই সেই পরিত্যক্ত শ্মশান!

ধূ ধূ করিতেছে এই প্রান্তর। দূরে ঐ প্রান্তসীমায় সূর্য্য ডুবিয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের শেষ রণ কবে শেষ হইয়াছে; ক্ষত্রিয়ের সে বীর্য্য কাহিনী কবে এই ধূলির সঙ্গে শেষ চিতাশয্যা রচনা করিয়া মিশিয়া গিয়াছে; তবু প্রতি প্রভাতে এখানে সূর্য্য উঠিতেছে, প্রতি সন্ধ্যায় ডুবিয়া যাইতেছে। যে সূর্য্য একদিন এখানে ডুবিয়াছে,—এ জাতির ভাগ্যে সে সূর্য্য কি আর উঠিয়াছে? কোন দিন উঠিবে কি না কে জানে?

আকাশের গায়, শেষ রক্তরশ্মি অতি ম্লান আভায় মিলাইয়া গেল। হেমন্তের সন্ধ্যা, এই প্রান্তরের বুকে, স্মৃতি দিয়ে, ছায়া দিয়ে, কি এক নির্জ্জন পরিমার প্রশান্ত ছবি আঁকিয়া তুলিল। প্রকৃতি ও ইতিহাস, একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিল, একে অন্যের শরীরে মিশিয়া গেল। স্তব্ধ মৌন মহিমা, নিশ্চল উদাসীন স্থির দৃষ্টি—; একি! এমন দেখি নাই, এমন দেখিব না!

* * * কুরুক্ষেত্র! আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছিলাম—; কিন্তু তোমায় দেখিতে পারিলাম না। অশ্রুতে আমার চক্ষু ছাইয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম, তুমি শুধু একটা স্মরণাতীত কালের সত্য মিথ্যা বিজড়িত যুদ্ধক্ষেত্র মাত্র।

না, না, অতীত ভারতের বিলুপ্ত গরিমার পাদপীঠ, তোমাকে আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। যে জাতি তোমার বুকে যুদ্ধ করিয়াছে, পৃথিবীর সে এক ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি। যে যুদ্ধ তোমার বুকে হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর সে এক শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ। তীর্থ, তীর্থ, মহাতীর্থ তুমি; তোমার ধূলিতে কি করিয়া পা ফেলি; তোমার ধূলিতে আমার মাথা লুটাইতে দাও।

* * * ঐখানে যোদ্ধারা প্রভাতে অবগাহন করিতেন। ঐখানে ভীম শরজালে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিয়া, কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ধরাইয়াছিলেন; 'ভারত-যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবনা' সে প্রতিজ্ঞা অবশেষে ভগ্ন হইয়াছিল। ঐখানে বীর শরশয্যায় শুইয়াছিলেন, অর্জ্জুন মুমূর্ষু তৃষিত বীরকে গাণ্ডীব হস্তে, সপ্ততাল ভেদ করিয়া, পাতাল হইতে গঙ্গা আনিয়া সে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন,—এই সেই বাণ গঙ্গা! ঐখানে মাতা কুন্তী বীর কর্ণকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন; ক্ষাত্রবীর কোন লোভে সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। আবার ঐখানে ভীম দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধ, ঐখানে সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় যুদ্ধে ক্ষাত্রশিশু অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল। ভারতের এই সেই সমরক্ষেত্র! এখানে সেই ক্ষাত্রধর্ম্মের তেজোদৃপ্ত অতীত মহিমা, প্রতি ধূলি কণায় লুকায়িত রহিয়াছে!

পৃথিবীতে যুদ্ধ করে নাই কোন্ জাতি? কিন্তু কোন্ জাতি কবে যুদ্ধের নিশানে এমন নীতি কথা ঘোষণা করিয়াছিল? বলিতে পার, কোথায় জগতে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মানুষ এমন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিল? জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির এমন মহাবাক্য পৃথিবীর কোন্ যুদ্ধে উচ্চারিত হইয়াছিল? জগতে যাহা হয় নাই, ভারতে তাহাই হইয়াছিল। মানুষ যে মহামিলনের স্বপ্ন আজ দেখিতেছে, সে বিরাট বিশ্বরূপ একদিন এই যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অন্ধ ভারত, কিছুই কি দেখিতে পাওনা? রে পতিত জাতি,—এতই কি বধির হইয়া গিয়াছ? "ক্লীব হইওনা, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ"—এ বাণী কি একদিন এই প্রান্তরে বৃথা উচ্চরিত হইয়াছিল? বৃথায়?

* * * রজনীর অন্ধকার আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই অন্ধকারে কুরুক্ষেত্র ডুবিয়া গেল; এই অন্ধকারে সমস্ত ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হইল। আমি এই মহা সমাধিক্ষেত্রে এই মহাতীর্থের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছি? দেখিতেছি,—ভারতবর্ষ খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি প্রাণহীন পণ্ডতর্কে, যুক্তিহীন আচার নিয়মে, এই বিশাল হিন্দুজাতি পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের মত অসার পড়িয়া আছে। দেখিতেছি—ইতিহাসের বিচিত্র ধারা

যুগে যুগে আসিয়া এখানে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে কত ধর্ম্ম কত সভ্যতা, কত সমাজবিধি, এক মহামিলনের প্রতীক্ষায় আজ এই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চলিবার পথ পাইতেছে না। দেখিতেছি, মিলনের পূর্ব্বাভাসে সংঘর্ষণ ও বিরোধে, জাতীয় জীবন সংক্ষুব্ধ হইতেছে। এমন সময় চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। একটি জ্যোতিরেখাতে সমস্ত বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিলাম সেই শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, সেই ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ গোলকবিহারী, খণ্ড ভারতে এক অখণ্ড মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা সেই অর্জ্জুন সারথী, আবার আসিতেছেন। আবার ভারতে এই বহুধর্ম্ম, বহু সভ্যতা, বহু বিরোধের মধ্যে মিলনের মহামন্ত্র বিশ্বশঙ্খে ঘোষিত হইবে; সমস্ত জগতে তার প্রতিধ্বনি ছুটিবে। বিস্মিত পৃথিবী অবসর, আশায় আনন্দে চাহিয়া দেখিবে। আসিবে,—সেদিন আসিবে। কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে আবার শিব সাধনায় বসিয়াছেন— আবার সেখানে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান হইবে। সে মঙ্গলে ভারত দাঁড়াইবে, জগৎ জুড়াইবে, পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি একসঙ্গে ভগবানের জয় গান গাহিয়া উঠিবে।

একি শুধু কল্পনা? শ্রান্ত পথিকের পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুধু একটা ব্যথার উচ্ছ্বাস? কে জানে, কে বলিতে পারে?

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

নৈমিষারণ্যে সম্মিলিত শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণের সমক্ষে, তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা নামক সূত এই ভাগবত শাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। উগ্রশ্রবা অবশ্য ভাগবতের রচয়িতা বা সঙ্কলয়িতা নহেন, ব্যাসদেব নারদের উপদেশ অনুসারে বিশেষভাবে যুগধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসাধনাকে এক বিরাট সমন্বয়ের সূত্রে আনয়ন করিবার জন্য এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সূত এই গ্রন্থ স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থের মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য তিনি জানিতেন, এই জন্যই তিনি ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরে এই শাস্ত্র বর্ণনা করেন।

ভাগবত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষভাবে এই সূতের পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি কি গুণে এই ভাগবত শাস্ত্রের মর্ম্মবিৎ

[illegible] বলিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে আমরা [illegible] অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য একটি [illegible] দ্বার প্রাপ্ত হইব। [illegible] ঋষিগণ অবশ্যই সূতকে চিনিতেন—নতুবা সভাস্থলে অকস্মাৎ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া এত আনন্দিত হইলেন কেন এবং আদর পূর্বক তাঁহাকে বিবিধ প্রশ্নই বা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নহে, ঋষিগণ অতি স্পষ্ট ভাষায় সূতকে বলিলেন—

"ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং॥" ১।১।২২

"আমরা পুরুষ সকলের সত্বনাশকারী দুস্তর কলি-সাগর উত্তীর্ণ হইতে মানস করিতেছিলাম, এমন সময় তুমি আসিয়া উপস্থিত হইলে। তুমি কর্ণধার সদৃশ। তোমার দর্শনলাভ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।"

শৌনকাদি সুপ্রসিদ্ধ ও সাধনশীল ঋষিগণ যাঁহাকে এতাদৃশ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করেন, তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা, কি গুণে তিনি এরূপ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন তাহা অবধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। তবে এ বিষয়ে সেই ঋষিগণই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা সেই ঋষিগণেরই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া সূতকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি সূতকে বুঝিতে পারিলে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার একটি দ্বার প্রাপ্ত হইব।

ঋষিগণ সূতের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ত্বয়া খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশাস্ত্রাণি যান্যুত॥" ১।১।৬

(আখ্যাতানি ব্যাখ্যাতানি—শ্রীধরঃ) শ্লোকটির সরল অর্থ এই, "হে অনঘ তুমি মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাসের সহিত পুরাণ ও ধর্ম শাস্ত্র সমূহ কেবল যে অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নহে, তাহাদের ব্যাখ্যাও করিয়াছ।"

উদ্ধৃত শ্লোকের 'অনঘ' শব্দটি বড়ই ব্যঞ্জনাপূর্ণ (suggestive) [illegible] রূপে আলোচ্য। 'অঘ' শব্দের অর্থ কি? [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

তাহারা মন্দ, একজন আমার প্রশংসা করে আর একজন আমারই নিন্দা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিশেষত্বের সীমা নাই। এই যে বিশেষত্ব, ইহার কারণ কি? হিন্দু শাস্ত্র বলেন ইহার কারণ জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার। এই বিশেষত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া মানুষ 'সত্য'এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না। একজন লোক দেশের জন্য বা সমাজের জন্য দিনরাত্রি নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতেছে, একজন স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা মনুষ্য মনে করিতেছে, ইহাতে তাহার নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে, তাহার এই ছদ্মবেশের অন্তরালে নিশ্চয়ই কোন লাভের প্রত্যাশা আছে, নতুবা সে পরিশ্রম করিবে কেন? 'স্বার্থ ছাড়া মানুষ খাটিতে পারে না' এই ধারণাটা সেই লোকের বিশেষত্বের একটা অঙ্গ, সে যতক্ষণ এই বিশেষত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে ততক্ষণ সে সত্যের পরিচয় লাভ করিতে পারিবে না। একটা কেবল অতি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া গেল। বিশেষত্বের সীমা নাই। ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ছাড়া জাতিগত সমাজগত বিশেষত্ব বা গণ্ডী আছে। রঙ্গীণ কাচের মধ্য দিয়া পৃথিবীর প্রতি চাহিলে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস যেমন সেই রঙ্গে মণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, তেমনি জগতের অধিকাংশ মানুষ একটা একটা গণ্ডীর মধ্য দিয়া সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করে বলিয়া সেই সেই বিষয়ের যাহা যথার্থ মর্ম্ম তাহা অবধারণ করিতে পারে না এবং 'সত্য'এর পরিচয় না পাওয়ার জন্য দুঃখ পায়। মনে করুন আমার ধারণা যে, পুরাণগুলি গাঁজাখুরি গল্প; এই ধারণাটা মনের মধ্যে লইয়া আমি যতই পুরাণ পড়িব ততই গাঁজাখুরি দেখিতে পাইব। একটি প্রবাদ আছে যে পুরুষোত্তমধামে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া যাত্রী যাহা মনে ভাবিতে ভাবিতে যাইবেন সেখানে ঠিক তাহাই দেখিতে পাইবেন। একজন লোক পুঁইশাক ভাবিতে ভাবিতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া দেখিল সেখানে কেবল একবোঝা পুঁইশাক রহিয়াছে। অবশ্য এ কথাটা পুরুষোত্তমের মন্দির সম্বন্ধে সত্য না হইলেও 'জগন্নাথ'এর দর্শন সম্বন্ধে অকাট্য সত্য। 'সত্য' যেন জলের মত, যে যেমন পাত্র লইয়া যাইবে সেই পাত্রের আকার ধারণ করিয়া সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। এই বিশেষত্বের গণ্ডীই আমাদের দুঃখের কারণ।

অবশ্য কাচের মধ্য দিয়া কোন জিনিস দেখিলে তাহা অত্যন্ত বিকৃত দেখায়, তাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না, জিনিসটি ঠিক যেমন [illegible] মধ্য দিয়া তাহাকে ঠিক তেমনিই দেখিতে ও বুঝিতে [illegible]

হইলে ঐ কাচখণ্ডকে পূর্ব্বে সমতল করা দরকার। এই বিশেষত্বটুকুই আমাদের চিত্ত-কাচের বন্ধুরতা, ইহার কারণ ঐ জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার বা অঘ।

গীতায় আছে "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে, অর্থাৎ ঐ যে সংস্কার তাহার হাত হইতে চিত্তের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, তাহার পর সেই জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলিয়া তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে এবং ইন্দ্রিয় সমূহের কোনরূপ বিক্ষোভ থাকিবে না। এই কথাগুলি যদি এক কথায় বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে 'অনঘ' হইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বৈরাগ্যের প্রয়োজন। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে অর্থাৎ মানব 'অনঘ' হইলে যে জ্ঞানের উদয় হয়, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সেই জ্ঞানকে অহৈতুক জ্ঞান বলে। শ্রীধর স্বামী এই অহৈতুক শব্দের অর্থ বলিয়াছেন শুষ্ক তর্কাদির অগোচর। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৭) এই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'অনঘ' হইতে হইবে।

আমরা অনেক সময় সম্প্রদায়কে 'সত্য' অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করি, এই একটি অঘ। ইহার জন্য আমরা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা দেখিতে পাইনা। আমরা অনেক সময়ে সামাজিক বা পারিবারিক রীতিনীতিকে সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করি এই একটি অঘ। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেক সময়েই সত্যের পরিচয় পাইনা। আমরা অনেক সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার বা স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যকে 'সত্য' বলিয়া মনে করি ফলে সত্যের যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় না। ইংরাজ দার্শনিক বেকন জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এই সমস্ত কারণকে Idols বলিয়াছেন। প্রতিমা ও উপমার মধ্যে দিগ্ভ্রান্ত হইয়া আমরা আসল 'মা'কে দেখিতে পাই না, ইহাই অঘ। সত্যই জগতের আশ্রয়, "সত্যান্নাস্তি পরোধর্ম্মঃ" সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই; সত্য যেদিক হইতেই আসুক না কেন, যে বেশ ধারণ করিয়াই আমাদের নিকট উপস্থিত হউক না কেন শ্রদ্ধান্বিত ভক্তের মত তাহাকে আদর করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আমরা তাহা করি না, আমরা 'অঘশূন্য' নহি, আমরা অহংকারে আত্মহারা, আমরা মনে করি সত্য অপেক্ষা আমরা বড়, আমাদের সম্প্রদায় বড়, আমাদের জাতি বড়। তাই জগতে এত অনর্থ, তাই মানবজাতির এত দুর্দশা, তাই আমরা জগতের [illegible] সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে একটা সমন্বয় রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাই না। [illegible]

হইলেই আমরা এই দুর্দশার অন্ধ-গহ্বর হইতে পরিত্রাণ পাইব, এবং 'সত্য' এর সন্ধান পাইয়া ধন্য হইতে পারিব। সুতরাং সূতকে প্রথমেই 'অনঘ' বলিয়া সম্বোধন করার একটা বিশেষ সার্থকতা ও গভীর মর্ম্মার্থ রহিয়াছে।

এই 'অঘ' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে আর দুইটি কথা স্বভাবতঃই মনে হয়। ব্রাহ্মণেরা যে প্রত্যহ সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে 'অঘমর্ষণ' বলিয়া একটি বিশেষ ক্রিয়া আছে। এই ক্রিয়ায় নাসিকাগ্রে একগণ্ডুষ জল ধারণ পূর্ব্বক একটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরগত ভস্মীভূত পাপরাশি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ জলগণ্ডুষে মিশিয়াছে এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। যে মন্ত্রটি উচ্চারিত হয় তাহা এই—

"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো-বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥"

এই মন্ত্রটির অর্থ এই—"মহা প্রলয়কালে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বিরাজমান ছিলেন, তখন সমস্ত অন্ধকারাবৃত ছিল; তাহার পর সৃষ্টির প্রথমে অদৃষ্ট প্রভাবে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলময় সমুদ্র সমুৎপন্ন হইল। এই সমুদ্রজল হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা উৎপন্ন হইলেন। বিধাতা দিনের প্রকাশকারী সূর্য্য ও রাত্রির প্রকাশকারী চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা করেন, পরে ব্রহ্মা ভূঃ, ভূবঃ, আদি সপ্তলোক সৃষ্টি করিলেন।"

মহাপ্রলয়ের অবস্থা চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই পরম সত্যের আলোকে এই প্রকাশিত অনন্ত বিশ্বচরাচরের অর্থ উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যহ অঘমর্ষণ করিয়া 'অনঘ' হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা একটি দৈনিক সাধনা; ভাগবতধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে এই 'অনঘ' অবস্থা ধারণা করিতে চেষ্টা করা উচিত।

এই 'অঘ' শব্দের প্রসঙ্গে আর একটি কথা সহজেই মনে হয়। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অঘাসুর বিনাশের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই অঘাসুরের সুবৃহৎ মুখবিবরের মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিয়াছেন, আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাহাকে বিনাশ করিয়া সকলকে অনঘ করিলেন। এই তত্ত্ব এক্ষণে উল্লেখ মাত্র করা হইল, যথাস্থানে ইহার বিশদ আলোচনা করা হইবে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের এই 'অনঘ' শব্দটি যে অতি গভীর অর্থের প্রকাশক এবং ইহার যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে তাহা আমরা মোটামুটি বুঝিলাম।

ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা উগ্রশ্রবা সূতের গুণ বর্ণনার প্রথমে যে শ্লোকটি বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ আমরা বুঝিলাম। উগ্রশ্রবা সূত 'অনঘ' অর্থাৎ একটা সীমাবদ্ধ মাপকাটি দিয়া আমাদের মত সত্যকে তিনি ছোট করিয়া দেখেন না, এক কথায় তিনি একজন মুক্তপুরুষ। এই অবস্থায় তিনি পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পড়িয়াছেন ও তাঁহাদের অর্থ উপলব্ধি করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে শাস্ত্রালোচনার পদ্ধতি কেবল আমাদের দেশে নহে সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট বলিয়া গিয়াছেন "আমাদের যুগ সমালোচনার যুগ। একালে যুক্তি ও তর্কের নিকট সকল জিনিসকেই পরীক্ষা দিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিবেন আমি পবিত্র জিনিস, আমাকে সত্য বলিয়া ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লও, আমাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিও না—আমাতে বিশ্বাস কর তোমার ভাল হইবে। রাজবিধি ও আইনকানুন বলিবেন, আমি শক্তিশালী, আমাকে লইয়া তর্ক করিবে কি? আমাকে যদি না মানিয়া লও আমি বাধ্য করিয়া তোমাকে আমার শাসনাধীনে রাখিব। ধর্ম্ম ও রাজবিধি এরূপ কথা অনেক সময়েই বলেন। তাঁহাদের কথায় লোকেও কিছু ভয় পায়। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ইহারা যদি যুক্তি ও তর্কের অগ্নি পরীক্ষায় নিজেদের সত্যতা সপ্রমাণ হইতে না দেন, যদি স্বাধীনভাবে লোকে ইঁহাদের লইয়া আলোচনা করিতে না পায়, তাহা হইলে ফল এই হইবে যে লোকে ইহাদের প্রতি সন্দেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিবে, স্বভাবতঃই লোকের মনে হইবে যে ইহাদের গোড়ায় কিছু গলদ আছে।*

একথা হিন্দুর দেশে একেবারে নূতন নহে "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে" ইহা মনুরই বাক্য। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র যুক্তির দ্বারা আলোচনা করিবে কে? সকলেই কি এই কার্য্যের অধিকারী? আজকাল সকলেই শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করিতে, শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্বন্ধে একটা কিছু মতামত প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। কিন্তু কথা এই যাঁহারা এই প্রকারে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন, বহুযুগ হইতে প্রচারিত ও আদরের সহিত সহস্র সহস্র মানবহৃদয়ে পোষিত

* The present age may be characterised as the Age of Criticism,—a criticism to which every thing is obliged to submit. Religion, on the ground of its sacredness and Law, on the ground of its majesty, not uncommonly attempt to escape this necessity. But by such efforts they inevitably awaken a just suspicion of the soundness of their foundation, and they lose all their claim to the unfeigned homage paid by reason to that which has shown itself able to stand the test of free enquiry.'

কোনও ধারণার বিরুদ্ধে একটা মত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার এই মত প্রকাশের কি অধিকার আছে, তাহাই আলোচ্য। আমরা চঞ্চলচিত্ত ও স্বার্থপর, বাহিরের ঘটনা দ্বারা আমাদের মানসিক অবস্থা প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ব্রহ্মচর্য্য নাই, সংযম নাই, বৈরাগ্য নাই, সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা নাই, অথচ আমরা সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়া সকল বিষয়ে মত প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে জগতের মঙ্গল হইতেছে না, অমঙ্গলই হইতেছে। সমালোচনা করাটা একটা বিশেষরূপ অধিকার লাভের পর হইলেই ভাল হয় নতুবা তাহাতে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এজগতে সে অনর্থ যে ঘটে নাই তাহা নহে। "উন্নততর সমালোচনা" * বলিয়া একটা জিনিস আছে। তাহার হস্তে খৃষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত লাঞ্ছনা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র খুব বিরাট ও সুরক্ষিত বলিয়া এরূপ লাঞ্ছনা ঘটে নাই—তবে মধ্যে ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। "উন্নততর সমালোচনা" অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া যাহা করিতেছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

ভাগবতের ঋষিগণ সূতকে "অনঘ" বলিলেন। ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাহার যথার্থ মর্ম্ম অবধারণ করিবার যে অধিকার তাহা সূতের হইয়াছে—এই কথা বলা হইল।

অনধিকারীর হস্তে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও গোপিকাদিগের প্রেম কত প্রকারেই না ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যাঁহারা এই লীলা সম্বন্ধে নিজের মনগড়া একটা ব্যাখ্যা বা মত প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই চিত্তের সে পবিত্রতা, হৃদয়ের সে গভীরতা ও ব্যাকুলতা নাই, কেবলমাত্র যাহার সাহায্যে এই লীলার মর্ম্ম কিছু কিছু মানবে বুঝিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই বিশেষভাবে স্মরণ করা উচিত।

"Forget first the love for gold, and name and fame, and for this little three penny world of ours. Then, only then you will understand the love of the Gopis, too holy to be attempted without giving up everything, too sacred to be understood until the soul has become perfectly pure. People with ideas of sex, and of money, and of fame, bubbling up every minute in the heart daring to criticise and understand the love of the Gopis." The sages of India.

* Higher criticism.

ইহার অর্থ এই "কাঞ্চনের মায়া, নাম ও যশের মায়া আর আমাদের এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জগৎটার মায়া, আগে ভুলিয়া যাও। তাহা হইলে গোপীদের প্রেম বুঝিতে পারিবে, নতুবা নহে। এই প্রেম তত্ত্ব এত পবিত্র যে, সর্ব্বত্যাগী না হইলে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা; হৃদয় যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র না হইয়াছে ততক্ষণ ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না। হায় দুরদৃষ্ট! যে সমস্ত মানুষের হৃদয়ে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই কামিনীকাঞ্চন ও নাম যশের চিন্তা জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছে তাহারাই গোপীপ্রেম বুঝিতে ও সমালোচনা করিতে যাইতেছে!"

স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন অবিকল সেই কথা প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে সহস্র সহস্র স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে, তবে স্বামীজি একালের লোক বলিয়াই তাঁহার কথা বিশেষ ভাবে উদ্ধৃত হইল। আসল কথা 'অনঘ' হওয়াই ভাগবত-ধর্ম্মের রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায় ও অধিকার এবং ভাগবত বক্তা উগ্রশ্রবা সূত সেই অধিকারে অধিকারী এবং সেই অধিকারের পর তিনি শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াছেন, এই কথাই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে কথিত হইল।

এইবার সূত শাস্ত্রাদি কোথায় কি ভাবে পড়িয়াছেন—তাঁহার উপদেষ্টা কে, ঋষিগণ তাহাই জানাইবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

> "যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
> অন্যে চ মুনয়ঃ সূত পরাবর বিদো বিদুঃ॥
> বেত্থ ত্বং সৌম্য তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
> ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্যগুরবো গুহ্যমপ্যুত॥১।১-৭-৮

ইহার সরল অর্থ এই "বিদ্বান ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বেদব্যাস ও সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবেদী অন্যান্য মুনিগণ যে সমস্ত শাস্ত্র জানেন, তুমি সেই সেই মহাত্মাগণের অনুগ্রহে সেই সমস্ত শাস্ত্রও যথার্থরূপে অবগত হইয়াছ। অতি গুহ্য বিষয়ও তোমার অবিদিত নাই, কারণ গুরুগণ ভক্তিবিশিষ্ট শিষ্যকে অতিশয় গুহ্য বিষয়ও বলিয়া থাকেন।"

উগ্রশ্রবা সূত কিপ্রকারে শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এই দুইটি শ্লোকে তাহার বেশ সুন্দর আভাস পাওয়া গেল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মসাধনার যে কয়টি নিগূঢ় কথাও পাওয়া গেল। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ লইয়া

দার্শনিক পণ্ডিতগণের যে মতভেদ তাহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রুতিতে অনেকস্থলে বলিয়াছেন ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁহাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাঁহার নাম নাই, তাঁহার বর্ণ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, আবার শ্রুতিতেই অনেকস্থলে আছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ ইত্যাদি। ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে, তর্ক আছে, সেই সব তর্ক অনেকস্থলে এতই জটিল যে মানবের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই তর্ক পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যেই আছে, সাধক বা ভক্তদিগের মধ্যে নাই। সাধক তিনি, যথার্থ ধর্ম্মশীল তিনি, যিনি এই উভয়ভাবের মধ্যে একটা সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছেন। আমরা অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে যদি দার্শনিক বা পণ্ডিতের নিকট যাই, তাহা হইলে তিনি আমাদের যুক্তি দিবেন, তর্ক দিবেন, কিন্তু আসল জিনিস দিতে পারিবেন না। বিরোধ ও মতভেদের মধ্যে যাঁহার চিত্ত চঞ্চল, সেই এককে পাইয়া যিনি শান্তি লাভ করেন নাই, তিনি অমানুষিক প্রতিভাসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের চিত্ত শান্ত করিতে পারিবেন না, তাঁহার শিক্ষা আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্যই উৎপাদন করিবে। উগ্রশ্রবা সূত তাঁহার সৌভাগ্য বশতঃ যে সমস্ত মহাত্মার চরণমূলে বসিয়া শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ প্রকৃতির লোক নহেন, তাঁহারা ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের ভাষায় "পরাবরবিদো" (পরাবরে সগুণ নির্গুণে ব্রহ্মণী বিদন্তীতি) সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবেদী—অর্থাৎ তর্ক, অনুমান, মতভেদ প্রভৃতির রাজ্যের উর্দ্ধের লোক। সেই সমস্ত মহাত্মাদের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য বশতঃই উগ্রশ্রবা সূত ভাগবতধর্ম্মের রহস্য মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এইবার উগ্রশ্রবা সূতের গুরুগণ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা উচিত। শাস্ত্র বলিতেছেন যে তিনি ব্যাসদেব ও অন্যান্য সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মবাদী মুনিগণের শিষ্য। এইখানে ভাগবতধর্ম্মের উদারতার কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। জগতে অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একজন মহাপুরুষ বা অবতারের, এক একখানি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রের ও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বলিতেছে, ধর্ম্ম ও সত্য কেবলমাত্র এইখানেই আছে, কেবলমাত্র আমরাই তাহার অধিকারী, আমাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, আর যাহা কিছু আছে, সব মিথ্যা, সব ভ্রান্তি, সব কুসংস্কার। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এই কথা বলিতেছে। কাজেই জগতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মতে

মতে, শাস্ত্রে শাস্ত্রে নিদারুণ যুদ্ধ। ধর্ম্মের নামে জগতে যত নরহত্যা ও যুদ্ধ হইয়াছে, এমন আর কোন কারণেই হয় নাই।

জগতের কেবলমাত্র কোন একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় বিধাতার অনুগৃহীত, ভগবান তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে সত্য ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন, অন্যান্য জাতি তাঁহার সে দানে বঞ্চিত হইয়াছে, এ কথা আজকালকার সুধীগণ আর স্বীকার করিতে চাহেন না। অবশ্য এখনও জগতে এমন অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তমত পোষণ ও প্রচার করিতেছেন, কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাঁহাদের এই মতকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া উড়াইয়া দিতে শিক্ষা করিতেছে। এখন মানুষ বুঝিতে পারিতেছে যে বিশ্বমানবের ইতিহাস, বিশ্বনাথের লীলামাত্র। এখন লোকে সকল ধর্ম্মের ও সকল সত্যের অপক্ষপাতে আলোচনা করিতে ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্‌গ্রীব। শিক্ষার আলোক যে দিক হইতেই আসুক না কেন, সত্য যে বেশেই আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, হৃদয়ের সমস্ত দ্বার খুলিয়া রাখিতে হইবে, জাতিবর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাহাকে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে, পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদিগকে 'অমৎ' হইতে হইবে। অহঙ্কারের নাম হৃদয়গ্রন্থি, অবিদ্যা হইতেই ইহার উৎপত্তি, যে বিদ্যায় অমৃত লাভ হয় সেই বিদ্যার শাণিত অস্ত্রে এই হৃদয় গ্রন্থি, এই সংকীর্ণতা ও অনুদারতার অন্ধকারময় পরিধি ছিন্ন ও চূর্ণ করিতে হইবে। প্রাণকে আকাশের মত উদার ও নির্ম্মল করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সেই অনন্ত লীলাময়ের সুমহান্ লীলানাটকের এক একটি দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সমস্তের যেখানে পূর্ণ সমন্বয়, সেইখানেই তিনি।

উগ্রশ্রবা কেবলমাত্র একজন নির্দ্দিষ্ট মুনির নিকট শাস্ত্রশিক্ষা করেন নাই। "অন্যে চ মুনয়ঃ" অন্যান্য সমস্ত ব্রহ্মবেদী মুনিগণকে তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে এই উদারতা ইহাও ভাগবত ধর্ম্মের একটি অতি প্রধান কথা। উপনিষদে দেখিতে পাই ক্ষত্রিয় রাজাগণের নিকট ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যবন বা বৈদেশিকগণের নিকটও যাহা কিছু শিক্ষণীয় প্রাচীন হিন্দু অতি আদরের সহিত তাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথাটি একটু গভীর ভাবে আলোচনা করা উচিত। কেবল মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিয়া কোনও ধর্ম্মের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায় না। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় যাহা পাওয়া যায় তাহা ধর্ম্মের একটা অতি সামান্য কিছু

ভগ্নাংশ মাত্র, উপাসকের হৃদয় ও আত্মা, শ্রদ্ধান্বিত ভক্তের অনুভূতি, গ্রন্থের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের ভাষা যদ্যপি নীরবে গ্রহণ করিতে পারা যায়, একটি প্রাণের উচ্ছ্বাস ও অনুভূতি যদি নিঃশব্দে অপর হৃদয়ে সংক্রামিত হয় তাহা হইলে প্রকৃত সাধুর সংসর্গে ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। এই জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।" আজকাল কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে উপাস্য ঈশ্বর ও উপাসক মানব এ দুইয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকা সঙ্গত নহে অর্থাৎ কোন মহাপুরুষ বা গুরুকে এই দুইয়ের মধ্যে খাড়া করা উচিত নয়। তাঁহারা ইহাকে মধ্যস্থতা বাদ (Madiatorship) বলেন। ধর্ম্মসাধনায় মধ্যস্থতা বাদ উড়াইয়া দিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর, তাঁহারা ঈশ্বর বা ধর্ম্মসাধনাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব দুর্ব্বল অব্যবস্থিতচিত্ত মানবকে অহঙ্কারবশে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখেন। মধ্যস্থতাবাদের অর্থ কি এবং ইহার প্রয়োজনই বা কি তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্বকথা লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র গ্রন্থ পড়িয়া তাহা উপলব্ধি হয় না, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ ঐ ধর্ম্মের সামাজিক, পারিবারিক প্রভৃতি সংস্কার পুঞ্জের দ্বারা গঠিত চিত্ত ভক্ত ব্যক্তির হৃদয়ের ও আত্মার সহিত ঐ সমস্ত তত্ত্বের সম্বন্ধ কি, ঐ সমস্ত তত্ত্ব উপাসনাশীল সাধকগণের চিত্তে কি মহাভাবের উদ্দীপনা আনয়ন করে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিজ নিজ হৃদয় ও আত্মার দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিব, ততক্ষণ ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা বুঝিতে পারিব না। ইহাই মধ্যস্থতাবাদের যথার্থ মর্ম্ম। এই জন্যই উগ্রশ্রবা সূত কেবলমাত্র ব্যাসদেবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্যান্য মুনিগণের নিকট শ্রদ্ধান্বিত ভাবে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ শিক্ষা আহরণ করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্ম্ম যে বিশ্বজননী ধর্ম্ম—তাহা ভাগবতবক্তা উগ্রশ্রবা সূতের চরিত্র আলোচনা করিয়াই আমরা বুঝিতে পারি।

আজকাল অনেকে গুরুবাদের সহিত গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করেন। গুরুকরণ সম্বন্ধে ভাগবত শাস্ত্রের মত কিরূপ উদার তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে যদু ও অবধূত সম্বাদরূপ এক পুরাতন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা পাঠ করিলে আমরা ভাগবত ধর্ম্মের গুরুবাদের তত্ত্ব বুঝিতে পারি। সেই ইতিহাসে দেখা যায় জগতের সকলেই গুরু, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থ, এমন কি

পিঙ্গলানারী বেশ্যা ও এই অবধূতের গুরু! সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বত্রই ছড়ান রহিয়াছে, আমাদের তাহা আহরণ করিবার শক্তি নাই। এই শক্তির যাহাতে বিকাশ হয় তজ্জন্য মানবকে চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টাই ভাগবতধর্ম্মের সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই মানব 'অনঘ' হয় এবং ভাগবতধর্ম্মের অন্তর্নিহিত রহস্যরাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

অভিসারিণী।

নিশীথ রাতে সবাই যখন
ঘুমায় বিছানায়,
আমি তখন বসে' থাকি
কিসের দুরাশায়
দুয়ার খোলা আমার ঘরে
প্রদীপ নিভ'-নিভ'
শয্যাতলে কাহার লাগি
আঁচল পেতে দিব
নিদ্রা যখন জড়িয়ে আসে
কাতর আঁখির পাতে
আঁধার ঘরে রৈব বসে'
কাহার প্রতীক্ষাতে
যদি তারে স্বপ্নে দেখি,
মগ্ন ঘুমের ঘোরে?
সেটি যে মোর সইবে নাক',
কাঁদ্‌ব আবার ভোরে।

২

প্রদীপ এখন নিবে গেছে,
আজকে একটিবার
দুখিনীরে দাও গো দেখা
বড় অন্ধকার!

চোখের কোণে কাজল-রেখা
কখন্ গেছে ধুয়ে,
অমানিশার নিদ্রাকাতর
ঘাড়টি পড়ে নুয়ে।
সন্ধেবেলার খোঁপায়-বাঁধা
বকুলমালাখানি
কোথায় খুলে পড়ে' গেছে
কিছুই নাহি জানি।

৩

নিশীথরাতের বিজন পথে
তোমার পদধ্বনি
এই দিকেতে শুন্‌ব বলে'
আছি প্রহর গণি'।
প্রভুর আমার লজ্জা হবে,
সজ্জা করে' তাই
দিনের আলোক চাইব না ত',
অন্ধকারই চাই।
জানি আমি, কেমন করে'
আস্‌বে তুমি আর
সবার মাঝে আমার ঘরে,
—এমন পতিতার!
তাই ত' ডাকি গভীর রাতের
গোপন অভিসারে;
একটি দিনও পাব নাকি
প্রেমের অধিকারে?

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

সংকলন।

। বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্, মহোদয়ের লিখিত, 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রথমাংশ বাহির হইয়াছিল, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় অবশিষ্ট অংশ বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক গদ্যলেখকগণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ বুঝাইতে লেখক বলিতেছেন—

"রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার পদ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পদগৌরবে বঙ্গভাষা যথেচ্ছভাবে চলিতে পারিতেছিল না, বাঙ্গালা গৃহস্থের প্রাঙ্গণে 'মেঠো' গ্রাম্য পথে পুষ্করিণীর ঘাটে দিদিমার রূপকথার সভায় যাতায়াত করিবার জন্ম তাহারা কিছুমাত্র ক্ষমতা, যোগ্যতা বা অবসর ছিল না, সে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারিত, দার্শনিক গবেষণা করিতে পারিত, উহা কেবল মাতামহী সংস্কৃত ভাষার জোরে। এক কথায় এক পুঁথি ব্যক্ত করিতে, কটাক্ষে 'তাক্' লাগাইয়া দিতে, হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে পারিত না। তাহার জন্ম, সমুচিত দৃষ্টান্ত শিখাইবার জন্ম, প্রতিভার আবশ্যক ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা!

"রামমোহন তর্ক করিতে,, নিরস্ত করিতে, ধ্যানস্থ করিতে জানিতেন; কেশবচন্দ্র উদ্দীপ্ত করিতে, অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন, বিদ্যাসাগর বুঝাইতে, কাঁদাইতে জানিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইতে, দীনবন্ধু হাসাইতে জানিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র ন্যূনাধিক সমস্ত এবং তাহারও অধিক জানিতেন। লেখক-বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ গঠিত পূর্ণ বয়স্ক মনুষ্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে কোন অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব, অর্থ ও ছন্দ পরস্পরকে ব্যভিচারিত করে না। সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধ এই সরস্বতী - শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পীর উপযুক্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সমূহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত যোগ আছে, পর পর ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে যে একটি গতিশীল মনের একটা ক্রমবিকাশ আছে তাহা লেখক এইরূপে দেখাইয়াছেন। "দুর্গেশনন্দিনী প্রতিভার ব্যায়াম ক্রীড়া উহা একটা test শিল্প, আত্মপরীক্ষার চেষ্টা। কপালকুণ্ডলা প্রতিভার আনন্দ স্ফুর্ত্তি।" কবি আপনাকে চিনিয়াছেন;—আপন হৃদয়ের প্রতিভা মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু সে তখনও বন্ধ, অসামাজিক—সামুদ্রিক।" "নবীন-

চন্দ্রের যেমন পলাশীর যুদ্ধ, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা,—উভয়ের কোন অর্থ নাই—purpose নাই। তবু সুন্দর—অদৃষ্টপূর্ব্ব একক সৌন্দর্য্য! কপালকুণ্ডলা tale নহে, উপন্যাস নহে, উহা গদ্যরীতির কাব্য-নাটক, গ্রীক নাটক।

কপালকুণ্ডলা রচনায় প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্রের কবি জীবনের যে অবস্থা পরিব্যক্ত হয় তাহা "আধ আলো-আধ ছায়াময় উষা মূর্ত্তি" "সেক্সপীয়রের প্রতিভাও এই উষাস্বপ্ন দেখিয়াছে—নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন"। এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী, তাহার পরেই কবি আত্মজাগ্রত হন।" কবি কীটসের এইরূপ নিরুদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ছিল, নবেলের ক্ষেত্রে এমিলী ব্রন্টিরও ছিল! কিন্তু উভয়েই অল্পায়ু; কেহই পূর্ণবয়সে পদার্পণ করে নাই, করিলে কি হইত, তাহা অনিশ্চিত। দেখিতেছি সুইনবার্ণ অতিজীবী হইয়াও আর দ্বিতীয় আটলান্টাইন লিখিতে পারেন নাই, দ্বিতীয় পলাশী কিম্বা দ্বিতীয় কপালকুণ্ডলাও লিখিত হয় নাই।"

কপালকুণ্ডলার পর মৃণালিনী। মৃণালিনী উপন্যাস হইতে চলিয়াছে। লেখক দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার উচ্চকণ্ঠ নামাইয়া আনিয়াছেন। মৃণালিনী তিলোত্তমার ভগিনী, হেমচন্দ্র, জগৎসিংহ ও নবকুমারের, গিরিজায়া বিমলার, মনোরমা কপালকুণ্ডলার বঙ্গীয় সংস্করণ, সামাজিক মিশ্রসংস্করণ, সর্ব্বোপরি দেশদর্শন ও দেশানুরাগের একটা নূতন বাতাস গ্রন্থখানির মধ্যে বহিতেছে—দেশের জন্য দশের জন্য ব্যক্তিগত স্বস্বার্থ উৎসৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই অনুরাগের কোন ফল হয় নাই, হেমচন্দ্রের বীরবাহু ও নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতীর ন্যায় এই দেশানুরাগ কেবল অশক্ত নিরুদ্দেশ্য উচ্ছ্বাসে ব্যয়িত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালী লেখক কি করিবে? পলিটিক্‌স্ বা রাজনীতির ক্ষেত্রে সে নিজের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, অথচ দেশানুরাগ ত প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিরই আছে। প্রতিভা জাগিয়া উঠিয়া সর্ব্বপ্রথম দেশের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পারে না।

বঙ্কিমের প্রতিভা নিরুদ্দেশ্য উচ্ছ্বাসেই ব্যয়িত হয় নাই, তাহার প্রমাণ "বঙ্গদর্শন" প্রতিষ্ঠা। "দেশের তখনকার অবস্থায়, শিক্ষা নাই, আলোচনা নাই, চিন্তা নাই, কোনদিকেই বাঙ্গালীর মন খুলে নাই, বঙ্গভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পরম শক্তিনিদান সারস্বতকুঞ্জ প্রজ্বলিত হয় নাই; ঘরে ঘরে সাহিত্যের গার্হস্থ্য অগ্নিসেবা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অভাবের দিকে বঙ্কিমের দৃষ্টি না যাইয়া পারে না; তাহার ফল বঙ্গদর্শন" * * * "১৮৭২ খৃঃ অব্দে

যাহার সূচনা হইয়াছে, তাহার চক্র এখনো নিজের সম্পূর্ণ আবর্ত্তন সমাধা করিয়া ফিরে নাই ; কে জানে কতদিন লাগিবে ?

"পারিবারিক জীবন ভিন্ন জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না" "বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের প্রথম পারিবারিক উপন্যাস" তাহার পর চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল।

তাহার পর বঙ্কিমের প্রতিভার গতি দেশের ইতিহাসের দিকে। "দুর্গেশ নন্দিনীতে যে ঐতিহাসিক সূত্রের জন্ম হইয়াছে, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও চন্দ্রশেখরে যাহার সূক্ষ্মতন্তু প্রসারিত না হইয়া পারে নাই, নব সংস্কৃত রাজসিংহ তাহারই অনুসরণ।"

আনন্দমঠে "স্বদেশপ্রেম ও দাম্পত্যধর্ম্ম সমঞ্জসিত আদর্শে অন্বেষণ করিয়াছে, আনন্দমঠ রচনার সময় বঙ্কিমের বয়স ৫৩ বৎসর।

"পারিবারিক প্রেমে ও দেশানুরাগে তিনি যে নিষ্কাম আদর্শর সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা আরও সূক্ষ্মভাবে—অত্যন্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন—তাহার ফল দেবী চৌধুরাণী।"

উপরোক্ত আদর্শের ব্যাভিচার কতদূর মারাত্মক হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য সীতারাম।

"সীতারাম রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন—উহা যে শিল্প হইল না, কাব্য বা উপন্যাস হইল না বুঝিলেন।"

১৮৬১ খৃঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেই হইতে ১৮৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েকটি বৎসর মাত্র মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কার্য্য। উহার পর আরও একাদশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র এই ভবলোকে ছিলেন—শিল্পের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই।"

সম্ভবতঃ ১৮৮৪ ইংরাজীতে 'প্রচার' ও নবজীবন বাহির হয়।"

"নবজীবনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নবজীবন আরম্ভ হইয়াছে।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ কবি উত্তরকালে ঋষিত্বলাভ করেন।

২। বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বকোষ।

"বিশ্বকোষ" এর ন্যায় "নানাতত্ত্ব সমন্বিত, বহু মৌলিকপ্রবন্ধবহুল, অশেষগবেষণাগর্ভনিবন্ধনযুক্ত, শাস্ত্র সাহিত্যে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় রচনাশোভিত দ্বাবিংশ খণ্ডব্যাপী" সুবৃহৎ বাঙ্গালা গ্রন্থের সংবাদ আমাদের দেশের অনেক লোকেই জানেন না। ইহা অপেক্ষা জাতীয় দুর্ভাগ্যের

পরিচয় আর কি হইতে পারে? আর্য্যাবর্ত্তের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় গত আশ্বিন মাসে এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা ঐ প্রবন্ধ হইতে দুএকটি কথা নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"সাহিত্যসেবী সুপরিচিত পণ্ডিত ৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তদীয় অনুজ প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ১২৯২ সালে (ইংরাজী ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে) ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রাম হইতে প্রথমে "বিশ্বকোষ" প্রকাশিত হয়। * * ইঁহারা দুই বৎসর মাত্র, বিশ্বকোষ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে সমগ্র 'অ'-বর্ণ এবং 'আ'-বর্গের কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। অনন্তর নানা কারণে তাঁহারা এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহাশয় 'বিশ্বকোষ'এর সূচনা হইতেই ইহার সঙ্কলন বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।"

"ইতঃপূর্ব্বে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে 'শব্দেন্দু মহাকোষ' অভিধেয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বৃহৎ অভিধান প্রকাশিত হইতে-ছিল। বিশ্বকোষের ভাবী সঙ্কলয়িতা নগেন্দ্র বাবুই উহার সঙ্কলন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাকোষ 'অ' হইতে অনন্ত শব্দ পর্য্যন্ত (প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।"

"১২৭৩ সালের ২৩শে আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই শুক্রবার নগেন্দ্র বাবু জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং যে সময়ে তিনি 'শব্দেন্দু মহাকোষ' প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আঠার বৎসর মাত্র।"

"রাজা সার্ রাধাকান্ত দেবের সুযোগ্য দৌহিত্র নানা ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত মহাত্মা ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং প্রাজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময় হইতেই নগেন্দ্রনাথের প্রতিভাকে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

"শব্দেন্দু মহাকোষ" বন্ধ হইয়া গেলে, আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শানুসারে নগেন্দ্র বাবু পাথুরিয়া[illegible] বসু মহাশয় কর্ত্তৃক নাগরাক্ষরে প্রকাশিত শব্দকল্প-দ্রুমের পরিশিষ্টের [illegible] সঙ্কলন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। এই সময়ে পুঁথি সংগ্রহাদির নিমিত্ত নগেন্দ্র [illegible] মুর্শিদাবাদ জেলায় গমন করেন। তখন 'বিশ্বকোষ' দুই বৎসর মাত্র প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বহরমপুরে প্রসিদ্ধ কবিতত্ত্ববিৎ [illegible]লাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত নগেন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ হয়।"

নৃত্যগোপাল বাবুর সহিত নগেন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ রামদাস সেন মহাশয়ের পুস্তকাগারে গমন করেন। তথায় অনেক জ্ঞানী ও গুণবান ব্যক্তির সহিত নগেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়, তাঁহারা সকলেই "বিশ্বকোষ" বন্ধ হইয়া যাওয়ার জন্য অশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিয়া শুনিলেন বঙ্গবাসী সম্পাদক ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং ঔপন্যাসিক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিশ্বকোষ পুনঃ প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে তবে ব্যাপার খুব বৃহৎ বলিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বাবুর উপদেশে ও উৎসাহে নগেন্দ্রনাথ এই বহুব্যয়সাধ্য সুমহান্ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন।

৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় তখন বীরভূম জেলার লাউঘোশা গ্রামে বাস করিতেন, ত্রৈলোক্য বাবু তখন মিউজিয়মে কর্ম্ম করিতেন। নগেন্দ্রনাথ ত্রৈলোক্য বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও রঙ্গলাল বাবুকে পত্র লেখা হইল। রঙ্গলাল বাবু আনন্দের সহিত পত্র পাইবামাত্র বিশ্বকোষের স্বত্ব ও প্রকাশভার প্রদান করেন।

একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নগেন্দ্রবাবু বিশ্বকোষ সঙ্কলন ভার গ্রহণ করেন। তিনি ধনীর সন্তান হইলেও তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব, ঘটনাচক্রে সর্ব্বস্বান্ত, সামান্য চাকরীজীবী অথচ বৃহৎপরিবারপ্রতিপালক। শব্দকল্পদ্রুমের সামান্য চাকরীই তখন তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যে দুই এক খানি বহুমূল্য অলঙ্কার তখনও তাঁহাদের বাড়ীতে ছিল, নগেন্দ্র তাহাই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন। গ্রেট ইডেন প্রেস হইতে 'বিশ্বকোষ' মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

'আ' বর্ণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের যত্নে প্রকাশিত হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু 'আমি' শব্দ হইতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর আনন্দকৃষ্ণ বাবু 'বিশ্বকোষের' যাবতীয় প্রবন্ধই মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে সংশোধন করিয়া দিতেন এবং 'বিশ্বকোষের' প্রথমাবস্থায় তিনি স্বয়ং গণিত-জ্যোতিষ সংক্রান্ত কতিপয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বিশ্বকোষের কার্য্য ও শব্দকল্পদ্রুমের চাকরী একত্র হয় না বুঝিয়া নগেন্দ্রনাথ শব্দকল্পদ্রুমের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইল কিন্তু গ্রাহক হয় না। নগেন্দ্রনাথ বালক, লোকে ভাবিল ইহা আর কতদিন চলিবে? নগেন্দ্রনাথ মহা বিপদে পড়িলেন।

এই সময়ে তিনি সমস্ত বৈদিক ও পৌরাণিক ভূগোল আলোচনা করিয়া বিশ্বকোষে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন মানচিত্র প্রকাশ করিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই মানচিত্র এসিয়াটিক্ সোসাইটির অধিবেশনে প্রদর্শন করিলেন। সোসাইটির সভাপতি-প্রমুখ সমবেত সুধীমণ্ডলী নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, পণ্ডিতে বুঝিলেন, বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধিৎসু উদীয়মান প্রত্নতত্ত্ববিদের আবির্ভাব হইয়াছে। বিশ্বকোষের গ্রাহক সংখ্যা ক্রমে দু একটি বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট ১৫ কপি পুস্তকের গ্রাহক হইলেন। সম্পাদক মহাশয় তখন ঋণগ্রস্ত হইয়া ইহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে-ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া 'বিশ্বকোষ' নিজের আয়ে নিজের ব্যয়-ভার বহন করিতে সমর্থ হইল।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে "বিশ্বকোষের" ন্যায় অথবা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর একাধিক অভিধান বা Encyclopaedia প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির যত্নে ও কৃতিত্বে এরূপ বিরাট অভিধান এপর্য্যন্ত একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সারাজীবন একমাত্র মহদুদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিয়া, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে অকালে বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইতে অপর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?"

১৩১৬ সালে যখন তিনি রোগক্লিষ্ট, তখন কাঁদিয়াছিলেন, শারীরিক যন্ত্রণার জন্য নহে, মৃত্যুভয়ে নহে—বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হইল না বলিয়া; তিনি নিজের জীবন অপেক্ষাও বিশ্বকোষকে ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বকোষ পূর্ণ হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্ত সম্পাদকের সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও বলি "বাঙ্গালার আশার স্থল ভরসার পাত্র নগেন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবী হউন।"

৩। বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকথা—পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক লাহোর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ ভাবে শ্রোতব্য। "লাহোরে সভ্যতা বিস্তার, লাহোরে ইংরাজী শিক্ষা প্রচার, লাহোরে সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।" কালীপ্রসন্ন বাবুর পিতামহই লাহোরের আদি বাঙ্গালী প্রবাসী। [illegible] পূর্ব্বে নিবাস কলিকাতা বাগবাজারের ঘাটের কাছে। সাহিত্য-পরিষৎ-

পত্রিকার উক্ত সভার কার্য্য বিবরণীতে কালীপ্রসন্ন বাবুর বক্তৃতার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে—নিম্নে তাহার দু একটি কথা সঙ্কলিত হইল।

দেশে যখন রেল হয় নাই—বয়েল গাড়ীতে দস্যুসঙ্কুল পথ অতিবাহন করিয়া যখন তিন মাসে দিল্লী ও তথা হইতে আরও কিছুদিনে লাহোর পৌঁছিতে পারা যাইত - সে সময়ে বাঙ্গালী যে ভাবে দূর দূরান্তর দেশে গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বাঙ্গালী 'কুণো' এই অপবাদ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজ আমলের প্রথমে বাঙ্গালীরা লাহোরের সর্ব্বস্ব ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর পিতামহই লাহোরে বাঙ্গালীদিগের বাসের সমস্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। "রেভারেণ্ড গোলোকনাথ বসুর পুত্র চার্লস্ গোলোকনাথই ট্রিবিউনের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় সুখচরনিবাসী চাটুজ্যে গোলোকনাথ আরবে মাঝির সঙ্গে যোগ দিয়া আরবী কাগজ প্রথম প্রকাশ করেন। হরি ঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী রাধারমণ রাহা ইংরাজী স্কুলের ১ম শিক্ষক ছিলেন। বারাসত নিবাসী রামচন্দ্র দাসই সর্ব্ব প্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ লালা হংসরাজ সেই স্কুলের ছাত্র। তখন পঞ্জাবের সমস্ত জেলায় যত স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, সে সমস্ত স্কুলেই বাঙ্গালী হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। ৪০।৫০।৬০ বর্ষ বয়স্ক যত ইংরাজী জানা লোক পঞ্জাবে এখন আছেন, তাঁহারা সকলেই সেই আদি বাঙ্গালী হেড্‌মাষ্টারগণের ছাত্র। একবারে সীমান্ত প্রদেশে হাজারা জেলায় কেবল পাঠানের বাস, তাহাদের ভাষা পস্তু। বাঙ্গালীর গৌরবের কথা এই যে, এই পস্তু ভাষার দেশেও সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামে এক বাঙ্গালী "আঞ্জুমানে হাজারা" নামে এক সভা স্থাপন করেন, পাঠানদিগকে তাহার সদস্য করেন আর সেই সভা দ্বারা সে দেশে স্কুল, কন্যা পাঠশালা, দাতব্য ডাক্তারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সৃষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালী। রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরই সর্ব্ব প্রথমে উর্দ্দু প্রাইমার রচনা করিয়া পঞ্জাবীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। Dr. Lightner (the Orientalist) [ডাক্তার লাইটনার—প্রাচ্য শাস্ত্রবিৎ] প্রথমে ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺ রায় কালীপ্রসন্ন রায় বাহাদুর, ৺ শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র রায় প্রভৃতির যত্নে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হয়। রহিম খাঁ নামক এক বাঙ্গালী মুসলমানের চেষ্টায় লাহোরে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। সেকালে বর্দ্ধমান নিবাসী ডভিব কলারশিপ প্রাপ্ত ডাক্তার রহিম খাঁ আর একজন প্রসিদ্ধ

বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন। গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রী সভার সদস্য ডাঃ ব্রজলাল ঘোষ রায় বাহাদুর হইতেই লাহোরে Freemasonry প্রবর্ত্তিত হয়। তিনিই Grand master হইয়াছিলেন।

এই ব্রজ বাবুর পিতার কৌশলেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১৫০ জন বাঙ্গালীর প্রাণ বাঁচিয়াছিল। সিপাহীরা তোপের সঙ্গে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পরদিন বেলা একটার সময় তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করে। ব্রজ বাবুর পিতা সিপাহীর পোষাক পরিয়া সাঁতার দিয়া যমুনা পার হইয়া, অপর পারে কর্ণালে ইংরাজের ছাউনীতে গিয়া সেই খবর দিলে তাঁহারা আসিয়া বাঙ্গালীদিগকে উদ্ধার করেন। পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর বুদ্ধির প্রশংসা-স্বরূপ একটি প্রবাদ বাক্য চলিয়া গিয়াছে, "কাসাওয়ে টোপীওয়ালা খায় ধুতি-ওয়ালা।"

কাঙ্গাড়া জেলায় বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর উপনিবেশ আছে। * * আকবরের সময় টোডরমল্ল ১০০ ঘর কায়স্থকে বাঙ্গালা দেশ হইতে আনিয়া এদেশে বাস করান। এখন তাঁহারা মহাজন জাতি। ব্যারিষ্টার মতিলাল এখনও আপনাকে বাঙ্গালী কায়স্থ বলিয়া গর্ব্ব করেন। হিন্দুর মধ্যে শৈবই অধিক। ইঁহাদের মধ্যে পাল ও সেন উপাধি অনেক।

বৈষ্ণবেরা প্রায়ই বৈরাগী ও রামভক্ত। এখনকার সুকেতরাজ স্বাধীন রাজা। রাজেন্দ্রপাল বলেন, আমরা ওদিক্ অর্থাৎ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসিয়াছি। হীরানন্দ শাস্ত্রী এম্ এ, বলেন, ভূমিকম্পে যে কালীবাড়ীর ধ্বংস হইয়াছে, উহা শতাধিক বর্ষের প্রাচীন এবং বাঙ্গালী দ্বারা স্থাপিত। * *

এক সময়ে পঞ্জাবে বাঙ্গালীর এত প্রভাব ছিল। * * বাঙ্গালী যে দেশে গিয়াছেন সেই দেশেরই সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং নিজেদের মধ্যেও বেশ ঘনিষ্টভাবে একতা স্থাপন করিয়া কালীবাড়ী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেন। * * Black Mountain Expedition এ একজন পোষ্টমাষ্টার কর্ত্তব্য পরিচালনের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে গিয়া শত্রুহস্তে মারা যান। তাঁহার শব বহন কালে কমিশনর ও প্রধান সেনাপতি টুপি খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মবীরের নামটি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরিষৎ বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন।

মাসিক সাহিত্য।

(আলোচনা)

অর্চ্চনা—কার্ত্তিক ১৩১৮।

"হিন্দুস্থানী ভাষায় লিঙ্গ-বিচার" প্রবন্ধে লেখক দেখাইতেছেন—হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষায় ক্লীবলিঙ্গ নাই। উর্দ্দু শব্দগুলি পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ। উর্দ্দু ভাষা নানাভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। যে ভাষা হইতে যে শব্দ আমদানী হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই শব্দ সেই ভাষা প্রদত্ত লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতি এবং বিদেশীগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বড় শীঘ্র হিন্দুস্থানী বলিতে শিখে। কিন্তু শুদ্ধ ভাবে হিন্দুস্থানী লিখিতে বা বলিতে পারা বড় দুরূহ।' বিশেষরূপে সংস্কৃত পারসী ও আরবী জানিলে তবে হিন্দুস্থানী ভাষায় লিঙ্গজ্ঞান জন্মিতে পারে। উর্দ্দু ভাষায় প্রাদেশিকতার গোল খুব বেশী। কোনও শব্দ লক্ষ্ণৌর লেখক পুংলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, আবার সেই শব্দ দিল্লির লেখক স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়ার বিশেষণ, এমন কি সম্বোধনবাচক শব্দেও লিঙ্গভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অনেক উদাহরণ দিয়া লেখক প্রবন্ধটিকে শিক্ষাপ্রদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। লেখক উর্দ্দু ভাষায় বিশেষরূপে অভিজ্ঞ। "স্ত্রী স্বাধীনতা" গল্প শ্রীমতী বিভাবতী দেবী—শ্লেষাত্মক চিত্র, নিপুণ ভাবে অঙ্কিত। "নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র" শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য। লেখক বলিতেছেন এই গ্রন্থে ইংরাজী, এপিক, নভেল ও মাস্ক এই তিনের ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়, 'স্থানে স্থানে ইহার কোন কোন অংশ যেন গীতিকাব্য।' প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র সভায় পঠিত। উন্নততর সমালোচনা পদ্ধতির প্রাথমিক বিধির সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে লেখক একাগ্যে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল করিতেন। আগে নবীনচন্দ্রের যুগ, তাহার পর নবীনচন্দ্র, তাহার পর তাঁহার কাব্য। "রত্নাবলীর প্রণেতা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য, উইলসন প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া দেখাইতেছেন যে কাশ্মীররাজতরঙ্গিণীর বর্ণিত রাজা হর্ষদেব বা ধাবক কবি কিংবা বাণভট্ট "রত্নাবলী" রচয়িতা নহেন, কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষবর্দ্ধনই উক্ত নাটিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।" শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল [illegible] শ্রীহর্ষ জীবনের মধ্যভাগে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। 'নাগানন্দ' ও 'রত্নাবলী' ভিন্ন প্রিয়দর্শিকা নামক আরও একখানি নাটিকা শ্রীহর্ষের প্রণীত। প্রবন্ধটি [illegible]

মৌলিক ? "দিল্লী সম্বন্ধে শোভন রায়" মুন্সী শোভন রায় পাতীয়ালা প্রদেশ-বাসী একজন সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়। ইনি 'খোলাসাতুত তবারিখ' নামক প্রসিদ্ধ ভারতীয় ইতিহাসের রচয়িতা। সপ্তবিংশ সংখ্যক প্রসিদ্ধ ফরাসী ইতিহাস হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের প্রভূত পরিশ্রমের ফলে ১৬৯৬ খ্রীঃঅব্দে তবারিখ সম্পূর্ণ হয়। কর্ণেল লীজ এই গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার পাণ্ডবদিগের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১১০৭ হিঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। সয়ারুল মুতাখরিন্ গ্রন্থের রচয়িতা এই গ্রন্থ হইতে স্বীকার না করিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিজের গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আর একজন লেখক মৌলিক রচনা বলিয়া এই গ্রন্থের হিন্দিতে অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। হিন্দি গ্রন্থের নাম 'আরাইশি মহফুল'। শোভন রায় দিল্লী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ইলিয়ট সাহেব তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি তাহারই সার সংগ্রহ। "সাহজাদী সম্বন্ধে বার্ণিয়ো" নামক প্রবন্ধে লেখক ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ো, সম্রাট সাহজাহানের কন্যা মম-তাজমহলের গর্ভসম্ভূতা জাহানারা বেগম সম্বন্ধে যে সমস্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ও নীচ-জনোচিত কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বার্ণিয়ো সম্রাট দরবারে খুব অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন—এই প্রকারেই তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন! অর্চ্চনা'য় সূচীপত্র দেওয়া হয় না কেন?

কণিকা—ভাদ্র ও আশ্বিন—সৈদাবাদ হইতে প্রকাশিত। পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে। শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "হিন্দুর ঈশ্বর" প্রবন্ধটির নাম খুবই ভাল। স্থানে স্থানে অনুদার ভাবে কলঙ্কিত হইলে ও সুপাঠ্য। লেখক সম্ভবতঃ ইংরাজী জানেন না, কারণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি বাইবেল্ কখন পাঠ করেন নাই। কিন্তু লেখকের সাহস খুব! তিনি ডারুইনের মত, বেদ আলোচনাকারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত, প্রাচীন আর্য্যজাতির বাসস্থান সম্বন্ধীয় মত প্রভৃতির বেশ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরবাদ লইয়া বর্ত্তমান সভ্যজগতে যে সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হইতেছে, লেখকের সৌভাগ্য যে তাঁহাকে আর সে সমস্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এবিষয়ে দেশীয় সমসাময়িক আলোচনার সহিতও লেখকের পরিচয় নাই। হীরেন্দ্র বাবুর গীতায় ঈশ্বরবাদ' পড়িলেও প্রবন্ধটি মাসিক কাগজে ছাপাইতে পাঠাইবার পূর্ব্বে লেখকের হস্ত কম্পিত হইত। "ভবভূতির রামচন্দ্র" শ্রীবিপিনবিহারী সরকার। লেখক দেখাইতেছেন "বীরত্বে বাল্মীকির রামচন্দ্র অপেক্ষা ভবভূতির রামচন্দ্র

হীন। হৃদয়ের সহানুভূতিতে ভবভূতির রামচন্দ্র অপেক্ষা বাল্মীকির রামচন্দ্র অনেকাংশে নিকৃষ্ট। রামায়ণের সময়ে লোকে বীর ছিল। তাই তাহার ভাষায় বীর ধর্ম্মেরই প্রাধান্য করা হইয়াছে। কিন্তু ভবভূতির সময়ে লোকে ক্রমশঃ বীর ধর্ম্ম ভুলিয়া বিলাস সাগরে সন্তরণ করিতেছিল। তাই তাঁহার উত্তর-রামচরিত্রে বীরত্বের পরিবর্ত্তে প্রেমের কথাই বেশী।" "জড়ের অনশ্বরত্ব" শ্রীদীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়—প্রবন্ধটি প্রথমে অতি সুন্দর ও সর্ব্বজনবোধ্য ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে—শেষে একটু তাড়াতাড়ি করিয়া যেন শেষ করা হইয়াছে। লেখক অত্যন্ত সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা লেখককে সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। "রাজা বিজিরাও" শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। গজনীর মামুদ তাঁহার তৃতীয়বার ভারত আক্রমণে ভাটিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের মতে এই স্থান মুলতানের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ভাটিয়া রাজ্যের তৎকালীন নৃপতির নাম বিজিরাও। ইনি যুদ্ধে পরাজিত হইলেও অশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্কুল কলেজ পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থে এই বীরের নাম পর্য্যন্ত নাই। লেখক এই বীরের পরিচয় দিয়া ভালই করিয়াছেন। 'দালিয়া' 'আমার বাতি' ও 'মৃতের অভিসার' আলোচ্য সংখ্যায় এই তিনটি গল্প শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী, শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত। তিনটি গল্পেরই রচনা প্রশংসনীয়, গল্পগুলি সুপাঠ্য ও সুন্দর। শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য 'শাক্ত গোপাল'এর পরিচয় দিয়াছেন। মুরারই ষ্টেসনের নিকট পাইকর নামক গ্রাম আছে। ইহার প্রাচীন নাম প্রাচীনকোট। এই গ্রামে এক রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণের গৃহে এক ধাতু নির্ম্মিত গোপাল বিগ্রহ আছেন। তাঁহার পূজায় রক্তচন্দন ও বিল্বপত্র ব্যবহৃত হয়। ভোগে উষ্ণ চাউল ও মাছ মাংসের ব্যবস্থা আছে, অবশ্য গোপালের সম্মুখে বলিদানের বব্স্থা নাই। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখিত 'মিলনের আকুলতা' বেশ সুপাঠ্য কবিতা। কণিকা বেশ সুপাঠ্য ও সুসম্পাদিত।

কোহিনুর—নবপর্য্যায়, কার্ত্তিক।—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের "প্রত্যাশিনী" কবিতায় শব্দচয়নের বেশ নৈপুণ্য আছে কিন্তু কবি কি বলিতেছেন তাহা অবোধ্য—'দীনা সুখহীনা' "প্রত্যাশিনী"ই বা কে, আর "স্তব্ধ ছদ্মবেশী"ই বা কে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কেহ যদি বলেন যে প্রথমটি কবিতার মর্ম্ম কথা, আর দ্বিতীয়টি স্বয়ং কবি, তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। "মধ্যযুগে মোস্‌লেম্ সাম্রাজ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা" ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ—

মোহাম্মদ কে, চাঁদ—মুসলমান নরপতিগণ চিরদিনই অতীব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথম অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, মানমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক খৃষ্টান লেখক তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না, লেখক বলিতেছেন "কিন্তু আমরা গভীর গবেষণাকারী বহুসংখ্যক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের উক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারি যে, দ্বাদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও মুসলমানেরা ইউরোপ ভূমিতে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।" দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে খ্রীষ্টানগণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও 'আরবী হইতে অনূদিত গ্রন্থাবলীই তখন ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক ছিল। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক লিখিত গণিত, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া পারিস, বোলন, অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে পঠিত হইত।" দর্শনশাস্ত্র ভূগোলশাস্ত্র প্রভৃতিতেও মুসলমানগণ দীর্ঘকাল ইউরোপের শিক্ষক ছিলেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে মুসলমান ভ্রাতৃগণ অনেক শিক্ষা লাভ করিবেন—আমরা প্রবন্ধটিকে বিশেষরূপেই মূল্যবান বিবেচনা করি। "নবাব ঈশা খাঁ মস্নদ আলী" লেখক সৈয়দ নুরুল হোসেন কাশিমপুরী—প্রবন্ধটি মূল্যবান ও সুলিখিত—বাঙ্গালার ইতিহাসের এই সমস্ত প্রয়োজনীয় অথচ বিস্মৃত কথা যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। "ইবান বতুতার ভারত ভ্রমণের একাংশ" মোহাম্মদ হাফিজল হাসান—তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। কোহিনূরের বিশেষত্ব ঐতিহাসিক প্রবন্ধের আধিক্য—কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশগুলিই ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সৈয়দ এমদাদ আলি "আমীর খসরু"র মর্ম্মানুবাদ করিতেছেন—আলোচ্য সংখ্যায় দ্বিতীয় স্তবক বাহির হইয়াছে—"স্বর্গীয় মৌলবী আহমদ কবীর" লেখক মোহাম্মদ সেরাজল হক্। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে খারন্দীপ নামক পল্লীগ্রামে মৌলবী আহম্মদ কবীর সাহেবের জন্ম হয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লিভারপুরের 'ক্রেসেণ্ট' মাদ্রাজের 'মোহামেডান' ভূপালের 'অল্‌রেয়াজ' কাটিওয়ারের 'মোহামেডান পেট্রিয়ট' কলিকাতার 'এপিফেনি' প্রভৃতি অনেক ইংরাজী সংবাদপত্রের ও 'কোহিনুর' 'সোলতান' প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালা পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। শ্রীযুক্ত টি, ডব্লিউ, আরনল্ড সাহেব

"প্রিচং অব ইস্‌লাম" ও 'ইস্‌লাম' নামক পুস্তকদ্বয়ের প্রণয়ন সময়ে তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান জাতি" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন। "ষ্টাডিজ ইন্ দি বাইবেল, এণ্ড দি কোরান" নামক তাঁহার ইংরাজি পুস্তক এখনও প্রকাশিত হয় নাই। গত ১৫ই মে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। "আরব জাতির ইতিহাস" ক্রমশঃ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে বাহির হইতেছে। পাঠকের ধৈর্য্য থাকা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত লিখিত 'প্রেমের শিক্ষা' কবিতাটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। "রত্নচয়ন" নাম দিয়া হজরত মহম্মদের উপদেশবাণী প্রকাশিত হইতেছে। 'পুণ্যকথা'ও বেশ সুন্দর সংগ্রহ। 'কবিতাগুচ্ছ' অবশ্য বিশেষত্ব হীন।

ভারতী—কার্ত্তিক। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত লিখিত "শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত" অতি সুন্দর প্রবন্ধ, সম্ভবমত আচার্য্যের নিজের কথায় আধুনিক কালের দার্শনিকদিগের পদ্ধতি ক্রমে বেশ সরল ও সুবোধ্য ভাষায় লিখিত। প্রবন্ধটি আর একটু বেশী করিয়া বাহির হওয়া উচিত। "উন্মাদিনীর কাহিনী" কবিতা, সুকবি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন রচিত। ভাব ও ভাষা উভয়ই সুন্দর, কবিতাটি পাঠ করিয়া বাঙ্গালা কবিতার একটি বিস্মৃতপ্রায় সুর কর্ণে বাজিয়া উঠিল। নবীন কবিগণকে যদি অনুকরণ করিতেই হয় এই প্রকারের রচনার অনুকরণ করুন। "জগন্নাথ" শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত। লেখক প্রবন্ধটি লিখিতে পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জলদস্যু রক্তবাহুর উৎকল জয়, কেশরী বংশ, গঙ্গাবংশ, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মুসলমানদিগের সহিত সংঘর্ষ, ষোড়শ-শতাব্দীর মধ্যভাগে কালাপাহাড়ের আক্রমণ, উড়িষ্যায় মারহাট্টা শাসন ও পরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজশাসন বর্ণনা করিয়াছেন। "আর্য্যভট্টীয় সঙ্খ্যালিখন" শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র (আধুনিক পাটনা) নগরে থাকিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম গ্রন্থকারের নিজের কথায় 'আর্য্যভট্টীয়'; ব্রহ্মগুপ্ত উহার নাম দিয়াছেন 'আর্য্যাষ্টশত' কারণ উহাতে ১০৮টি আর্য্যাবৃত্তের শ্লোক আছে। ঐ গ্রন্থের আধুনিক নাম 'আদি আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত'। আর্য্যভট্টের সঙ্খ্যালিখন প্রণালী অত্যন্ত জটিল। ক হইতে ম পর্য্যন্ত ২৫টি বর্ণাক্ষরের মান যথা-

ক্রমে ১ হইতে ২৫ ; য হইতে হ পর্য্যন্ত এই ৮টি বর্ণের মান যথাক্রমে ৩ হইতে ১০। স্বরবর্ণের মান এইরূপ—অ = ১,১০ ; ই = ১০^২, ১০^৩ ; উ = ১০^৪, ১০^৫ এই ক্রমে ঔ = ১০^১৬, ১০^১৭ ; প্রত্যেক স্বরবর্ণের দুইটি করিয়া মান, স্বরবর্ণ বর্গাক্ষরের সহিত যুক্ত হইলে তাহার প্রথম মানটি আর অবর্গাক্ষরের সহিত যুক্ত হইলে দ্বিতীয় মান লইতে হইবে। উদাহরণ—সৌর বিবর্ত্তনকাল আর্য্য-ভট্টের সাঙ্কেতিক ভাষায় "খ্যুঘৃ"।

খ্যু = খু + যু ; খু = খ্ × উ = ২ × ১০০০০ = ২০০০০

যু = য × উ = ৩ × ১০০০০০ (উকারের অবর্গমান) = ৩০০০০০

ঘৃ = ঘ × ঋ = ৪ × ১০০০০০০ = ৪০০০০০০

৪৩২০০০০ বৎসর

যুক্তাক্ষরের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ স্বরবর্ণ যুক্তাক্ষরের প্রত্যেক অক্ষরেই লাগিবে। লেখককে কোন জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন এই লিখন প্রণালী তান্ত্রিক মন্ত্র সাধনের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল। লেখকের মতে ছন্দের সৌকর্য্য ও সংক্ষিপ্ততার জন্যই ইহা কল্পিত। এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি বেশ সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত।

"পালিভদ্র কোথায়?" ঐতিহাসিক প্রবন্ধ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত। পালিভদ্র সম্বন্ধে প্রাচীন এত, যাহা পরবর্ত্তীকালে একেবারে অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে, তাহাই লেখক মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া চালাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আগামীবারে আলোচনা করা যাইবে।

"বঙ্কিমযুগের কথা" এবার দ্বিতীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে কিন্তু লেখক নাম প্রকাশ করেন না কেন? 'চয়ন' বেশ ভালই হইয়াছে। 'আর্য্যভট্টীয় সংখ্যা লিখন' প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ কিছু অধিক হওয়া বড়ই দুঃখের কারণ হইয়াছে, এ প্রকারের প্রবন্ধে সামান্য একটি সংখ্যা বা চিহ্নের ভ্রান্তি সাধারণ পাঠককে আকুল করার সম্ভব।

সঞ্চয়।

১। প্রাচীন ভারতে আদমস্থমারী।

"মডার্ণ রিভিয়ু" পত্রিকায় শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ, মহোদয় শীর্ষোল্লিখিত বিষয়ে একটি মনোজ্ঞবর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই ভারতবর্ষে এক প্রকার আদমস্থমারীর প্রচলন ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, এইরূপ একটা প্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া গ্রীক পর্য্যটক মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন।

"The third body of superintendents consists of those who enquire when and how births and deaths occur with the view not only of levying a tax but also in order that births and deaths among both high and low may not escape the cognisance of Government".

অর্থাৎ কোন্ সময়ে এবং কি হারে জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর পরিদর্শকগণ নিযুক্ত থাকিতেন; কেবল কর আদায়ের স্থবিধার জন্য যে এই সংবাদ সংগৃহীত হইত তাহা নহে; ইহার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে কি উচ্চ কি নীচ, কোন লোকই এই উপায়ে শাসনকর্ত্তার অগোচরে থাকিতে পারিত না।"

কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে লোকগণনা ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, মেগাস্থিনিসের বর্ণনা তৎসমুদয়কে পরিপোষণ করিতেছে। ভারতের প্রাচীন যুগের নরপতিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যে শাসন-সৌকর্য্যার্থ, শাসনাধীন সমস্ত দেশ ও তাহার অধিবাসীবর্গ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শাসনকর্ত্তাদের গোচরীভূত হওয়া অত্যাবশ্যক। মগধাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের উন্নত শাসন প্রণালীতে, সেইজন্য এই সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। একথা অবশ্য সত্য, যে বর্ত্তমান সভ্যজগতের Census—লোকগণনা এবং তদনন্তর্গত অনুষ্ঠান সমূহের উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা ঠিক আজকালকার ভাবে, প্রাচীনকালের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় নাই।

সেকালের স্থমারী এবং একালের স্থমারীতে প্রভেদ বিস্তর। প্রথমতঃ চন্দ্রগুপ্তের শাসন সময়ে, আদমস্থমারী, দশ বিশ বৎসর পরে পরে হইত না; বস্তুতঃ এইরূপ সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটা বিভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিত এবং এই

বিভাগের কর্ম্মচারীগণ স্থায়ী ভাবে প্রতি বৎসর এই কার্য্য করিতেন। সেন্সস অতিশয় বিস্তৃত ছিল, এবং এই বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও অল্প ছিল না। এই বিভাগের কর্ত্তার নাম ছিল সমপস্থ আদম সুমারী ব্যতীত তিনি রাজস্ব আদায়, হিসাব পরীক্ষা, ভূমি জরীপ প্রভৃতি আরও অনেক কার্য্য করিতেন। এক এক জন সমপস্থের অধীনস্থ প্রদেশকে চারিটি জেলায় ভাগ করা হইত; প্রত্যেক জেলার অধীনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম থাকিত। প্রত্যেক জেলার ভার এক একজন প্রধান কর্ম্মচারীর উপর থাকিত, তাঁহার নিম্নে গ্রাম্য কর্ম্মচারীগণ কার্য্য করিতেন। মোটামুটি দেখিতে গেলে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ ইংরাজ শাসনের কালেক্টারের কার্য্য করিতেন; সমপস্থ কমিশনার বা সর্দ্দার কালেক্টাররূপে তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালন করিতেন। সর্দ্দার কালেক্টারের উপদেশ মত প্রত্যেক গ্রাম্য কর্ম্মচারীগণের উপর ৫ হইতে ১০টি পর্য্যন্ত গ্রামের ভার দেওয়া হইত। জেলার ও গ্রামমণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত সর্দ্দার কালেক্টার আর এক সম্প্রদায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন; তাঁহাদের কার্য্য অনেকটা গুপ্তচরের কার্য্যের অনুরূপ ছিল। এই চরগণ কালেক্টারের অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। তাঁহাদের কার্য্যও অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র ছিল এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই সংবাদাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন।

চর বা ওভারসিয়ারগণের প্রধান কার্য্য ছিল রাজস্ব আদায় করা ও ভূমি মাপ করা। এই দুই কার্য্য ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল, যথা প্রত্যেক গ্রামের মোট অধিবাসী সংখ্যা গণনা করা; গ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহ এবং পরিবারের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা; প্রত্যেক পরিবারের জাতি এবং জীবিকা কি তাহা অনুসন্ধান করা; কোন্ কোন্ বাস্তু ভিটা নিস্কর তাহা নির্ণয় করা; কোন্ গৃহে কত অধিবাসী তাহা নির্ণয় করা; প্রত্যেক পরিবারের আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ করা; প্রত্যেক গৃহে গৃহপালিত পশ্বাদির সংখ্যা নির্ণয় করা। এই সমস্ত কার্য্যে চরগণ গ্রাম্যকর্ম্মচারীবৃন্দের সাহায্য পাইবার অধিকারী ছিলেন। এতদতিরিক্ত তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করিতে হইত, যথা রাজ্যান্তর হইতে লোকাগমন এবং রাজ্য হইতে প্রজাদের প্রস্থানের কারণ অনুসন্ধান করা; আগত এবং বহির্গত লোক সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা; এবং সন্দেহযুক্ত স্ত্রী পুরুষগণের গতিবিধির উপর তীব্র দৃষ্টি রাখা। এই সমস্ত গুপ্তচরেরা সময়ে সময়ে তীর্থক্ষেত্রে, স্নানের ঘাটে, জন-

শূন্য প্রদেশে, পাহাড় পর্ব্বতে, বিধ্বস্ত পল্লী সমূহে, চোর, শত্রু এবং দুষ্ট লোক-গণকে করায়ত্ত করিবার জন্য ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেন।

প্রাচীন যুগে এই রূপ সেন্সসের উদ্দেশ্য কি ভাবে শাসকগণের নিকট প্রতিভাত হইত তাহা জানা আবশ্যক। সেন্সসের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উভয়বিধ সার্থকতাই তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এইরূপ সর্ব্ববিধ সংবাদ সংগ্রাহক বিভাগের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী ছিল। কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিরোধী স্বাধীন নৃপতিগণের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবম্বিধ সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থার অতিশয় প্রয়োজন ছিল। আর এক হিসাবে রাজনীতিক উপকারিতা সেন্সসের ছিল। কারণ, গ্রাম সমূহ অতি সুকৌশলে বিভক্ত ছিল; যে সব গ্রাম রাজস্ব প্রদান করিতনা তাহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা হইত; যে সব গ্রাম হইতে সৈন্য সংগ্রহ হইত সে সমস্ত এক দলে থাকিত, আবার যে সমস্ত গ্রাম হইতে খাদ্যসামগ্রী, গবাদিপশু, বনজাত দ্রব্য প্রভৃতি সংগৃহীত হইত তাঁহাদের আর এক শ্রেণী ছিল। তাহা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম এবং অধম এই তিন শ্রেণীতেও গ্রাম সমূহকে ভাগ করা হইত। যুদ্ধ সময়ে এই শ্রেণী বিভাগের উপকারিতা সহজেই অনুমিত হইবে।

অর্থনীতিক হিসাবে, জনসাধারণের উপজীবিকা, আয় ব্যয়, প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহের সহিত তাহাদের বৈষয়িক অবস্থার একটা সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি পাওয়া যাইত এবং করাদি নির্দ্ধারণ বিষয়ে অত্যন্ত উপকারে আসিত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে প্রণালীতে লোক গণনা করা হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে দিয়া আমরা শেষ করিব। বলিয়া রাখা ভাল যে ভারতবর্ষের মত তথ্যবহুল সেন্সাস্ জগতের আর কুত্রাপিও গৃহীত হয় না। সমগ্র ভারতের জন্য সেন্সসের বড়কর্ত্তার নাম Census Commissioner কমিশনার; প্রত্যেক প্রদেশের সেন্সাস কর্ত্তাগণকে Provincial Census Superintendent বলা হয়; তাঁহাদের অধীনে প্রত্যেক জেলার একজন করিয়া Deputy Magistrateকে District Census officer নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক জেলা কয়েকটি charge চার্জ্জএ বিভক্ত হয়; এই চার্জ্জকে সার্কেলে, সার্কেল সমূহকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র block ব্লকে পরিণত করা হয়। একটি একটি block এক একজন Enumerater বা গণনাকারীর অধীনে থাকে; এইরূপ কতকগুলি গণনাকারীগণের উপর

সার্কেলের কর্ম্মচারী superviser সুপারভাইজার কর্ত্তৃত্ব করেন; চার্জ্জের মালিক থাকেন Charge Superintendent; ইঁহারাই সাক্ষাৎভাবে District Census officerএর অধীন। অনূন ৫০ খানি ঘর বা পরিবার লইয়া ব্লক গঠিত হয়, ৫০০ ঘর লইয়া সার্কেল হয়, এইরূপ ১০,০০০ ঘর লইয়া চার্জ্জ হয়।

অধুনা সভ্যজগতে ১০ বৎসর অন্তর লোক গণনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় লোকগণনার তফশীলে ষোলটি ঘর আছে তাহা এই—(১) গৃহের নম্বর (২) ব্লকস্থ লোক সংখ্যার ক্রমিক নম্বর (৩) নাম, (৪) বয়স, (৫) বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা বা স্ত্রী মরিয়াছে কিনা তাহার পরিচয় (৬) স্ত্রী কি পুরুষ, (৭) ধর্ম্ম, (৮) জাতি, (৯) পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির প্রধান পেসা, (১০) ঐ গৌণপেশা (১১) যাহারা অপরের পোষ্য তাহাদের পরিপালকগণের পেসা, (১২) যে জেলায় জন্ম, (১৩, মাতৃভাষা, (১৪) লেখা পড়া জানে কিনা, (১৬) জন্ম হইতে কালা ও বোবা, পাগল, গলিত কুষ্ঠারোগী ও দুইচক্ষু অন্ধ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষীয় গণনার তপশীল Enumaration Schedule জগতের অন্যান্য দেশের তফশীল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বিশদ। ইংলণ্ডে মোটে ৬টি ঘর পূরণ করিতে হয়।

পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে দুই সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে লোকগণনার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা মোটামুটি আজকালকার সভ্যজগতের প্রথার অনুরূপ।

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত।

২। অন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনী।

উদ্দেশ্য ও ফল।

গত জুলাই মাসে ২৬শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরীতে এক মহাসমিতির অধিবেশন হয়। এই মহাসমিতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই মহাসমিতির নাম Inter-Racial Congress বা Race Congress—আমরা ইহাকে অন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনী বলিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সুধীগণ এই মহাসমিতির জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করেন, সম্প্রতি তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহাসমিতির অধিবেশনের উদ্দেশ্যই বা কি এবং ইহার অধিবেশনের দ্বারা কি ফল হইবে তাহা আমাদের বিশেষ করিয়া চিন্তা করা উচিত। এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য—

To discuss in the light of science and modern

conscience, the general relations subsisting between the peoples of the west and those of the East, between the so-called white and so-called coloured peoples, with a view to encouraging between them a fuller understanding, the most friendly feeling, and a heartier co-operations" উদ্দেশ্যটি আমরা একটু সরলভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিজ্ঞানের উন্নতি নিবন্ধন অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ, সমাজ, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব ছিল, এখন তাহা নিতান্ত সুখসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রীকগণ, যাহারা গ্রীক নহে তাহাদিগকে বার্ব্বেরিয়ান বলিতেন, হিব্রুজাতি অন্য জাতীয় লোককে জেণ্টাইল্ বলিতেন— এ সমস্ত কথা ঘৃণাব্যঞ্জক। সম্ভবতঃ এই ভাবেই প্রাচীন হিন্দুগণ বৈদেশিক-মাত্রকেই ম্লেচ্ছ এই আখ্যায় অভিহিত করিতেন। ইহা ছাড়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-জগৎ সম্বন্ধে এক প্রচলিত কথা আছে

"East is East and West is West
And never the twain shall meet.

"প্রাচ্যদেশ প্রাচ্যদেশই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে ইহাদের মিলন কখনই হইবে না।"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে এখন যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা বেশ ভাল নহে। এই উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত বিজ্ঞান ও আধুনিক ধর্ম্ম-বুদ্ধির সাহায্যে তাহা অবধারণ করাই এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যাহাতে যথার্থ পরিচয় হয় তাহার ব্যবস্থা করাও এই সমিতির উদ্দেশ্য। পরস্পর পরস্পরকে যথার্থভাবে চিনিতে পারিলে, ইউরোপের লোক এশিয়া ও আফ্রিকার লোককে আর ঘৃণা ও অবহেলা করিতে পারিবে না, এশিয়া ও আফ্রিকার লোকেও এশিয়ার লোককে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করিবে না। মহাসমিতির উদ্দেশ্য যে অতীব মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মনে এই প্রকারের একটা নূতনভাবের হঠাৎ উদয় হইল কেন, তাহাও আলোচনা করা উচিত। এই সম্মিলনী হইতে যে প্রবন্ধ-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত উইয়ার ডেল্ সাহেব ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"In less then twenty years we have witnessed the most remarkable awakening of nations long regarded as sunk in such depths of somnolence as to be only interesting to the western world because they presented a

wide and prolific field for commercial rivalries * * but which otherwise were an almost negligible quantity in international concerns." ইউরোপের জাতিসমূহ প্রাচ্যজগতে আসিয়া বাণিজ্য করিতেছিলেন। প্রাচ্য জাতি সমূহকে তাঁহারা মানুষ বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না, ভোজ্য বস্তুর সহিত ভোক্তার যে সম্বন্ধ, তাঁহারা মনে করিতেন প্রাচ্যজাতি সমূহের সহিত তাঁহাদেরও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। তাঁহারা প্রাচ্য জগতে বাণিজ্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, ভাবিতেছিলেন এই সমস্ত জাতি চিরকালের জন্য নিদ্রানিমগ্ন হইয়াছে—তাহাদের আর কোন কালে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের দেশ চিরকালই আমাদের ভোগায়তন হইয়া থাকিবে। হঠাৎ ইউরোপের এ ভ্রান্ত ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কুড়ি বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রাচ্য জাতির উত্থাপন হইয়াছে, জাপান ইউরোপের যে কোন পরাক্রমশালী জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, চীনদেশেও একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে।

এই উক্তি হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হঠাৎ প্রাচ্যজাতিগণকে ঈদৃশ সম্মানের চক্ষে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন কেন? এই জন্য সম্মিলনীর নিমন্ত্রণপত্রে লিখিত হইয়াছে—So far as possible special treatment will be accorded to the problem of the contact of Europeans with other developed types of civilisation, such as the Chinese, Japanese, Indian, Turkish and Persian. চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ সভ্যতায় বেশ উন্নত; ইউরোপ, অন্ততঃপক্ষে ইউরোপের মনীষিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই সমস্ত সুসভ্য প্রাচ্য জাতিকে আর উপেক্ষা করা বা বৈষম্যের চক্ষে দর্শন করা সম্ভবপর নহে। সম্মিলনী এই সমস্ত জাতির সহিত ইউরোপীয়গণের সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সম্মিলনী অবশ্য বৎসর বৎসর হইবে, এইবার ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গেল—এই অধিবেশনের দ্বারা কি লাভ হইল তাহাই ভাবিবার কথা—এ সম্বন্ধে গ্রন্থের সম্পাদক পূর্ব্বাভাসে বলিয়াছেন—"henceforth it should not be difficult to answer those who allege that their own race towers far above all other races, and that therefore other races must cheerfully submit to being treated or maltreated, as hewers of wood and drawers of water." এখন হইতে আর কোনও জাতি বলিতে পারিবে না যে আমরা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্যান্য জাতিগণকে তাহাদের দাসত্ব করিতে হইবে, তাহারা অন্যান্য জাতির সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অধিকারী।

ONE KING. ONE FLAG
ONE FLEET. ONE EMPIRE
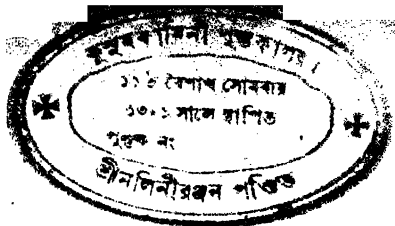
বন্দনা

রাজ্যেশ, এস রাজ্যে।

মহিমান্বিতা ভার্য্যা সহিতে
আর্য্যভূমি এ ভারত-মহীতে,
মুকুটচ্ছলে শীর্ষে বহিতে
গুরুভার রাজকার্য্যে

ধন্য করিয়া পুণ্যধারায় জহ্নু-কন্যা গঙ্গা
বহে জ্ঞানসম শ্বেতপ্রবাহে হর-জটাজূট-সঙ্গা ;
কম-হিল্লোলা যমুনা চলে শ্যামতনু রুচি বর্ণে,
কল্লোলে করি' ভক্তি প্রেমের সুদূরধ্বনি কর্ণে
ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্র-রুধিরে রক্ত-তটিনী ছুটিল,
সমরে অমর ভগবদ্বাণী দ্বন্দ্ব দর্প টুটিল ;—
যুক্ত-বেণীতে প্রবাহি ত্রিধারা-জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম,—
এ মহাতীর্থে এস, সম্রাট ! পালিতে রাজার ধর্ম্ম।

স্তুতি।

যুক্ত করিয়া অযুত কণ্ঠ
তোল সুস্বর গগনে,
জর্জ্জ-মেরীর পূর্ণপ্রতাপ
বিঘোষিত হোক সঘনে
নতজানু হ'য়ে যোড় করি করে,
ডাক একমনে যতেক অমরে,
চিরভাস্বর তাঁহাদের বরে
হোক্ বৃটানিয়া ভুবনে।

উল্লাসময় সঙ্গীত-তালে,
বিচরেণ রবি আকাশে,
দিগন্তে চাহি না দেখিতে পান
রাজ্যের সীমা কোথা সে !
ন্যায়-দণ্ডের উজ্জ্বলভাতি
স্ফুরে বিদ্যুৎ কুলিশের সাথী,
দর্পে নিরাসি, সর্ব্ব অরাতি
বিবর্ণ মুখ তরাসে
রত্ন-খচিত দীপ্ত কিরীটে
নানা-মণি-চারু-মিলনে,
মধ্য-রত্ন বিরাজে ভারত
পদ্মরাগের কিরণে !
ফুটে যে আলোক মুকুট-ছটায়,
মহামেঘ-ঘটা তাহে কেটে যায়,
মন্দ্র পাশরি তূর্ণ মিলায়
ইন্দ্রচাপের বরণে !
কি মহিমময়ী বৃটন-শক্তি
অদ্রির মত অচলা !
সমুদ্র কটী-বন্ধের সম,
শীর্ষে সূর্য্য-উজলা !
করধৃত অসি দুষ্ট দলনে,
নয়নে কিরণ তিমির হরণে,
দেখ দাঁড়াইয়া শুভ্রবরণে,
বরাভয়-দানে সফলা !

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

পুণ্যব্রত।

অবসাদ আসিয়াছিল, দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলাম, মনে হইতেছিল নিখিল বিশ্বে আমরা অসহায়; সংস্কার বশে কর্ম্ম করিতেছিলাম কিন্তু হৃদয়ে উৎসাহ ছিল না, মনে হইতেছিল ভবিষ্যত একেবারে অন্ধকার—কিছুতেই কিছু হইবে না। অনেক সময়ে মনে হইতেছিল এতদিন আমাদের পুরোদেশে যে আদর্শের উজ্জ্বল আলোক পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতেছিল, যাহার প্রতি চাহিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম, সে আলোক সত্য নহে, কল্পনা মাত্র। পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বে একটা মিলনের ভাব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল, নিরাশায় নিমগ্ন হওয়ার পর সে ভাব ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছিল।

সহসা মেঘমুক্ত পূর্ণশশধরের মত আমাদের সেই আলোক আবার প্রকাশিত হইয়াছে—এবার তাঁহার জ্যোতি উজ্জলতর,এবার তাঁহার রূপ আরও মনোহর, তিনি আসিয়াছেন, কি হাস্যোজ্জ্বল তাঁহার মুখ! অন্ধও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে, বধিরও তাঁহার অভয় বাণী শুনিতে পাইয়াছে, পঙ্গুও তাঁহাকে পাই-বার জন্য পর্ব্বত লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আবার ভারতবর্ষে মহা-মহোৎসব—উল্লাসসঙ্গীতে সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে—এত দিন আমরা মহামিলনের যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ বুঝিতেছি তাহা সফল হইতে বিলম্ব নাই। আজ বুঝিলাম আমরা অসহায় নহি, আমাদের সাধনা সমুহ অরণ্যে রোদন নহে, সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যিনি নিখিলবিশ্বের সিদ্ধিদাতা, অনন্ত মানবজাতি যাঁহার প্রতি চাহিয়া যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হই-তেছে, তিনি আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না, আমাদের সকল চেষ্টা তাঁহার আশীর্ব্বাদে সফল হইবে।

প্রতীচ্য জগতের সুধীমণ্ডলীর মানস নেত্রের পুরোদেশে কি মহান, কি অপূর্ব্ব আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—অখণ্ড মানবজাতি—বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব। ঐ সপ্তসিন্ধু উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই মহা-বাণী পবিত্র ভারত ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এইবার তাহার প্রতিধ্বনি উত্থিত হইবে—ভারতবর্ষেই সেই মহামন্ত্রের সাধনা আরম্ভ হইবে। মানুষ মানুষের ভোজ্য বস্তু নহে, একজাতি অপর জাতির ক্রীড়নক নহে—সকল মান-বের, সকল জাতির জীবনের মূলে বীজের মত সচ্চিদানন্দ রহিয়াছেন, কেহই মূল্যহীন ও নিশ্চেষ্ট নহে, সকলেই বিকাশের পথে চলিয়াছে; কেহ কাহাকেও

বাধা দিও না, একজনকে বা একজাতিকে বাধা দিলে সমস্ত বিশ্বের অকল্যাণ হইবে—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য কর—মানুষ মানুষের শত্রু নহে—প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, আনন্দের পতাকা-নিম্নে নিখিল বিশ্ব মিলিত হইবে। ভারতবর্ষের নিকট এই মহাবাণী মোটেই নূতন নহে, অতি প্রাচীন কাল হইতে, মানব সভ্যতার প্রত্যুষ হইতে ভারতবর্ষে এই মহামন্ত্রের সাধনা চলিয়াছে—ভারতবর্ষের ইহাই অন্তরতম কথা। ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী একদিন সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন রাজ্যের পরিচালকগণ কুটীরবাসী, জটাবল্কলধারী ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন। ভারতের সেই 'শ্রেয়' সেই 'সংযম' আজ আবার তাহারই কথা জগত জুড়িয়া উত্থিত হইয়াছে। এতদিন বিশ্ববাসী ভোগের পথে ছুটিয়াছিল এখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন বুঝিয়াছে এ কেবল মরু-ক্ষেত্রে মরীচিকার অনুসরণ, ভোগের মধ্যে জীবন সফল নহে—ত্যাগই আদর্শ; ভারতের প্রাচীন বাণীর প্রতিধ্বনি আজ জগৎ কম্পিত করিয়া উত্থিত হইয়েছে।

কত সংঘর্ষ, কত বিদ্বেষ, কত কুরুক্ষেত্র, কত ম্যারাথন, কত জেহাদ, কত ক্রুসেড, হইয়া গিয়াছে—ঐ তাহার বিরাট ইতিহাস—মানবজাতি ঐ তোমার শৈশব কাহিনী! কত চপলতাই করিয়াছ! কিন্তু তাহার জন্য লজ্জা করিবার কারণ নাই—এই চপলতার মধ্যেই তোমার পুষ্টি হইয়াছে, তোমার জ্ঞান হইয়াছে, তুমি পৃথিবীকে আয়ত্তাধীন করিয়া আজ মহা মিলনের মন্ত্রসাধনার আসন গড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ। আজ এই প্রেম সাধনার দিনে, হে ভারতবর্ষ, তোমারই বিজয়পতাকা আকাশে উড্ডীন হইয়াছে। তুমিই প্রথমে এ মহা মিলনের কথা জগতে প্রচার করিয়াছ—তুমিই প্রথমে জড়ের মধ্যে চৈতন্য, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব অনুভব করিয়াছ। আজ ভারতবর্ষের সেই যুগ-যুগান্তর ব্যাপি মহা সাধনা সফল হইবার দিন আসিয়াছে।

যোগীবর! আজ আবার জাগ্রত হও। কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গনে যে বিশ্বরূপ তুমি দেখিয়াছিলে, অস্ত্রের ঝন্ঝনার মধ্যে, রুধির স্রোতের মধ্যে, যে বিভুতিযোগ তুমি একদিন কীর্ত্তন করিয়াছিলে, ঐ দেখ আজ সমগ্র মানব জাতি সেই বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য, সেই বিভূতি যোগ শুনিবার জন্য লালায়িত হইয়া তোমার পদমূলে উপস্থিত হইয়াছে।

হে ভারতবর্ষ! তুমিই একদিন রাজপুত্রকে তাহার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা হইতে, প্রেমময়ী ভার্য্যার প্রেমোষ্ণ মধুর বক্ষ হইতে, বিলাসবিভ্রম পূর্ণ

প্রাসাদ ও পিতামাতার ক্রোড় হইতে বাহির করিয়া গভীর রজনীতে তাহাকে ভিখারীর সাজে সাজাইয়াছিলে—দীনাতিদীন বেশে তাহাকে মানবের দ্বারে দ্বারে তোমার মর্ম্মকথা সাম্য, প্রেম ও অহিংসার কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলে। আজ আবার বুঝি সেদিনের পুনরভিনয় হইবে, সেই সংবাদ আবার বুঝি প্রচারিত হইবে—দীনপতিত যাহারা, অবজ্ঞা ও অবহেলায় পদাহত যাহারা, তাহারাও দাঁড়াইবে—'অমৃতের পুত্র' তাহারা, এ সংবাদ শুনিবে, গৌরব মুকুটে তাহাদের মস্তক উন্নত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। হে ভারতবর্ষ! তোমার কত পুত্র, তোমার সেই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কতবারই না জাগ্রত হইয়াছেন! ঐ তাঁহাদের কীর্ত্তিকথা তোমার পর্ব্বত গাত্রে খোদিত, তোমার তটিনীগুলির কল্লোল মধ্যে তাঁহাদের অমর বাণী এখনও কীর্ত্তিত হইতেছে।

আজ তোমার বক্ষে বিশ্বমানবের সকল শাখা নিজ নিজ সাধনা ও সভ্যতা লইয়া একত্র মিলিত হইয়াছে। আবার তুমি তাহাদের মিলিত করিবে—আবার তুমি তাহাদের সকলকে একই মহামন্ত্রে উদ্বোধিত করিবে। তোমার বাণী মহাদেশ হইতে মহাদেশে, এক মেরু হইতে অপর মেরুতে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কীর্ত্তিত হইবে—আজ যেন তাহারই উদ্যোগ হইতেছে!

কি মহান্ অধিকারেই তুমি আমাদের অধিকারী করিয়াছ। কি মহান্, অতীত আমাদের পশ্চাতে, কি বিরাট ভবিষ্যত আমাদের সম্মুখে! আজ আর হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। এখন আমাদের দায়িত্ব বুঝাইয়া দাও, কেবল অধিকারের অসার গর্ব্বে আমরা যেন হীন হইয়া না পড়ি, আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা বুঝিতে পারি। কত বড় কার্য্য আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, ঐ কোটি কোটি সহিষ্ণু নরনারী আমাদের চতুর্দ্দিকে, বিশ্বের সংবাদ তাহারা জানে না, বাহিরের প্রকৃতির সহিত তাহাদের পরিচয় নাই, তাহারা নিজেদের অতীত ভূলিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাবিবার তাহাদের সামর্থ্য নাই। তাহাদের অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, শক্তি নাই, দুঃখে শোকে অভাবে, অবিচারে তাহারা দিবানিশি প্রপীড়িত, অথচ তাহারা কত শান্ত, কত নির্ম্মল চিত্ত, কত পরিশ্রমী, কত ধর্ম্মশীল, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে তাহাদের মুখে কথা নাই, তাহারা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া জগতের অন্নসংস্থান করিতেছে। কত ত্যাগশীল, কত মহান্ তাহারা!

তাহারা আমাদের সেবা করিয়াছে, আজ একবার আমাদিগকে তাহাদের

সেবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। বিশ্বজ্ঞানের সকল বিভাগের দ্বার একবার তাহাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান কর, কি মহাশক্তি ভারতের পল্লীপ্রান্তরে নিদ্রানিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের জাগাইবার চেষ্টা হইয়াছে, যখনই তাহারা জাগিবার উপক্রম করিয়াছে তখনই সমগ্র পৃথিবী তাহাদের এই জাগরণের প্রভাব অনুভব করিয়াছে, এখন তাহাদের স্থায়ীভাবে জাগিয়া উঠিবার সময় আসিয়াছে—আর তাহারা ঘুমাইবে না। তাহারা জাগিবে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু আমরাই বা নিশ্চিন্ত ও উদাসীন কেন? তাহাদের সেবার জন্য আমাদের বাহির হইতে হইবে—ইহা আমাদের বহু বহু শতাব্দী হইতে গৃহীত ঋণ, প্রকৃতির বিচারালয়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে আমাদিগকে ইহা অবিলম্বে শোধ করিতে হইবে।

হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া, সেবার সঙ্গে প্রাণ লইয়া কেবল একবার তাহাদের সমীপস্থ হইলে আমাদের মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে—বুঝিতে পারিব আমরা কত বৃহৎ, আরও বুঝিতে পারিব যথার্থ ভারতবর্ষ কোথায় এবং তাহার অলৌকিক সাধনাই বা কি?

কোথায় নানকের উদারতা, কোথায় কবীরের আত্মনিষ্ঠা, কোথায় চৈতন্য নিত্যানন্দের বিশ্বপ্লাবী প্রেম—আজ তাহারই প্রয়োজন। দেশের জন্য বিদেশের জন্য, নিজের ও জগতের কল্যাণের জন্য সেই প্রেমমন্ত্রের সাধকগণ আবার সাধনা আরম্ভ করুন। নিজের জন্য অর্থ, প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম উপার্জ্জনের নিমিত্ত দিন রাত্রি ব্যাকুল—ইহাই জীবনের মুখ্য আকাঙ্ক্ষা, অথচ গৌণভাবে দেশের জন্য, দশের জন্য, বিশ্বমানবের জন্য দু চারিটি বড় বড় উদারতাব্যঞ্জক কথা বলিতেছি, এ প্রকারের মিথ্যাচারের দ্বারা জগতে কোনও জাতির কখনও মঙ্গল হয় নাই। এই ভারতবর্ষ বুদ্ধ, শঙ্কর, ও চৈতন্যের দেশ -এদেশে মিথ্যাচারের স্থান নাই। ভারতবর্ষ সকলের, সকলেই ভারতবর্ষের—আরও দেশ আছে, আরও স্থান আছে—তবুও ভারতের নাম কর্ম্মভূমি, এতদিন আমরা এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই, আজ যখন দেখিতেছি, জোরায়াস্তার, বুদ্ধ, জিন, মহম্মদ, নানক, কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, সকলেরই পতাকা একসঙ্গে ভারতবর্ষে উড্ডীয়মান—আজ যখন দেখিতেছি বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞানের, কর্ম্মের সহিত ধ্যানের অপূর্ব্ব মিলন এই ভারতবর্ষে সংঘটিত হইয়াছে, তখন বুঝিতেছি সত্যই ভারত কর্ম্মভূমি!

আবার যেন কেহ আসিতেছেন, যেন এক মহতী শক্তির পুনরাবির্ভাব হই-

ভেছে—ভারতবর্ষই তাহার কেন্দ্র হইবে। দেশে দেশে সারা পড়িয়াছে, নানা ভাবের উদ্যোগ হইতেছে—আবার যেন কেহ আসিতেছেন—বিশ্বমানবের গুরু তিনি, সকল ধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয় কর্ত্তা তিনি। তাঁহাকে উপযুক্তভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে—আমাদের দেশবাসী সকলকে এ জন্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত, পুনঃ পুনঃ আহ্বান আসিতেছে—সমগ্র হৃদয়মন অর্পণ করিয়া আমাদিগকে পুণ্যব্রত পালন করিতে হইবে।

সর্ব্বত্রই এই এক বিশাত্মা বিরাজিত—জীবও ব্রহ্ম দুটি সুন্দর পক্ষীর মত সখ্যভাবে বদ্ধ হইয়া একবৃক্ষে বিরাজমান—ভারতবর্ষ এ তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন—একাগ্রচিত্তে দেশে দেশে এ তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, আজ আমাদিগকে আবার তাহা বুঝিতে হইবে।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।”

একমাত্র সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা একরূপকে বহুধা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহাকে নিজ আত্মার মধ্যে দেখিয়া শাশ্বত সুখ লাভ করিতে হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ।

সারারাত ঘুরি' ফিরি' চুরি করি' চোর
ঘরে এসে শুয়ে' প'লো না হইতে ভোর।
কহে চোর—সাধু বলে' চালা'ব নিজেকে
যতদিন ধরা না—হঠাৎ চেয়ে দেখে
কাহার পলকহীন তীব্র আঁখি দু'টি
চেয়ে আছে, তিরস্কার বাহিরায় ফুটি'।
সভয়ে মুদিল চোর নিদ্রারুণ আঁখি,
দেখিল জানিতে তাঁর কিছু নাই বাকি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

দীনবন্ধু মিত্র ও হাস্যরসের রচনা।

মাইকেল মধুসূদন দ:ত্তর দুই খানি প্রহসন ছাড়িয়া দিলে নিছক হাস্যরসের রচনা ও ইংরাজী ধরণের হাস্যরসাত্মক নাটক লইয়া আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে দীনবন্ধুই প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নাটক ছাড়িয়া দিয়া শুধু হাস্যরসের রচনা ধরিলে, অবশ্য হাল ও সাবেক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস রচয়িতার বিশেষ অভাব নাই। দীনবন্ধু বঙ্কিম সম্প্রদায়ের অনতিপূর্ব্বে "শেষ বাঙ্গালী কবি" ঈশ্বর গুপ্তের চতুস্পার্শে সাকরেদ পাল্লা-দার ও জুড়িদাররূপে হাস্যরসিক বহুতর যোগ্য ব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যের আসর গুলজার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের নিতান্ত দুর্ভিক্ষ ছিল, একথাও বলা যায় না। মানুষ কবে না হাসিয়া থাকিতে পারে? কবিওয়ালাদিগের গান, দাশু রায়ের পাঁচালী প্রভৃতি রচনা অনেক দোষদুষ্ট সত্য, কিন্তু স্থানে স্থানে হাস্যরসের ফোয়ারা বিশেষ। বুড়োশিবের গীত, যজ্ঞ-ভস্মের প্রসঙ্গ, আগমনীর আনন্দ, মানভঞ্জন ও কলঙ্কভঞ্জনের পালা, উদ্ধব সংবাদ, "কুব্জার বন্ধুর" বন্ধুতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ভক্তি ও কৌতুকরসের অম্ল-মধুর সংমিশ্রণে মাঝে মাঝে বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। * আবার অনেক রসিক ব্যাপারী "মদনরাজার প্রেমের বাজারে"র যে ভরপুর পশরা নামাইয়া-ছেন, তাহা নিতান্ত অরসিক ভিন্ন সকলেরই উপভোগ্য, একথা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। তখনকার কথকঠাকুরগণও যে নিতান্ত বেরসিক ছিলেন না, তাহা শ্রীধর কথকের যে কয়েকটি প্রচলিত গান আছে তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবলার পতিনিন্দা নিতান্ত দূষণীয়, কিন্তু ভারতচন্দ্রের "উকিল আমার পতি কিল খাইতে দড়" ইত্যাদি চিত্র ভুলিবার নহে। 'বৃদ্ধস্য তরুণী' বিড়ম্বনা, দাম্পত্য-কলহ • ইত্যাদি বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে নিতান্ত বিরল নহে। যাহাই হউক, অতিদূর অতীতে না গিয়াও, সাবেক সাহিত্যে যে হাস্যরসের অনাটন ছিল একথা এই সকল উদাহরণের পর আর বলা যায় না।

বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরসের রচনা।

কিন্তু সেকালের ও একালের হাস্যরসের রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে।

---

* রাম বসু।

• শেষোক্ত বিষয়ে দীনেশ বাবু বলিয়াছেন যথা—"বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া নিত্যকর্ম্ম। এই গালির স্বাদ সর্ব্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব (!) আছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; পৃ: ৫২৬)। প্রমাণ যথা বিজয়গুপ্তে—"একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা গাধা॥" ইত্যাদি

হাস্যরসে আবার একাল ও সেকাল? শুনিলেও হাসি পায়। মানুষ চিরকালইত হাসিয়া থাকে; হাসির আবার রকম-ভেদ আছে নাকি? কিন্তু কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। নিতান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। মানুষ চিরকালত হাসিয়া থাকে, চিরকাল কথাও কহিয়া থাকে। কিন্তু যেমন সেকালের ভাবভঙ্গী, রুচি, বিধি, তেমনি হাস্য পরিহাসও একালের সহিত তুলনায় এক হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে জগতে নূতনত্ব বলিয়া জিনিষ থাকিত না, এবং সেইজন্ত জীবনও বিস্বাদ হইয়া উঠিত। মানুষ নিতান্ত "সেকেলে" হইয়া পড়িত। রুচিভেদে শিক্ষাভেদে, স্থান ও কালভেদে, সাহিত্যের আকারত বদ্‌লাইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রকারেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

হাস্যরসে একাল ও সেকাল।

প্রাচীন সাহিত্যে (অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পূর্ব্বতন বঙ্গ-সাহিত্যে) যে টুকু হাস্যরস ছিল, তাহার উৎস অবাধ, সহজ ও রসাল হইলেও অজস্র বা বিপুল ধারায় বহিত না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সাহিত্যক্ষেত্রকে সরস করিয়া রাখিত মাত্র। এইজন্ত দীনেশ বাবু তাহার অত বড় পুস্তকের মধ্যেও হাস্যরসের রচনা বলিয়া একটা পৃথক শ্রেণী বিভাগ করেন নাই; কিন্তু হাল সাহিত্যে সেরূপ না করিলে চলিবে না। যাহা হউক, এরূপ স্বতঃসিদ্ধ মৃদু হাস্যের রশ্মি অল্প বেশী পরিমাণে তখনকার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য রচনাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন কবি এবিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, গোয়ালিনী বা ধোবানীরূপিণী মনসা দেবীর আবির্ভাব, দেবদেবীর রহস্যপ্রিয়তা, লহনার সহিত খুল্লনার বিবাদ প্রভৃতি নানাস্থলে ভিন্ন ভিন্ন কবির বিশেষ পরিহাস শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা কতটুকু? এরূপ হাস্যরসের খেলা পুস্তক বিশেষকে নিতান্ত ভারাক্রান্ত না করিয়া একটু হাল্‌কা ও রসাল করিত মাত্র। সাহিত্যে এত অপ্রচুর অন্তর্নিহিত ধারা হাস্য-রসমাত্র পিপাসুকে তৃপ্ত করিতে পারে না। উত্তাল রসসিন্ধুর তুফানে ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না।*

প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরস ও তাহার বিশেষ লক্ষণ।

* এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও শ্রদ্ধেয় লেখক লিখিয়াছেন: "প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরস সর্ব্বত্রই প্রায় অপরাপর রসের সহিত একত্রে, অপরাপরের পরে, পশ্চাতে মধ্যস্থলে বা বাহিরে বাস করিত। প্রায় কোথাও অপরের সঙ্গবিরহিত হইয়া, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, হাস্য আপনার আস্য দেখাইতে অগ্রসর হইত না। বাঙ্গালীর বারইয়ারীতলায়ও না। তথায় সে আর যতই ঠেঁটামি, নোংরামি, ও নেংটামি দেখাক, এ পক্ষে আদবকায়দাটি ছাড়িত না। হয়ত

ইহার উপর আর একটি কথা আছে। প্রাচীন সাহিত্যে এই কৌতুক-প্রিয়তার সীমা বড় সঙ্কীর্ণ ছিল। কাব্যরচনায় যেমন কবিগণ কতকগুলি বাঁধা বিষয়ের বাহিরে যাইতে সাহস করিতেন না, হাস্য পরিহাসসম্বন্ধেও সেইরূপ। কতকগুলি চিরন্তন বাঁধা গৎ এর মধ্যে পড়িয়া এই হাস্যরসোদ্রেকের চেষ্টা, অবিরতধারা বৃষ্টিপতন-শব্দের মত, বড় "একঘেয়ে" হইয়া পড়িতেছিল। এই সীমাবদ্ধতার একটি কারণ বোধ হয় যে প্রাচীন লেখকেরা সমস্ত জীবনটাকে কৌতুকের চক্ষে বা কৌতুকের হিসাবে দেখিতে পারিতেন না। এরূপ দৃষ্টিশক্তির জন্য একটা বিশেষ চিন্তাশীলতার আবশ্যক; এবং এরূপ চিন্তাশীলতা বোধ হয় সাহিত্যের শৈশবে আশা করিতে পারা যায় না। কিন্তু কারণ যাহা হউক না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উচ্চাঙ্গ হাস্যরসের একান্ত অভাব। 'উচ্চাঙ্গ হাস্যরস' 'হাস্যে চিন্তাশীলতা' প্রভৃতি শুনিয়া হয়ত অনেকের হাস্যোদ্রেক হইবে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্কীর্ণতা।

তাহার কারণ।

সেকালের অধিকাংশ লেখা শুধু ধর্ম্মের আবরণে বাহির হইত। এমন কি 'বিদ্যাসুন্দর' প্রত্যক্ষভাবে যাহাই হউক না কেন পরোক্ষভাবে কালীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা দীনেশ বাবুর বইখানি একবার উল্‌টাইয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ধর্ম্মের এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলিও কত নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ, চণ্ডী ও মনসার মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, শ্রীচৈতন্তের চরিতামৃত কাব্যে এই কয়েকটি বাঁধা বিষয় ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য এই বাঁধাবাঁধির মধ্যেই অনেক অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা ও অন্যান্য দৃশ্যের উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা বিদ্যাসুন্দর। দেবদেবীর স্তুতি-কালে অনেক কবি লুকাইয়া বেশ এক চোট হাসিয়া লইয়াছেন—কিন্তু তথাপি প্রতিভার (পরিহাসশক্তির ত কথাই নাই) স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা কখনই এরূপ বাঁধাবাঁধির মধ্যে হইতে পারে না।

ধর্ম্মের আবরণ।

া ন্যাংটো হইয়া আসরে নামিত, অথবা আসরে নামিয়া নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ হইত; কিন্তু রূপরের পরে পশ্চাতে নামিত; একা সর্ব্বস্ব হইয়া ও নিজের নিরাচ্ছিন্নতা লইয়া আসর লইত া।" [শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় "প্রদীপ," ১৩০৮ মাঘ ও ফাল্গুন]

আরও একটি কারণে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কৌতুকপ্রবণতার বিকাশ হয় নাই। সেটি উচ্চ আদর্শের অভাব। উচ্চ-আদর্শ কেন, জীবনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, তখন সাহিত্যে কোন আদর্শই ছিল না। কারণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালীর আদর্শীভূত সংস্কৃতসাহিত্য হাস্যরসের রচনায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নহে।* ছিলনা একথা বলা যায় না. কারণ হাসি অশ্রু জীবন ও সাহিত্যের নিত্য সহচর। যাহা কিছু ছিল, তাহা আবার নাট্যসাহিত্যে—চিরন্তন হাস্য-ভাণ্ড-বহনকারী বিদূষকে। কিন্তু সংস্কৃতনাটকের এই পেটুক রহস্যপটু ব্রাহ্মণ বটুর হাস্যপরিহাস অনেক সময়ে অত্যন্ত এক ভাবাপন্ন ও রস-স্বাদ-হীন। ভবভূতি তাঁহার নাটকে বিদূষক-বিসর্জ্জন করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও বেশী কৃতকার্য্য হন নাই। (উত্তর রামচরিতে চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে দাণ্ডায়ণ-সৌধাতকি সংবাদ দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালার "ভাঁড়" এই বিদূষকের এক নিম্নতর সংস্করণ বটে, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বিশেষ স্থান নাই। ক্ষণভঙ্গুর বাক্‌পটুতা ও হাস্যপরিহাসের দ্বারা রাজামহারাজ অথবা সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের চিত্তবিনোদনই তাহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যবসা ও উপজীবিকা ছিল; তাহারা অন্য কোন উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা রাখিত না।

উন্নত আদর্শের অভাব।

প্রাচীন সাহিত্যের এই কৌতুকপ্রিয়তা কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন; তাহার সাক্ষ্য, তাঁহার সভায় ত্রিরত্ন—"হাস্যার্ণব," মুক্তারাম, ও দেশবিখ্যাত গোপালভাঁড়। কিন্তু এই রহস্যপ্রিয়তার রুচি বিশেষ সূক্ষ্ম বা মার্জ্জিত ছিলনা। হো-হো হাসি, শ্লেষ, বিদ্রূপ, তামাসা, বাক্‌চাতুর্য্য—ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল; সময় ২ অশ্লীল রসেরও অবতারণা হইত। দীনেশ বাবু এই রসিকতাকে ইংলণ্ডের চার্লস দি সেকেণ্ডের সময়ের রসিকতার সহিত তুলনা করিয়াছেন—তাহা নিতান্ত অযথার্থ হয় নাই। ক্রমে এই রঙ্‌তামাসার তরঙ্গ রাজসভা ছাড়াইয়া সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়াছিল,কারণ তখনকার অনেক কবি রাজানুগ্রহের প্রত্যাশা রাখিত।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের রসিকতা।

---

* ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী কোন ২ কবি পারস্যভাষাভিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে পারস্য সাহিত্যের চর্চ্চা লেখকদিগের মধ্যে ছিল কিনা ও তাহার প্রভাব সাহিত্যে কতখানি তাহা এখনও অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

সুতরাং একদিকে যেরূপ মুসলমান নবাব-দরবারের বিলাসিতা কৃষ্ণনগরের রাজসভা আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে মুসলমানী কেচ্ছা-কেতাবের প্রভাবও বঙ্গসাহিত্য পঙ্কিল ও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের ইতর রসের যাহা প্রধান আকর্ষণ সেই "বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ" নাগর ধরা কুট্নীদাসী হীরে মালিনীর আমদানী এই মুসলমান সাহিত্য হইতে। সাহিত্যের তখন ঘোর দুরবস্থা।

কিন্তু এই পঙ্কিল প্রবাহ একশ্রেণীর রচনাকে বেশী স্পর্শ করে নাই। কবিওয়ালাদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সাহিত্যের মূল্য খুব বেশী নহে, কিন্তু যে অশ্লীল রুচি রাজসভা ও তদনুগৃহীত সাহিত্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে ইহার কিছু বেশী অনিষ্ট হয় নাই; কারণ সে বিকৃত রুচি তখনও দূরপল্লী ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনও পূর্ব্বতন সাহিত্যের নির্ম্মল সহজ সরল কৌতুকপ্রিয়তা বহন করিয়া এই ভক্তিরসাপ্লুত কবি-গীতি নিরক্ষর অনাড়ম্বর জনসাধারণের তৃপ্তি সাধন করিত।

কবিওয়ালা।

কিন্তু যে রুচির বিকার ভারতচন্দ্রীয় যুগে সাহিত্য মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা সহজে যাইবার নহে। এইজন্য পরবর্ত্তী সমস্ত কবি-দিগের রচনা একবারে নির্দ্দোষ নহে। দাশুরায়ের পাঁচালীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; রামবসু, গোপাল উড়ে, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতির যাত্রাসঙ্গীত (গোপাল উড়ে বিদ্যাসুন্দরের এক যাত্রা-'সংস্করণ' করিয়াছিলেন) হাপ আখাড়াই, নদে-শান্তিপুরে 'খেউড়' গান, কবিযুদ্ধ প্রভৃতি সকলস্থলে এই বিকৃত রুচির প্রকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের যুগ।

ঈশ্বর গুপ্তের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শিষ্য প্রশিষ্য সহযোগী প্রতিযোগী লইয়া এক সময় তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের একছত্র সম্রাট ছিলেন। সে বহুকালের কথা নহে, এখনো অনেকে জীবিত আছেন যাঁহারা "পাষণ্ড-পীড়ন" ও "রসরাজের" উদ্গারিত সেই দুরন্ত রসস্রাব অত্যন্ত আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই সমস্ত কবিতায় প্রীতিলাভ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সেকালের শ্লেষ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরসাত্মক অশ্লীল উক্তিসমূহেরও মধ্যে যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত সরল খাঁটী বাঙ্গালা ভাব ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেইটুকু বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তথাপি যাহারা

এই সময়কার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই গুপ্ত-গুড়্‌ গুড়ে উদ্‌গারিত রস সময় বিশেষের রুচিকর হইলেও কখনই উপাদেয় ছিল না। কারণ এস্থলে সাহিত্যিক আদর্শ মোটেই উঁচু নহে। গালিগালাজ, লাঞ্ছনা, জঘন্য কুৎসা, অশ্লীল উক্তি, যে প্রকারেই হউক অপর পক্ষকে নিরস্ত্র করা ও হো-হো হাস্যের লহরী ছুটাইয়া ইতর জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করা, এস্থলে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ উপায়ে সংবাদপত্রের কাটতি হইতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্য চলে না। এই পূতিগন্ধময় দুরন্ত রসোদ্‌গারে একদিন বঙ্গসাহিত্য কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাহা তৎসাময়িক কোন শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে পাঠক বেশ ধারণা করিতে পারিবেন। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়" বলিয়াছেন—"প্রভাকর ও রসরাজে যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তায় দুইজন ময়লা পরিস্কারক জাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরের হণ্ডিকাস্থিত ময়লা লইয়া পরস্পরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ জঘন্য দৃশ্য হয়, সেইরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত।" এ শুধু কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের "রহস্যের ধূলী খেলা" নহে; এস্থলে হাস্যরসের সহিত আরও অনেক বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত।

গুপ্ত গুড়্‌গুড়ে সংবাদ।

সাহিত্যের দুর্গতি।

উল্লিখিত বর্ণনা মোটামুটি সত্য হইলেও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা যে একেবারে ইতরজনোচিত বা অশ্রদ্ধেয়, একথাও বলা যায় না। এই "বাঙ্গালী র‍্যাবিলেস্" যে সত্যসত্যই একজন ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, বঙ্কিম প্রভৃতি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকসমূহ যে তাঁহার শিষ্যরূপে আপনাদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, শুধু ইহাই তাঁহার গৌরব ও প্রতিপত্তির পরিচায়ক। আধুনিক রুচিপরিবর্ত্তনের ফলে, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার আর সেরূপ আদর নাই; এমন কি তাঁহার মন্ত্রশিষ্যগণও অধিকাংশস্থলে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া উন্নততর আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি ইহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তি বঙ্গসাহিত্যে আর অল্প দেখা যায়। সাহিত্যসম্রাটদিগের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, যুগে যুগে অনেক দুর্দ্দশার অধীন হইতে হয়; ঈশ্বরগুপ্তের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

গুপ্তকবির প্রতিভা ও যশ।

দীনবন্ধুর সাহিত্যে প্রথম "হাতেখড়ি" বোধহয় ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত

"সাধুরঞ্জন" নামক মাসিকপত্রিকায়। এখন যেরূপ রবিবাবুর পদাঙ্কানুসরণ অনেক তরুণবয়স্ক কবির যৌবন-স্বপ্ন, সেইরূপ সে যুগে ঈশ্বরগুপ্তের ন্যায় অনুপ্রাসকণ্টকিত, রস পরিপূর্ণ, ব্যঙ্গশ্লেষাদিবহুল কবিতা রচনা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল। বঙ্কিমবাবু দীনবন্ধুর এই সমস্ত রচনার (বিশেষতঃ তাঁহার "মানবচরিত্র" নামক কবিতা-বিশেষের) অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয় যে এই সমস্ত অপরিণত শিক্ষানবিশী রচনায় শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইলেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কি ঈশ্বরগুপ্তী মাপ কাটীতে মাপিলেও এই সকল কবিতার মূল্য অধিক বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, গুপ্তকবির প্রদত্ত শিক্ষা যে একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই, তাহা এই সমস্ত কবিতা হইতে স্পষ্ট অনুমেয়।

দীনবন্ধুর সাগরেদী।

ঈশ্বর গুপ্তের সহিত দীনবন্ধুর সম্বন্ধ তাঁহার অন্যান্য কাব্য-শিষ্যগণের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতরবলিয়া বোধ হয়। বঙ্কিমবাবু তাঁহার সুপরিচিত সমালোচনায় বলিয়াছেন :—"ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবিত্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার,তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সহিত দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।" এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলো-বোধ হয় এ স্থলে প্রয়োজন।

পরবর্ত্তী লেখক মাত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক সমুদয়ের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী। কিন্তু ইহা কিছু অপ্রশংসার কথা নহে। কারণ, আমরা সাধারণতঃ ঋণ অর্থে যাহা বুঝি, সাহিত্যে ঋণ তাহা বুঝায় না। এইজন্য অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে শিষ্যের আসন গুরুর অপেক্ষা অনেক উচ্চে। অনুকরণ মাত্রই অগৌরবের বিষয় নয়, তাহা বোধ হয় সাহিত্যজ্ঞ পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যেস্থলে লেখকের নিজস্ব প্রতিভা কিছুই নাই, সেই স্থলেই অনুকরণ দূষনীয়। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। গুপ্তকবির নিকট অনেক বিষয় ঋণী হইলেও, তাঁহার গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দীনবন্ধুর নিজস্ব সম্পত্তি এত বেশী ও পরের জিনিস নিজস্ব করিয়া লইবার এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে অনুকরণ তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অনিষ্টকর হইতে পারে না।

সাহিত্যে আদান প্রদান।

এখন দেখা যাউক, ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব দীনবন্ধুর উপর কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। এরূপ প্রভাব কতদূর বাঞ্ছনীয় ছিল, সে কথাও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হইবে। মোটামুটি রকমে ধরিলে, এই গুরুশিষ্য সংবাদ তিনটি প্রধান বিষয় লইয়া—(১) ভাষা (২) রচনার বিষয়, ভঙ্গি ও রুচি এবং (৩) পরিহাসশক্তি। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে শেষোক্ত বিষয়েই উভয়ের সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং এক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয় দুইটি ছাড়িয়া দিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে উভয়ের হাস্যরস পটুতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গুরুশিষ্য সংবাদ।

গুপ্তকবি ও দীনবন্ধু উভয়েই প্রধানতঃ হাস্যরসের লেখক হইলেও, প্রয়োগবৈষম্যে উভয়ের হাস্যরসে কিঞ্চিৎ মূলগত পার্থক্য আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হাসিতে শুধু একাল ও সেকাল নহে, রকমভেদও আছে; এক্ষণে সে বিষয় পুনরুত্থাপন করিয়া দুএকটি কথা বলিব।

হাস্যরসের রচনা ও তাহার লক্ষণ।

হাসির এরূপ আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে পাঠকগণ শঙ্কিত হইবেন না; কারণ হাসি জিনিষটা এই বিশ্লেষণের পরেও বোধ হয় হাসিরূপে থাকিয়া যাইবে; আলঙ্কারিক শতচেষ্টাতেও তাহাকে কান্নারূপে পরিণত করিতে পারিবেন না, আশা করা যায়।

হাসি জিনিষটাকে সচরাচর আমরা একটু হীনচক্ষুতে দেখিয়া থাকি। হাসিতামাসা প্রভৃতি জীবনে প্রয়োজনীয় বটে; ইহা না হইলে মানুষ অনেক সময় বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তথাপি অশ্রুর ন্যায় হাসির তত আদর নাই। অশ্রু জিনিষটা যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী হাসি ততটা নয়।

মর্ম্মস্পর্শী না হইতে পারে কিন্তু অনাদরের কিছুই নাই। বরং অন্যান্য জীবজন্তু ছাড়িয়া যে আমাদের হাসিবার ও অন্যকে হাসাইবার ক্ষমতা আছে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অহেতুক বা অনিমিত্তক হাসি বলিয়া একটা "জাল" পদার্থ আছে (বানরেরাও দাঁতমুখ খিঁচাইয়া থাকে), বোধ হয় ইহারই জন্য "আসল" হাসি বলিয়া জিনিসটার উপর সাধারণের, বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের, এতটা অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে হিতাহিত মন্দামন্দ জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা হাসিয়া থাকি ও সেই জন্যই আমরা জীবশ্রেষ্ঠ। অত্যধিক গাম্ভীর্য্য কিছু কাজের নহে, বরং আরও হাস্যাস্পদ।

তাহা হইলে এই মন্দামন্দজ্ঞান ইহাই সকল হাসির মূলে অবস্থিত। হাসি পদার্থ টা নিতান্ত অসার নহে। মানুষের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বুদ্ধিবৃত্তি, তাহা অশ্রুর স্থায় হাসিরও অন্তরালে রহিয়াছে। তার পর অনুভূতির কথা, দুঃখের স্থায় হাসিরও কি অনুভূতি নাই? কয়জন লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে? যিনি পারেন তিনি সকলের নমস্য, কারণ তিনি এই দুঃখময় জগতের সর্ব্বত্র আরাম ও আনন্দের উৎস স্বরূপ।

এই বুদ্ধিবৃত্তির বলে ও এই অনুভূতি লইয়া মানুষ একটা জিনিসের সহিত অন্য একটার তুলনায় বিচার করিতে পারে। এই জন্য যাহা তাহার অভ্যস্ত নয়, যাহা অসঙ্গত, বিকৃত, অসদৃশ বা বিপরীত ভাবাপন্ন তাহা সে মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারে ও তদনুযায়ী ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। মানুষ চিরকাল এরূপ অভ্যাসের দাস ও চিরন্তন প্রথা বা সংস্কারের পক্ষপাতী যে যদি তাহার জীবনের কোন একটি ঘটনার বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হয়, তাহা হইলে সে একেবারে অভিভূত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে,—তা' সে হাসিয়াই হউক বা কাঁদিয়াই হউক। সেই অননুভূতপূর্ব্ব ব্যতিক্রমটা চট্ করিয়া জীবনের অন্যান্য চিরাভ্যস্ত সংস্কারের সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে পারে না। এই বিচলিত ভাব এবং তজ্জন্য যে স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে তাহাই হাসি ও অশ্রুর মূল কারণ। আকার প্রকার, রুচি বিধি, শব্দ বাক্য সর্ব্বত্র এই বিকৃতি বা বৈসাদৃশ্য হইতে হাসি ও অশ্রুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্থান কালাদিভেদে ইহা লজ্জা, ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ প্রভৃতি অন্যান্য ভাবও উৎপাদিত করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

হাসি ও অশ্রুর অনুভূতি।

তাহা হইলে হাসি ও অশ্রু এতদুভয়ের উৎপত্তি মূলতঃ এক, শুধু গতি বিভিন্ন। একই কারণে যে আমাদের এইরূপ দুইটি পরস্পর বিরোধি ভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা সামান্য বিস্ময়কর নহে। শুধু বিস্ময়কর কেন, অনেকের নিকট কিছু গোলমেলে ঠেকিতে পারে। যদি বৈসাদৃশ্যের সমাবেশ হাসি ও অশ্রু উভয়ের কারণ হয়, তবে কোন্‌খানেই বা আমরা হাসিয়া থাকি আর কোন্‌খানেই বা কাঁদি, তাহা কিরূপে ঠিক করা যাইতে পারে?

বৈসাদৃশ্যের সমাবেশ হইতে হাসি ও অশ্রুর উদ্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই দুয়ের রূপান্তর আমাদের সেই বৈসাদৃশ্যের কম-বেশী অনুভূতির উপর নির্ভর করে; স্থানকালাদির উপরত নির্ভর করিয়াই থাকে তাহা পূর্ব্বে বলি-

য়াছি, জীবনে সকল বিষয়ের অনুভূতি যদি সঙ্গত বা সমীকৃত হইত—তাহা হইলে হাসি ও কান্না কিছুই থাকিত না। যাহা বিহিত, অভ্যস্ত ও উপাদেয় মানুষ সকল বিষয়েই তাহার কামনা করিয়া থাকে; তাহাতে হাসিবার বা কাঁদিবার কিছুই নাই। এইটিই জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম; এবং সচারচর গাম্ভীর্য্য অর্থে (আমরা পণ্ডিতের বা মূর্খের গাম্ভীর্য্যের কথা এখানে বলিতেছি না।) ইহাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু জীবনটা একটানা নদীর স্রোত নহে; মানুষ চিরকাল গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারে না। এই স্বাভাবিক সঙ্গতির ব্যতিক্রমের ফলে জীবনে হাসি ও কান্নার উৎস। এই স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য একটু শিথিল করিয়া দিলেই হাসি, ও ইহা ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিলেই কান্না।

উভয়ের নিকট সম্বন্ধ।

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যখন হঠাৎ একটা বিপদ উপস্থিত হয় তখন এই বিসদৃশ ঘটনায় আমরা হাসিয়া ফেলি কিম্বা কাঁদিয়া ফেলি। যদি বিপদটা দুস্তর ও ভয়াবহ বোধ হয় তবে কান্না পায়; আর যদি তাহা অনিষ্টকর না হইয়া শুদ্ধমাত্র একটা বিপর্য্যয় ঘটায় তবে না হাসিয়া থাকিতে পারি না। অত্যন্ত বিপদেও অনেক সময় হাসি পায়। সেইরূপ আবার যদি একটা মুখোস পরিয়া কোন ছোট ছেলের নিকট যাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ দূর হইতে সে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিবে। কিন্তু আরও নিকটে আসিলে, সে ভয় পাইবে ও অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিবে।

তেমনি রোমিওর প্রেম-কাহিনী বড়ই করুণ রসাত্মক কারণ তাঁহার অমানুষী প্রেম, আমাদের সচরাচর প্রেমের ধারণা অত্যন্ত ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই প্রেম-পিপাসার প্রবল আঘাতে তাঁহার নশ্বর ক্ষুদ্র পার্থিব জীবন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অসীম, কিন্তু জীবন ক্ষুদ্র ও শক্তি সীমাবদ্ধ, এই বৈষম্যের ভাব যখন আমাদের হৃদয়ে সজোরে আঘাত করে তখন আমরা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের আরো উপরে উঠি; অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, তেমনি আবার অন্যদিকে শ্লেণ্ডার (Slender) বা হোঁদলকুৎকুতের প্রেমের ব্যাপার এত কৌতুকাবহ, কারণ তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ আমাদের সচরাচর প্রেমের ধারণার এত নীচে পড়িয়া যায় যে এই বৈসাদৃশ্য আমাদের দন্তরুচি-কৌমুদীর বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে না।

তাহা হইলে হাসির সহিত অশ্রুর এই নিকট সম্বন্ধ উপলব্ধি করা হাস্যরসিকের

প্রধান কার্য্য। কারণ হাসি যে শুধু বাতুলতা নহে এবং সমস্ত জীবনের সহিত তাহারও একটা সম্বন্ধ আছে ইহা না বুঝিলে তাঁহার হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিফল না হউক, ক্ষণ ভঙ্গুর হইবে। তিনি আমাদিগকে হাসাইবেন বটে কিন্তু আমাদের হৃদয় আদৌ স্পর্শ করিবেন না।

এইখানেই ভাঁড়ামি (Bufoonery) বা বৈদগ্ধ্যের (Wit) সহিত আসল হাস্য-রসের (Humour) তফাৎ।* হাস্যরস স্বাভাবিক, বৈদগ্ধ্য কৃত্রিম। বৈসাদৃশ্য বা অসঙ্গতি জিনিষটার যদি যেমন-তেমনি-অবিকল স্বাভাবিক বর্ণনা হয়, তবে তাহা হাস্যরসের পরিচায়ক; কিন্তু ইহাকে লইয়া তুলনায় ব্যাখ্যা, উল্‌টে পাল্‌টে দেখা প্রভৃতি ভাঁড়ামির পরিচায়ক, সুতরাং Humour বা হাস্যরসের মূল, লেখকের মনের মধ্যে নহে, বাহিরে—হাস্যাস্পদ পদার্থ বা ঘটনার সমাবেশে। বক্রেশ্বরকে যখন অশ্বারোহণে ব্রহ্মশিবিরের নাম করিয়া মণিপুর শিবিরে বন্দীভাবে আনা হইয়াছিল, তখন তাহার অশ্বারোহণ পটুতাসূচক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, তাহার রসমুণ্ডি ক্ষীরচাঁপা সংক্রান্ত রসিকতাগুলি, তৎকৃত মণিপুররাজপরিবারের বর্ণনা প্রভৃতি witty বটে, কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটা humorous, যদিও এস্থলে Humour টা অতি উচ্চশ্রেণীর humour নহে।

হাস্যরস ও ভাঁড়ামি।

এখন দেখা যাউক Humour এর প্রকৃত লক্ষণ কি। এ সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদিগের সহিত পুরাতন সমালোচকগণের মতের মিল নাই। অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইবে না যে সেকালে Humour ছিল না, ইহা শুধু একালের সৃষ্টি। প্রকৃত পক্ষে এই Humour শব্দটি ভিন্ন ২ যুগে অনেক অর্থবিভিন্নতার মধ্য দিয়া আধুনিক অর্থে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমন কি গত শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Hazilitt, Humour এর যে অর্থ দিয়াছেন তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও সমস্ত জিনিষটাকে বুঝাইয়া দেয় ন কিন্তু

* Wit, Humour এই দুয়ের ভাবব্যঞ্জক শব্দ বাঙ্গালায় আছে কি না জানিনা। বঙ্কিমচন্দ্র 'ব্যঙ্গ' ও 'হাস্য' এই দুইটি কথা Satire ও Humour এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়াছেন। আমি এস্থলে তাহাই গ্রহণ করিলাম; শুধু Wit অর্থে বৈদগ্ধ্য এই কথা অন্য শব্দাভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি। 'হাস্য' কথাটি এত ব্যাপক ভাবের ব্যঞ্জক যে তাহা প্রকৃতপক্ষে Humour এর ভাব বুঝাইতে পারে না; বরং comic এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। তেমনি 'বকবৈদগ্ধ্য' কথাটি এত সঙ্কীর্ণ ভাবের পরিচায়ক যে তাহাতে Wit এর অর্থ প্রকাশ পায় না। কিন্তু Wit ও বৈদগ্ধ্য এই দুই কথার ধাতুগত বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে. সে জন্য অন্য প্রতিশব্দ অভাবে বৈদগ্ধ্য Wit অর্থে গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হইবে না।

† Lectures on the British Comic Writers.

এ সমস্ত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক সময়ে Humour এর লক্ষণ নির্দ্দেশের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে বিখ্যাত হাস্যরসিক, ঔপন্যাসিক-কবি ও সমালোচক জর্জ্জ মেরেডিথ (Meredith) এর উদ্যম উল্লেখ যোগ্য। তিনি বলেন "যদি একটি হাস্যাস্পদ ব্যক্তিকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করা যায়, তাহাকে যুগপৎ হাসির তরঙ্গে ভাসাইয়া ডুবাইয়া আঘাত করিয়া বিপর্য্যস্ত কর এবং তাহার উপর দুএকবিন্দু অশ্রুপাত কর, সঙ্গে২ তাহার সহিত নিজের ও অন্য সকলের সাদৃশ্য অনুভব কর; যতটা তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে অনাবৃত কর ততটা তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর; তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে তুমি এস্থলে হাস্যরসের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিয়াছ। নীচুদরের হাস্যরসিক একটি আরাম ও আনন্দদায়ক হাসির উৎসমাত্র; কখনো বা স্নিগ্ধতার আবরণে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস শমীকৃত করিয়া আনে, কখনো বা এই উচ্ছ্বাসে আপনি ভাসিয়া যায়। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক তিনি তাঁহার কল্পনা ও সহানুভূতির একটি বিপুল বেষ্টনে সাধারণ কৌতুকরচয়িতার স্বপ্নাতীত অসংখ্য বৈসাদৃশ্যের সমাবেশ একত্র করিতে পারেন।"* উল্লিখিত কয়েক ছত্র হইতে বুঝা যায় যে Wit ও Buffonery হইতে Humour কোন্ গুণে বিভিন্ন। মেরেডিথ বলিতেছেন যে শুধু হাসির তরঙ্গে ডুবাইয়া তোলপাড় করা হাস্যরসের মূল উদ্দেশ্য নহে। উচ্চাঙ্গশ্রেণীর হাস্যরসের রচনার মধ্যে ইহা না থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু যে সহানুভূতি, যে রসগ্রাহিতা, যে কারুণ্যধারা উচ্ছলিত কোমল-মধুর হৃদয়ের প্রীতি, Don Quixote এর নির্বুদ্ধিতা, Sancho Panza'র পন্থহীন প্রজ্ঞাত্মক বিচিত্রতা, Rosalind এর কৌতুকপ্রিয়তা, Dr. Primrose এর হাস্যোদ্দীপক সরলতা অথবা Falstaff এর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও আমোদ প্রমোদ, একটি বিপুল বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিতে পারে, তাহাই হাস্যরসের প্রাণস্বরূপ।

"If you laugh all round him (to wit, the ridiculous person), tumble him, roll him about, deal him a smack and drop a tear on him, own his likeness to you and yours to your neighbour, spare him as little as you shun, pity him as much as you expose, it is the spirit of Humour that is moving you. The humourist of mean order is a refreshing laughter giving tone to the feeling and sometimes allowing the feelings to be too much for him. But the humourist, if high, has an embrace of contrasts beyond the scope of the comic poets." (*Essay on Comedy and the Uses of the comic Spirit.*)

এই সহানুভূতি আছে বলিয়াই প্রকৃত হাস্যরস এত মর্ম্মস্পর্শী। হাসির সহিত করুণার্থ গ্রথিত করিয়া দেওয়া হাস্যরসিকের শ্রেষ্ঠ গৌরব; কিন্তু এরূপ সরল অথচ মর্ম্মস্পর্শী করিতে হইলে, এরূপ মেঘ ও রৌদ্রের খেলা দেখাইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে লেখকের উন্মুক্ত কল্পনা ও অসীম সহানুভূতি থাকা চাই। বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ হাস্যরস বটে, কিন্তু তাহাতে সহানুভূতির মাত্রা অল্প। এই জন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপে অনেক সময়ে আমাদের ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইতে হয়, কিন্তু হাস্যরস সকল সময়েই নির্ম্মল সহজ স্নিগ্ধ আনন্দের উৎস। "উপ"-হাস্য কখনই হাস্য নহে, এই 'উপ' উপসর্গটাই ইহার বিশেষত্ব ব্যঞ্জক।

হাস্যরসে সহানুভূতি।

ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুর হাস্যরসের রচনা তুলনায় সমালোচনা করিলে, প্রথমেই এই সমস্ত তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা। কারণ ঈশ্বরগুপ্ত যেরূপ ব্যঙ্গ ও বৈদগ্ধ্যে পটু, নিছক হাস্যরসে দীনবন্ধুরও ক্ষমতা তদ্রূপ। ইহাতে অবশ্য এমন বুঝাইবে না যে হাস্যরসে ঈশ্বরগুপ্তের কোনও ক্ষমতা ছিল না অথবা দীনবন্ধু ব্যঙ্গ ও বাকবৈদগ্ধ্যে পটু ছিলেন না। যাঁহার রচনায় যে গুণের বাহুল্য আমরা শুধু তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। ঈশ্বরগুপ্তের যদি "বাঙ্গালী র‍্যাবিলেস্" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা সার্থক হয়, তবে দীনবন্ধুকে "বাঙ্গালী মলিয়র" বলিলে বোধ হয় কিছু ক্ষতি হয় না।

গুপ্তকবি ও দীনবন্ধু: তুলনায় সমালোচনা।

ঈশ্বরগুপ্তের সামাজিক বিষয়ের উপর রচনা ভিন্ন অন্যত্র যেটুকু রসিকতা আছে, তাহা বৈদগ্ধ্য অথবা নিতান্ত "খেলো" রকমের রসিকতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এপ্রকার চাতুর্য্যের উদাহরণ তাঁহার কবিতা সংগ্রহের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মিলিবে। স্থানে স্থানে এরূপ বাগাড়ম্বর কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়েকটি পড়িলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

গুপ্তকবির রসিকতা; তাহার লক্ষণ ও প্রসর।

"বকাবকি করিতেছে যত বকা-বকী।
বকী বলে বৃথা বকা, বকা বলে বকি।
বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে
বকা-বকী, বকাবকি, করিতেছে জোরে॥" ইত্যাদি

যাক্ বকাবকী লইয়া মিছে বকাবকি করিয়া আর কাজ নাই। এরূপ

কবিতায় আমোদ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে আমোদের মূল্য কতটুকু? তাহা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতে পারে না। তারপর গুপ্তকবির আদিরসাত্মক কবিতাগুলি যে স্থানে স্থানে হাস্যরসাত্মক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বোধ হয় স্বেচ্ছাকৃত নহে; কারণ এরূপ স্থলে গাম্ভীর্য্যই তাঁহার উদ্দেশ্য, হাসিটুকু আমাদের অতিরিক্ত লাভ। সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার রচনাগুলিতে স্থানে স্থানে যে প্রকৃত হাস্যরসের ও তীব্র কৌতুকব্যঙ্গের প্রসর আছে, তাহা তাঁহার "বাঙ্গালী র‍্যাবিলেস" এই পদ সার্থক করিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশস্থলে এই নির্ম্মল স্নিগ্ধ হাস্যরসটুকু তীক্ষ্ণ দ্বেষ ও বিদ্রূপাদির মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। "এ বি পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে", "সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম", "বৃদ্ধের যুবতী দারা প্রাণ হতে বড়", "বাহিরেতে কোঁচা লম্বা অষ্টরম্ভা ঘরে" "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে" "কপ্নাধারী প্রেমদাস সেবাদাসী লয়ে" প্রভৃতি অসংখ্য ছোট ছোট সামাজচিত্রগুলি স্থানে স্থানে বড়ই কৌতুকোজ্জ্বল ও উপাদেয় হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালীর "পৌষপার্ব্বণ," "ছুটী" "স্নানযাত্রা" প্রভৃতি নিত্যদৃষ্ট পরিচিত চিত্রগুলি অপরূপ রচনা-ভঙ্গীতে সরস, লিপি কৌশলে ও কবি হৃদয়ের সহানুভূতিতে বড়ই রমণীয় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার তীব্র দ্বেষ ও ব্যঙ্গের আধিক্যে এই হাস্যরসের উপভোগ সর্ব্বত্র আরামদায়ক নহে।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু দুএকটি কথা না বলিলে আমাদের এই গুরু শিষ্য সংবাদ অসম্পূর্ণ থাকিবে। উপরে বলিয়াছি যে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ব্যঙ্গ প্রধান, এক্ষণে এই ব্যঙ্গ-শক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রথমতঃ—

গুপ্তকবির ব্যঙ্গ শক্তি।

এই বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ অধিকাংশস্থলে বড়ই বিদ্বেষপূর্ণ ও প্রায়ই গালিগালাজে পরিণত হয়। উদাহরণের অভাব নাই। "পাষণ্ড-পীড়ন"এর পাষণ্ড পীড়ন কিরূপ বীভৎস-রসে সম্পন্ন হইত উল্লিখিত হইয়াছে। "বড়দিন"—শীর্ষক কবিতার প্রারম্ভে যীশু ও তদীয় ভক্তগণের উপর অশ্লীলতা-সূচক বিদ্রূপ, বিধবা-বিবাহসম্বন্ধীয় কবিতাসমূহে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ ইত্যাদি সুপরিচিত বা কুপরিচিত স্থানগুলি উদাহরণস্বরূপ না বলিলেও চলে। হুডিব্রাসের কবি পিউরিটানদিগকে (Puritan) যথেষ্ট হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই; কিন্তু তিনি যখন পিউরিটান্‌দিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালাগালি দিয়াছেন, তখন তাঁহার বিদ্রূপে আমাদের কোনও শ্রদ্ধা হয় না। ব্যঙ্গ-কবিতায় অতিরঞ্জিত উক্তি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু

গালিগালাজ অথবা মিথ্যা দোষারোপের দ্বারা কিছুই ফল হয় না। এক্ষেত্রে যে দীনবন্ধু গুরুর পদাঙ্কানুসারী নহেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাহা হইলেও নিমেদত্ত, রাজীবলোচন, জামাইবারিক প্রভৃতি চিত্রের নিম্নে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রহিয়াছে তাহা কিছু কম তীক্ষ্ণ বা ধারালো হয় নাই। গালিগালাজ যে ব্যঙ্গ কবিতার প্রাণ নহে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে ঈশ্বরগুপ্তী রসিকতা বড় "খেলো" রকমের ; তাহার সুর আদৌ মার্জ্জিত নয়। এমন কি স্থলবিশেষে ইতরজনোচিত—সুরুচি বা সংযত ভদ্রতার লেশমাত্র নাই। এসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর আর কিছুই বলা যায় না। তিনি বলেন যে তখন লোকে "কিছু মোটাকাজ ভালবাসিত ; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ।" বঙ্কিম প্রভৃতি অন্যান্য আধুনিক যুগের লেখক-দিগের ন্যায় যদিও দীনবন্ধু শেষোক্ত পথাবলম্বী, তথাপি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যহিসাবে তাঁহাতেও এই "বফুনত্ব" বা "মোটা কাজ" অল্পপরিমাণে বর্ত্তিয়াছিল। কিন্তু এই "মোটা কাজের" সহস্র অসুবিধা থাকিলেও একটি বিশেষ গুণ ছিল—ইহা বড় সহজ ও স্বাভাবিক। সরু কাজ যতই মনোহর হউক না কেন, তাহা কৃত্রিম। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভায়, এই "খাঁটী বাঙ্গালী"র বাঙ্গালা সুরটুকু ছিল! পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠক তাহার মর্ম্মানুভব করিতে পারেন না, কিন্তু সুদূর শ্রীহট্ট হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, জলপাইগুড়ির কোল হইতে সুন্দরবনের সীমান্ত পর্য্যন্ত, সাধারণতঃ আমরা যাঁহাদিগকে "পাড়াগেঁয়ে" বলিয়া অবজ্ঞা করি, সেই পল্লীগ্রামবাসী বিপুল জনসাধারণ ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তের ভাবে মুগ্ধ হইতে পারেন। এরূপ সর্ব্বদেশের সর্ব্বজনের কবি হইবার সৌভাগ্য কয়জন লেখকের ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রঙ্গলাল ও দীনবন্ধু ভিন্ন বোধহয় আর কোন আধুনিক নব্যবঙ্গের লেখক এই খাঁটী দেশী সুরটুকু অধিক পরিমাণে রাখিতে পারেন নাই। অন্য লোকের কথাত দূরে থাকুক এমন কি আধুনিক যুগের অবিসম্বাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা সমগ্র-ভাবে রাখিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বৈদেশিকতার তীব্রতা না থাকুক তাঁহার উপন্যাসকাব্যগুলি যে বৈদেশিক রসের পাকে প্রস্তুত এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আর দীনবন্ধুও যেটুকু দেশী ভাব রাখিতে পারিয়া-ছেন, তাহাই বা কতটুকু ?

সরু কাজ বনাম মোটা কাজ।

তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু উভয়েই যে এই স্বাভাবিক সহজ সুরটুকু রাখিতে পারিয়াছেন তাহার কারণ এই যে উভয়েই বাঙ্গালীর বাস্তবজীবন ও বাস্তব-জগতের কবি। Idealisation বা মানসিক সৃষ্টির ক্ষমতা যে উভয়ের নাই, একথা বলিতেছি না, তবে উভয়েই স্বভাবতঃ ও প্রকৃতপক্ষে realists বা বাস্তবজীবনের চিত্রকর। আধুনিক কবিতায় যে সমস্ত ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনার খেলা দেখা যায়, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধুতে নাই বলিলেও চলে। এই জন্যই বোধ হয় সূক্ষ্মরসাস্বাদী আধুনিক পাঠকের নিকট এই সকল রচনা মোটেই ভাল লাগে না। অবশ্য সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বৃত্তিগুলিও সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হইয়া পড়ে এবং কল্পনাবহুল ব্যক্তিগত কবিতারও আধিক্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আধুনিক প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্য আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট! কিন্তু সেকালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; একালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ন্যায় হাত-পা চোখ মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এইজন্য তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই; তাঁহাদের তীব্র সরস লেখনীর মুখে এক একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাত্যহিক বাঙ্গালী জীবনের ছায়া আর কোথায় এত সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে? এরূপ জীবন ও কবিতা যত কাছাকাছি থাকে তত কি ভাল নয়?

সমাজচিত্র ও বাস্তব-জীবনের কবিতা।

এইজন্য উভয়েরই সমাজচিত্রগুলি এত মনোহর ও আনন্দপ্রদ। আমাদের সহস্র বিচিত্রতাময় আধুনিক খণ্ড ও গীতি কাব্য সমূহের মধ্যে যেমন একদিকে সে কালের কবিদের স্বপ্নাতীত মৃদু সুকুমার অতীন্দ্রিয় ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে একটি রুগ্ন কাতর অপরিস্ফুট অহেতুক-বিষণ্ণতা-গদ্‌গদ ভাবের অত্যধিক প্রাবল্যে যেন কবিতা মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গুপ্ত কবি ও তৎশিষ্যবর্গের লেখায় এই [illegible]স ও কামিনীজনোচিত কিঙ্কিণিঝঙ্কার অথবা এই অসুস্থ চিত্তের অপুষ্ট বিলাস-কাকলীর স্পর্শমাত্র দেখা যায় না।

তাঁহাদের গাঢ় বিচিত্র বেগবান্ রচনার অন্য সহস্র দোষ সত্বেও তাহা সহজ চিত্তের সবল উক্তি এবং প্রকৃত পুরুষোচিত প্রতিভার পরিচায়ক। ইহাদের কাহারও লেখা "ঈথরে" (Ether) নির্ম্মিত নহে; প্রতিদিনের সুখ দুঃখ, ভাঙ্গাগড়া হাসিকান্না ইহারই জীবন্ত চিত্র তাঁহাদের লেখার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত। এই কারণে তাঁহাদের ভাষাও এত সজীব, সরস ও স্ফুর্ত্তিশালী। মানুষের অন্তর্জীবন যেরূপ সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে, বহির্জীবনও কেন সেরূপ হইবে না? এই বহির্জীবন যে সাহিত্যে অমর অক্ষরে চিত্রিত হইতে পারে তাহা ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু তাঁহাদের অতুল রচনাবলীর দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।*

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে তৃতীয় কথাটি এই যে তাঁহার কবিতার রুচি বড় সূক্ষ্ম নহে; পরন্তু অশ্লীলতা দোষে স্থানে স্থানে বড়ই দূষিত হইয়াছে। এই রুচির

গুপ্ত কবির রুচির বিকার।

বিকার সম্বন্ধে বোধ হয় বেশী কিছু বলিতে হইবে না। কেবলমাত্র এই দোষের জন্য গুপ্ত কবির অনেক কবিতা একেবারে অপাঠ্য, (যথা, 'বিধবা বিবাহ,' 'বিধবা আইন,' 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' ইত্যাদি)। এ সকল স্থলে অশ্লীলতার অবতারণা না করিলে যে বিদ্রূপ পূর্ণাঙ্গ বা তীব্র হইত না তাহা নহে। তবুও সে সময়ের অন্যান্য অনেক কবির ন্যায় ইতর সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য গুপ্ত কবিকেও এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তারপর গুপ্ত কবির রচনার ভঙ্গীও সকল স্থলে স্পৃহনীয় নহে। গুরুর এই সমস্ত দোষ স্থলে স্থলে যে শিষ্য দীনবন্ধুতে দেখা যায় না, একথা বলা যায় না। তবে তাহা অতি সামান্য। সেগুলি যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমরা এই গুরু শিষ্য সংবাদ শেষ করিব। গুপ্ত কবির কবিতার রসিকতা অনেক সময় তাঁহার ভাষা ও রচনার

ভাষা ও রচনার ভঙ্গী।

ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব এত বেশী যে পুনরায় একথার আলোচনা করিলে কোনও ক্ষতি নাই। গুপ্ত কবির অসাধারণ বাক্‌বিন্যাসপটুতা, শব্দ কৌশল ও সরস ভঙ্গী রসজ্ঞ পাঠককে যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত করিয়া তোলে। তাঁহার কবিতায় যেন রঙতামাসার তুবড়ি, হাউই, চর্‌কি ছুটে। আবার তাঁহার কতকগুলি বিশেষ কৌশল আছে, তাহার দ্বারা রচনার সরসতা অনেক সময় দ্বিগুণিত হয়। ইহার মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত

* টেকঁচাঁদ ও হুতোমের কথা পরে বলিতেছি।

অনুপ্রাসপ্রয়োগ, শ্লেষবাক্যবিন্যাস, ছন্দের দ্রুতগতি, পদের অপূর্ব্ব মিল, কথাবার্ত্তার ভাষার উপর অসামান্য অধিকার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে দীনবন্ধু গুরুর অসাধারণ শক্তির অল্প বিস্তর অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু শুধু কৌশল ও চাতুর্য্যের উপর তাঁহার রসিকতা গঠিত নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে উৎসের মূল আরও গভীর এবং তাহার বিমল ধারায় যে একটি মার্জ্জিত শিক্ষিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, তাহা তখনকার লিপি-যোদ্ধাদের স্বপ্নাতীত। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দে।

প্রসাদী সঙ্গীত। (২)

হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তিসাধনার সোপানগুলি, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর পর অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শত শত সাধক এই পথের পথিক হইয়া ভবনদী উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সাধক রামপ্রসাদ স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, সংসার সন্তাপে ব্যথিতহৃদয় মুমুক্ষু সাধকগণ যাহাতে এই পথ আশ্রয় করিতে পারেন, সেজন্য তিনি এই পথের সমগ্র পরিচয় তাঁহার সঙ্গীত সমূহের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধককবি রামপ্রসাদের গানগুলিকে কেবল সাহিত্যের দিক হইতে দেখিয়া তাহাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না—এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবনের যে ক্রমবিকাশের ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহারা সাধন পথের পথিক তাঁহারা রামপ্রসাদ ও অন্যান্য সাধক কবির সঙ্গীতগুলিকে এইভাবে দেখিয়া থাকেন।

আরাধ্যের লীলা শ্রবণ, ও তাঁহার গুণ বা নাম কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া, আত্মনিবেদন বা পরাভক্তিকে—চিত্তের স্বাভাবিকী বৃত্তিরূপে পরিণত করিবার বিধান আছে। এই বিধানানুযায়ী অনুষ্ঠানের ফলে আরাধ্য দেবতা সম্বন্ধে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। তৎপরে উপাস্যের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ধ্যানের অনুষ্ঠান আবশ্যক, ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য সমগ্র কর্ম্মের ফল ইষ্ট চরণে অর্পণ করিতে হয়। এই কর্ম্মফলত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি-যোগের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, এবং ইহার ফলে সাধক আনন্দস্বরূপ ভগবানের পরম পদপ্রাপ্ত হইয়া অনন্ত শান্তির অধিকারী হন। প্রসাদী সঙ্গীতেও আমরা প্রথমতঃ ইষ্টনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তে

নিমিত্ত, তাঁহারই অর্চ্চনা ও বন্দনার নিমিত্ত, তাঁহারই দাস্য এবং সখ্য লাভের নিমিত্ত, তাঁহারই নিকটে জীবনের সুখ দুঃখ জয় পরাজয় মান অপমানের কথা নিবেদনের নিমিত্ত অভ্যস্ত হইবার ঐকান্তিক আগ্রহের ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাই। যখন নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণের নিমিত্ত আত্মশিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে তখন কালীভক্ত রামপ্রসাদ গান ধরিয়াছেন :—

শ্রবণ ও কীর্ত্তন।

"রসনে! কালী কালী নাম রটরে,
মৃত্যুদশা নিতান্ত ধরেছে জটেরে,
কালী যাঁর হৃদে জাগে,
তর্ক তাহার কোথা লাগে;
এ কেবল বাদার্থ মাত্র খুঁজে দেখে ঘট পটরে।
রসনাকে কর বশ,
শ্যামা নামামৃত রস;
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম,
কেবল কৈবল্য ধাম;
করে জপনা কালীর নাম, কিতব উৎকট রে॥
শ্রুতি রাখ তত্ত্বগুণে,
অন্য নাম নাহি শুনে;
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়ে কালী বলে কাল কাটরে।"

এই গানে, নামে রুচি জন্মাইবার জন্য একটা শান্ত-মধুর আগ্রহের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তর্ক শাস্ত্রের কচ্‌কচিতে মনোনিবেশ করিবার আর আবশ্যকতা নাই, বৃথা কথায় কাল কাটাইবার সময় নাই, ভক্তের হৃদয় অনন্যশরণ হইয়া কৈবল্যদায়িনী শ্যামা মার নামামৃত পান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; দোহাই দিয়া হস্তকে নাম জপ করিবার জন্য, কর্ণকে নাম গান শুনিবার জন্য, রসনাকে নাম কীর্ত্তনে অভ্যস্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন।

যখন জগন্মাতার চরণ তলে স্থান লইবার জন্য, তাঁহার পদ সেবার নিত্য অধিকারী হইবার নিমিত্ত বিপুল ব্যগ্রতা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তখন সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী মা অভয়ার চর৻ ভিখারী রামপ্রসাদ দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

স্মরণ ও পাদ°সন।

"মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কিগো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে
উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে।
চরণ তলে পড়ে প্রাণত্যজিব॥"

এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না থাকিলে, এরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহসংসার ধন জনের আশা পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল-ময়ীর পবিত্র নামে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে এই রূপ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া অভীষ্ট দেবীর পদ-প্রান্তে পড়িয়া থাকিবার দৃঢ়তা না থাকিলে, সংসারী রামপ্রসাদ, কবি রামপ্রসাদ, যশস্বী রামপ্রসাদ, কি এত অল্প কালের সাধনায় চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ মহামায়ার চরণ সেবার নিত্য অধিকারী হইতে সমর্থ হইতেন? ইষ্টপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মাভ্যাসের সময় সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই যে সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার প্রধান সহায়, ইহা সকল অবস্থার সাধকই কিছুনা কিছু অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং রামপ্রসাদের যে এই অবস্থায় ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণপণ দৃঢ়তা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল, তাহা উপরি উদ্ধৃত এবং অন্যান্য অনেক সঙ্গীত হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি, বাহুল্যভয়ে বিস্তৃত ভাবে তাহা আর দেখাইতে চেষ্টা করিলাম না।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

এই সাধন সঙ্গীত গুলিতে প্রার্থনা ও স্তুতির ভাব ও বিরল নহে। কিন্তু রামপ্রসাদের প্রার্থনা ও স্তুতিমূলক গানগুলির মধ্যে কোথাও ধন-জন-রূপ-যশঃ অথবা পুত্র কলত্র লাভের আকাঙ্খা স্থান পায় নাই। বরাভয়প্রদায়িনী, নৃমুণ্ড মালিনী, বিশ্বজননী, মা দক্ষিণা কালীর দর্শন লাভই তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। করুণাময়ীর করুণা পাইলেই তাঁহার তৃপ্তি, অচল নন্দিনী শ্রীদুর্গার চরণ কমলে অচলা ভক্তি লাভই তাঁহার আকাঙ্খার সামগ্রী। এই আকাঙ্খার বিষয় বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। অতি যত্নে হৃদয়ের নিভৃত স্থলে পরিপুষ্ট এই মানোবাসনা চরিতার্থ করিবার প্রার্থনায় ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক কবি গান করিয়াছেন;—

প্রার্থনা ও স্তুতি।

"এলোকেশী দিগ্‌বসনা।
কালী পুরাও মনোবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া
ব'লে দেমা ঠিক ঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে।
এবাসনা কেহ জানে না।"

সাধন সময়ে উপাস্যের আশ্বাস বাক্য।

আরাধ্য দেবতার আশ্বাস বাক্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই এই অবস্থায় ভক্ত দ্বিগুণ উৎসাহে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাই এত ব্যাকুলতার সহিত ভক্ত রামপ্রসাদ জননীর কৃপালাভ করিবার অধিকারী হইবেন কি না তাহার "ঠিক ঠিকানা" জানিতে চাহিয়াছেন।

দাস্য ও সখ্য

শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ ও পদসেবা এবং প্রার্থনা ও স্তুতি সম্যক্ অনুশীলনে অন্তঃকরণ যখন স্বভাবতঃই ভজনশীল হয়, তখন সাধক ভগবানের ভক্তবৎসলতার প্রথম সন্ধান পান। প্রতাপশালী মহৎ লোকের অশ্রয় পাইয়া যেরূপ নিতান্ত দুর্ব্বল লোকও প্রতিপক্ষের নিকট বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্ত যখন আপনাকে অনন্ত-শক্তি ভগবানের অনুগৃহীত বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন, তখন সাধনার প্রতিকূল শক্তির প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করেন এবং কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকেন। এই অবস্থার চিত্র রামপ্রসাদের অনেক গানেই অঙ্কিত হইয়াছে, একটিমাত্র উদ্ধৃত হইল ;—

"আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেন না আমারে শমন চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামার দরবারে থাকি অভয় পদের বইরে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে নাই মহলে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা নদী সিকস্তি তাতেও মহল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি ব'য়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ওপদ পেয়েছ জাননা সে পদের মজ

এই আত্মগৌরবাত্মক সঙ্গীতের মধ্যে ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির উপর বিশ্বাসের এমন একটা প্রগাঢ়তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, শুনিবামাত্রই মনে হয় ভক্ত রামপ্রসাদ যেন এই অবস্থায় ভগবানের সেই অভয়বাণী "তেষামহং সমুর্দ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন।

এই প্রিয়ত্ব বুদ্ধি বিকশিত হইবার সময় অনুরাগ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে উপাস্যের সহিত উপাসকের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং প্রিয়জনের নিকট

আত্মনিবেদন

মনের কথা খুলিয়া বলিয়া লোকে যেরূপ তৃপ্তির এক অমিয়-অস্বাদ অনুভব করে, ভক্ত ও তদ্রূপ উপাস্য দেবতাকে আপনার জন মনে করিয়া অকপটহৃদয়ে তাঁহার নিকটে মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। উপাসক ভেদে এই আত্ম নিবেদনের ভাব ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। রামপ্রসাদ বিশ্বের আদি কারণকে জননী ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং সন্তান জননীর নিকট যেভাবে সুখ-দুঃখের কথা নিবেদন করে, তিনিও ঠিক সেই ভাবেই জগজ্জননীর নিকট সরলভাবে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন। এই আত্মনিবেদনের সঙ্গীত-গুলির মধ্যেই আমরা রামপ্রসাদের আন্তরিক ব্যাকুলতার সুস্পষ্ট আলেখ্য বিবিধ-ভাবের বর্ণ বৈচিত্র্যে সুরঞ্জিত দেখিতে পাই। কখনও পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ দহনে অস্থির হইয়া পতিতপাবনী মা জগদম্বার নিকট কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিয়াছেন ;—

"মা আমি পাপের আসামী।
এই লোক্‌সানি মহল ল'য়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।

তাই বারে বারে নালিশ করি দিতে হবে বেশী কমী॥" ইত্যাদি

কখনও দর্শনাকাঙ্ক্ষা জনিত মর্ম্মবেদনার অশ্রুজলে হৃদয় প্লাবিত করিয়া নৈরাশ্যের কণ্ঠে গাহিয়াছেন ;—

"মা বলে ডাকিস্‌নারে মন মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দেখা দিত সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥" ইত্যাদি।

পরক্ষণেই আবার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভক্তবৎসলা জননীর শিবানীর সাড়া পাইয়া মাতৃ ভক্ত রামপ্রসাদ আশ্বাসের সুরে গাহিয়াছিলেন ;—

"মা আমার অন্তরে আছ
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।
তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া কতকাচ কাচাও মা ॥"
ইত্যাদি।

যখন ইচ্ছাময়ী মহামায়া, ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন আবার দয়াময়ার নির্দ্দয়তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিজের ঐকান্তিক অনন্যতার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন ;—

"তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হাদে গো জননী শিবে ॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে ॥
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে ॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাও ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে ॥
গিয়েছিনা যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে ॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমিত মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে ॥"

গানটি এত হৃদয়গ্রাহী যে ইহার আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বাস্তবিকই অভীষ্ট দেবতার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেহটাকে কাঠের মুরদ্ করিতে নাপারিলে বিশ্বরূপা ভগবতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে কেহ সক্ষম হয় না।

আত্মনিবেদনে ভক্ত সন্তানের বাৎসল্যের অধিকার দাবী।

শুধু মর্ম্মব্যথার করুণ গানেই রামপ্রসাদের আত্ম নিবেদন সমাপ্ত হয় নাই। ভক্তবাৎসল্যের অধিকার দাবী করিয়া অভিমান গঠিত অনুযোগপূর্ণ কটুক্তি দ্বারা তাঁহার শ্যামা মাকে যে স্নিগ্ধ মধুর গালি বর্ষণ করিয়াছেন, বিশ্বজননীকে যে জীবের প্রতি ব্যবহারের মধ্যে মাতৃত্ব ধর্ম্মের ব্যত্যয় দেখাইয়া তীব্রস্বরে উপহাস করিয়াছেন, জোর করিয়া মায়ের পদরত্ন কাড়িয়া লইবেন বলিয়া যে সন্তান সুলভ আবদার জানাইয়াছেন,

তাহাতেই আমরা রামপ্রসাদের মাতৃভাবে আরাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখিতে পাই।

"মা মা বলে ডাক্‌বনা।
মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রনা॥
ছিলাম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী;
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
আমি দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব;
মা বলে আর কোলে যাব না॥" ইত্যাদি।

অথবা:—"মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব ক'ল্লে হয়না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥" ইত্যাদি।

অথবা:—"এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥

প্রভৃতি অপূর্ব্ব ভাব ব্যঞ্জক সঙ্গীতের মধ্যে যে অনুরাগের সজীবতা ফুটিয়াছে তাহা সাধনার ইতিহাসে অতুলনীয়। এই জীবন্ত অনুরাগের আকর্ষণ বশেই মা জগদম্বা আত্মমায়া প্রভাবে;—

"ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥"

এইরূপে শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত ভগবৎ প্রীতির জন্য নববিধ ভজনাত্মক কর্ম্মের অভ্যাস দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে ভক্তের উপাস্য বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে থাকে।

উপাস্যের মাহাত্ম্যজ্ঞান।

নারদ ভক্তিসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে মধুরাদি ভাবের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আরাধ্যের মহাত্ম্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকে তবে বিশেষ বিশেষ ভাব অবলম্বনে ভক্তি সাধনার কোন সার্থকতা থাকে না, এই নিমিত্তেই শ্রীমদ্ভাগত পুরাণে মহাত্ম্য জ্ঞানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটু লক্ষ্য করিলেই ধরিতে পারা যায় রামপ্রসাদের অভিমান অভিযোগাত্মক সঙ্গীতগুলির মধ্যে ও উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্য জ্ঞান, ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে।

"জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রনা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানেনা;
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা জন্মিলে না, মরিলে না"

এই গানে মহান্‌ স্থলভ গঞ্জনার সহিত জননীরূপিণী, আদ্যাশক্তির জন্ম মৃত্যু রাহিত্যের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। উপাস্য সম্বন্ধে তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় অন্যত্র স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি ;
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥"

ভক্ত মাতৃভাবে উপাসনা করিতে করিতে যে পরমতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা মনের মধ্যে গোপনে পুষিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিলেও অন্য সময়ে সেই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মনের উৎসাহে গান করিয়াছেন ;—

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
তারা পদ্ম বনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমন।
আত্মা রামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর মর্ম্ম কাল জেনেছেন ;
অন্য কেটা জানবে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুতরণ
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝেনা,
ধরবে শশী হয়ে বামন ॥"

এই তত্ত্ব নির্ণায়ক সঙ্গীতের মধ্যে যোগপনিষদের অনেক গূঢ় কথা অতিশয় মনোরম ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বিশদ বিবৃত করিতে হইলে পৃথক গ্রন্থ লিখিতে হয়। শ্রোতৃ মণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে এ বিষয় আর অধিক আলোচনা করিলাম না। সাধকের আরাধ্য পরম পদার্থ বিষয়ে তত্ত্ব নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিবার পরে, পরোক্ষভাবে অধিগত উপাস্যের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবার বিধান আছে। রামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্র-শাস্ত্রানুমোদিত দুরূহ শব সাধন ও নিগূঢ় ষটচক্র সাধন-যোগ অনুষ্ঠান করিয়া

জ্ঞানের পরে ধ্যান।

অভীষ্ট দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শব সাধনা বিষয়ক গান একদিকে যেরূপ ভৈরব বেতালাদির বিভীষিকা বর্ণনে ভীতিব্যঞ্জক ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অন্যদিকে তদ্রূপ ভক্তের মাতৃবৎসলতার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসভাবের উজ্জ্বল সমাবেশে মধুর ও আশাপ্রদ।

ধ্যানযোগে শবসাধনা।

"জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালী;
বম্ বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুস্পথ শূন্যাগারে;
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধ চন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে;
আপাদ লম্বিত জটাজাল॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প;
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভুতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষুলাল॥
যে জন সাধক বটে, :তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হ'য়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর করাল বদনী জোর
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সেকি মানে বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥"

তান্ত্রিক সাধকগণ প্রসাদের এই উপাদেয় সঙ্গীতটিকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রজনী দ্বিপ্রহরান্তে তাঁহারা অন্তঃকরণে শক্তি সঞ্চারের নিমিত্ত বেহাগ রাগিনীতে যখন ইহা গান করেন তখন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল চিত্ত সাধকের মনও সাহস ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

ধ্যান-যোগের অন্তগত ষট্‌চক্র সাধন প্রণালী বিবৃত করিয়া রামপ্রসাদ যে

গান রচনা করিয়াছেন তাহা পুঁথি পড়া বিস্তার পরিচয় বলিয়া মনে হয় না, ধ্যানে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই যেন অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে একটা গানের সামান্য অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম যথা ;—

ধ্যানযোগে ষট্‌চক্র ভেদ।

"তারা আছ লো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে,
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা।
এক স্থান মুলাধারে, অন্য স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।
শিব শক্তি মধ্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে।
ভূজঙ্গ রূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা
এই ধ্যান করে ধন্য নরে। ইত্যাদি

এই নিগূঢ় যোগ তত্ত্বের বর্ণনা মধ্যেও মজ্জাগত ভক্তি ভাবের বিমল উৎস স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। রামপ্রসাদ সর্ব্বত্রই আত্মাশক্তির মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছেন এই সকল উন্নত ভক্ত জীবন লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন—

রামপ্রসাদের মনে সর্ব্বসময়েই ভক্তিভাবের প্রাবল্য।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

ধ্যান যোগে সিদ্ধ হইলেও সাধক সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মগুলির বন্ধনপ্রবণতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলে পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দূর হয় না। এই আশঙ্কা নিবারণের উপায় নির্ব্বাচন করিয়া শ্রীভগবান গীতাশাস্ত্রে প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন ;—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্ম বন্ধনৈঃ।
সংন্যাস যোগ যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥"

অর্থাৎ হে কুন্তী নন্দন যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে

অর্পণ কর, এইরূপ করিলে তুমি কর্ম্ম জনিত ইষ্টানিষ্ট ফল হইতে মুক্ত হইবে, পরে আমাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ অর্পণ করিয়া যোগযুক্তচিত্ত হইয়া তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

প্রসাদী সঙ্গীতে এই কর্ম্ম সমর্পণের ভাব প্রকাশ করিবার সময় কিরূপে নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল ইষ্ট ভজনাত্মক কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে রামপ্রসাদ তাহাও অতি সুন্দর ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ধ্যানের পরে কর্ম্মফল ত্যাগ।

"ওরে মন বলি ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণ পুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মারে।"

গীতোক্ত কর্ম্ম সমর্পণ বিষয়ে ভগবানের যে অমূল্য উপদেশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে এই গানটী তাহারই মর্ম্মার্থ প্রকাশক ও সাধনোপায় নির্দ্দেশক ভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই কর্ম্ম সমর্পণ সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্ত সাধক, বিধি নিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হয়, তখন ভক্তি মুক্তি সমস্তই তাঁহার করায়ত্ত হয়, মোহনিদ্রা আসিয়া আর কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, পুনরাবর্ত্তনের ভয়ে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয়না। কোনরূপ সুখ দুঃখে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না তিনি আপ্তকাম হইয়া এক অনির্ব্বচনীয়া শাশ্বতী শান্তির চির অধিকারী হন এবং রস স্বরূপ ভগবানের প্রেম সাগরে ডুবিয়া থাকেন। এই অবস্থার অনুভূতির চিহ্ন স্বরূপ সিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদ যে গান গাহিয়াছেন তাহা আর আক্ষেপ ও নিরাশার উষ্ণ শ্বাসে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সন্দেহ বা অশান্তির কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, আনন্দ ময়ের আনন্দ স্পর্শে তাহা ভক্তের নিকট অমৃতের অফুরন্ত উৎস স্বরূপ হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতই তাহার পরিচয় স্থল;—

কর্ম্মত্যাগের পর শান্তি।

"এবার আমি ভাল করেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
বিধিনিষেধের অতীত অবস্থা।
যে দেশে রজনী নাই;
সেই দেশের একলোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যাঁর ঘুম তাঁরে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুমপাড়ায়েছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামা নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥"

রামপ্রসাদ মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রহ্মময়ীর চিন্ময় সত্বাতে আপন অস্তিত্ব বিলীন না করিয়া আনন্দময়ীর চরণপ্রান্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া অনন্ত সেবানন্দ উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। সুতরাং এই বিধি নিষেধের অতীত অবস্থায়ও আনন্দময়ীর আনন্দঘন লীলা মূর্ত্তির হৃদয় মাঝারে নিত্য অধিষ্ঠানে উল্লসিত হইয়া গান গাহিয়াছেন;—

রামপ্রসাদ নির্ব্বাণ মুক্তির প্রার্থী ছিলেন না। সেবানন্দই তাঁহার পরম পুরুষার্থ।

"আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলী॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি
নামটি কভু নাহি ভুলি॥
আবার দু'আঁখি মুদিলে দেখি
অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলে॥
আমায় যা বলে তা বলুক তারা;
অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরাম প্রসাদ বলে মা বিরাজে শতদলে;
আমি শরণ নিলাম চরণতলে।
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥"

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের অভ্যন্তরে সাধকগণ আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বাণ ষটকের "চিদা-

নন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং” ধ্বনির অভ্যন্তরে যেরূপ সাধনার চরমোৎকর্ষ অনুভব করেন, তদ্রূপ রামপ্রসাদের এই সঙ্গীতের অভ্যন্তরেও বিশুদ্ধ ভক্তি-মার্গের সাধকগণ ভক্তিযোগের উন্নততম আদর্শ দেখিতে পান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিবারচণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

ভাগবত ধর্ম্ম।

গুরুবাদের ভিত্তি।

ভাগবতবক্তা উগ্রশ্রবা সূত শ্রদ্ধান্বিত ভাবে ব্রহ্মবিৎমুনিগণের নিকট কি ভাবে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আমরা আলেচনা করিয়াছি। এইবার সূতের যিনি গুরু অর্থাৎ দীক্ষাগুরু তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব অর্থাৎ সূত তাঁহার গুরু, ব্যাসনন্দন শুকদেবকে কি ভাবে দেখিতেন তাহাই আলোচনা করিব। শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ঋষিগণ সূতকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, তিনি প্রথমে তাঁহার গুরুকে প্রণাম করিলেন, তাহার পর দেবতাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। সূত তাঁহার গুরুকে যে দুইটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রণাম বা স্মরণ করিলেন সেই দুইটি শ্লোকের অর্থ আলোচনা করিলেই আমরা হিন্দু-গুরুবাদের ভিত্তি বুঝিতে পারিব! শ্লোক দুইটি এই

“যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোস্মি॥
যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতি সারমেক
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধং।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাং ॥১-২-৩৪

শ্লোক দুইটির সাধারণ অর্থ এই:—শুকদেব গৃহস্থ ব্রাহ্মণের করণীয় নিত্য-নৈমিত্তিক কোনও ক্রিয়া না করিয়া, একেবারে একাকী সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। ব্যাসদেব পুত্রের বিরহে বড়ই কাতর হইয়াছেন ও হে পুত্র!

হে পুত্র! বলিতে বলিতে তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ব্যাসদেব হে পুত্র! হে পুত্র। বলিতেছেন, বনের গাছগুলিও হে পুত্র! হে পুত্র! বলিতেছে। টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, বৃক্ষগুলির এই প্রকারে হে পুত্র! হে পুত্র! বলার কারণ আছে। শুকদেব যোগবলে সকল ভূতের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি যখন দেখিলেন যে তাঁহার পিতা বেদব্যাস মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃই পুত্রশোকে এইরূপ কাতর হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, তখন তিনি পিতাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য গাছগুলির অন্তরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও গাছ-গুলি ব্যাসদেবকে পরিহাস করিয়া তাঁহাকেই পুত্র! পুত্র! বলিয়া ডাকিতে লাগিল; অর্থাৎ হে ব্যাসদেব! তুমি যদি শুকদেবকে পুত্র বলিতে পার তাহা হইলে আমরাও তোমাকে পুত্র বলিতে পারি। কারণ তুমি নিশ্চয়ই তোমার পুত্রের জড় দেহকে পুত্র বলিতেছ, সেই জড় দেহটিই তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে কারণ তাহার যে আত্মা, সে ত সর্ব্বব্যাপী তাহার থাকা বা চলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। যে জড়বুদ্ধিতে আজ শুকদেব তোমার পুত্র, সেই জড় বুদ্ধির কাছে দুদিন পরে তুমিও আমাদিগের পুত্ররূপে প্রকাশ পাইতে পার। আসল কথা 'কস্তকে পত্রিপুত্রাস্থামোহ এবহি কারণং' এই তত্ত্বটি তুমি জাননা। প্রথম শ্লোকটির শ্রীধর স্বামী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া একটু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। প্রথমে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাই আলোচনা করা যাউক।

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয়টির অর্থ এই—এই ব্যাসনন্দন শুকদের অত্যন্ত দয়ালু। ঘোর অন্ধকারময় সংসারে পতিত হইয়া যে সমস্ত মানব কষ্ট পাইতেছে তাহাদের উদ্ধারের জন্য তিনি এই ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভাগবত শাস্ত্রের প্রভাব অসাধারণ, ইহা অখিল বেদের সার ও অনুপম গ্রন্থ, এবং যে রহস্যময় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় বিশ্বব্যাপার চলিতেছে তাহার মর্ম্ম নির্দ্ধারণের জন্য ইহা প্রদীপ স্বরূপ। এই প্রকার সাধু ও দয়ালু মুনিগণের গুরু শুকদেবকে প্রণাম করি। শ্লোকটির অর্থনিরূপণে টীকাকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নাই। এক্ষণে এই শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য হইতে গুরুবাদের যথার্থ ভিত্তি নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রাচীনকালের সমস্ত ধর্ম্মেই গুরুকরণ বা দীক্ষা গ্রহণ পরিদৃষ্ট হয়, অবতারবাদ

বা মহাপুরুষবাদের সহিত গুরুবাদের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আজকালকার যে সমস্ত পণ্ডিত গুরুবাদের বিরোধী, যে সমস্ত আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় গুরুবাদ বা মধ্যস্থতাবাদকে অবজ্ঞা করিয়া ঈশ্বর ও মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান রাখিবার বিরোধী তাঁহাদের যুক্তি কি তাহাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে গুরুবাদ মানব-চিত্তের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায়, গুরুবাদের দ্বারা মানুষ একটি যন্ত্র হইয়া পড়ে। ইনি আমার গুরু, ইনি যাহা বলিবেন আমাকে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, এই প্রকারের সাধন পথ আশ্রয় করিলে মানুষের কোনরূপ উন্নতি হয় না, পরন্তু মানুষ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ-চিত্ত ও অনুদার হইয়া পড়ে। গুরুবাদের বিরুদ্ধে ইহাই একমাত্র যুক্তি—এই কথাই নানাজনে নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিলে আমরা এই যুক্তির অসারতা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব এবং হিন্দু গুরুবাদের ভিত্তি ও আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু প্রাগুক্ত শ্লোক দুইটি বুঝিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিলে সত্যের দুই প্রকার আদর্শ পরিদৃষ্ট হইবে—একটি সনাতন, আর একটি দেশকাল পাত্র ও অবস্থানুযায়ী। কিন্তু এই দুইটি আদর্শ বিভিন্ন নহে, ইহারা অঙ্গাঙ্গী ভাবে, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মবাদের মত অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত। একটি ছাড়িয়া অপরটি দাঁড়াইতে পারে না। মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ, মানবে মানবে সম্বন্ধ, মানবজীবনের আদর্শ—এসমস্ত সনাতন—উপনিষদে এই সমস্ত কথা মুখ্যভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র উপনিষদ বা গীতা লইয়াই হিন্দু শাস্ত্র শেষ নহে, ইহা ছাড়া স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র বা ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র, সংহিতা প্রভৃতিও আছে। উপনিষদ ও গীতাও যেমন হিন্দুর শাস্ত্র, পুরাণ তন্ত্র ও স্মৃতিও তেমনি। সমস্তকে এক অখণ্ড দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতে না পারিলে হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। আজ কাল বেদান্তের নাম দিয়া খাঁটি জার্ম্মান দর্শনের অনুবাদ বাজারে বিক্রীত হইতেছে, অনেকে বঞ্চিত হইতেছেন—জার্ম্মান দর্শন পড়িতেছেন বলিয়া নহে—তবে ইহাই উপনিষদ বা বেদান্ত এইরূপ মনে করিতেছেন বলিয়া; প্রাচীন কালের আদর্শগুলি খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে—শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যায় সমাজদেহ নিদারুণ ভাবে আক্রান্ত ও অভিভূত হইতেছে—তাহার কারণ এক অখণ্ড দৃষ্টিতে হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সমাজ, ও সমস্ত ইতিহাস আমরা বুঝিতে পারিতেছি

না। অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় নিজ নিজ কল্পনার তুলাদণ্ডে সমস্ত বিষয়ের মূল্য নিরূপণ করিতেছি। এই অখণ্ড দৃষ্টিশক্তির বিকাশ এযুগে স্বামী বিবেকানন্দের যত খানি হইয়াছিল, আর কাহারও ততখানি হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই অখণ্ড দৃষ্টিশক্তিকে ইংরাজের ভাষায় Historic Consciousness বলা চলে।*

সত্যের এই দুই প্রকার আদর্শের মধ্যে যাহা সনাতন আদর্শ তাহাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি এই সনাতন আদর্শের প্রচারক। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা যদি শ্রুতির বিরোধী হয় তাহা হইলে শ্রুতিকেই স্বীকার করিতে হইবে। এককথায় সত্যের যে দেশ কাল পাত্র বা অবস্থানুযায়ী আদর্শ তাহা সনাতন আদর্শের অনুকূল এই টুকু বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করিতে হইবে! অনেকে মনে করেন যে পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির উপদেশ ও শিক্ষা যাঁহারা অনুবর্ত্তন করেন তাঁহাদের স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকার নাই। অন্ধভাবে কোনওরূপ প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া এই সমস্ত পালন করিতে হইবে। হিন্দুজাতির প্রতি এতদপেক্ষা অপমানের কথা আর কিছুই নাই। এ প্রকারের কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা কখনও হিন্দুসমাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন কিনা বিশেষ সন্দেহ। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।" যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে। তবে যুক্তিদ্বারা সত্য নির্ণয়ের একটা প্রণালী আছে। সেই প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা না করিলে ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল, যুক্তির স্থান অধিকার করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিবে।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন হেতবঃ॥

বেদবাক্য প্রথমে শ্রবণ করিবে, শ্রবণের পর মনন, এই খানে যুক্তির প্রয়োগ। তাহার পর ধ্যান। এই প্রকারে সত্যের দর্শন লাভ হইবে।

সুতরাং আগে বেদ, পরে যুক্তি। কথাটা শুনিয়া মনে হইবে তবেত সবই হইল? এযুক্তি প্রয়োগে আর লাভকি? বেদ কি তাহা না বুঝিলে এইরূপই মনে হইতে

* ভগিনী নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন :—"It would seem sometimes as if the Swami lived and moved and had his very being in the sense of his country's past. His historic consciousness was extraordinarily developed." The Master as I saw Him Page 116.' এই ঐতিহাসিক চৈতন্যের বিকাশ ছাড়া কোন জাতির মঙ্গল হয় না।

পারে বটে, কিন্তু বেদ কি তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিলে আর এ সন্দেহের উদয় হইবে না। বেদ কি তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। আবার 'যুক্তি' সম্বন্ধেও শাস্ত্র বলিতেছেন।—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রা বিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥　মনু—১২·১০৬

অর্থাৎ ঋষিদিগগের উক্তি সমূহ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সাহায্যে নির্ণয় করিতে যিনি চেষ্টা করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন, অন্যে জানে না।

শ্রুতি সম্বন্ধে দেশীয় মত এই যে ঋষিরা বেদের রচয়িতা নহেন, বেদ অপৌরুষেয়—ঋষিরা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা মাত্র। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে সনাতন সত্য, কল্পনা, অনুমান বা যুক্তি তর্কের জিনিস নহে—বেদ বা সনাতন সত্য সমূহ তত্ত্বদৃষ্টির প্রত্যক্ষের বিষয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ দুইটি আদর্শের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ণিত হইল, গুরুবাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধেও সে দুইটি আদর্শ তুল্যভাবে প্রয়োজ্য।

হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের একটি বিশেষরূপ পার্থক্য আছে। সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মেই অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ পরিদৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টান যেমন বাইবেলকে অভ্রান্ত বলেন, হিন্দু তেমনি বেদকে অভ্রান্ত বলেন। কিন্তু প্রভেদ আছে। নব্য বাইবেল অর্থাৎ খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তিগুলি মানিতে হইবে, কিন্তু কেন মানিব? ইহার উত্তরে খ্রীষ্টান বলিবেন যে মহাত্মা খ্রীষ্টের উক্তি তাহার মধ্যে রহিয়াছে। খ্রীষ্ট বাইবেলের প্রমাণ। কিন্তু হিন্দুর কৃষ্ণ বা অপর কোন অবতার বা মহাপুরুষ বেদের প্রমাণ নহেন। বেদ স্বতঃপ্রমাণ—বরং কৃষ্ণের প্রমাণ বেদ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার The Sages of India (ভারতের মহাপুরুষগণ) গ্রন্থে এ বিষয়ে অতি নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—Krishna is not the authority of the Vedas, but the Vedas are the authority of Krishna himself. His glory is that he is the greatest teacher of the Vedas that ever existed, So as tc other incarnations; so with all our sages." বেদ যেমন কৃষ্ণের প্রমাণ তেমনি অন্যান্য অবতার বা মহাপুরুষগণেরও প্রমাণ, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই যে বেদের শিক্ষক তাঁহার মত করা হয় নাই।*

আসল কথা ঋষিত্ব লাভ করাই হিন্দুসাধনার চরম আদর্শ—অন্ধ ভাবে

* সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।

কোনও মত মানিয়া চিরকাল বসিয়া থাকা আদর্শ নহে। মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে হইবে, পরের মুখে ঝাল খাইলে চলিবে না—সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ইহাই হিন্দু সাধনার লক্ষ্য। এই সাধনার মধ্যে দিয়া প্রাচীন কালে অনেকে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া আমাদের ঋষি হইতে হইবে।

যে শাস্ত্র এই প্রকারের স্বাধীন ধর্ম্মানুশীলন উপদেশ করিয়াছেন সেই শাস্ত্রই আবার গুরুবাদ প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং এই গুরুবাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রহস্যও বিশেষ রকমের উপযোগীতা আছে। আমরা এই রহস্যও উপযোগীতাই আলোচনা করিব।

উগ্রশ্রবা সূত যখন তাঁহার গুরু ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে স্মরণ করিয়া প্রনাম করিলেন তখন তিনি কিভাবে গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি বলিতেছেন শুকদেব কৃত্য শূন্য হইয়া প্রব্রজ্যায় যাইতে-ছেন ও বৃক্ষগুলির অন্তরমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিধ্বনি ছলে তাঁহার বিরহ-কাতর পিতাকে তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন—শুকদেব সর্ব্বভূতহৃদয় ও মুনি। প্রথম শ্লোকে সূত এই ভাবেই স্মরণ করিতেছেন। এই ভাবটি সূত প্রথম উপলব্ধি করিয়া তাহার পর তাঁহার গুরুর মধ্যে এই সনাতন ভাবের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। আগে সনাতন ভাব তাহার পর ব্যক্তিতে বা বস্তুতে তাহার প্রকাশ। যেমন আগে বেদ তাহার পর কৃষ্ণ, ঠিক তেমনই। যদি আগে ব্যক্তি তাহার পর সেই ব্যক্তির প্রমাণের উপর সনাতন সত্যকে খাড়া করা হইত তাহা হইলে গুরুবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে যুক্তি দিয়া থাকেন তাহার মুল্য থাকিত। যে ধর্ম্মে মহাপুরুষ বা অবতারের নামে শিক্ষা, উপদেশ, আচার বা তত্ত্ববিশেষের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করা হয়, সেখানে বেশ জোর করিয়াই বলিতে পারা যায় যে গুরুবাদ দ্বারা মানব সঙ্কীর্ণ ও অন্ধ হইয়া পড়ে—মিলনের উদারভূমিতে সে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুর গুরুবাদের দার্শনিক ভিত্তি এরূপ অশক্ত নহে। সামাজিক জীবনে গুরুবাদের অনেক বিকৃত প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু গুরুবাদের এই দার্শনিক ভিত্তিও চিরকালই পরিচিত, সাধকগণ সকল সময়েই এই ভাবে গুরু পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

এই যে গুরুবাদের ভিত্তির কথা বলা হইল, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে কেবল মাত্র গুরুবাদের নহে, এই দার্শনিক তত্ত্ব হিন্দু সভ্যতার

একটি প্রকাণ্ড বিশেষত্ব। হিন্দু সাধনার ও হিন্দু সমাজের যে সমস্ত বিষয় বৈদেশিক বা বৈদেশিক শিক্ষা মুগ্ধ স্বদেশীয়গণের নিকট অসার বা কুসংস্কার মূলক বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, এই দার্শনিক তত্ত্ব, হিন্দু চিন্তার এই বৃহৎ বিশেষত্বটুকুর আলোকে শ্রদ্ধান্বিত ভাবে আলোচনা করিলে তাহাদের গভীর মর্ম্ম অনেক স্থলেই আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবে।

এই দার্শনিক তত্ত্ব অতি প্রাচীন। বেদের মধ্যে ইহার ভিত্তি অতি স্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের অনেকেই পরবর্ত্তী পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে উপনিষদাদির অর্থ উপলব্ধি করেন নাই, সেই জন্য এ সমস্ত কথা আমাদের চিন্তারাজ্যে এখনও বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 'অনুদর্শন' বলিয়া একটি কথা ইতঃপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে— 'অনুদর্শন' জিনিষটা কি তাহা শ্রুতিবাক্য হইতে অতি পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়। একটি উদাহরণ। কঠোপনিষদে রহিয়াছে

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

"অতিশয় নিত্য তিনি, নিত্য বস্তু সমূহের, অতিশয় চেতন তিনি, চেতন বস্তু সমূহের, এক তিনি, বহুর কামনা পূরণ করেন। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সেই তত্ত্বকে আত্মস্থ বা নিজের মধ্যে অনুদর্শন করেন তাঁহারাই নিত্য শান্তি লাভ করেন, অন্য কেহ তাহা পায় না।"

এই বেদমন্ত্রে দেখিতেছি যিনি 'অতিশয় নিত্য, অতিশয় চেতন ও এক' তিনি প্রথমে, তৎপরে অন্যান্য নিত্যবস্তু (অবশ্য 'তথাকথিত') ও চেতন বস্তু। এই এক অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আগে এক পরে বহু। আগে নির্গুণ ব্রহ্ম পরে সগুণ ব্রহ্ম। কিন্তু সমাধির চরম অবস্থা ব্যতীত অন্য কুত্রাপি ইহাদের বিচ্ছেদ নাই। এই যে মহামিলন ইহাই দর্শন করিবার যে অভ্যাস তাহারই নাম 'অনুদর্শন'। এই মানসিক অভ্যাসের জন্যই হিন্দুকে Metaphysical বলে। গ্রীক বা পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শনপদ্ধতি ইহার ঠিক বিপরীত। আগে বহু পরে এক। হিন্দুর এই মানসিক অভ্যাস আয়ত্ত না করায় হিন্দু সন্তান বিকৃত মত বেদান্তের নাম প্রচার করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

গুরুবাদের ভিত্তিটুকু মোটামুটি বুঝিলাম—এই বার ইহার উপযোগীতা

আলোচনা করা যাউক। সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে হিন্দু শাস্ত্রের এই উপদেশ পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থা নহে। প্রাচীনতম শাস্ত্রে ও ইহার সুস্পষ্ট বিধান আছে যথা অথর্ব্ববেদের মুণ্ডকোপনিষদে

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্
ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

এই মন্ত্রে গুরুকরণের অনেক তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। কোন্ অবস্থায় মানব গুরুসমীপে গমন করিবে অর্থাৎ শিষ্য কোন্ অবস্থায় যথার্থভাবে দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী এবং গুরুরই বা কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে গুরুবাদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এই মন্ত্রটির অর্থ উপলব্ধি করিলে তাহা আরও বিশদ হইবে। কর্ম্মের দ্বারা যে সমস্ত লোক পাওয়া যায়, পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি লোকের যাহা কিছু আমরা উপভোগ করি অর্থাৎ ষড়্‌বর্গ, সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তুর প্রকৃতি যখন আমরা অন্তদৃষ্টির সাহায্যে বিচার করি অমনি আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাদের অসারতা বুঝিতে পারি। সেই সময়ে মনের মধ্যে বৈরাগ্য আসা অবশ্যম্ভাবী, তখন আর ভোগ সুখ মান সম্ভ্রম প্রভৃতির জন্য পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না; এই যে অবস্থা এই অবস্থাই দীক্ষা গ্রহণের ঠিক অবস্থা। গীতায় দেখি অর্জ্জুন ঠিক এই অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, চণ্ডীতে দেখি সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য ঠিক এই অবস্থাতেই মেধস মুনির নিকট চণ্ডী শুনিয়াছিলেন, উপনিষদে দেখি নচিকেতা ঠিক এই অবস্থাতেই যম রাজের নিকট, মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ও যোগবশিষ্ঠে দেখি রামচন্দ্র ঠিক এই অবস্থায় বশিষ্ঠ ঋষির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় বেদবিদ্যাপারগ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু এই প্রকারে নির্ব্বেদ হইবে কাহার? "ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। যে সময় মনুষ্যের এই অবস্থা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তখনইত তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যেও পূর্ব্বের ঐ কথার আভাস দেখিতেছি।

মানুষ স্বাধীন ভাবে পরমার্থ তত্ত্বের আভাস প্রথমে প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ তিনি প্রথমে ইংরাজী দর্শনের কথায় The Impersonal হইতে বাহির হইবেন,

কিন্তু এই পরমার্থ তত্ত্বের আভাস পাওয়াই এই পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করা নহে। সাধনা চাই, প্রনালীবদ্ধ শিক্ষা চাই, অভিজ্ঞের উপদেশ ও পরিচালনা চাই। মনে করুন, এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, এক দিন আমি এই গ্রন্থখানি উপর উপর দেখিয়া অথবা ইহার অনুবাদ স্থানে স্থানে পড়িয়া মনে করিলাম অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ, আমি যাহা খুঁজিতেছি, যাহা পাইলে আমি কৃতার্থ হইব এ গ্রন্থে ঠিক তাহা আছে। এই যে আভাসে ভাগবতের মহিমা উপলব্ধি করা ইহাই ভাগবত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করা নহে। ভাগবতে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে হইলে বা ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে ভাগবত খুব ভাল জিনিষ, ইহার দ্বারা আমরা পরমার্থ লাভ হইবে এই টুকু বুঝিয়া, একজন শিক্ষক বা গুরুর নিকট যাইতে হইবে। তিনি ভাগবত পাঠের যাহা প্রণালী তদনুযায়ী শ্লোকের পর শ্লোক, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ও স্কন্ধের পর স্কন্ধ পড়াইয়া, আমাকে ভাগবতের মর্ম্মবিৎ করিবেন। এই যে পণ্ডিতের শরণাপন্ন হওয়া ইহা কি পরাধীনতা, ইহার দ্বারা চালিত হওয়ায় আমরা স্বাধীনতার কি কিছু সঙ্কোচ হইল ? আমার স্বাধীনতা রহিল, তবে উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছাচার রহিল না। ইহাই গুরুবাদ ও দীক্ষা।

মনে করুন একটা আদর্শ রাষ্ট্র। তাহার অধিবাসীগণ নিজেদের পরাধীন বলিয়া বিবেচনা করে না, তাহারা সকলেই স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন বলিয়া কি তাহারা আইন কানুন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি মানিয়া চলে না ? তাহারা এই সমস্ত খুব মানিয়া চলে, তাহারা প্রাণপন চেষ্টায় আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী। এই অনুবর্ত্তিতায় তাহাদের স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না কারণ তাহারা জানে ও উপলব্ধি করে (Know and realize) যে এই আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করা একটা বহিঃস্থিতি শক্তির অধীন হইয়া অন্ধভাবে অগ্রসর হওয়া নহে, সে জানে যে তাহার নিজের যে পবিত্রতর ও উন্নততর ব্যক্তিত্ব, তাঁহারই নিদেশ (the dictates of his higher self) সে পালন করিতেছে এবং এই পালনেই সে তাহার পরমপুরুষার্থ লাভ করিবে। আদর্শ রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা যে কারণে অক্ষুন্ন থাকে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে গুরুর অনুবর্ত্তন করিয়াও শিষ্যের স্বাধীনতাও ঠিক সেই কারণে অক্ষুন্ন থাকে। ইহাই গুরুবাদের যর্থার্থ ভিত্তি।

সমাজে গুরুবাদ যে ভাবে চলিতেছে তাহার ভিত্তি মুলতঃ হয়ত এই রূপই ছিল, কিন্তু পরে নানা কারণে তাহা হয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা হউক ইহা একটি সমাজ বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্ন (a Sociological problem) ইহার

আলোচনা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের আলোচনা প্রয়োজন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ইহার জন্ম হইয়াছে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের পরিবর্ত্তনে হয়ত এই প্রথা ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যাহা হউক ইহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য নহে। এই প্রথাও যে ঐ প্রাচীন তত্ত্বসাধনার বীজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্যাগ—বুদ্ধ।

একদিন রাজপুত্র কুণ্ডল, কিরীট, দণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। পৃথিবীতে মানুষ, স্বর্গে দেবতা বিস্মিতনেত্রে সে দৃশ্য স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। সম্ভোগের অতুল বৈভব, ত্যাগের এই অভাবনীয় কঠোর আঘাতে আপন হীনতা স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িল। কোমল বাহুর বেষ্টনে বন্ধন প্রয়াসী প্রেমময়ী নারী, প্রবল ঝড়ে বিচ্ছিন্ন লতিকার ন্যায় পথের ধূলিতে মুখ লুকাইল। রাজপ্রসাদের কতদিকের কত গবাক্ষ হইতে, কত পরিচিত মুখ, কত অঞ্চল ভরা প্রেম, কত অশ্রু ভারাবনত আঁখি, বিপুল আবেগে সহস্র রসনায় সাধিয়া বলিল,—"যেয়োনা, যেয়োনা কুমার" সিংহাসনের ভীষণ শূন্যতা ছুটিয়া আসিয়া চরণে ধরিল, কহিল, "ধরণীঈশ্বর, তুমি কোথা যাও?" সেই স্তব্ধ নিশিথিনী, ফুল্লকৌমুদী, বায়ুর হিল্লোল, তার মধ্যে আর একটি কণ্ঠ কি করুণ কাঁদিয়া উঠিল,—"স্বামি, সর্ব্বস্ব আমার, ফিরে চলে এস।—আমার বুকে ফিরে চলে এস।" সে কণ্ঠ বাতাসে কাঁপিতে লাগিল, আকাশে মিলাইয়া গেল। কোথায়ও কি তার কোন দাগ, কোন চিহ্ন রহিলনা! * * * হায়, সকলি ফুরাল! বন্ধন, কাহারে ধরিতে চাও? জগতের চির বন্দীশালে যিনি মুক্তির অরুণ জ্যোতিঃকে ফুটাইয়া তুলিবেন, তাঁহাকে? যিনি কোন অজানা আকাশের অপূর্ব্ব কোমলতা, অগাধ গম্ভীরতা, অনন্ত বিস্তারকে ধরিয়া আনিয়া বিশ্বমানবের চির বিচরণ ভূমি করিয়া দিবেন, তাঁহাকে? শৃঙ্খল, দূরে—দূরে অপসৃত হও।

কপিলবস্তুর দিকে একটি বারও মুখ না ফিরাইয়া, রাজপুত্র সম্মুখের পথে চলিয়া গেলেন। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া বলিয়া গেলেন;—"আমি বধির, আমি বধির।" গহনবনে ঘন পত্রের আবরণ ভেদ করিয়া আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

হে গৌরবময় মনুষ্যত্ব, তোমার উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম।

এত নয় অপ্রেমিকের ক্রুর নির্ম্মমতা, এযে নূতন সৃষ্টির বিপুল আয়োজন; ত্যাগের ভীষণ প্রচণ্ডতা, সত্যের সুকঠোর দৃপ্ত ছবি, অনন্ত করুণা নিসৃত জমাট অশ্রুপ্রস্রবনের পাষাণময় ধবল মুর্ত্তি। সুম কোমল, কুলিশ কঠিন।

কলিকাতা,
২৪শে ভাদ্র ১৩১৪।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী

নৈবেদ্য।

নাহি হেথা পুষ্পডালি, ধূপাধার, শুভ আলিম্পন,
অগুরু-গুগ্‌গুল-ধূম, শঙ্খ ঘণ্টা, কাঞ্চন প্রদীপ,
না চাহে পূজান্ত-বর বাসনার নন্দন ত্রিদিব,
এ দীন করেনি প্রভু হেন কোন' সুবিষম পণ।
নীল জলে রাখি দীর্ঘ ছল ছল অলক্ত-কম্পন,
সুবিজন জাহ্নবীর পারে ডুবে দিবস-অধিপ,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে অতিস্ফুট অশোক ও নীপ,
ঝরে' যায়, ঝরে' যায়, তাই আজি হে হৃদিরঞ্জন,
আবক্ষ ডুবায়ে, ভরি করপুটে পূত অর্ঘ্যজল,
কম্পিত হতেছি কান্ত! একি আশা না এ নিরাশ্বাস?
বিলম্বে মালঞ্চে মোর ব্যর্থ হবে বাসন্ত উচ্ছাস;
এ দীন নৈবেদ্যভার রবে পড়ি—হৃদি পুষ্পদল!
তবু আমি দিনু ঢালি; দিনান্তের রবি ডুবে যায়,
তেমতি কামনা যত ডুবে যেন এ মোর পূজায়।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

সংকলন।

ঠাকুর শ্রীচণ্ডিদাস।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী অতীব সারগর্ভ কথা প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা বীরভূম সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে বা তাহার বাহিরে থাকিয়া চণ্ডী দাসের অপ্রকাশিত পূর্ব্ব পদাবলী জীর্ণ ও প্রাচীন হস্তলিপি সমূহ হইতে উদ্ধার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের

অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে যে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলা হইয়াছে তৎপ্রতি তাঁহাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া এই প্রবন্ধে উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বনে ঠাকুর চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা হওয়া দরকার আমরা নিম্নে প্রবন্ধটির মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

চণ্ডীদাসের যে সমস্ত পদ এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে তাহা সহজীয়া প্রভাবের বিষবিন্দু সংস্পৃষ্ট। চণ্ডীদাস ব্রজরসের উচ্চতম সাধক ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যুগে সহজিয়াদের হস্তে পতিত হইয়া চণ্ডীদাসের অনেক পদ ভনিতা অংশে বিকৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে রামিনীর কথা আছে, তাহা সহজিয়াদের যোজনা মহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের পদে রামিনীর উল্লেখ ছিল না। সহজিয়াদিগের সাধনে নায়িকার একান্ত প্রয়োজন। তাহারা তাহাদের আচারের পোষকতা সাধন কল্পে অনেক গ্রন্থের ও অনেক চরিত্রের বিকৃতি ঘটাইয়াছে। সহজীয়াদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় বৈরাগ্যের পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং শ্রীপাদ রূপগোস্বামী 'প্রকৃতি' গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক কি চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও এইরূপ কুকথা প্রচার করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চণ্ডীদাসের প্রতিপত্তি দেখিয়া, সহজীয়ারা নিজেদের মত চালাইবার জন্য রামিনীর নাম ও অন্যান্য কথা চণ্ডীদাসের পদে যোজনা করিয়াছে।

লেখক বলিতেছেন—"ঠাকুর নরোত্তমদাসের তিরোভাবের পরে এদেশে সহজীয়া বৈষ্ণবগণের প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের পর হইতে অসংখ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হয়, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রায় এক হাজার পুঁথি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অধিকাংশই পাতড়া পুঁথি। এই সকল পুঁথিতে প্রেমপবিত্রতার আদর্শ স্বরূপ বৈষ্ণবাচার্য্য, বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণকে বিড়ম্বিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম দিয়া নিজেরা স্বমত পোষক পাতড়া গ্রন্থ লিখিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তাঁহারাও যে নায়িকা লইয়া উপাসনা করিতেন, এইরূপ কদর্য্য মত প্রচারিত করা হইয়াছে।"

ভ্রমসংশোধন।

বর্ত্তমান সংখ্যায় 'দীনবন্ধু মিত্র ও হাস্যরসের রচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে দুইটি মুদ্রাকর প্রমাদ হইয়াছে, পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

৭৬ পৃষ্ঠা ২য় পংক্তিতে 'ইহার' পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত পাঠ হইবে—"ছিল, যাহা আধুনিক আনকোরা বিলাতী বাঙ্গালা 'পং' এর।"

৮২ পৃষ্ঠা প্রথম পাদটীকার শেষে নিম্ন বাক্যগুলি যোজিত হইবে—"সংস্কৃত সাহিত্যে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা নাই। আলম্বন বিভাব প্রভৃতি আলঙ্কারিক সংজ্ঞায় হাস্য সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারটাকে বাঁধিতে কুলায় না। এ বিষয়ে আমরা সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্য পরিভাষা প্রনয়ণ কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"
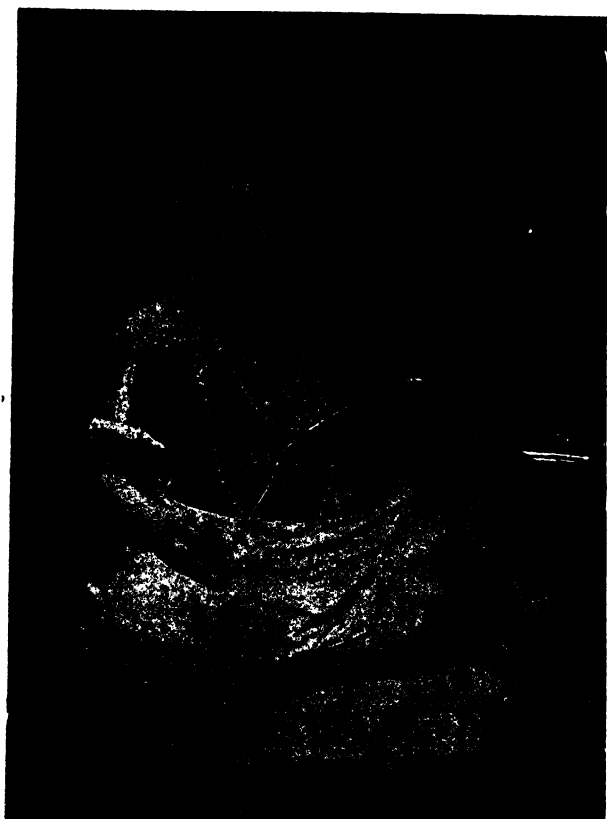
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
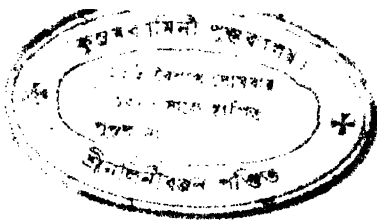
বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ ১৩১৮।

সত্য-নারায়ণ।

মানবপ্রকৃতির গভীরতম রহস্য কে বুঝিয়াছে? আজ এই মতভেদপূর্ণ জগতে কে আমাদিগকে তাহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে সক্ষম? কথায় প্রয়োজন নাই, তর্ক ও যুক্তি নিষ্ফল; বাদ ও বিচারের, জল্প ও বিতণ্ডার কলরবে মানব জাতির সাহিত্য পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—এখন জীবনে জীবনস্রোত ঢালিয়া, হৃদয়ে প্রেমের বন্যা বহাইয়া, অন্তঃকরণ সরস করিয়া তাহাতে জীবন্ত ভাববীজ বপন করিয়া কে আমাদিগকে সকল সন্দেহের পারে, সকল বিরোধের বাহিরে, সকল দুঃখ ও সকল অভাবের সুমীমাংসায় লইয়া যাইবে?

বিশ্বে রহস্যের সীমা নাই, ক্ষুদ্র বালুকাকণা ও অগণ্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া, সহস্র সহস্র সৌরজগতপরিপূর্ণ ঐ ছায়াপথ, কোথায় রহস্য নাই? কোন্ তত্ত্ব মানব বুঝিয়াছে? প্রহেলিকার সীমা নাই, বিস্ময়ে মানবচিত্ত বিশ্বের প্রতি চাহিয়া আছে। বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের বিশ্রাম নাই, তাহারা বিশ্বরহস্যের দ্বারগুলি একটির পর একটি উদ্‌ঘাটন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মানবপ্রকৃতি সকল জটিলতার মধ্যে জটিলতম, সকল রহস্যের হয়ত মীমাংসা হইয়া যাইবে কিন্তু মানব প্রকৃতির গভীরতম রহস্য বোধহয় মানবের নিকট প্রকাশিত হইবে না। প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বজ্ঞান সাধিত হইবে, নবীনেরা বলিতেছেন বিশ্বজ্ঞানের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। বিশ্বজ্ঞানের উন্নতিদ্বারা মানুষ আপনাকেই ভাল করিয়া চিনিতে ও জানিতে শিখিতেছে। বিশ্বজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ—ইহাই আজি-কার সিদ্ধান্ত। জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে—হইলে সুখের কথা, কিন্তু এখনও কত বাকি!

এই যে আত্মবোধ সম্পন্ন, অসীম বিকাশশক্তি বিশিষ্ট চৈতন্যের বীজগুলি,—এই যে কোটি কোটি নরনারী, বিনশ্বর জগতে আপনাদিগকে অবিনশ্বর বলিয়া

ঘোষণা করিতেছে, অগণিত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এক অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত সত্যের স্বপ্নে সময়ে সময়ে বিভোর হইয়া উঠিতেছে—ইহাদের সত্তার রহস্য ও ইহাদের ভবিষ্যত ভাবিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এগুলি বীজ, ইহাদের বিকাশ হইতেছে—এই বিকাশ যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর ধরিয়াই হইবে—কিন্তু ভবিষ্য জগতের সমগ্র ইতিহাস—দূর ভবিষ্যতে মানব যাহা কিছু করিবে সমস্তই আজিকার এই মানবচৈতন্যের মধ্যে বিরাজমান। বিকাশ—আত্মপ্রকৃতিগত বিকাশ—ইহাই জগতের নিয়ম। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একটি জড়পদার্থ অথবা একটি পশু বা উদ্ভিদ লইয়া হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পারেন এই এই পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহের সংঘাতে এই বস্তু, এই পশু বা এই উদ্ভিদের এই এই অবস্থান্তর হইবে। একটি মানব শিশুর বিকাশের অনুকূল ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা জানিলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এরূপ হিসাব করিতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে ঘটনা বা অবস্থা বিশেষের মধ্যে মানব কি করিতে পারে বা করিতে পারে না তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত। কখনও আমরা তাহা ধারণায় আনিতে পারিব কি না সন্দেহ, আমরা প্রত্যেকেই একটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা—নিজেদের কাছেও যেমন অপরের কাছেও তেমনি।

এই জন্য ব্যক্তির জীবনেই হউক আর জাতির জীবনেই হউক রহস্যের সীমা নাই। যিনি বলেন বুঝিয়াছি তিনি বোঝেন নাই, আবার যিনি বলেন বুঝি নাই, তিনিও বোঝেন নাই, বুঝিয়াছি ও বুঝি নাই এইটুকুর মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, প্রাচীনদিগের এই উক্তিই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।*

আমরা চলিয়াছি—জগতে বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—কিন্তু কোথায় চলিয়াছি তাহা অনির্ণেয়। এক মহানাটকের অভিনয় হইতেছে আমরা প্রত্যেকে এবং আমাদের জাতি সেই নাটক অভিনয় করিতেছে—কিন্তু এই মহানাটকের উপসংহার কি তাহা অবোধ্য ও অননুমেয়।

আমাদের এই জাতি, আমাদের এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ, আমাদের এই অতি বিরাট সভ্যতা ও সাধনা, এই বহুজাতির মহাসম্মিলন, এই অগণ্য সংঘর্ষের অস্পষ্ট ইতিহাস—ইহার তত্ত্ব কি এতই সহজ, ইহার রহস্যে কি আদৌ কোন

---

* নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

জটিলতা নাই? ভারতের মর্ম্মকথা কে বুঝিতে পারিয়াছে? কে আমাদের বুঝাইয়া দিবে? এই জটিল প্রহেলিকার মীমাংসার জন্য কয়জন সাধক যথার্থ-ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন।

আজ শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রয়োজন; আজ বিনীতহৃদয়ে এই মহাতপস্বী ভারত-বর্ষের চরণমূলে উপবেশন করিতে হইবে, আজ আর ভ্রান্ত বিজ্ঞতার অভিমান লইয়া তর্কের ঘূর্ণিবায়ু সৃজন করিবার সময় নাই, আজ নীরব, প্রাণময় ও শ্রদ্ধা-ন্বিত সেবার প্রয়োজন। দাম্ভিকভাবে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, কখন উপমাত্মক ন্যায়ের সাহায্যে, কখনও ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের নামে অপর জাতির বা অপর দেশের ইতিহাস হইতে সূত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে আমাদের শৈশবের চপলতা, সে আমাদের বিচারহীন অনুচি-কীর্ষার ফল, হে ভারতবর্ষ! আজ তুমি আমাদের সেজন্য ক্ষমা কর।

ঐ কত প্রকার সংস্কারের কথা, কতপ্রকার ভ্রান্ত বিজ্ঞতার কথা ঘোষণা করিয়া কতজন নেতৃত্বের প্রয়াসী হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কণ্ঠ নীরব হইয়া আসিতেছে কেন? আমরা যেন বুঝিতেছি, অন্ধের হস্ত ধরিয়া অন্ধের মত ছুটিয়াছিলাম। আজ আর তর্ক নাই, আজ আর কলহ নাই, আজ বড় বড় কথার কোলাহল থামিয়া যাউক, আজ শ্রদ্ধা ও সেবা, আজ নম্র হৃদয়ে আত্ম দান, আমাদের ধর্ম্ম হউক। সংস্কার চাই, পরিবর্ত্তন চাই—উন্নতি চাই—জীব-নের তাহাই লক্ষণ, কিন্তু ভক্তি ও শ্রদ্ধাই তাহার সাধন।

একদিন মোহান্ধ হইয়া, হে ভারতবর্ষ! আমরা তোমার অবমাননা করি-য়াছি। নিজেদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়া তোমার উপদেষ্টা হইয়াছিলাম—সাধনা না করিয়াই নিজেদের সিদ্ধপুরুষ ভাবিতেছিলাম—পরের কথা আয়ত্ত করিয়া তাহাই আওড়াইয়া ভাবিতেছিলাম পণ্ডিত হইয়াছি—আমা-দের সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর—আমাদের হৃদয় ভক্তিরসে অবনত হউক, আমাদের কর্ম্মে নিষ্কামতা দাও।

এখন ভাবিয়া দেখিতেছি, এতদিন কেবল অনুকরণই করিয়াছি, তোমায় চিনিতে চেষ্টা করি নাই—তাই আজিও আমাদের তথ্যজ্ঞান অপরিস্ফুট, কর্ত্তব্য-সূত্র বিশৃঙ্খল, কার্য্যকলাপ অসংযত ও অব্যবস্থিত। আজ আমরা আমাদের মৌলিক বিশিষ্টতা টুকু অবধারণ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছি। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, নিজেদের জন্যই বাঁচিয়া থাকিতে চাই—এই বিশিষ্টতার মধ্য দিয়া আমাদিগকে সম্মিলনের পথ উদ্ভাবন করিতে হইবে।

হে তপস্বি! তুমি মহাযোগ সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া ভবিষ্যতের মানবজাতির শিক্ষক হইবার জন্য নিস্তব্ধ আসনে বসিয়া রহিয়াছ। এতদিন তোমাকে চিনিতে পারি নাই, চিনিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টাও করি নাই তোমাকে জীবন-শূন্য জড়পিণ্ড বলিয়া মনে করিতেছিলাম—তোমার পবিত্র অঙ্গে না জানিয়া কতই না আঘাত করিয়াছি! আজ দেখিতেছি তুমি জীবিত, তুমি তোমার স্থির লক্ষ্যের দিকে আমাদের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছ—আজ তাই আমরা তোমার প্রকৃতি, আমাদের আত্মপ্রকৃতি বুঝিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। তুমি আমাদের 'শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র,' তুমিই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতি, ভক্তি ও গৌরবের পাত্র।

আজ আবার তোমার নব-উদ্বোধন—দাও আমাদের শান্তি পরায়ণতা, পরিশ্রমশীলতা, ধীরতা ও অনাসক্ত চিত্ততা—এই তোমার মহাশিক্ষার বলে আমরা ধন্য হইব, বিশ্বমানব ধন্য হইবে।

এস হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এস বৌদ্ধ জৈন, পার্সি, এস জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত, এস যাজ্ঞিক ও যোগী, সন্ন্যাসী ও গৃহী—তোমাদের বেদ, কোরাণ, বাইবেল, ত্রিপিটক ও আবেস্তা, তোমাদের ত্রিশূল, ক্রুশ ও চন্দ্রাঙ্ক লইয়া এই মিলনের মহাতীর্থে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত পরম প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ ও মিলিত হও। এই ভারতবর্ষ সকলের, সকলেই ভারতবর্ষের। ঐ দেখ পাশাপাশি মস্‌জিদ্‌, গির্জ্জা ও মন্দিরের চূড়া উৰ্দ্ধগগনে উঠিয়াছে। এস আমরাও মিলিত হইব—আমরাও এক হইব, ভারতে নব মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করিব। জগৎ আমাদের আদর্শে গঠিত হইবে—বিশ্বমানবের মহামিলন সম্পূর্ণ হইবে।

মানব সভ্যতা এই ভারতেই প্রভাতের মধুর স্বপ্ন দেখিয়া বিভোর চিত্তে বলিয়াছিল—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তাহার পর মানব ইতিহাসে কত যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত; সংঘর্ষ হইয়াছে, বিরোধ হইয়াছে, ধরণীবক্ষ রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছে, এখনও সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক মানবের প্রবৃত্তির মধ্যে বসিয়া শোণিতপানের লালসা পোষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই বিরোধের অন্তরালে সভ্যতায় সভ্যতায়, জাতিতে জাতিতে সংমিশ্রণ হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার আদান প্রদান হইয়া মৈত্রীর সুবর্ণময় ভিত্তি ও ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীই ভারতের মর্ম্মকথা—সংযম ও নিবৃত্তির পথই ভারতের সনাতন পথ, সেই পথেই আমাদের চলিতে হইবে—শান্তির শুভ্রপতাকা ঐ ধীরে ধীরে

আত্মপ্রকাশ করিতেছে—আনন্দময়ের প্রেম বংশীর মধুরধ্বনি ঐ বিশ্বসভ্যতার অন্তরতম প্রদেশ হইতে নিনাদিত হইতেছে—এস আমরা ঐ পতাকাতলে মিলিত হই—ঐ বংশীর উদার মধুর রাগিনীর সহিত আমাদের হৃদয় যন্ত্রের তারগুলির সামঞ্জস্য সাধন করি। ভারতের প্রাথমিক স্বপ্ন ভারতেই প্রথম সফলতা লাভ করিবে তাহারই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের প্রত্যেক-কেই সেই আয়োজনে নিজ নিজ সাধ্যমত সহায়তা করিতে হইবে।

তোমার সহিত আমার অনেক বিষয়ে মিল নাই—দূর হইতে এতদিন তোমাকে দেখিতেছিলাম——তোমার সম্বন্ধে যাহা হউক একটা মত গড়িয়া কেবল বিভীষিকা দেখিতেছিলাম। আজ তোমাকে নিকটে পাইয়াছি—আজ দেখিতেছি তুমিও মানুষ ঠিক আমারই মত মানুষ—যে মানুষকে লক্ষ্য করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ বলিয়াছেন "বিধাতা নিজের অনুরূপ করিয়া মানব সৃষ্টি করিয়াছেন।" * গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ ॥১০।২০

তুমিও সেই মানুষ, আমিও সেই মানুষ—তাই বলিতেছি, নিকটে আসিয়াছ, আরও নিকটে এস—এস হৃদয়ে এস, অন্তরে এস, তুমি আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি—দেখিবার সময় কথা কহিও না—ধীরভাবে সহানুভূতির সহিত দেখিলে দেখিতে পাইবে একই আনন্দময়ের লীলা—অনন্তকোটি মানবের জীবন মধ্যে অভিনীত হইতেছে। তোমার জাতীয় বিশিষ্টতার মধ্যে আমায় প্রবেশ করিতে দাও, আমার জাতীয় বিশিষ্টতার মধ্যে তুমি প্রবেশ কর। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়ও প্রেম লইয়া প্রবেশ কর—দাম্ভিক সমালোচকের বিষাক্ত ছুরিকা-হস্তে আসিওনা, অহঙ্কারের হলাহল হস্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার আশায় আসিওনা—তাহা হইলে অতীতের সেই সমর-কোলাহল ও অস্ত্র-ঝন-ঝনা আবার জাগিয়া উঠিবে, এই বহুশতাব্দীর বিপুল চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে—কেহই কাহাকেও চিনিতে পারিবে না।

কে কাহাকে শিখাইবে, জগতে সকলেই সকলের শিক্ষক, সকলেই সকলের গুরু—আজ দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে, আজ মানবের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে—আজ শ্রদ্ধান্বিত ভাবে, এস সেই পরমগুরুকে বুঝিতে চেষ্টা করি, যিনি

* "God created man in his own image, in the image of God create he him." Genesis.

জাতি বিশেষের বা সমাজ বিশেষের গুরু নহেন—নিখিল বিশ্বের যিনি আত্মা, বিশ্বমানবের যিনি গুরু ও পথ প্রদর্শক। আজ সকল প্রকারের কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতা তিরোহিত হউক—অবিদ্যার অন্ধকার দূরীভূত হউক, মোহশৃঙ্খল খসিয়া যাউক; সত্য সকলের—সেই সত্যের আলোক জ্বলিয়া উঠুক—সকলে সমস্বরে বলি—"সত্য পরং ধীমহি"।

এই পরমসত্যই নারায়ণ—ইনিই আমাদের বিশুদ্ধ ও সাত্বিক জ্ঞান 'সবিতৃ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী' ও হৃদয়-'সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট'—দার্শানিকের ভাষায় ইনিই সূত্রান্তর্যামী বিরাট। তিনিই মহামিলনের অভীষ্টদেব—বিশ্ব-সভ্যতার ধ্রুবনক্ষত্র। কবির কল্পনা, দার্শনিকের গবেষণা, বৈজ্ঞানিকের সুস্পষ্টজ্ঞান, পরীক্ষাবিধান ও নিয়মাবধারণ-প্রবণতা—রাজনীতিবিৎ ও বার্ত্তাশাস্ত্রবিদের নবনব উদ্ভাবনা সমাজতত্ত্ববিদের অধ্যবসায় তাঁহাকেই খুঁজিতেছে। সম্মিলনশক্তির অনুশীলনই তাঁহার যথার্থ উপাসনা—মনের সংযম, সহানুভূতি, বশ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা তাঁহার পূজার উপকরণ—প্রেমই তাঁহার চরণে অর্পণ করিবার পুষ্পাঞ্জলি—আসুন আমরা সেই সত্য-নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করি!

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"

অর্থের দহন

পথ বহি যায় দীন গুণ্ গুণ্ গেয়ে,
রাজা দেখিলেন তারে কক্ষ হ'তে চেয়ে।
কহিলেন নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি—
মিথ্যা এই ধনরত্ন বৃথা জমিদারী।
আমিও হ'তাম সুখী ওর মত হ'লে,
পেয়েছে সন্তোষ দীন ধনের বদলে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

পাটলিপুত্র।

গত কার্ত্তিকমাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "পালিভদ্র কোথায়" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রীক্ বর্ণিত পালিবোথরা নগরীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা অন্যত্র * সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে অনুকূল বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল যুক্তি দ্বারা উহা সমর্থন করিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে সুপ্রসিদ্ধ স্কচ্ ঐতিহাসিক ডাক্তার রবার্টসনের বাক্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ডাক্তার রবার্টসনের An Historical Disquisition of Ancient India নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে Notes and Illustrations বিভাগে চতুর্দ্দশ সংখ্যক নোটের সহিত অনুকূল বাবুর প্রবন্ধ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। মল্লিখিত উক্ত প্রবন্ধে অনুকূল বাবুর অনুবাদিত রবার্টসনের মত ও যুক্তিগুলি যে নিরতিশয় ভ্রান্তিমূলক তাহাও প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, "পালিবোথরা (পালিভদ্র নহে) যে পাটলিপুত্রেরই রূপান্তর মাত্র এবং এই পাটলিপুত্রই বর্ত্তমান পাটনা নগরীতে পরিণত হইয়াছে" এই মতটি পণ্ডিতমণ্ডলী কি কি যুক্তি অবলম্বনে নিঃসংশয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তই যে গ্রীক বর্ণিত স্যান্ড্রাকোটস্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ নামের সাদৃশ্য—কোন গ্রীক পুস্তকে উক্ত নামটি স্যান্ড্রকোপ্টস্ লিখিত আছে। এখন, গ্রীক ভাষায় 'চ' নাই তাহার স্থানে 'স' বা 'স্ত্র' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে এবং গ্রীক ভাষায় শব্দশেষে সাধারণতঃ যে 'স্' যোগ হয় তাহা বাদ দিলে উক্ত নামটি চন্দ্রকোপ্ত এইরূপ হয়। 'চন্দ্রকোপ্ত' যে চন্দ্রগুপ্তেরই অপভ্রংশ মাত্র তাহা নিঃসন্দেহ। † দ্বিতীয়তঃ অশোক যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, পুরাণে ও বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অশোকের শিলালিপিতে যে সমুদয় সমসাময়িক গ্রীক রাজগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারা আলেকজান্দারের সময় হইতে দুই কি তিন পুরুষ ব্যবধান মাত্র। সুতরাং অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত যে আলেকজান্দারের সমসাময়িক তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

* দেবালয় মাঘ ১৩১৮

† J. A. S. B. Vol XIV.

তৃতীয়তঃ চন্দ্রগুপ্ত ও স্যান্দ্রকোপ্টসের জীবন বৃত্তান্তে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। (১) পুরাণে বর্ণিত আছে চন্দ্রগুপ্ত অতিশয় নীচবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুদ্রারাক্ষসের দ্বিতীয় অঙ্কে "রাক্ষস" বলিতেছেন।

"ভগবতি কমলালয়ে তুমি আদপে গুণজ্ঞ নও,
আনন্দের হেতু সেই নন্দে করি ত্যাগ
বৈরী মৌর্য্য পুত্রে তব কেন অনুরাগ ?

* * *

অপিচ বলি ওগো নীচ কুলোদ্ভবে !
খ্যাত কুলোদ্ভব নৃপ
হয়েছে কি দগ্ধ সবে এধরণীর মাঝে
তাই কিরে পাপীয়সি
পতিত্বে বরিলি তুই কুলহীন রাজে ?"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গানুবাদ ৩৩ পৃঃ)

(২) মুদ্রারাক্ষসে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বহ্লীক প্রভৃতি ও পর্ব্বতরাজের সৈন্যদ্বারা পাটলিপুত্র অবরোধ করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(বঙ্গানুবাদ ৩৮ পৃঃ)

চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল গ্রীক বর্ণিত স্যান্দ্রাকোপ্টস সম্বন্ধেও এইরূপই দেখিতে পাই। (১) জাষ্টিন লিখিয়াছেন 'তিনি অতি নীচবংশে জন্মগ্রহণ করেন।' (২) গ্রীক ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি আলেকজান্দর ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে সমুদয় প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার প্রস্থানের অনতিকালপরেই তৎসমুদয় পুনরায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়। এই স্বাধীনতার সমরের প্রধান নায়ক ছিলেন স্যান্দ্রাকোপ্টাস্। এই সমরে জয়লাভ করিবার পর তিনি তাঁহার বিজয়ী সৈন্য লইয়া মগধ অধিকার করেন। মুদ্রারাক্ষসে শক যবন প্রভৃতি যে সমুদয় সৈন্যের উল্লেখ আছে তাহারা সকলেই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থিত। সুতরাং এস্থলেও মুদ্রারাক্ষসে ও গ্রীক ইতিহাসে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে স্যান্দ্রাকোপ্টস্ ও চন্দ্রগুপ্ত একই ব্যক্তি; সুতরাং আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রই যে গ্রীক বর্ণিত স্যান্দ্রাকোপ্টসের রাজধানী পালিবোথরা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনুকূল বাবু লিখিয়াছেন "পালিভদ্র চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে না।" কিন্তু তিনিই অন্যত্র লিখিয়াছেন 'প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে প্রাসিজের রাজধানী পালিভদ্র ছিল' (ভারতী ৬৫৬পৃঃ) এবং চন্দ্রগুপ্ত যে প্রাসিজ জাতির রাজা ছিলেন তাহা মেগাস্থিনীসের বিবরণী হইতেই আমরা জানিতে পারি।*

মেগাস্থিনীস কোনস্থানে পালিবোথরাকে স্পষ্টতঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিনা। কিন্তু তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বাস করিতেন† অথচ কেবলমাত্র পালিবোথরা নগরীরই বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাকেই ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পালিবোথরাই যে রাজধানী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এপর্য্যন্ত আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে চন্দ্রগুপ্ত ও স্যান্দ্রাকোপ্টস্ একই ব্যক্তি, সুতরাং চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র ও স্যান্দ্রাকোপ্টসের রাজধানী পালিবোথরা একই। এখন পালিবোথরা সম্বন্ধে মেগাস্থিনীস অপর যে দুইটি কথা বলিয়াছেন তাহার সহিত পাটলিপুত্রের সামঞ্জস্য দেখাইতে পারিলেই আমাদের প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়।

প্রথমতঃ মেগাস্থিনীসের বর্ণনা অনুসারে পালিবোথরা গঙ্গা ও ইরাণ্নোবোয়াস নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অমরকোষ অভিধানে দেখিতে পাই শোণ নদীর অপর একনাম হিরণ্যবাহু, গ্রীক ইরাণ্নোবোয়াস্ সে হিরণ্যবাহুরই রূপান্তর সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

পাটলিপুত্র যে গঙ্গানদীর তীরে ছিল মহাপরিনিব্বাণসুত্তে ও অন্যান্য গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শোণনদীও যে পাটলিপুত্রের নিম্নে প্রবাহিত হইত তাহারও প্রমাণ আছে। পতঞ্জলি লিখিয়াছেন "অনুশোণং পাটলিপুত্রং"।‡ মুদ্রারাক্ষসের চতুর্থ অঙ্কে মলয়কেতু রাক্ষসকে পাটলিপুত্র আক্রমণের নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া বলিতেছেন।

---

* Fragment XXV.

Mc. Crindle's translation P. 66.

† Arrian C. V.

‡ Cunningham's Archaeological Survey.

"দেখুন— * * *

হেন শত গজ পিবে
শোণকান্তি শোণ নদীনীর
তুঙ্গকূল সেই শোণ
—স্রোতোবলে ভাঙ্গে যার তীর
উপকণ্ঠ-তরুশ্যাম ;

* * *

অপিচ :—

মদমিশ্র বারিধারা, শুণ্ড দিয়া উদ্‌গারিয়া
বৃষ্টিসম করিতে করিতে বরিষণ
(বিন্ধ্য ঘেরে মেঘে যথা) গম্ভীর গর্জ্জন রবে
গজবৃন্দ নগরেরে করিবে বেষ্টন।"

এখানে নগর অর্থে পাটলিপুত্র, সুতরাং পাটলিপুত্র যে শোণনদের তটেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পালিবোথরা সম্বন্ধে মেগাস্থিনীসের প্রথম কথা—অর্থাৎ গঙ্গা ও ইরান্নোবোয়াস এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থান—তাহা যে পাটলিপুত্র সম্বন্ধেও প্রযুজ্য তাহা দেখান হইল।

মেগাস্থিনীসের দ্বিতীয় কথাঃ—পালিবোথরা Prasii (প্রাসিজ বা প্রাসিয়াই) জাতির রাজ্য মধ্যে অবস্থিত। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গন বলেন 'প্রাসিয়াই' 'প্রাচ্য' কথারই অপভ্রংশ মাত্র। মগধ দেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত সুতরাং সংস্কৃতে তাহার প্রাচ্য আখ্যা হওয়াই স্বাভাবিক। কানিংহাম বলেন 'পলাশ বিকল্পে পরাশ মগধের একটি সুপরিচিত নাম। উক্ত প্রদেশে বহু সংখ্যক পলাশ বৃক্ষ জন্মে এই নিমিত্তই এই নামকরণ হইয়াছে। কানিংহামের মতে 'পরাশ' হইতেই 'প্রাসিয়াই' এই গ্রীক শব্দের উৎপত্তি। কার্টিয়াস্ 'প্রাসিয়াই' স্থানে 'ফরাসাই' এইরূপ লিখিয়াছেন। গ্রীক 'ফরাসাই' আর সংস্কৃত পরাশ যে একই কথা তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক উভয় মতেই 'প্রাসিয়াই' মগধের অপর নাম মাত্র। অপর পক্ষে পাটলিপুত্র মগধের সুপরিচিত রাজধানী। সুতরাং পালিবোথরা সম্বন্ধে মেগাস্থিনীসের দ্বিতীয় কথাও পাটলিপুত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। পাটলিপুত্রই যে গ্রীক বর্ণিত পালিবোথরা এসম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর বর্ত্তমান পাটনায় বা নিকটবর্ত্তী স্থানেই

যে পাটলিপুত্র বা পালিবোথরা অবস্থিত ছিল ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল তাহাই দেখাইতেছি।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিয়ুয়েনথসাংএর বর্ণনা অনুসারে বর্ত্তমান পাটনা সহরই প্রাচীন পাটলিপুত্রের স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। পাটনা সহরকে এখনও নাকি পাটলিপুত্র বলা হইয়া থাকে। কিন্তু পাটলিপুত্র গঙ্গা ও শোণ নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল অথচ এখন উক্ত সঙ্গমস্থল পাটনা হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এমতাবস্থায় মেজর রেণেল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করেন যে পূর্ব্বে শোণ নদী বর্ত্তমান পাটনার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। পাটনা বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার র‍্যাভেনসা রেণেলের উক্ত অভিমত পাঠ করিয়া তাহার সত্যতা নিরূপণে যত্নবান হন। এই সময় পাটনা জিলার জরিপ আরম্ভ হয়। জরিপের অধ্যক্ষ ম্যাক্সওয়েলকে র‍্যাভেনসা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলেন। ম্যাক্সওয়েল অনুসন্ধান করিয়া শোণ নদীর প্রাচীন খাত আবিষ্কার করেন। ইহা নওবাৎপুর, ফুলহারী এই দুই গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঁকিপুরের নিকট যাইয়া গঙ্গায় সম্মিলিত হইয়াছে। র‍্যাভেনসা এই বিষয় অবগত হইয়া পাটনার প্রাচীনতম ইংরেজ অধিবাসী জে, বি, ইলিয়টকে এতৎ সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন তদুত্তরে ইলিয়ট বলেন যে তিনি ইতঃপূর্ব্বেই স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে পূর্ব্বে শোণ নদী বাঁকিপুরের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বুকানান হ্যামিণ্টনও অনুসন্ধান করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে রেণেল, ম্যাক্সওয়েল, ইলিয়ট ও বুকানান, এই চারিজন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুসন্ধান দ্বারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।*

শোণ নদী পূর্ব্বকালে পাটনার নিকটস্থ বাঁকিপুরে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইত এই তথ্য আবিষ্কারের পর হইতে পাটলিপুত্রের স্থান নির্ণয়ে আর কোন গোল রহিল না। প্রাচীন পাটলিপুত্র যে পাটনার নিকটেই অবস্থিত ছিল এই মত অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত হইল। পরে ওয়াডেল এবিষয়ে আরও কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করেন।† পাটনার নিকটে স্থূলভদ্রস্বামী নামক জৈন মন্দিরে তিনি একটি উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পান। তাহাতে লিখিত আছে যে পাটলি-পু

* Ravenshaw's article in J. A. S. B. Vol XIV.

† "Site of the Classical Capital of Asoka" by Waddell.

পুত্রের জৈন অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক এই মন্দির স্থাপিত হয়। মেগাস্থিনীসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে পাটলিপুত্রের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২০ মাইল বিস্তৃত কাষ্ঠ প্রাচীর এবং তাহার উপরে ৫৭০টি কাষ্ঠ নির্ম্মিত উচ্চচূড় গৃহ (Tower) ছিল। ওয়াডেল, তিনস্থানে, সমভূমি হইতে প্রায় ১০।১৫ ফিট নীচে এই কাষ্ঠ প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান। স্থানীয় অধিবাসীগণ তাহাকে বলে যে কূপ খনন করিবার কালে প্রায়ই এই প্রকার কাষ্ঠ প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে নাকি অনেকগুলি কাঠ একত্রিত দেখা যায়। "আগমকুয়া" নামক একটি কূপ খনন কালে দালানের কড়িকাঠের মত ৩০টি বিশাল কাঠ বহির্গত হয়। ওয়াডেল অনুমান করেন যে এই সমুদয় সেই উচ্চচূড় গৃহগুলির অবশেষ।

ওয়াডেল লিখিয়াছেন যে পাটনার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসমূহের নাম এখনও মৌর্য্যবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা অশোক ও তাঁহার পৌত্র রাজা দশরথের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। পাটনার নিকটেই 'অশোপুর' নামক দুইটি গ্রাম, 'অশোচক' নামে একটা চক্ বা বিস্তৃত ভূখণ্ড, 'অশোখণ্ড' নামে একটি নালা এবং "অশকপুর" ও "দশরথ" নামক আর দুইটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এতদ্ব্যতীত হিউয়েনথসাং বর্ণিত পাটলিপুত্রের স্তূপ, বিহার ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের মধ্যে ওয়াডেল কতকগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গুলি বাস্তবিকই হিউয়েনথসাং বর্ণিত স্থানগুলির ধ্বংসাবশেষ কি না এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন এই নিমিত্ত আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না।

পাটলিপুত্রের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। অতঃপর পাটলিপুত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মগধের রাজধানী প্রথমে রাজগৃহে ছিল। পরে রাজা উদয় পাটলী নামক গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহাই কালে সুপ্রসিদ্ধ নগরীরূপে পরিণত হইয়া পাটলীপুত্র, কুসুমপুর ও পুষ্পপুর নামে অভিহিত হয়। পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে এবিষয়ে ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। তবে পুরাণ অনুসারে রাজা উদয় অজাতশত্রুর পৌত্র কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহাকে অজাতশত্রুর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহাপরিনিব্বাণসুত্তে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদেব মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে রাজ-

গৃহ হইতে বৈশালী গমন কালে এই পাটলিগ্রামে গঙ্গা পার হন। তখন ইহা সামান্য একটি গ্রাম মাত্র ছিল এবং মগধরাজ ব্রিজীগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এইখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। বুদ্ধদেব তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে কালে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ নগর হইবে কিন্তু অগ্নি, জল ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ইহার ধ্বংস সাধন হইবে।

ভগবানের এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমভাগ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সুলেমান পর্ব্বত এবং হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনীসের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই বিশাল নগরী দৈর্ঘ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থে দেড় মাইল ছিল। ইহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া কাষ্ঠপ্রচীর এবং তদুপরি পাঁচশত সত্তরটি উচ্চচূড় গৃহ (tower) বিদ্যমান ছিল। চতুঃষষ্টি সংখ্যক তোরণ দ্বারা এই কাষ্ঠ প্রাচীর বিভক্ত এবং তীর নিক্ষেপের নিমিত্ত ইহাতে অনেক ছিদ্র ছিল। চারিশত হাত প্রস্থ এবং তিরিশ হাত গভীর একটি পরিখা কর্ত্তৃক ঐ কাষ্ঠ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। উক্ত পরিখা যুদ্ধের সময় শত্রুদলের আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিতে এবং নগরীর পয়ঃপ্রণালীরূপে ব্যবহৃত হইত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। বিস্তৃত ভূখণ্ড,—চতুর্দ্দিকে সরোবর, লতামণ্ডপ এবং সুসজ্জিত উদ্যান ও বৃক্ষাদির দ্বারা সুশোভিত। মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ,—তাহার] শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণ স্তম্ভগুলি সুবর্ণ দ্রাক্ষালতা ও তদুপরি উপবিষ্ট রজত পক্ষীদ্বারা অলঙ্কৃত—এই দৃশ্য কবি কল্পনাকেও পরাভূত করে। সমগ্র মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার অধীশ্বর বিশ্রুতনামা ও মহৈশ্বর্য্যশালী পারস্য অধিপতির রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও মনোহারিত্বে ও সাজসজ্জায় পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ সমধিক গৌরববান ছিল গ্রীক ঐতিহাসিকগণ একথা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের পাঁচশত বৎসর পরেও পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলিপুত্রের বৃহৎ প্রাসাদসমূহ দেখিয়া লিখিয়াছেন "এই সুবৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদগুলি দেখিলে মনুষ্য নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয় না—ইহা নিশ্চয়ই কোন দৈত্যদ্বারা নির্ম্মিত।"

কিন্তু পাটলিপুত্র যে কেবল এই ঐশ্বর্য্যের লীলা অভিনয় করিয়াছিল তাহা নহে। শীঘ্রই ভারতবর্ষে এক অভিনব ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইল। রাজচক্র-

বর্ত্তী অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজধর্ম্মরূপে বরণ করিয়া লইলেন। এই অভিনব ধর্ম্ম বিপ্লবেও রাজধানী পাটলিপুত্র প্রধান রঙ্গভূমি। পাটলিপুত্রে সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসা নিবারিত হওয়ায় "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ভগবানের এই মহাবাণীর সার্থকতা সম্পাদিত হইল এবং পাটলিপুত্র হইতে চতুর্দ্দিকে প্রেরিত মহপুরুষগণ' কর্ত্তৃক উক্ত মহাবাণী আসমুদ্র ভারতবর্ষে এবং সুদূর মিশর দেশ পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইল। এই পাটলিপুত্রের সুশীতল শ্যামল ছায়ায় সমগ্র ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের এক মহা অধিবেশন হয়। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালা তৃতীয়বার আলোচিত ও সুসংস্কৃত হয় এবং সমগ্র বৌদ্ধ জগতে যে বিরোধাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা প্রশমিত হয়। রাজ-চক্রবর্ত্তীর কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ, এ, অপূর্ব্ব দৃশ্যও ইহারই বক্ষে অভিনীত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ফলে ভারতবর্ষে এক নূতন পদ্ধতির নির্ম্মাণশিল্প ও কারুকার্য্যের উৎপত্তি হয়। সমস্ত ভারতবর্ষ, চৈত্য স্তূপ বিহার স্তম্ভ ও সংঘা-রামে আচ্ছন্ন হয়। প্রবাদ আছে যে অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে তৎকালে নির্ম্মাণ শিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল। রাজধানী পাটলিপুত্রও এই সময়ে বিবিধ স্তূপ, বিহার, স্তম্ভ প্রভৃতিতে শোভিত হয়। হিউয়েনথ্সাংএর বিবরণী হইতে আমরা পাটলিপুত্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্তূপ বিহার প্রভৃতির বিষয় জানিতে পারি। সকলেই জানেন তথাগত বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন প্রদেশে নীত হয় এবং তদুপরি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক দ্রোণ স্তূপের নিম্ন হইতে ঐরূপ ধ্বংসাবশেষ আনয়ন করিয়া পাটলিপুত্রে স্থাপন করেন ও তাহার উপরে একটি বিরাট স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। হিউয়েনথসাং ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজা অশোক নির্ম্মিত ৩০ ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভের বর্ণনা করিয়াছেন। তদুপরি একটি খোদিত লিপি ছিল তাহার সার মর্ম্ম এই "রাজা অশোক ধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের উদ্দেশে তিনবার সমস্ত জম্বুদ্বীপ উৎসর্গ করেন এবং তিনবারই বিবিধ ধন রত্ন দ্বারা তাহার প্রত্যাদান করেন।" হিউয়েনথসাং পাটলিপুত্রের একটি প্রস্তর প্রাসাদের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এত বৃহৎ যে বাহির হইতে দেখিলে বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, মহেন্দ্রনামে অশো-কের এক ভ্রাতা সংসার ত্যাগী হইয়া নির্জ্জন সাধন ভজনে রত হন। অশোক

তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পাইলে তিনি নির্জ্জন শান্তিপ্রদ পর্ব্বত-গুহা ছাড়িয়া কোলাহলময় নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হন। তদুত্তরে অশোক বলেন "তুমি যদি নির্জ্জন স্থানের অভিলাষী হও তবে আমি নগরীর মধ্যেই নির্জ্জন স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" এবং তাহার বাসের নিমিত্ত এই বিশাল প্রস্তর গৃহ নির্ম্মাণ করেন। অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অনতিকাল পরেই পাটলিপুত্রে সুপ্রসিদ্ধ 'কুক্কুটারাম' বিহার নির্ম্মাণ করেন। তথায় এক সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। এই বিহারের পার্শ্বেই সুবিখ্যাত "আমলকী স্তূপ" বিদ্যমান ছিল ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে চীন পরিব্রাজক একটি জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। রাজা অশোক একবার পীড়িত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হন। মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া তিনি পরকালে সুকৃতি লাভের জন্য তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি বিতরণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার যে মন্ত্রী প্রতিনিধি স্বরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন তিনি ইহাতে অসম্মত হন। কিয়দ্দিন পরে একটি অর্দ্ধভুক্ত আমলকী ফল হাতে লইয়া তিনি উক্ত মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন জম্বুদ্বীপের রাজা কে?" মন্ত্রী উত্তর করিল "মহারাজ স্বয়ং" অশোক উত্তর করিলেন "না মন্ত্রী আমি আর এখন রাজা নই, এই অর্দ্ধখণ্ড আমলকী ব্যতীত আর আমার কিছুই নাই। বার্দ্ধক্যে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল কীর্ত্তিও সম্মান এ সমস্ত হইতেই বঞ্চিত হইয়া, আমি প্রতাপান্বিত মন্ত্রীর হস্তের ক্রীড়নক মাত্রে পরিণত হইয়াছি। এ সাম্রাজ্য আর আমার নহে, এই অর্দ্ধ আমলকী খণ্ডই আমার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি।"

এই বলিয়া এক অনুচরকে ডাকিয়া তাহার হস্তে উক্ত আমলকীখণ্ড প্রদান করিয়া বলিলেন "কুক্কুটারাম বিহারের শ্রমণগনকে আমার নমস্কার জানাইয়া বলিবে 'যিনি পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপের সম্রাট ছিলেন এক্ষণে তিনি কেবলমাত্র এই আমলকীখণ্ডের অধিপতি। তাঁহার জীবনের এই শেষ সামান্য দান আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।' উক্ত বিহারের জ্যেষ্ঠ স্থবির (বৃদ্ধ শ্রমণ) ঐ দান গ্রহণ করিয়া বলিলেন "রাজা অশোক এই দানের ফলে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন।" রাজা অশোক রোগমুক্ত হইয়া উক্ত আমলকীর বীজগুলি রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্থবিরগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।

এতদ্ব্যতীত আরও পাঁচটি প্রসিদ্ধ স্তূপের বিষয় হিউয়েনথসাং লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। এইগুলি পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকায় দূর হইতে ইহাদিগকে পাঁচটি ক্ষুদ্র পাহাড় বলিয়া মনে হইত। (অনেকে অনুমান করেন পাটনার সুপ্রসিদ্ধ "পাঁচ পাহাড়"ই এই স্তূপগুলির ধ্বংসাবশেষ।)

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ফলে সর্ব্ববিষয়েই পাটলিপুত্র এই অভিনব ধর্ম্মজগতের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাটলিপুত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। একশত বৎসর পরে যেদিন মৌর্য্যবংশের বিলোপসাধনকারী পুষ্যমিত্র হিন্দুধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরব্ধ করেন সেদিনও পাটলিপুত্র এই নবজাগরণের কেন্দ্র। এই পাটলিপুত্র হইতেই যজ্ঞীয় বিজয় অশ্বের বন্ধন মুক্ত করা হয় এবং বীর যুবক বসুমিত্র সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহাকে পুনরায় পাটলিপুত্রে উপনীত করেন। পতঞ্জলি প্রমুখ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পাটলিপুত্রেই উক্ত যজ্ঞ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পরই পাটলিপুত্রের শক্তি সমৃদ্ধির হ্রাস আরম্ভ হয়। যে পরাক্রান্ত রাজগণ ইহাকে ভারতবর্ষের রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ নগরারূপে পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িলেন। রাজগণ দুষ্ক্রিয়ারত ও রাজকার্য্যে দৃষ্টিশূন্য হওয়ায় সর্ব্বত্র অরাজকতা ও অত্যাচার বিরাজ করিতে লাগিল। অন্তর্বিদ্রোহে রাজশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। পুষ্যমিত্র প্রতিষ্ঠিত সুঙ্গবংশের দশমরাজা দেবভূমি ব্যভিচারে রত ছিলেন এমন সময় তাহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেব কর্ত্তৃক হত হন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুঙ্গবংশের লোপ হয়। বাসুদেব কাণ্ববংশ প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু পাটলি-পুত্রের সৌভাগ্যদিবা ফিরিল না। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে পরাক্রান্ত অন্ধ্র-রাজগণ মগধরাজ্য অধিকার করিলেন সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রও দাসত্বের নিগড়ে বদ্ধ হইল।

ইহার পর হইতে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত সব অন্ধকার। সেই গভীর দুর্য্যোগময় নিশীথে, মৃত গৌরবের সমাধিবক্ষে কোন্ তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় হইয়াছিল ইতিবৃত্ত তাহার কোন সংবাদই রাখে নাই। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাটলীপুত্রের ভাগ্য আবার কিছুকালের জন্য সুপ্রসন্ন হইল। মাহেন্দ্র-ক্ষণে সামন্তরাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত পরাক্রান্ত লিচ্ছবী সম্প্রদায়ের কন্যা কুমার দেবীর পরিণয় সম্পন্ন হইল। এই উদ্বাহ ক্রিয়া হইতেই প্রতাপা-ন্বিত গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুদয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত যেদিন রাজসিংহা-সনে আরোহণ করেন সেদিন পাটলিপুত্রের ও বঙ্গবাসীর ইতিহাসে একটি

চিরস্মরণীয় দিন। দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় বিক্রমাদিত্যের প্রখর জ্যোতিতে চিরদুর্ব্বল বাঙ্গালীর কলঙ্ককালিমা অপসৃত করিয়া গিয়াছেন। দুর্ব্বল বাঙ্গালী আজিও মানসনেত্রে দেখিতেছে পাটলিপুত্রের নগরদ্বার হইতে অসংখ্য রথ হস্তী অশ্ব পদাতিক পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় নিঃসৃত হইতেছে। পুরোভাগে তাহাদের নায়ক বঙ্গবীর মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত বিচিত্র সজ্জাবিশিষ্ট রাজহস্তীর উপর আরোহণ করিয়া এই অগণিত সৈন্যশ্রেণী চালনা করিতেছেন। মহানদী তীর-স্থিত দক্ষিণ কোশলরাজ্য অধিকার করিয়া এই বিজয়ী সৈন্য উড়িষ্যার মধ্যদিয়া বঙ্গোপসাগরের কূল অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, গোদাবরী ও গঞ্জাম প্রদেশস্থ সামন্ত রাজগণকে পরাভূত করিয়া এবং সুবিখ্যাত পল্লবরাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়া এই বিপুল বাহিনী ক্রমে কাঞ্চী নগরীতে উপস্থিত হইল। তথা হইতে মালাবার, মহারাষ্ট্র, খান্দেশ এবং মধ্যপ্রদেশের ভিতরদিয়া এই বিজয়ী সেনাবৃন্দ সুদীর্ঘ তিন সহস্র মাইল সুদুস্তর পথ অতিবাহিত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। না জানি সে দিন পাটলীপুত্রে কি মহোৎসবের স্রোত বহিয়াছিল। বিচিত্র শোভায় সজ্জিত রাজবর্ত্মে সম্মিলিত নাগরিকগণের ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে আসমুদ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধিভূত, বন্দীকৃত নরপতিগণ যেদিন রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্তের বিজয় যাত্রার (triumphal procession) শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন সেই দিন অতুল গৌরব মণ্ডিত পাটলিপুত্র স্বীয় বক্ষোপরি সমগ্র ভারতবর্ষের একটি [illegible]াট সত্তা উপলব্ধি করিয়া কি রোমাঞ্চকলেবর হইয়া উঠে নাই ?

সমুদ্রগুপ্তের এই দিগ্বিজয় চিহ্নিত পথে সহস্র বৎসর পরে আর একজন বাঙ্গালী অত্যদ্ভুত বিজয় পতাকা প্রোথিত করিতে করিতে গিয়াছিলেন। এবারে অগণিত সৈন্যের পরিবর্ত্তে তাহার সহিত একজনমাত্র অনুচর, অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কেবল তাহার অশ্রুজল এবং দিক নিনাদী রণকোলাহলের পরিবর্ত্তে হৃদয়-দ্রবকারী হরিনাম কীর্ত্তন। প্রথমবারের নায়ক হস্তিপৃষ্ঠে সমাসীন বীরগর্ব্বোদ্ধত রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট, এবারের বিজয়ী, ধূলধুসরিত প্রেমাশ্রুপূর্ণ শচীর দুলাল। দুইজন বঙ্গবীর সহস্র বৎসর ব্যবধানান্তর এইরূপে দুইবার ভারতবর্ষ বিজয় করিয়াছিল, কে বলিবে কাহার জয়ের গৌরব অধিক ?

সমুদ্র গুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে সুপ্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা পাটলি-পুত্রের তৎকালীন অবস্থা কিছু কিছু জানিতে পারি। ফাহিয়ান কেবল-

মাত্র যাহা কিছু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কিত তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সময় পাটলিপুত্র বৌদ্ধধর্ম্মজগতের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল ফাহিয়ান তাহার প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে এদেশে আসিয়াছিলেন। এই পাঁচশত বৎসরে রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্ম-বিপ্লব প্রভৃতির মধ্য দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমৃদ্ধির যেটুকু মাত্র অবশিষ্ট ছিল ফাহিয়ানের বিবরণীতে কেবলমাত্র তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহা হইতেই আমরা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। সম্রাট অশোকের প্রাসাদাবলী তখনও বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ফাহিয়ানের উক্তি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। পাটলিপুত্রে তখন একটি মহাযান এবং একটি হীনযান সংঘ ছিল, তাহাতে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। নানা দেশ হইতে ধর্ম্মপ্রবণ শ্রমণ এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ছাত্রগণ এই আশ্রমে আসিতেন। ফাহিয়ান বৌদ্ধ বিনয়সূত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেই ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু পাটলিপুত্র ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি উক্ত গ্রন্থগুলি পান নাই! তিনি তিন বৎসর কাল পাটলিপুত্রে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং উক্ত গ্রন্থগুলির নকল করেন। পাটলিপুত্রের শ্রমণগণের ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া ফাহিয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। ইহার সহিত তাহার স্বদেশবাসী শ্রমণগণের নিয়মভ্রষ্টতার তুলনা করিয়া ফাহিয়ানের একজন সঙ্গী আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন "অদ্য হইতে আমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কাল পর্য্যন্ত আমি যেন আর কখনও ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ না করি।"

ফাহিয়ানের সময়েও প্রবীণ বৌদ্ধ শ্রমণগণ রাজার নিকট কিরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রে রাধাস্বামী নামে একজন বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, ও পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাজা স্বীয় গুরুর ন্যায় তাঁহার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কখনও তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতেন না; রাজার হস্তের সহিত হস্ত সংস্পর্শ হইলে রাধাস্বামী তৎক্ষণাৎ হস্ত ধৌত করিয়া ফেলিতেন।

পাটলীপুত্রের অধিবাসীবৃন্দ তখন বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী ও উন্নতিশীল ছিল এবং সকলেই পরোপকার ও ধর্ম্মাচরণ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করার জন্য ব্যগ্র হইত। বৈশ্য জাতির প্রধান ব্যক্তিগণ পাটলিপুত্রে বহুসংখ্যক ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! এই ধর্ম্মশালা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য

হইবার যোগ্য। ফাহিয়ান উহাদিগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "দেশের সমস্ত অসহায়, দরিদ্র, পিতৃহীন মাতৃহীন শিশু, পত্নীহীন সন্ততিহীন বৃদ্ধ, অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ এবং পীড়িতগণ এই সকল ধর্ম্মশালায় আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সকলকেই সর্ব্বপ্রকার সান্ত্বনা ও সাহায্য করা হয়। উপযুক্ত চিকিৎসকগণ দ্বারা পীড়িতগণ চিকিৎসিত হয় এবং তাহাদিগকে যথোপযুক্ত খাদ্য ও ঔষধাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদের আরামের জন্য সর্ব্ববিধ সুবন্দোবস্ত করা হয় এবং তাহারা নিরাময় হইলে স্বেচ্ছায়ই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।" বর্ত্তমানকালে ইহা তত অসাধারণ বলিয়া মনে না হইতে পারে কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তখন পৃথিবীতে কুত্রাপি এইপ্রকার দাতব্য অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল না। যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র সর্ব্বভূতে দয়া, ইহা সেই ধর্ম্মেরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।

উৎসব ও আমোদ প্রমোদ জাতীয় সজীবতার লক্ষণ স্বরূপ। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর সকল আমোদ উৎসবই ধর্ম্মানুসঙ্গিক। আজকালও দুর্গাপূজা প্রভৃতি আছে কিন্তু তাহা যেন প্রাণহীন। প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিস্তর আমোদ উৎসব প্রচলিত ছিল। ফাহিয়ান পাটলিপুত্রের একটি বিশিষ্ট উৎসব বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ফাহিয়ানের বর্ণনার উপসংহার করিতেছি।

"পাটলিপুত্রের অধিবাসীগণ চারিটি চক্রযুক্ত শকট প্রস্তুত করে এবং তাহার উপর বাঁশ বাঁধিয়া পাঁচতালা স্তূপের আকার নির্ম্মাণ করে। বিবিধ বর্ণে চিত্রিত রেশমী ও কাশ্মিরি বস্ত্র ইহার চতুর্দ্দিকে জড়ান হয় এবং বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ইহার উপর স্থাপন করে। ঐ সকল মূর্ত্তি স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ রত্নে খচিত হয় এবং উহা হইতে রেশমী ঝালর ও পতাকা ঝুলিতে থাকে। বংশদণ্ডনির্ম্মিত কৃত্রিম স্তূপটির চারিদিকে চারিটি প্রতিমা আধার—প্রত্যেকের ভিতর একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি।

এইপ্রকার প্রায় কুড়িখানি শকট থাকে। প্রত্যেকখানিই অতুল-শোভান্বিত ও বিস্ময়াবহ এবং অপরগুলি হইতে বিভিন্ন। প্রতি বৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিনে নগরস্থিত সমুদয় শ্রমণ ও উপাসকগণ সুনিপুণ গায়ক ও বাদক লইয়া নগরের বাহিরে একত্রিত হয়। তথায় নানাবিধ সঙ্গীত ও বাদ্য চলিতে থাকে এবং পুষ্প ও সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা বুদ্ধদেবের পূজা হয়। তৎপরে ব্রহ্মণেরা আসিয়া তাহাদিগকে নগর প্রবেশের নিমিত্ত আমন্ত্রণ করে। তদনুসারে শকট প্রভৃতি লইয়া সমারোহের সহিত তাহারা নগরে প্রবেশ করে এবং তথায় দুই

রাত্রি অবস্থান করে। ঐ সময় সারারাত্রি নগরীর আলোকমালা প্রজ্বলিত থাকে এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট গীত বাদ্যের সঙ্গে পূজা হয়।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য অটুট ছিল। কিন্তু এমন সময় মধ্য এশিয়ার প্রান্তর হইতে বর্ব্বর হুণজাতি বিধাতার রোষবহ্নির ন্যায় সমগ্র মানব জাতির উপর অত্যাচার উৎপীড়নের বহ্নি প্রজ্বালিত করিল। রোম সাম্রাজ্য সে বিরাট সংঘর্ষে টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ কিছু কালের জন্য তাহাদের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু পঙ্গপালের ন্যায় এই বর্ব্বর জাতি ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ ছাইয়া ফেলিল তখন তাহাদের প্রচণ্ড গতি রোধ করে কাহার সাধ্য! সেই অপ্রতিহত তেজের সম্মুখে গুপ্ত সাম্রাজ্য চিরকালের জন্যে অস্তমিত হইল।

সেই দিন পাটলিপুত্রের গৌরবজ্যোতি চিরদিনের জন্য অপহৃত হইল। সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। ভগবান বুদ্ধদেব যে ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন "জল, অগ্নি ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ইহার ধ্বংস হইবে" অনেকে অনুমান করেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েনথসাং পাটলিপুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "এই নগরী বহুদিন যাবৎ জনশূন্য হইয়াছে, তবে স্থলে স্থলে গৃহভিত্তির কিছু অবশিষ্ট আছে। শত শত বিহার দেবমন্দির এবং স্তূপের ধ্বংসাবশেষ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কেবল মাত্র দুই তিনটি অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান আছে।" এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে পাটলিপুত্রের ধ্বংসকার্য্য বহুদিন যাবৎ আরব্ধ হইয়াছে তবে অতীত স্মৃতির নিদর্শন এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন হয় আর প্রায় ৬৩৫ খ্রীঃঅব্দে হিউয়েনথসাং উক্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। অনধিক একশত বৎসরের মধ্যেই সেই সুসমৃদ্ধ পাটলিপুত্রের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল! এই বিষয় বিবিচনা করিলে পাটলিপুত্র ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাচীন নগরীর শেষ পরিণাম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

পাটলিপুত্রের শেষ স্মৃতি কখন কি ভাবে বিলুপ্ত হইল কেহই জানে না। ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই সুবিখ্যাত রাজধানী বিরাট জনহীন প্রান্তর মাঝে পর্যবসিত হইল।

সম্রাট বাবর এই প্রান্তরের নিকট দিয়া অশ্বারোহনে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহার পদতলে কত গৌরবময় সাম্রাজ্যের

সমাধিক্ষেত্র পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য শত শত নগরীর ন্যায় পাটলি-পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাম হয়ত বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত কিন্তু সম্রাট সের সাহ স্থানটি সুরক্ষিত দেখিয়া তাহার উপর নূতন এক নগরী নির্ম্মাণ করেন। ইহাই বর্ত্তমান পাটনা নগরী এবং ধ্বংসগত প্রাচীন কীর্ত্তির একমাত্র স্থান নির্দ্দেশক।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

ভীষণ মধুর।

মৃত্যু আসি কহে মোরে, "একবার ওগো প্রিয়তম
চাহ মোর মুখপানে ; বক্ষমোর তুহিন শীতল,
নিশ্চল তারার মত দেখ মোর নয়ন যুগল,
আলুলিত কেশপাশ তন্দ্রাময়ী নিশীথিনী সম ;
দিবা রাত্র ধুক্ ধুক্ হৃৎপিণ্ড নাহি করে মোর,
বিস্মৃত-অমৃত ঝরে দু'অধরে হাসির ধারায়,
কেন বৃথা জাগরণ জগতের স্বপন-কারায় ?
এস এস, ওগো সখা, পরাইয়া দিব বাহু-ডোর,
চুমিব নয়নে সুখে—মুছে যাবে চির অন্ধকারে
জীবনের মরীচিকা, শতবর্ণ আলোকের লীলা ;
আলিঙ্গনে অঙ্গ হবে সুকঠিন গিরিহিমশিলা
—ঈশান অমরনাথ হ'য়ে রবে অনন্ত তুষারে।"
অপাঙ্গে চাহিনু শুধু একবার আননে তাহার,
এত রূপ ! হায়, হায়, তবু কাঁপে হৃদয় আমার।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

দীনবন্ধু মিত্র ও হাস্যরসের রচনা। (২)

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সম্পূর্ণ ইংরাজপ্রভাব-বর্জ্জিত না হইলেও, আমরা সাধারণতঃ তাঁহাকে সাবেকসাহিত্যের শেষ কবি বলিয়া ধরিয়া থাকি; এবং নানাকারণে ইহাই ঠিক। কিন্তু ইংরাজী আমলে দীনবন্ধুই প্রথম হাস্যরসরচয়িতা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে, আরও দুইজন প্রখ্যাতনামা লেখক এই পথে গমনের উদ্যম করিয়াছিলেন। মাইকেলের কথা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি, ও তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা আমরা দীনবন্ধুর নাট্যসমূহের আলোচনার সময় করিব। এস্থলে কেবল "আলালের" চিরস্মরণীয় রচয়িতা টেকচাঁদ ঠাকুরের কথা কিছু উত্থাপন করিব। "হুতোমের" সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিলেও চলে, কারণ হুতোম টেকচাঁদের অনুকরণে লিখিত, ও আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও দোষ হইবে না।

মাইকেল ও টেকচাঁদ।

টেকচাঁদের নিকট দীনবন্ধুর ঋণ তত বেশী বলিয়া বোধ হয় না। তবে উভয়েই এক পথাবলম্বী, তজ্জন্য একের প্রভাব অন্যের উপর যতটা অবশ্যম্ভাবী, ততটা হইয়াছিল। উভয়েই ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন; উভয়ের রচনা চরিত্রচিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যে ও হাস্যরসে সমুজ্জ্বল: উভয়ের ভাষা * (শুধু কৌতুক-প্রবন্ধের কথা বলিতেছি) নিরাড়ম্বর ও মর্ম্মস্পর্শী। তথাপি টেকচাঁদের প্রভাব দীনবন্ধুর উপর অধিক বলিয়া বোধ হয় না।

টেকচাঁদ ও দীনবন্ধু: তুলনায় সমালোচনা।

যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য এত অধিক যে এসম্বন্ধে দুএকটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বোধ হয়।

আলালী রসিকতা যে আমাদের এত মর্ম্মস্পর্শী তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় ইহার একান্ত কৃত্রিমতার অভাব। শুধু ভাবে নহে, ভাষায়, ভঙ্গীতে, বর্ণনায়, সর্ব্বত্র। সকলেই অবগত আছেন যে টেকচাঁদ তাঁহার পুস্তকে সর্ব্বদা কথাবার্ত্তার চলিত শব্দের ব্যবহারের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইহাতে তাঁহার ভাষা বেশ দ্রুত, সরস, ও সজীব হইয়াছে; আধুনিক লেখকদিগের কৃত্রিম "আড়ষ্ট" ভাব কোথাও দেখা যায় না। তাহার উপর আলালী লেখার ভঙ্গী-

আলালী রসিকতার প্রধান আকর্ষণ।

---

* দীনবন্ধুর ভাষা কতটা টেকচাঁদের অনুযায়ী তাহা পরে আলোচ্য।

টাই কৌতুহলোদ্দীপক ও হাস্যরসোপযোগী। এরূপ দ্রুত সহজ স্ফুর্তিশালী ভাষা ও ভঙ্গী তাঁহার পরবর্ত্তী প্রায় সকল হাস্যরসরচয়িতাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এ বিষয়ে আধুনিক সাহিত্যে 'আলাল'ই পথপ্রদর্শক। বাজার আদালতের ভিড়, বিবাহের ঘোঁট, শ্রাদ্ধের ঘটা, বরযাত্রীর দুর্দ্দশা, ঠকচাচার গতিবিধির বিবৃতি, 'বেলাল্লা ছোঁড়াদের' আচার বর্ণনা, জেলখানা, ইত্যাদি নিত্যদৃষ্ট চিরপরিচিত চিত্র ও বিষয়গুলি একটি স্নিগ্ধ সকরুণ কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যরসে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের নিকট যেন একটা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। এরূপ সজীব অঙ্কণ ও তাহাকে idealise করিবার অর্থাৎ চিন্ময় সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতা দীনবন্ধুর অপেক্ষা টেকচাঁদের কোন বিষয়ে ন্যূন নহে।

স্বভাব চিত্র।

ও idealise করিবার ক্ষমতা।

যাহা হউক, এই গাম্ভীর্য্যের অভাব, তরল ও লঘু ভাষার প্রয়োগ, বাক্য-বাহুল্য, সহজ সরল ভাব, ক্ষিপ্রকারিতা, ইহাই আলালী রসিকতার প্রাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হাস্যরস স্বাভাবিক, কৃত্রিম নহে। জোর করে 'টেনে বুনে রস নিঙ্‌'ড়াইয়া বাহির করা আলালী রসিকতার উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয়ে টেক-চাঁদ দীনবন্ধুর সহিত শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। টেকচাঁদের রচনা পড়িতে পড়িতে ফীল্ডিং (Fielding) কে মনে পড়ে; কিন্তু টেকচাঁদের ভাষা ফীল্ডিং Fielding এর মত মার্জ্জিত নহে—বরং অনেকটা ষ্টার্ন (Sterne) বা স্মলেট (Smolett) * এর ন্যায় লঘু ও ক্ষিপ্রগতি।

আর একটি কথা। হাস্যরসবহুল গল্পের মধ্যে একটা করুণ ভাব আনিয়া ফেলা, ইহাও টেকচাঁদের একটা বিশেষ ক্ষমতা। এবিষয়ে তিনি দীনবন্ধুকে ছাড়াইয়া না উঠিলেও, তাঁহার সমকক্ষ, একথা অস্বী-কার করিতে পারা যায় না। দীনবন্ধুর কৌতুকরচনা গুলিতে যে করুণভাবটুকু আছে, তাহা হাস্যরসের প্রবল তূফানে সময়ে সময়ে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; এ দোষটুকু টেকচাঁদে নাই বলিলেও হয়। অনুচিত প্রশ্রয়প্রাপ্ত বরাটে ছোঁড়া মতিলালের লীলাখেলা যখন শেষকালে বেশ একটু করুণ আকার ধারণ করিল তখনই বড় উপাদেয় হইয়াছে। ঠকচাচার বা বাঞ্ছা-রামের কূটবুদ্ধির পরিণাম শেষকালে হাস্যরসাত্মক না হইয়া করুণরসে পরিণত

হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রণ।

* ইঁহারা তিন জনেই অষ্টাদশশতাব্দীর শেষাংশের বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ও এক হিসাবে ইংরাজী উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা।

হইয়াছে। কিন্তু রাজীবলোচন বা নিমে দত্ত'র পরিণাম তত মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। দীনবন্ধুর হাস্যরসের রচনায় গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল হাসি তামাসার প্রবল তরঙ্গ; কিন্তু টেকচাঁদের আলাল পড়িতে পড়িতে শেষকালে আমাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত না হইয়া যাইতে পারে না।

আলালী রচনার গুণ ও দোষ।

সমালোচকগণ বলেন ও আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি যে জীবন ও ভাষা, জীবন ও সাহিত্য যত কাছাকাছি থাকে তত ভাল। সূক্ষ্ম শিল্পের কৃত্রিমতা মনোহর বটে, কিন্তু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের মনোহারিতা আরও মর্ম্মস্পর্শী। এই হিসাবে আলালের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য এত অধিক। স্বাভাবিক চিত্র, স্বাভাবিক ভাষা ও বর্ণনা স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা—ইহাতে কাহার না আনন্দ অনুভব হয়? আলালী রচনায় যতটুকু এই উদ্দেশ্য ছিল ততটুকু ভাল, কিন্তু স্থানে স্থানে যেখানে টেকচাঁদ এই উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই দোষে পতিত হইয়াছেন।

আলালের ভাষা ও ভঙ্গী।

কারণ আলালী রচনার গুণও যেরূপ অনেক, সেইরূপ অনেক দোষেরও সম্ভাবনা আছে। নিপুণ লেখকের হস্তে না পড়িলে, ভাষা ও ভঙ্গী উভয়ই নিতান্ত খেলো হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। খেলো যে অনেকস্থলে হয় নাই, তাও বলা যায় না। দীনেশ বাবু টেকচাঁদের ভাষাটাকে একেবারেই "বাজারে ভাষা" বলিয়াছেন (প্রদীপ; ১৩০৭)! কিন্তু ততদূর না গিয়াও ইহা স্বীকার্য্য যে এই ভাষা নিতান্ত ইতর ভাষায় পরিণত হইতে বেশী সময় লাগে না। অবশ্য সে সময়ের সাহিত্যইতিহাস আলোচনা করিলে এই ভাষার যে একটা সার্থকতা ছিল ও ইহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের বিপুল উপকার সাধিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। তথাপি এই ভাষা যে সর্ব্বত্র সাহিত্যোপযোগী নহে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ভাষার কথাও দূরে থাকুক, আলালী লেখার ভঙ্গীটাই এইরূপ যে তাহাতে কোন উচ্চ শ্রেণীর রচনা সম্ভব নহে।* বাস্তবিক, এই গাম্ভীর্য্যের অভাবে টেকচাঁদের রচনায়, ভাবে ভাষায় বর্ণনায় সর্ব্বত্র, যে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য অল্প বিস্তর নষ্ট হয় নাই তাহাও বলা যায় না। এরূপ ভাষা ও ভঙ্গী সাহিত্যে কতদূর স্থায়ী, তাহা বিশেষ সন্দেহের স্থল, আলালী লেখাও স্থায়ী হয় নাই। খুব খেলো রকমের

* "ঐভাষার কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়।" (রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। পৃঃ ৩১২) এ কথাটি স্থলবিশেষে সত্য হইলেও, সর্ব্বত্র সমর্থন করিতে পারা যায় না।

রচনা ভিন্ন বোধ হয় আর কোন স্থলে আজকাল এরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন অলঙ্কারকণ্টকিত পণ্ডিতীভাষা অসহ্য, তেমনি নিতান্ত খেলো "বাজারে" ভাষারও সাহিত্যে স্থান নাই।*

সাবেকসাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনা কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেকালে কি ছিল তাহা না বুঝিলে দীনবন্ধু হাস্যরস রচনায় যে যুগান্তর আনিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝা যাইবে না। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকের সমালোচনায় দুইটি দিক আছে—একটা ইতিহাসের দিক, অপরটি কাব্যগত ব্যক্তিত্বের হিসাবে লেখার ভালমন্দ বিচারের দিক। অবশ্য এই দুইপ্রকার হিসাব পরস্পর বিরোধী নহে, পরন্তু অনেক সময় একটি অপরের সাহায্যসাপেক্ষ। জাতির যে সমস্ত চিন্তার মধ্য দিয়া সাহিত্য বিকাশ লাভ করিয়াছে ও অবশেষে আধুনিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং সে চিন্তাস্রোতের সহিত আলোচ্য লেখকের কি সম্বন্ধ, তাহা নিরূপণ না করিয়া. কেবল ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির হিসাবে কোনও রচনার পরিচয় কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আগে লেখকের যুগ, তারপর লেখক স্বয়ং ও তাঁহার রচনা।

সেকালের কৌতুকসাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।

অবশ্য কতকগুলি লেখক আছেন, যথা গীতি-কাব্যের লেখক, যাঁহাদের লেখার সৌন্দর্য্য কেবল ব্যক্তিত্বের হিসাবেই বিশেষ উপভোগ্য; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলেও ইহাঁদেরও রচনার মূল্য বেশী ভিন্ন কম হয় না। আবার কতকগুলি অসামান্য প্রতিভাশালী যুগপ্রবর্ত্তক লেখক আছেন, যাঁহাদের লেখার মূল্য ও বিশেষত্ব এরূপ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিক হইতে না দেখিলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। দীনবন্ধুও বঙ্গসাহিত্যে এরূপ একজন ক্ষমতাশালী লেখক, তাঁহার রচনা সাহিত্য জগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু সেই বিপ্লবের ফল কতদূর ব্যাপী ও এই বিপ্লব সাহিত্যকে আপনার স্বাভাবিক ধীর গতি হইতে বিচ্যুত করিয়া কতটা নূতন শক্তি ও নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে, তাহা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের দিক হইতে না আলোচনা করিলে কিরূপে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব?

সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

---

* আমরা এস্থলে শুধু আলালের কথা তুলিয়া টেকচাঁদের পরিহাস শক্তির সমালোচনা করিলাম। "মদ খাওয়া বড় দায়" প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য পুস্তকগুলি গল্পচ্ছলে লিখিত হইলেও কোনটাতে টেকচাঁদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

সাহিত্যে এরূপ কতকগুলি সময় আসে, যখন একটা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবি হইয়া দাঁড়ায়। এই নূতন ও পুরাতনের জীবন সংগ্রাম, বহির্জগতের ন্যায়, ভাবজগতেও চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে যেমন দিনের পর দিন নীরবে অলক্ষ্যে শত সহস্র পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে, সমাজজীবনেও সেইরূপ দিনের পর দিন শত সহস্র অলক্ষ্য পরিবর্ত্তন, অবশেষে একটা বিরাট বিপ্লব আনয়ন করে। এই স্বাভাবিক নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সমাজের রীতি নীতি, রুচি বিধির এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও আদর্শের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে, যুগচিন্তারও কি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে না? ইংরাজ-রাজত্বের সূচনাকালে যখন দুইটি বিপরীতগামী সভ্যতার সংঘর্ষে আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই প্রবল স্রোতের মুখে পড়িয়া, আমাদেব জাতীয় ভাষা ও ভাবের আদর্শ বিপ্লবের মুখ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তখন সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জীবনেও একটা বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সাহিত্যে বিপ্লব।

কিন্তু এইরূপ বিপ্লবে সমাজ ও সাহিত্য অভ্যুদিত ও কালে কালে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে। বঙ্গসাহিত্যে এই বিশাল ভাববিপ্লবের ইতিহাস সামান্য-রূপেও বিবৃত করিবার স্থান এখানে নাই; কিন্তু যাঁহারা এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে নবশক্তি ও নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। নূতন ও পুরাতনের এইরূপ সংগ্রাম অধিকাংশস্থলে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার দ্বন্দের নামান্তর মাত্র। অবশ্য আমরা এমন বলিতেছি না যে যাহা কিছু পুরাতন সমস্ত মন্দ, যাহা কিছু নূতন সমস্ত ভাল। নবশিক্ষাদৃপ্ত হিন্দুকালেজের যুবকগণ এক সময় এইরূপ ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন আজ আর নাই। কে যোগ্য, কে অযোগ্য, কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, তাহা কে বলিবে? সর্ব্বনিয়ন্তা কাল তাহার একমাত্র নির্দ্দেশক। তথাপি যুগে যুগে এই নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ, যোগ্যতার রক্ষণ ও অযোগ্যতার বিনাশের দ্বারা, সাহিত্যের মহোপকার সাধন করে। সমাজ ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি চিরকাল এইরূপ বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাধিত হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, যে উন্নতি, শত-

তাহার প্রয়োজনীয়তা ও সাহিত্যের ক্রম বিকাশের সহিত সম্বন্ধ।

বর্ষেও সাধিত হয় না, তাহা এইরূপ একটি বিপ্লবের সংঘর্ষে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। রাজা রামমোহনের গদ্য হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রী-সম্পন্ন গদ্য পর্য্যন্ত, মাত্র কয়েকবৎসরের ব্যবধান, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা পাঠককে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

নূতন যে পুরাতনের উপর অধিকাংশ স্থলে জয়লাভ করে, তাহার কারণ এই যে পরিবর্ত্তিত যুগের পক্ষে নূতন অধিকতর উপযোগী। পুরাতন সর্ব্বদা অচল ও অটল; সমাজ ও চিন্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন অগ্রসর হইতে পারে না। নবভাবা-লোকপ্রাপ্ত জাতির নূতন আবশ্যক পূর্ণ করিবার জন্য পুরাতন সকল সময়ে আগ্রহ দেখাইতে পারে না। পুরাতনের এই অন্তর্নিমগ্নতার জন্য, নূতন অভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতনত্বেরও আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। এই জন্য যখন ঐশ্বর্য্যময়ী ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য হইতে, আমাদের সাহিত্যে প্রথম ভাবস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন সেই নবজীবনের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, নূতন বিধি ও নূতন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হইয়াছিল। এবং সেইজন্যও সে যুগে এত নূতন সৃষ্টির সম্ভবও হইয়াছিল। ভাষা ও সাহিত্য এত অসাধারণ ও ক্রমবর্দ্ধনশীল বেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়াছিল, যে শতবর্ষ ধরিয়াও যে বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি স্বপ্নের অতীত ছিল, তাহা এই বিপ্লবের মুখে একদিনে সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের আপাতনির্জ্জীব দেহে যে কত অসাধারণ শক্তি লুপ্ত ছিল, তাহা এতদিনে বুঝা গেল।

নূতন ও পুরাতন, উভয়ের সামঞ্জস্যই সাহিত্য ও সমাজের উন্নতির উপায়।

কিন্তু পুরাতনের উপর বিদ্রোহী নূতনের জয় লাভ কখনও সম্পূর্ণ হয় না। নূতনত্বের চাকচিক্যে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া অনেক সময় আমরা তাহার এত পক্ষ-পাতী হইয়া দাঁড়াই, যে পুরাতনের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও আমাদের ঘৃণা বোধ হয়, নব্যবঙ্গের ইতিহাসেও এমন একটি দিন গিয়াছিল। ডিরোজীওর ছাত্রগণ একদিন "ring out the false, ring in the true" বলিয়া পুরাতন অতীতকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহা পুরাতন তাহাই যে মন্দ এমন কিছু নহে; সেই জন্য পুরাতনকে সকল সময় আমরা তাড়াইতে পারি না, এবং এরূপ তাড়ানও বাঞ্ছনীয় নহে। ডিরোজিওর পরবর্ত্তী যুগের ছাত্রগণ এই একদেশদর্শিতার ভ্রম অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পুরাতনকে

একেবারে তাড়াইলে চলিবে না; অতীতের আলোকে ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে; পুরাতনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নূতনকে অনেকটা পুরাতনের অনুযায়ী করিয়া লইতে হইবে। উভয়দিকেই কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন। এইরূপ যুগে যুগে পুরাতনকে নূতনের দ্বারা ও নূতনকে পুরাতনের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া আসিতে হইতেছে; এবং এইরূপেই সাহিত্য ও সমাজের উন্নতি সম্ভব হইয়া থাকে।

ভাবজগতে এই বিরাট বিপ্লবের অংশস্বরূপ দীনবন্ধুরও লেখা সাহিত্যের একটি দিকে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু এই বিপ্লব যুগান্তকারী হইলেও, অতীতের বন্ধন একেবার ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের সহিত দীনবন্ধুর প্রভেদ বিস্তর, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য যে একেবারে নাই একথাও বলা যায় না।

দীনবন্ধুর রচনা যুগান্তকারী হইলেও অতীতের সহিত বন্ধন ছিন্ন করে না।

পুরাতন সাহিত্য ও সমাজের শেষ কবি ঈশ্বরগুপ্তের সহিত দীনবন্ধুর যে নিকট সম্বন্ধ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই এক্ষেত্রে অতীতের সহিত দীনবন্ধুর অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র। ইংলণ্ডের বিপুল সাহিত্য যখন একদিন বর্ত্তমান যুগের নূতন আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ মস্তকে বহন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সম্মুখে আবির্ভূত হইল, সে একটি চিরস্মরণীয় দিন। কারণ উহা নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল। কিন্তু যে নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহা আমাদের দেশের জিনিস নহে, তাহা বিজাতীয়। সেই জন্য যাহা পুরাতন তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টা সমগ্রজাতির মধ্যে জাগিয়া উঠিল। এই সমাজরক্ষণকারী স্থিতিশীল দলের নেতা—প্রদীপ্ত প্রভাকরের ন্যায় প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র। দীনবন্ধুও দেখিলেন যে নূতনত্বের স্রোতে পড়িয়া, দেশের অনেক প্রাচীন সুপ্রথা ভাসিয়া যাইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার মোহে পড়িয়া নব্যযুবকগণ আহারে ব্যবহারে ও বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে, ডাহা সাহেব হইবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। ইংরাজীকে মাতৃভাষায় পরিণত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায়, তাঁহারা যে কেবল ইংরাজীতে বলিতে ও লিখিতে আরম্ভ করিলেন তাহা নহে, নিমচাঁদের মত ইংরাজীতে ভাবিবার ও স্বপ্ন দেখিবার দুরাশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। নূতনত্বের মোহে পড়িয়া অনেক দেশে ও অনেক যুগে ইহা অপেক্ষা অধিকতর

অতীতের সহিত দীনবন্ধুর যোগসূত্র।

দুর্বুদ্ধিতা আচরিত হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু দীনবন্ধু দেখিলেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই চিত্তবিপর্য্যয় কোনও মতে সুফলপ্রদায়ি নহে। একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার "মোটা লাঠী" * লইয়া অন্যদিকে তাঁহার সাকরেদ দীনবন্ধু ডাক্তারের মত "সরু ল্যানসেট" খানি বাহির করিয়া সমাজ দেহের এই অত্যধিক রক্তপ্রাবল্যের প্রশমনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। কেবল আইনবলে বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নহে; কুপ্রথাগুলি লোকের চক্ষু ফুটাইয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। এই জন্য ব্যাঙ্গকবি ঈশ্বরগুপ্ত ও হাস্যরসিক দীনবন্ধুর আবির্ভাব।

ঈশ্বরচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়েই বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীর হ্যাটকোট পরিয়া সাহেব হওয়া, অথবা বাঙ্গালা সমাজে টম্, ডিক্, হ্যারীর আমদানী করা, কোনও কাজের কথা নহে, বরং অনিষ্টকর। সে কেবল ঈসপবর্ণিত ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের গল্পের মত হাস্যাস্পদ বিড়ম্বনা। বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের দিনে জন্মিয়াও, দীনবন্ধু ভুলেন নাই যে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বটুকু হারাইলে চলিবে না। তেমনি আবার আমাদের সাহিত্যে যে টুকু খাঁটী বাঙ্গালা সুর আছে, তাহা হারাইলেও চলিবে না। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা, ও বর্ত্তমানের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, এ উভয়ই বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা বিজাতীয়, যাহা কৃত্রিম, তাহা মনোহর হইলেও কখনও জাতীয় সাহিত্যের বা জাতীয় জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমাদের সাহিত্য বা আমাদের সভ্যতার যেটুকু নিজস্ব জিনিস, তাহার অভাব কখনও কৃত্রিম শিল্পের মনোহারিতায় পূর্ণ হইতে পারে না। নূতন সভ্যতার প্রধান গোঁড়া মাইকেলও একদিন খাঁটী সাহেব হইয়া, এবিষয়ে আপনার ভ্রম পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

নূতন আদর্শ ও দীনবন্ধুর রচনা।

কিন্তু নূতনকে যেমন সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, তেমনি পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। প্রাচীন সমাজ যে সমস্ত বিষয়েই ভাল ছিল, তাহা নহে; পরন্তু নব্যবঙ্গের পাপ ও নির্বুদ্ধিতার ন্যায় প্রাচীন সমাজে অসাধুতা ও ভণ্ডামি যথেষ্ট ছিল। চিত্রের এই দুইটি দিক, মাইকেল তাঁহার দুইটি প্রহসনে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। মাইকেলের ন্যায়, দীনবন্ধুও বুঝিয়াছিলেন যে, যেমন বাঙ্গালীর

* বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

হ্যাট কোট পরিয়া সাহেব হওয়া বিড়ম্বনা, তেমনি আবার আধুনিক সমাজকে নৈমিষারণ্যবাসী হিন্দুদিগের সমাজের আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টাও বিফল। এখানকার সমাজের অবস্থা তখন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুরাতনকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু পুরাতনকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করাও যায় না। দূরদর্শী দীনবন্ধু দেখিয়াছিলেন যে পুরাতনকে লইয়া বসিয়া থাকা কোনও কাজের কথা নহে; তাহা হইলে জগতের সমস্ত অন্যান্য জাতির সহিত আমরা এক সঙ্গে কিরূপে অগ্রসর হইতে পারিব? এই জন্যই প্রাচীন আদর্শ নূতন আদর্শের দ্বারা অভিনব ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া, আমাদের জাতীয় আদর্শের নির্দ্দেশ করা উচিত। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সেই পরিবর্ত্তন যুগের অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় দীনবন্ধুও এরূপ নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নূতনকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু পুরাতনকে ত্যাগ করিলেন না। এই খানেই তাঁহার মহত্ব ও দূরদর্শীতা।

পুরাতনকে বর্জ্জন না করিয়া, নূতনকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই দীনবন্ধুর রচনাবলী আধুনিক যুগে এত উপভোগ্য। নূতনত্বের বিচিত্রতা ও অসীমতার সহিত পুরাতনের চির পরিচিত সুরটুকু বড় মিষ্ট লাগে। যাহা অভ্যস্ত, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা চিরকাল মর্ম্মস্পর্শী; তাহার উপর নূতনত্বের আস্বাদ দ্বিগুণ মধুর ও মনোহারী।

পুরাতনকে বর্জ্জন না করিয়া নূতনকে গ্রহণ।

এইরূপ পুরাতনের দিকে চাহিয়াই, দীনবন্ধু নূতন আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমরা পূর্ব্বে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যে অতীতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সাহিত্যের ভিতর দিয়া নহে। প্রাচীন সাহিত্যের নিকট দীনবন্ধুকে কোন প্রকারেই ঋণী বলা যাইতে পারে না। তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য, তাহার জাতীয়তাই তাঁহাকে অতীতের সহিত যোগসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। একদিকে যেমন আপন সমাজ, আপন জাতি, ও আপন ধর্ম্মকে তিনি ভালবাসিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে আপন ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। খাঁটী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব টুকু যে বিশেষরূপে স্পৃহনীয়, তাহা তিনি ঈশ্বরগুপ্তকে সাহিত্যগুরু পদে বরণ করিয়া স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। একদিন বঙ্কিমবাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজিকার দিনের অভিনব ও উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—

দীনবন্ধুর জাতীয়তাই অতীতের সহিত তাহার বন্ধনসূত্র।

হৌক সুন্দর কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায় খাঁটী বাঙ্গালীর মনের ভাবত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"* আত্মসখা বঙ্কিমচন্দ্রের এ মর্ম্মবেদনা দীনবন্ধুও অনুভব করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অতি দুঃসময়ে, বিদেশী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াও, তিনি আপাতঅবজ্ঞাত দুঃখিনী মাতৃ স্থানীয় মাতৃ ভাষাকে ভুলিতে পারেন নাই। কেবল ভাষা নহে, বাঙ্গালী জাতিকেও তিনি ভালবাসিতেন। তিনি বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়াছেন সত্য, তাঁহার নাটকে প্রহসনে বাঙ্গালীকে হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু সে শুধু বাঙ্গালীর মঙ্গলের জন্য। তিনি আত্মশক্তিকে সকলের উপর স্থান দিতেন, সেই জন্য ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এই ঘৃণার সহিত একটু আক্ষেপ একটু আন্তরিক বেদনাও কি অনুস্যূত নাই? আপনার অধঃপতনের চিত্র আপনি দেখিয়া যাহাতে বাঙ্গালী পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সমস্ত ব্যঙ্গ উপহাসের ইহাই মূলমন্ত্র ছিল। বাঙ্গালার অধঃপতনে তিনি আপনিও ব্যথিত হইতেন। এই বেদনাগ্নি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার হৃদয় মধ্যে বিরাজ করিত বলিয়াই তাঁহার লেখনীর মুখে ওরূপ তীব্র জ্বালাময় বাক্যবান ছুটিত।

তাহা হইলে অতীতের সহিত দীনবন্ধুর যে সম্বন্ধ তাহা শুধু প্রাচীন রচনার আদর্শানুসরণে পর্য্যবসিত হয় নাই; তাঁহার জাতীয়তাই এই বন্ধনসূত্র।

প্রাচীন সাহিত্যের নিকট দীনবন্ধুর স্বল্প ঋণ, তাহার কারণ।

বাস্তবিক, প্রাচীন আদর্শ প্রাচীন যুগের অনুযায়ী, তাহা আধুনিক যুগে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা যায় না। তাহা ছাড়া, আদ্যন্ত ছন্দোময়ী কবিতায় গ্রথিত প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরসের রচনার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য হাস্যরসের রচনার আদর্শ দীনবন্ধু প্রাচীন সাহিত্যে কোথায় পাইবেন? অত্যধিক ধর্ম্মের আড়ম্বরে মনের লঘুত্বটুকু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপাদির আবরণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ পাপপুণ্যময় প্রকৃত মানব চরিত্রের অঙ্কন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইলেও ধর্ম্মবিশ্বাসের যূপমূলে প্রাচীন গ্রন্থকার এ সমস্ত অক্লেশে বলিদান দিতে পারিতেন। লেখকের সমস্ত উদ্ভাবিনী শক্তি, সামাজিক

* ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের মুখবন্ধ।

জীবন-বর্জ্জিত সহস্র নিয়মজালজড়িত এক বর্ণহীন ধর্ম্মসাধনার জন্য ব্যয়িত হইত; হাস্যরস বা অন্যবিধ রচনার জন্য যৎসামান্য বাকি থাকিত কিনা সন্দেহ। সমাজ জীবনের ভুলভ্রান্তি পাপপুণ্য,ইহাই হাস্যরসিক কবির রচনার উপাদানস্বরূপ,কিন্তু যেস্থলে ধর্ম্ম বা উপ ধর্ম্মের প্রাবল্যে, সাহিত্য জাতির সামাজিক জীবন হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছিল, সেখানে হাস্যরসিকের রহস্য পটুতার প্রসর কোথায়? একদিকে ধর্ম্মের পুণ্যস্রোত ভক্তিরসাপ্লুত কবি হৃদয়কে তারল্যে মাধুর্য্যে ভাসাইয়া ডুবাইয়া ভগবৎপ্রেমের পথে লইয়া যাইত, অন্যদিকে শত সহস্র নিয়ম ও দেশাচারের বেড়াজাল সমাজ জীবনকে ক্ষুদ্র আয়তনের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিত। হাস্যরসে যে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের প্রতিভা ফুটিতে পায় নাই, তাহার কারণ তাঁহাদের প্রতিভার সঙ্কীর্ণতা নহে, তৎকালীন বঙ্গসামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রায়তন। যদি তাঁহাদের প্রতিভা সঙ্কীর্ণপ্রসর হইত, তাহা হইলে যেটুকু হাস্যরস অশেষ বাধাসত্ত্বেও আমরা পাইয়াছি, তাহাও পাইতাম না। কিন্তু সাহিত্যের চিরাগত নীতিপাশ তাঁহারা ছিন্ন করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাদের সাহিত্যও তাঁহাদের এই অলঙ্ঘনীয় ধর্ম্ম ও সমাজের অংশ স্বরূপ ছিল।

হাস্যরস সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের দরিদ্রতা।

হাস্যরস সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে এই একান্ত অভাব দীনবন্ধুও দেখিয়াছিলেন, এই অভাব পূরণের জন্য তিনি ইউরোপের বিশাল সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতিরেকে, জাতির উন্নতি অসম্ভব, এবং আদর্শগ্রহণ ও কলানৈপুণ্য শিক্ষার জন্য এইরূপ বিজাতীয় সাহিত্যের সাহায্য লওয়া কিছু অগৌরবের বিষয় নহে। সাহিত্যকে সমাজের উন্নতিমুখী গতির সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে; হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিদেশী সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, "অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য" লেখকদিগের গ্রন্থে যে ইউরোপীয় ভাবের ছায়া আছে, তাহা অস্বাভাবিক ও বাঙ্গালী প্রকৃতির বিরোধী বলিয়া কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এ কথা ভুলিলে চলিবে না, যে যেদিন দীনবন্ধু সাহিত্য আসরে নামিয়াছিলেন, সেদিন আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আপনার সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি ঢালিয়া দিয়াছিল। সেই সময় আমাদের সাহিত্য যদি নূতন ভাবগ্রহণে

এই দৈন্য বিমোচনের জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যের নিকট দীনবন্ধুর ঋণ।

উন্মুখতা না দেখাইত, তাহা হইলে সে আজ এত সমৃদ্ধিশালী না হইয়া শুধু স্মৃতিমাত্রাবশেষ হইয়া থাকিত। ইউরোপীয় সাহিত্যের সাহায্য লইয়াছিল বলিয়াই আজ আমাদের সাহিত্য এত বিশাল ও ওজস্বী, এ কথা কোনও মতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না, এবং এরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত বিষয়ের আলোচনাও আজকালকার দিনে নিষ্প্রয়োজন।

বিদেশী সাহিত্যের নিকট সাহায্য গ্রহণ কতটা বাঞ্ছনীয়।

আর একটি কথা। সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে দীনবন্ধু সমস্ত জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এমত নহে। এই জন্যই তাঁহার এরূপ সাহায্যগ্রহণ এত সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। একজাতি যখন অন্য কোন জাতির নিকট কিছু গ্রহণ করে, তাহা যদি আত্মপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা স্পৃহনীয় আর কিছুই নাই। এরূপ জাতি ধন্য! কারণ সে জাতির উন্নতির পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত। ইউরোপের নবযুগের প্রাক্‌কালে এলিজাবেথান্ লেখকগণ যে গ্রীক ও ইতালীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সেক্সপীয়র ও তৎসহযোগীবর্গের পরম গৌরবের পরিচায়ক।

এলিজাবেথান্ যুগের ন্যায় দীনবন্ধুর যুগও একটা সৃষ্টি বা গঠনের যুগ। ইংরাজী সাহিত্য যেরূপ গ্রীক্ ও ল্যাটিনের সঞ্জীবনীমন্ত্রে বহু শতাব্দীর তিমির-জাল ছিন্ন করিয়া, নব দীক্ষায় ও নব জাগরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক আমাদের নিৰ্জ্জীব সাহিত্যকে নব উদ্দীপনায়, নব আশার স্বপ্নে উদ্বোধিত করিয়া, নব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন যুগের যে কয়েকটি মহাত্মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির দৈন্য-বিমোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া, এক অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। এই সকল প্রতিভাশালী লেখক তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আদর্শের সাহায্য পান নাই, বা যাহা পাইয়াছিলেন তাহা অতি সামান্য। আপনার হৃদয়-মন্দিরে মাতৃভাষার যে স্বর্ণময়ী অভীপ্সিত প্রতিমা ভক্তি ও কল্পনার নেত্রে দেখিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত জীবনের চেষ্টা ও যত্ন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর যুগ একটা সৃষ্টি বা গঠনের যুগ।

এই মাতৃসেবাব্রত আত্মত্যাগী মহাত্মাদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আসন সকলের উপরে। নবযুগের আদর্শ, বোধ হয় রাজা রামমোহন ভিন্ন আর কাহারও

নেত্রে, এত সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় নাই। জাতির ভাব ও অভাব, উন্নতি ও অবনতি, রাজনীতিও সমাজচিন্তা, ধর্ম্ম ও আচার, আশা ও আকাঙ্ক্ষা—আর কেহই এত সমগ্ররূপে বুঝিতে পারে নাই, এবং প্রতিভার পূর্ণজ্যোতির অধিকার বোধ হয় আর কোথাও এত হয় নাই। এই জন্য যখন ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু প্রভৃতি, তাঁহাদের নাটক প্রহসনে কবিতায় সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত জাতির অধঃপতনের চিত্র আঁকিয়া তাহাদের চক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বঙ্কিম দেখিলেন যে এরূপ স্বভাব অঙ্কন (Realism) অপেক্ষা উন্নত আদর্শ-সৃষ্টি (Idealism) বেশী উপযোগী হইবে। বর্ত্তমান লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ভবিষ্যতের আদর্শও গড়িয়া লইতে হইবে। অধঃপতিত জাতিকে অনবরত তাহাদের অধঃপতনের চিত্র দেখাইলে, ক্রমে তাহারা নির্জ্জীব ও ভরসাহীন হইয়া পড়িবে। এই জন্য Satire তিনি ছাড়িয়া Romance ধরিলেন; Fact ছাড়িয়া Fiction লইলেন; Realism ছাড়িয়া Idealism এর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই গঠন কার্য্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও

কিন্তু Fact বা realism এরও উপযোগিতা আছে। সমাজের তখন ঘোর দুরবস্থা। প্রাচীন আদর্শ ইংরাজী আদর্শের সংঘর্ষে চুরমার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও নূতন আদর্শের সৃষ্টি হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত আদর্শের সৃষ্টি না হয়, ততদিন সমাজকে কে রক্ষা করিবে? নবশিক্ষায় উদ্ধতীকৃত নব্যবঙ্গের যুবক, পাশ্চাত্য আদর্শকেই আপনার আদর্শ করিয়া লইতে অন্ধ আবেগে ধাবিত হইলেন। দেশের কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে খড়্গহস্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝিলেন না যে এরূপ মূলোচ্ছেদে সমাজের দৃঢ় ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। কুপ্রথার সহিত দেশের সুপ্রথাগুলিও ভাসিয়া যাইবে, ও আমাদের যাহা কিছু জাতীয় ভাব ও জাতীয় স্পর্দ্ধার জিনিষ আছে, তাহা আর থাকিবে না। এই ভুল বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যঙ্গাত্মক রচনার (Satire) বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যই ঈশ্বরগুপ্তের "মোটা লাঠী" ও দীনবন্ধুর "সরু ল্যান্‌সেট", উভয়েরই প্রয়োজন হইয়াছিল। যে জাতি বা সমাজ ধ্বংসের মুখে ছুটিতেছে, তাহার সম্মুখে আদর্শসৃষ্টির প্রসার কোথায়? আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাহাকে ফিরাইতে হইবে, তবেত সে তোমার কথা শুনিবে। প্রথমে Satire তারপর Romance, প্রথমে Fact তারপর Fic-

দীনবন্ধুর কৃতিত্ব। উভয়ের কার্য্য পরস্পরের পরিপোষক।

পরিবর্ত্তন-যুগে স্বভাব-অঙ্কন ও ব্যঙ্গ রচনার আবশ্যকতা।

tion. এই হিসাবে দীনবন্ধুর কার্য্য বঙ্কিমের অগ্রগামী। দীনবন্ধু যাহা অসমাপ্ত রাখিয়াছেন, অথবা যাহা সমাপ্ত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়েই অসামান্য প্রতিভা লইয়া, পরিবর্ত্তন-যুগের গঠন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আধুনিক সাহিত্যে কৌতুক রচনার স্বাতন্ত্র্য।

শুধু সাহিত্যের গঠন হিসাবে ধরিলেও, আমরা দেখিয়াছি যে সাবেক সাহিত্যে হাস্যরসের রচনা বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র জিনিস ছিল না; দীনবন্ধুই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে যদিও দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক, মাইকেল ও টেকচাঁদ, এই পথে গমনের উদ্যম করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের বহুমুখী প্রতিভা এ বিষয়ে বদ্ধ ছিল না। হাস্যরসের রচনা মুখ্যতঃ উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজচিত্রের হিসাবে মাইকেলের রচনা অদ্বিতীয় হইলেও হাস্যরসের রচনা বলিয়া ধরিলে দীনবন্ধুর সৃষ্ট চিত্রগুলির নিকট হীনপ্রভ হইয়া যায়। টেকচাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ভাষার সংস্কার ও সরল গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা ও চরিত্রাঙ্কন। হাস্যরসের স্ফূর্ত্তি দেখা যাইলেও, তাঁহার গল্পগুলিকে নিছক হাস্যরসের রচনা বলিয়া ধরিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে। এরূপ কোনও আপত্তি দীনবন্ধুর বিষয়ে উঠিতে পারে না। মাইকেল বা টেক-চাঁদের ন্যায়, দীনবন্ধুর বহুমুখী প্রতিভা ছিল না; তাঁহার গ্রন্থাবলী শুধু কৌতুক-রচনায় সীমাবদ্ধ এবং সেইজন্য নিছক হাস্যরসের ফোয়ারা বলিলেও হয়। নামে "হাস্যাবতার", কার্য্যতঃ ও তিনি তাহাই ছিলেন; এবং তাঁহার আজীবন সেবা ও যত্ন তিনি এই শ্রেণীর রচনার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মাই-কেল দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন, ও টেকচাঁদ একটি উৎকৃষ্ট হাস্যরসাত্মক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীনবন্ধুই প্রথম হাস্যরসের রচনাকে সাহিত্যের গৌরবাস্পদ পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। মাইকেলের ন্যায় তিনি কোন দিন আপনার নাটকগুলি উল্লেখ করিয়া বলেন নাই—"I now half regret having published them পরন্তু তাঁহারই লেখার গৌরবে হাস্যরসের রচনা আজ বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় বিষয় নহে। "আলালের ঘরের দুলালে" বা "বুড়ো শালিকে" নিছক হাস্যরসাত্মক রচনার সূত্রপাত ধরিলে, "জামাইবারিকে" তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি।

কিন্তু এই হাস্যরসের রুচি, পূর্ব্বতন সাহিত্যের রুচির অপেক্ষা, সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত। বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্ত" হইতে আরম্ভ করিয়া, হাতনাগাদ "বিরহ"

"ছাইভস্ম," "ফোয়ারা" পর্য্যন্ত, এই কয়েকবৎসরের কৌতুক রচনায় যে নির্দ্দোষ প্রীতিপ্রফুল্ল অসূয়াক্রোধসম্পর্কশূন্য কারুণ্যধারার উচ্ছ্বলিত অবাধ উদার হাস্যরসের সৃষ্টি দেখা যায়, তাহা সেকালের লেখকেরা কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। হাস্যরসে রুচি বিশুদ্ধ হইবার জন্য দুইটি বিষয় দরকার; প্রথমতঃ, উচ্চ সাহিত্যিক আদর্শ, দ্বিতীয়তঃ, এক দল উন্নত শিক্ষিত পাঠক সম্প্রদায়। উচ্চ সাহিত্যিক আদর্শ অর্থে আমরা নৈতিক আদর্শের কথা বলিতেছি না। সেটা থাকাত নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা ছাড়া, পূর্ব্বে যে সেকালের "মোটা কাজের" তুলনায় একালের "সরু কাজের" উল্লেখ করিয়াছি, এ স্থলে আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। নৈতিক আদর্শও যে খুব উচ্চ ছিল, এ কথা আসম্বাদিত রূপে বলা যায় না। কারণ, চিত্তের স্বাধীনতা বা চরিত্রের স্থৈর্য্য অপেক্ষা, দেবদেবীর প্রসাদের উপর নির্ভর করা প্রচলিত বিশ্বাসের উদ্দিষ্ট ছিল। দেবদেবীর মাহাত্ম্যের নিকট মনুষ্যের পুরুষকারকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই জন্য কালকেতুর ন্যায় উন্নত চরিত্রকেও কবিকঙ্কন ভীরুতা ও কলঙ্কের হাত হইতে বাঁচাইতে পারেন নাই। তারপর পাঠক সম্প্রদায়ের কথা। সেকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষাসেবী পণ্ডিত মণ্ডলীকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত বঙ্গভাষা যদিও সময় সময় কবিকুলের নিকট ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী পাইত, তথাপি অর্দ্ধ নিরক্ষর জনসাধারণের চিত্তবিনোদই তাহার এক মাত্র কার্য্য ছিল।* সমাজের যাঁহারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁহারা দেশীয় সাহিত্যের আদর জানিতেন না। প্রাচীন সাহিত্যে যে রুচির বিকার দেখা যায়, তাহা এই সব কারণে অনেকটা প্রশ্রয় পাইয়াছিল। তারপর কৃষ্ণচন্দ্রের যুগে যে অশ্লীলতার স্রোত সাহিত্যে আসিয়াছিল, তাহার জের আমরা কবিওয়ালা ও ঈশ্বর গুপ্তের যুগ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। এই বিকৃত রুচির গভীর পঙ্ক হইতে বঙ্গ সাহিত্যকে উদ্ধার করা কম গৌরবের বিষয় নহে; এবং এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন নহে।

আধুনিক সাহিত্যে হাস্যরসের রুচি।

---

* The more cultured ranks of our society, under Hindu rule, delighted in the study of classical Sanscrit; during the Mahommedan rule, Arabic and Persian were added to this; and the vernacular literature deemed it always a great honour and privilege if it could only now and then obtain an approving nod from the aristocracy. This perhaps accounts for the somewhat vulgar humour which characterises old Bengali writing. (Dinesh Chandra Sen, Preface to the *History of Bengali Literature.*)

আমরা আরও দেখিয়াছি যে প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরস অনেক বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িয়া মারা যাইত। কিন্তু এই বাঁধাবাঁধিটা সময় গুণে ক্রমশঃ একটু শিথিল হইয়া আসিতেছিল। আমরা দেখিয়াছি গুপ্ত কবি ও অন্যান্য কবিওয়ালার নিকট এ সমস্ত বাঁধাবাঁধি কিছুই খাটিত না। তাঁহাদের হস্তে পাঁটা, তপ্‌সে মাছ, গোল আলু হইতে দেহতত্ত্ব ভগবৎমাহাত্ম্য পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, তাঁহাদের পরিহাসের বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কীর্ত্তি অন্য সকলের কীর্ত্তিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। শুধু কতকগুলি ছোট ছোট বিষয় বা ঘটনা লইয়া কৌতুক করা নয়, দীনবন্ধু হইতে আমরা সমগ্র জীবনটা একটা কৌতুকের চক্ষে বা কৌতুকের হিসাবে দেখিতে শিখিয়াছি। যে মহাত্মা আমাদের এই কর্ম্মভারাক্রান্ত দাসত্বময় দুঃখপূর্ণ জীবনকেও হাস্যরসের স্নিগ্ধ রেখাপাতে সমুজ্জল করিয়া দেখাইত পারেন, তিনি অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সুখ দুঃখ, ভয় বিস্ময়, ভুল ভ্রান্তি, প্রতিদিনের অগনিত আশা ও নিরাশা তিনি কিরূপ কৌতুকনেত্রে দেখিতেন, ও কবি হৃদয়ের অপরিমিত সহানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে এক নূতন জীবন দান করিতেন, সে সমস্ত বিবৃত করিয়া দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। তাঁহার এ কীর্ত্তির পরিচয় দিতে হইলে, তাঁহার নাট্যকলারও কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আধুনিক কৌতুক সাহিত্যের বিস্তৃততর প্রসর।

দীনবন্ধুর হাস্যরসের সহিত তাঁহার নাট্যকলার সম্বন্ধ।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

বৈপরীত্য।

জন্মান্ধ লভিয়া দৃষ্টি বলে—কি বাহার!
কি সুখে(ই) বঞ্চিত ছিল নয়ন আমার!
চক্ষুষ্মান্ চক্ষু মুদে' বলে, চমৎকার!
কি অগাধ শান্তি এই আঁধার মাঝার!

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

প্রসাদী-সঙ্গীত।

"প্রসাদী সঙ্গীত" নানাবিধ ভক্তিভাবের বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি নহে। ইহাতে একজন পরিপূর্ণ সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনের সমগ্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, ইহাতে ভক্তি বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্পফলসুশোভিত পরিণত অবস্থা পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন জীবন্ত-আলেখ্য, অপূর্ব্ব-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া "প্রসাদী সঙ্গীতে" মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের অসংখ্য অমূল্যতত্ত্ব প্রসঙ্গ ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঐ তত্ত্বগুলি একস্থ করিয়া অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে উহা হইতে রাম-প্রসাদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

প্রসাদী সঙ্গীত রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস।

রামপ্রসাদ ভক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে শাক্ত সাধকগণ সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতিপুরুষবাদকে ভিত্তি করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে শক্তি উপাসনার মর্ম্ম তাহা নহে, শাক্তগণের উপাস্যা আদ্যাশক্তি প্রকৃতি পুরুষ উভয়াত্মিকা। বেদান্ত দর্শন ঈশ্বর সংজ্ঞা দ্বারা ব্রহ্মের যে মায়োপহিত চৈতন্যের অবস্থা প্রতিপাদন করিয়াছেন শক্তি উপাসকগণের আরাধ্য দেবতাও মূলতঃ তাহাই। শাস্ত্র হইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণ সংগ্রহ করা অপ্রা-সাঙ্গিক; তবে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলেই আদ্যাশক্তি যে চৈতন্যরূপিণী তাহা বুঝিতে পারাযায়। রামপ্রসাদেরও তাঁহার অভীষ্ট দেবী সম্বন্ধে যে ঐরূপই ধারণা ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ হইতেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়;—

রামপ্রসাদের ধর্ম্মমত—শক্তি উপাসনার দার্শনিক ভিত্তি।

আদ্যাশক্তি জড়া প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়াত্মিকা।

"আগমনিগমাতীতা· খিলমাতা-খিল-পিতা
প্রকৃতি পুরুষ রূপিণী"

কালী কীর্ত্তনেও বলিয়াছেন;—

"তুরীয়া চৈতন্যরূপী বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা বাণী ভাবে যে দুহিতা॥"

অন্যত্র;—

"প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা॥"
কে জানে তোমায় মূল তুমি বিশ্বমূলা॥"

শুধু ইহাই নহে, রামপ্রসাদ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় শুদ্ধাদ্বৈত বাদী ছিলেন, তিনি পারমার্থিক ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি ভেদ স্বীকার করিতেন না। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া শক্তিমান্ ও শক্তি অথবা শিব ও শিবানী যে তত্ত্বতঃ এক অদ্বয় পরমার্থ স্বরূপ তাহা তিনি পরিস্ফুট ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন যথা ;—

রামপ্রসাদ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে শুদ্ধাদ্বৈত বাদী ছিলেন।

"অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদে ভাবে শিবা শিব ?
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী।"

তিনি বেদান্তের মুক্তিবাদ ও স্বীকার করিয়াছেন তবে ভক্তি মার্গের সাধকের পক্ষে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থনীয় নহে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিতেছেন ; —

মুক্তিবাদে বিশ্বাস সত্ত্বেও দ্বৈত ভক্তিতে স্বাভাবিক নিষ্ঠা।

"বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য ॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদামন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায় ॥"

এই বাক্যে রুচিভেদে উপাসনা ভেদ স্বীকার করাতে, রামপ্রসাদের ধর্ম্মমতে বিলক্ষণ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরমাত্মার এই অখণ্ড অদ্বয় অবস্থা বাক্য মনের অগোচর, মনুষ্যের ধারণাতীত। সুতরাং এই অবস্থায় পরম ব্রহ্মের সহিত সাধকের উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তাই করুণাময় পরমেশ্বর তত্ত্বতঃ মায়াতীত হইয়াও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই সনাতন মত ভক্ত রামপ্রসাদ তাহার সঙ্গীতে স্বল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন যথা ;—

পরমেশ্বরের মূর্ত্তি গ্রহণ তত্ত্ব।

"মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী।"

এই মূর্ত্ত্যুপাধি গ্রহণের মধ্যেও আবার বিশেষত্ব আছে। অনন্ত করুণাময় ভগবান ভক্তের ভাবতারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া উপাসকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যে ভক্ত যেরূপ প্রত্যক্ষ করেন তিনি সেই মূর্ত্তিকেই শিষ্য পরম্পরায় উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। রামপ্রসাদ স্বীয় গুরুর নিকট শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদিষ্ট

বাহ্যিক অনুষ্ঠান ত্যাগের অবস্থা।

মন্ত্রাদির লক্ষ্য কালীমূর্ত্তির আরাধনা করিতেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই ইষ্টমূর্ত্তি সনাতন সত্যরূপে সম্যক্‌ভাবে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ততদিন তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে ধাতু পাষাণ বা মাটির মূর্ত্তি গঠন করিয়া ধূপ্, দীপ্, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপহার যোগে ইষ্ট আরাধনা করিতেন এবং সেই মূর্ত্তির মধ্যে বিশ্বজননীর নিত্য অধিষ্ঠান অনুভব করিতেন। এইভাবে উপাসনা করিতে করিতে যখন ভক্ত সাধক বরাভয় প্রদায়িনী নৃমুণ্ডমালিনী কালিকা দেবীর ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, কালী-মূর্ত্তির ধ্যানে যখন তিনি সম্যক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন আর তাঁহার বিধি নিষেধের অধীনে থাকিয়া ধাতু পাষাণ অথবা মাটীর মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। ভাবোদ্দীপনার নিমিত্ত নৈবেদ্যাদির সংগ্রহের আর প্রয়োজন রহিল না। তিনি হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে আনন্দময়ীর আনন্দ স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আনন্দরসে ডুবিতে লাগিলেন। এই অবস্থা আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চিরাভ্যস্ত বাহ্যিক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইবার সময় অভ্যাসজনিত সংস্কার বশে একটা ত্রুটির ভাব অনুভব করিতেছিলেন। এই ত্রুটির ভাবও মনের মধ্যে না আসে, তজ্জন্য মনকে প্রবোধ দিয়া গান করিয়াছেন:—

বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় বাহ্যিক পূজা সম্বন্ধে উক্তি।

"মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে ব'স্‌রে ধ্যানে॥
জাক জমকে ক'র্‌লে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে ক'র্‌বে পূজা,
জান্‌বে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি,
কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি,
বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আল চাল আর পাকা কলা,
কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে,
তৃপ্তি কর আপন মনে॥" ইত্যাদি।

ঠিক এই ভাবেই আর এক সময় গাহিয়াছেন :—

"মন তোমার এই ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তাই চে'য়ে দেখনা॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি।
জে'নেও কি মন তা জাননা॥
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার।
ক'রতে চাও রে উপাসনা"॥ ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় তীর্থপর্য্যটন সম্বন্ধে উক্তি।

এই বিধি নিষেধের অতীত অবস্থায় তীর্থাদি পর্যাটনের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াও মাতৃসর্ব্বস্ব রামপ্রসাদ কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা এই ধরণের ;—

"আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী"॥ ইত্যাদি

অন্যত্র

"কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী"॥ ইত্যাদি

অথবা

"কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গায়িব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখতে পাব"॥ ইত্যাদি

অন্যত্র

নানা তীর্থ পর্যাটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে। প্রভৃতি।

দীনেশ বাবু ও রামপ্রসাদের ধর্ম্মমত।

বাহ্যিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ ব্যঞ্জক এই সকল সঙ্গীত হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রামপ্রসাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দীনেশ বাবুর রামপ্রসাদের ধর্ম্মমতের ঐক্য প্রদর্শন।

"রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য ছুঁইতে পারিয়া-

ছিলেন। "কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী" "নানাতীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে" প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থ যাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা"।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মনতার ক'রতে চাওরে উপাসনা ॥"
"ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।"

প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত গানের সঙ্গের রাজা রামমোহন রায়ের "আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার" প্রভৃতিগান একস্থলে রক্ষিত হইবার যোগ্য।" ইত্যাদি।

দীনেশ বাবুর উক্তির বিচার।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সকল ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন তৎ-সমুদয় প্রকৃত পক্ষে সুযুক্তি পূর্ণ কি না সে বিষয় বিচার করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবে ভক্ত রাম-প্রসাদের মূর্ত্তি গড়িয়া, পূজা পদ্ধতি অথবা তীর্থাদি গমন সম্বন্ধে উক্তিগুলি আপাত দৃষ্টিতে রামমোহন রায়ের উক্ত বিষয়ে প্রচারিত মতের অনুরূপ বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উভয়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তর প্রভেদ ছিল। প্রথমতঃ রামপ্রসাদ "মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া" এই উক্তি দ্বারা মূর্ত্তি পূজার ভিত্তি স্বরূপ পরমেশ্বরের আত্মমায়া-প্রভাবে মূর্ত্তিগ্রহণ বাদ স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি সে ভাবে উপাসনাও করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন রায় ইয়োরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রীয় ভক্তিযোগের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ ভগবানের বিশেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ একবারেই স্বীকার করিতেন না, সুতরাং উভয়ের উপাস্য ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

রামপ্রসাদের মূর্ত্তি স্বীকার।

রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রচার।

রামপ্রসাদ কোন অবস্থায়ই মূর্ত্ত্যুপাধি বিশিষ্টা, ভগবতীর রূপ ধ্যানের অতীত অবস্থায়ও যাইতে চাহেন নাই। সাধনার উন্নততম অবস্থায়ও গাহিয়াছেন ;

"আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী"

তিনি যে মাটীর মূর্ত্তির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মনোময়ী মূর্ত্তির ধ্যানে বিরত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা মতবাদ প্রচার করেন নাই ; তিনি ভক্তির যে উন্নততম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে বাহ্যিক কোনরূপ অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা

ছিল না সেই কথাই সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রাজা রামমোহন খ্রীষ্টীয় অথবা মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের অনুকরণে প্রতিমা গড়িয়া উপাসনা পদ্ধতি অথবা তথা-কথিত পৌত্তলিকতার প্রতি প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিগ্রহ সমন্বিত দেব মন্দিরের পরিবর্ত্তে নিরা-

রামপ্রসাদ ও রামমোহনের ধর্ম্ম মতের পার্থক্য।

কার ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রার্থনা মন্দির স্থাপন করিয়া হিন্দুর সাকার দেব দেবী উপাসনাকে পৌত্ত-লিকের বহু ঈশ্বরের পূজা মনে করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ দেব মন্দির মধ্যে পূজকের বেশে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিগ্রহ যে অপরূপ রূপের ছায়া মাত্র সেই বিশ্ব বিমোহন মূর্ত্তির হৃদয়াভ্যন্তরে নিত্য অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়া বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যমূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত আর আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, এই মাত্র। রামপ্রসাদের ভক্তি বৃক্ষের পক্বপত্র প্রকৃতির নিয়মানুসারেই বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক রাজা রামমোহন হিন্দুর উপাসনা বৃক্ষের জীবন স্বরূপ,অঙ্কুরোদ্গম কালের বিগ্রহ পূজা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান রূপ পত্রদ্বয় বিদেশীয় অস্ত্রে ছেদন করিয়া তৎস্থানে হিন্দু জাতির স্বাভাবিক রুচির প্রতিকূল উপাসনা পদ্ধতিরূপ কৃত্রিম পত্র সংযোজিত করিয়া বৃক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ভক্ত রামপ্রসাদ প্রেমস্নিগ্ধহৃদয়ে অনুভূতি বলে যে সত্য রাজ্য ছুঁইতে পারিয়াছিলেন, রামমোহন রায় যে পরবর্ত্তী কালে "গভীর শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা" সেই একই রাজ্য স্পর্শ করিতে পারেন নাই ইহা সাহস

তীর্থ পর্য্যটন বিষয় দীনেশ বাবুর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে উক্তির সমালোচনা।

করিয়াই বলা যাইতে পারে। তীর্থাদি পর্য্যটন বিষয়ে লৌকিক আস্থার প্রতি কটাক্ষপাত বিষয়েও দীনেশ বাবুর মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামপ্রসাদের "আমি কবে কাশী বাসী হব সেই আনন্দ কাননে গিয়ে নিরা-নন্দ নিবারিব।"

গঙ্গা জল বিল্ব দলে বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারানসীর জলে স্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব"।

অথবা "অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী" প্রভৃতি সঙ্গীতের সঙ্গে দীনেশ বাবুর উদ্ধৃত "কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী" প্রভৃতি শীর্ষক গান কয়টি মিলাইয়া পাঠ করিলে রামপ্রসাদ-তীর্থ যাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রাত কটাক্ষ করিয়াছিলেন" এই রূপ সিদ্ধান্ত অন্ধসংস্কারপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। রাম প্রসাদ কোন্

অবস্থায় ঐ সকল উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উহাদের প্রকৃত মর্ম্মার্থ কি তাহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

শাস্ত্র বিশ্বাস সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর উক্তির সমালোচনা।

দীনেশ বাবুর উদ্ধৃত "বেদে দিল চক্ষে ধূলা" ষড় দর্শনের এই অন্ধ গুলা, অথবা ঐরূপ ষড় দর্শনে না পায় দরশন, প্রভৃতি পদেও রামপ্রসাদ শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ পাত করেন নাই। উপনিষদে "ন বহুনা শ্রুতেন" অর্থাৎ বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না, ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্র সম্বন্ধে যে রূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, রাম প্রসাদের শাস্ত্র বিষয়ক পদ গুলিতেও তদনুরূপ মতই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক দীনেশ বাবু কাক-তালীয় ন্যায় অবলম্বনে রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরের সহিত রাম মোহন রায়ের জন্ম বৎসরের ঐক্য দেখিয়া যাহাই সিদ্ধান্ত করুন না কেন, রামপ্রসাদের সঙ্গীত আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাসের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মত প্রচারক রূপে ধরিতে পারিলাম না!

প্রসাদী সঙ্গীতে বৈদান্তিক জীবতত্ত্ব।

প্রসাদী সঙ্গীত আমরা বেদান্ত দর্শনানুমোদিত পরমাত্মার অন্তর্য্যামী রূপে প্রতি জীব দেহ অবস্থান তত্ত্বের উল্লেখও দেখিতে পাই।

"তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন
কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে;"

প্রভৃতি বহুপদে পূর্ব্বোক্ত বৈদান্তিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ।

জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে ও রামপ্রসাদ স্পষ্ট বাক্যে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

জন্মান্তর সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে মানব ঘরে ফেরা ঘোরা"

অন্যত্র

"আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি পশু পক্ষী আদি যত
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলেম হত"

কর্ম্মসূত্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন কেবা পাবে তার বাড়া
মিছে এদেশ সে দেশ ঘুরে বেড়াও;
বিধির লিপি কপাল জোড়া।"

তবে ভগবৎ কৃপায় যে কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয়, তাহা তিনি বিশ্বাস করি-

কর্ম্মবন্ধন ও ভগবৎ কৃপা। তেন:—

"ওরে কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গো কর্ম্মপাশ ফেল কেটে"

এই ক্ষুদ্র পদটীর মধ্যে পুরুষকার ও ভগবৎ করুণার প্রতি নির্ভর ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অভ্যাস দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ করা

ভক্তিযোগে পুরুষকারের স্থান।

পুরুষকারের কার্য্য, আর মঙ্গলময়ীর নিত্য করুণা উপলব্ধি করিবার যোগ্য হওয়া অনুগ্রহের কার্য্য। সম্পূর্ণরূপে নিজের শক্তি দ্বারা যে কর্ম্মডোর ছিন্ন হয় না, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—

"কাটিতে নারিনু করম ডোর
নিজ গুণে লহ তারিয়া।"

"প্রসাদী সঙ্গীতে" আমরা রাম প্রসাদের গুরুভক্তির ও যথেষ্ট নিদর্শন পাই। এই সঙ্গীত গুলির মধ্যে তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা বাক্য লিপিবদ্ধ

রাম প্রসাদের গুরুভক্তি।

করেন নাই, এমন কি তাহার বৃত্তিদাতা মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্র অথবা উৎসাহদাতা ভক্ত জমিদার রাজ কিশোর মুখোপাধ্যায়েরও নামোল্লেখ করেন নাই কিন্তু তাঁহার মন্ত্র দাতা গুরু শ্রীনাথের নাম বহু সঙ্গীতে সন্নিবেশ করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ একটি পদ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম;—

"ঘরে আছে মহারত্ন ভ্রান্তি ক্রমে কাঁচে যত্ন;
মনেরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, কর তত্ত্ব;
কলের কপাট খোলনা।"

এইরূপ অনেক পদ ভক্তের গুরু মন্ত্রের প্রতি নির্ভর ভাবের সুমিষ্ট স্বরে উপাদেয় হইয়া রহিয়াছে।

প্রসাদী সঙ্গীতে আমরা কোথায়ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা বিরোধের নিদর্শন পাই না। "বিদ্যাসুন্দরে" রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিদ্বেষের যথেষ্ট পরিচয়

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ।

দিয়াছেন। "কালীকীর্ত্তন" ও "আগমনী সঙ্গীতে" ও শৈব বৈষ্ণবাদির উপাস্য দেবতার তুলনায় শাক্তগণের উপাস্যা আদ্যাশক্তির প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পদাবলী সঙ্গীত গুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্যের ভাব প্রদর্শন করা দূরে থাক, পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্পষ্ট কথায় সামঞ্জস্য

বিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে রামপ্রসাদ একদিন গঙ্গা স্নান করিতে গিয়াছিলেন, তখন মহামায়া একটি বালিকার বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্যামা সঙ্গীত শুনিতে চাহেন। রামপ্রসাদ বলিকা-টিকে স্নানান্তে গান শুনাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া অপেক্ষা করিতে বলেন, স্নানের পর বাটী ফিরিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন মহামায়ার মায়াভিনয় বুঝিতে পারিয়া মনের আক্ষেপে কাঁদিতে লাগিলেন। অমনি দৈববাণী হইল যে বারানসী ধামে অন্নপূর্ণার বাটীতে দর্শন লাভ মিলিবে।

রাম প্রসাদের কাশী গমন ও ইষ্ট দেবীর নিকট সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ।

রাম প্রসাদ আশ্বাসে বুক বাঁধিয়া কাশী যাত্রা করি-লেন। সেই পুণ্য ক্ষেত্রে গমন করিয়া তাঁহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। তিনি ৺কাশীর সমস্ত মন্দির দর্শন করিলেন, কিন্তু বেণী মাধবের মন্দিরে গমন করিলেন না। অনন্ত করুণাময়ী ভক্তের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিবার নিমিত্ত এক দিন অন্নপূর্ণার মন্দিরেই কৃষ্ণরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তদবধি রাম প্রসাদের সমস্তভ্রম ঘুচিয়া গেল। ভক্ত কবি গান রচনা করিলেন।

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী! হলি মা রাসবিহারী!
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব ;
কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥ ইত্যাদি।

এই জ্ঞান নেত্র বিকশিত হইবার পর হইতেই আমরা রমেপ্রসাদের গানে সাম্প্রদায়িক উপাস্য সম্বন্ধে ভেদ ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাই যথা ;—

"উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে,
তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥"

রামপ্রসাদের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সৃষ্টিতত্ব বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়াই নিরস্ত হইব। শ্রুতিতে পরমাত্মার ঈক্ষণ দ্বারা জগৎসৃষ্টির বিষয় যাহা বলা হইয়াছে রামপ্রসাদের কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীতে অবিকল সেই তত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

"সেকি এমনি মেয়ের মেয়ে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষ হেরিয়ে।
সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রাখে উদরে পুরিয়ে॥

এই ভাব পূর্ণ অথচ দার্শনিকতত্ত্বসমন্বিত সঙ্গীতের পদে আদ্যাশক্তিকে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত এই উভয় কারণ স্বরূপই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

রামপ্রসাদ যোগী ছিলেন, কিন্তু যোগ সাধনার প্রাথমিক ফলস্বরূপ অণিমাদি লাভ তাঁহার নির্ম্মল ভক্তিপূর্ণ হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি ঐ সকল অলৌকিক শক্তি-ভক্তির বলে উপেক্ষা করিয়া গাহিয়াছিলেন ;—

যোগসাধনায় অণিমাদি পরিত্যাগ।

"আনন্দে প্রসাদ কয় কালীকিঙ্করের জয়
অণিমাদি আজ্ঞাকারী প'ড়ে থাক্ পাছে।"

ভক্তি মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে অলৌকিক শক্তিলাভে মুগ্ধ হওয়া ভক্ত সাধকগণের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান বিঘ্ন।

আমরা ইতি পূর্ব্বেই রামপ্রসাদের সঙ্গীত মধ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ধর্ম্ম-জীবনে অগ্রসর হইয়া অতি সহজ কথায় নীতি বিজ্ঞানের মূল সূত্র স্বরূপ যে একটি অমূল্য পদ রচনা করিয়াছেন তাহা এই ;—

নীতিবিজ্ঞানে রামপ্রসাদ।

"লোকে মন্দ বলে বল্‌বে ;
তায় কিরে তোর ব'য়ে গেল।
আছে ভালমন্দ দুটো কথা ;
যা ভাল তা করা ভাল॥"

শুধু এই সরল ভাবের ক্ষুদ্র কথা কয়টি চিত্ত মধ্যে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়া যদি আমরা নৈতিক জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলেও ভাল মন্দের দোটানা স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া নিরন্তর হাবুডুবু খাইতে হয় না।

রামপ্রসাদের অধিকাংশ সঙ্গীতই একটা বিশেষ সুরে বাঁধা হইয়াছে। এ বিষয়েও আমরা রামপ্রসাদের মৌলিকতার নিদর্শন পাই। প্রসাদী সুরটী যেন একটী স্নিগ্ধ অথচ বৈরাগ্যোজ্জ্বল মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ। লঘু ভাবের সহিত ইহার মিলন হওয়া সম্ভব নহে। সঙ্গীত কলানভিজ্ঞ লোকেরও শ্রবণে যেন সুরটী বিশেষ ভাবে লাগিয়া থাকে। সঙ্গীতের ভাবের কথা দূরে থাক্, শুধু সুরটীতেই হৃদয়ের এমন একটা স্পন্দন উত্থিত করে যে তাহা মানব মনকে সাংসারিক বিষয়বাসনার নিম্ন ভূমি হইতে একটু উর্দ্ধে তুলিয়া ল'য়। অন্যান্য অনেক কঠিন সুরের

প্রসাদীসুরের বিশেষত্ব।

গানও রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে রামপ্রসাদ সঙ্গীততত্ত্ববিৎ ছিলেন এই পরিচয় ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

রামপ্রসাদ যে শুধু ভক্ত'সাধক ছিলেন তাহা নহে। তিনি কবিও ছিলেন। কাব্যহিসাবে ধরিতে গেলেও এই সঙ্গীতগুলি বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম প্রয়োগ করিয়া বিস্তারিত ভাবে বিচার পূর্ব্বক এই সঙ্গীত গুলির রচনার পারিপাট্য প্রদর্শন করিবার আমাদের অবসর নাই। আমি দুইটী মাত্র গানের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রামপ্রসাদের উপমা প্রয়োগের সৌন্দর্য্য এবং বর্ণনাতে মাধুর্য্য প্রদর্শন করিয়া অত্রকার জন্য নিরস্ত হইব।

রামপ্রসাদের কবিত্ব।

"কেবল আসার আশা ভবে আসা মাত্র সার হ'ল।
চিত্রের কমলে যেন মিছে ভৃঙ্গ ভুলে গেল।
খেল্‌ব বলে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো আশা না পুরিল॥
নিম খাওয়ালে চিনি দিয়ে কথায় করে ছল।
ওমা মিঠায় ভোলে তিক্ত মুখে সারাদিনটা গেল॥"

সংসারাসক্তির নিস্ফলতা পরিস্ফুট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব উপমার সমাবেশ কাব্য জগতে অতুলনায়। শিবসঙ্গীতে ভাবোন্মত্ত ভবানীপতির বৈরাগ্যোজ্জল সৌন্দর্য্য বর্ণনোপলক্ষে লিখিয়াছেন ;—

"আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি।
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি॥
প্রজ্জলিত হয় থাকি থাকি থাকি।
দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ
তরুণ অরুণ অধর দেশ
শব আভরণ গলায় শেষ
দেবের দেব যোগিয়া॥
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি
ধরত তাপ দ্রিমিকি দ্রিমিকি
শ্যামা গুণে হর নাচিয়া॥

বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল
লহরী উঠিছে কল কল কল
জটাজুট মাঝে থাকিয়া॥
প্রসাদ কহিছে এভব ঘোর
শিয়রে শমন করিছে জোর
কাটিতে নারিনু করম ডোর
নিজ গুণে লহ তারিয়া॥"

গানটী শুনিবা মাত্রই ভক্তের নয়ন সমক্ষে শিবসুন্দরের ভাব ঢল ঢল মূর্ত্তিটী যেন সাক্ষাৎভাবে আবির্ভূত হয়। ধ্বন্যাত্মক কবিতার অনুপম নিদর্শনরূপে এই গানটীর স্থান অতি উচ্চে। মোট কথা ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার প্রাঞ্জলতার এরূপ উজ্জ্বল সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদের এই সাধন সম্বল সঙ্গীত গুলির মধ্যে অনুপ্রাসের বাহুল্য স্থান পায় নাই। ভারতচন্দ্রীয় ভাবহীন শব্দ ঝঙ্কারের বিনোদ নিকনে ইহাদের অর্থ গৌরব অপরিস্ফুট হয় নাই, অথবা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থি ধরণের অর্দ্ধবিকশিত কাব্য পুষ্পের অভ্যন্তর হইতে সূক্ষ্ম গবেষণা দ্বারা ইহাদের ভাব সৌন্দর্য্যের উদ্ধার সাধন করিতে হয় না। এই অনুপম সঙ্গীত নিচয়ের ভাষা ভাবের সুগন্ধ লইয়া পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এই পূর্ণ বিকশিত কাব্যগীতির সরল সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালী মাত্রেরই চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ মাঙ্গল্য ভাবের বিমল সুবাস মাতৃভাবের সাধনা নিরত বঙ্গীয় পরিব্রাজক বর্গের উৎসাহ হিল্লোলে বাহিত হইয়া দেশ দেশান্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

উপসংহার।

আমাদের রামপ্রসাদ আমাদের নিকট ভক্তির যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন বহির্মুখ শিক্ষার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া আমরা যেন সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হই ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।
কাঁথি।

সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
ও
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু তাঁহার নবপ্রকাশিত "The Soul of India" গ্রন্থে, সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি?

'জীবন্মুক্ত' পুরুষদের বিষয়ে বিপিন বাবু বলেন যে, যদিও ইহাদের শরীর ধারণাদি ব্যাপার প্রাকৃতিক ও জৈবিক নিয়মের অধীন, তথাপি ইচ্ছা মাত্রেই ইহারা আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন বা নিয়মের অতীত হইতে পারেন।* এই প্রসঙ্গে তিনি পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে উক্ত গোস্বামী মহাশয় এইরূপ একজন 'জীবন্মুক্ত' মহাপুরুষ ছিলেন।† সুতরাং জীবন্মুক্ত

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

পুরুষের যে লক্ষণ বিপিন বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও ইচ্ছা মাত্রে, শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার বন্ধন বা নিয়মের অতীত হইতে পারিতেন।

তারপর বিপিন বাবু বলেন যে ব্রাহ্মসমাজ গঠন ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপার সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত একসঙ্গে

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রাহ্ম-সমাজ।

অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁহার নাম উক্ত দুই মহাপুরুষেরই সহিত এক সঙ্গে উচ্চারিত হইবে। কিন্তু শেষ জীবনে আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ" বলে, তাহা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে যে,—

> "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টিপরাবরি॥"

ইউরোপে আজকাল এই—'ব্রহ্ম নির্ব্বাণের' অবস্থার প্রতি কোন কোন

---

* They are freed from all bondage, physical intellectual, and moral even in this life. * * * They are able to transcend outer physica limitations as well (?)

† "He was a living super-men, a true example of the Jeebanmukta."

মনীষিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা ইহাকে "Beyond good and evil" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তারপর বিপিন বাবু বলেন যে শুধু উক্ত গোস্বামী মহাশয় নহে, তাঁহার সমসাময়িক পরমহংস রামকৃষ্ণও এই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পরমহংস রামকৃষ্ণ।

এই সমস্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের সহিতই আমাদের জাতীয় জীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে মন্দির, তাহার দ্বার উন্মোচন করিতে হইলে এই সব মহাপুরুষদিগকে 'চাবী' রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহারাই ভারতীয় মৃত্তিকার খাঁটি ফসল। ইহারাই ভারতের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। আমাদের সভ্যতার যে একটি বিশেষত্ব আছে, তাহা ইহাদের জীবনেই বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের যে বিশেষত্ব তজ্জন্য আমরা এই সব মহাপুরুষদের নিকটই ঋণী।* ইহারাই আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব বা বিশেষ সাধনাকে একযুগ হইতে অন্য যুগে, ইতিহাসের মধ্য দিয়া ক্রম পরম্পরায় বহিয়া আনিতেছেন; অথচ প্রত্যেক যুগেই এই বিশেষ সাধনাকে সেই যুগধর্ম্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অতীতের সহিত ভবিষ্যতের, সমাজের প্রাচীন নিষেধ বিধির সহিত বর্ত্তমানের উন্নতি মুখী পরিবর্ত্তনের, সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমগ্র সমাজকে অরাজকতা বিদ্রোহ বা ধ্বংসের একটা ভাব হইতে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন।

এই সমস্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ কি?

তারপর বিপিন বাবু আবার বলেন যে এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে অতি-প্রাকৃত (Super-natural) কিছুই ছিলনা।† তবে তিনি যে অতি প্রাকৃতকে সম্পূর্ণ ভাবে অবিশ্বাস করিতেন তাহা নয়, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সাধনায় প্রেম ও বিশ্বাস লাভের পক্ষে ইহা (Supernaturalism) অত্যন্ত বিঘ্নজনক বলিয়া, সর্ব্বদাই ইহার নিন্দা করিতেন। তথাপি আমাদের মধ্যে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত যুবক,

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও Supernaturalism

* "In them the highest possibilities of the special thought and culture of our land have been fully brought out. * * * It is to these men that we owe all the peculiar developments of our social, moral and religious life."

† "There was little or nothing of so-called Supernaturalism in him" (?)

যাঁহারা এককালে বিজ্ঞান ও যুক্তি-তর্কের দোহাই দিয়া ("in the name of Seience and reason") আমাদের সমগ্র ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহকে একবারে কাল্পনিক ও মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই মহাপুরুষের উন্নত জীবনে আমাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের এক অভিনব ও জীবন্ত বিকাশ দেখিয়া তাঁহাদের হারানো বা নষ্ট বিশ্বাসকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছিলেন ইহা সত্য।

জাতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের উপর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির জীবনের প্রভাব।

'জীবন্মুক্ত' পুরুষের যে লক্ষণ বিপিন বাবু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আশঙ্কা হয়, বর্ত্তমান বিজ্ঞান, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান (Psychology) এই অবস্থাকেই অতি-প্রাকৃত (Super natural) এই আখ্যা প্রদান করিবে। সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে এই সব লক্ষণাক্রান্ত জীবন্মুক্ত পুরুষরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, আবার তাঁহাতে অতি প্রাকৃত কিছুই ছিল না, এইরূপ ঘোষণা করায়, সম্ভবতঃ অনেকে বিপিন বাবুর এই উক্তিতে একটা সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করিবেন। একজন মানুষকে একই সময় "*Super*-man" (?) বলিয়া, আবার তাঁহাতে "*Super*-naturalism" (?) কিছুই ছিলনা এরূপ বলাতে যে অনেকেই দুঃখিত হইতে পারেন, তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরাও স্বীকার করিতে বাধ্য। বিপিন বাবু বলেন "He was a living Super-man" আবার বলেন "Yet, there was nothing of so called 'Super-naturalism' in him"! তবে Supernaturalism এর আগে বিপিন বাবু 'So called' আর একটা কথা ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহার এরূপ অর্থ করিতে পারি যে যদিও "ব্রহ্ম নির্ব্বাণ' প্রাপ্ত ও 'জীবন্মুক্ত' এই অধ্যাত্মিক অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একজন "living Super-man" ছিলেন, তথাপি "So-called Supernaturalism"—অর্থাৎ ইতর শ্রেণীর বা লোক ঠকাইবার জন্য সাধারণ ভোজবাজীর মত যে অতি প্রাকৃত জিনিষ তাহা তাঁহার মধ্যে কিছুই ছিল না। এবং আমাদের শাস্ত্রোক্ত 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ' প্রাপ্ত অবস্থাকে বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান, একটা নেশার ঝোঁক বা fiction বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, উহা অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রোক্ত সমাধির অবস্থা এমন একটা "Super-conscious state" যাহাকে

বিপিন বাবুর Super-man ও Supernaturalism এ সামঞ্জস্যের অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দ ও Superconscious State.

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান এখনো ধারণা করিতে সক্ষম হয় নাই। যদি বিপিন বাবু এইরূপ বলিতেই চেষ্টা করেন, তবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে অতি-প্রাকৃত জিনিষের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বিপিন বাবুর "The soul of India" পুস্তক গত ডিসেম্বর মাসে, ১৯১১ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩১৮ সনের আশ্বিন মাসে আবার সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কন্যাজামাতা বাবু জগবন্ধু মৈত্র, উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের একখানা জীবন চরিত প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের "অন্তখণ্ডে" ও "পরিশিষ্টে" প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠা ব্যাপি উক্ত গোস্বামী মহোদয়ের জীবনে যে সমস্ত বিভিন্ন রকমের অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আমরা এইখানে ঐ সমস্ত অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রকৃতি, জগবন্ধু বাবু যেরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে যথাযথ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

বাবু জগবন্ধু মৈত্র প্রণীত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন চরিতে অতি প্রাকৃত ঘটনার বিশদ বিবরণ।

(১) উদ্ভিদ জগতের সহিত সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এত ঘনিষ্টতা হইয়াছিল যে একবার ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যে আম্রবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া তিনি সাধন ভজন করিতেন, সেই আম্রবৃক্ষে একটি পেরেক বিদ্ধ করা হয়, পরে ঐ বৃক্ষটি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে ঐ পেরেকটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য গোস্বামী মহাশয় বৃক্ষের অনুরোধ সেই মুহূর্ত্তেই পালন করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু বলেন, ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নয়। কেন না উদ্ভিদ জগতের সমস্ত তত্ত্ব এখনও বিজ্ঞান সম্যক আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এইত আমাদের Dr J. C. Bose এ বিষয়ে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগৎকে সে দিন চমকিত করিয়াছেন। (২) শুধু উদ্ভিদের ভাষা নয়, পশু পক্ষীর ভাষাও তিনি বুঝিতে পারিতেন। তিনি "চড়াই পাখী, ইঁদুর, সর্প ও একটি বানরীর" কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। (৩) ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য, জড় পদার্থে নির্ম্মিত হিন্দুর বিগ্রহাদি মূর্ত্তিও জীবন্ত মানুষের মত তাঁহার সহিত ব্যবহার করিত। (৪) বৃন্দাবনে রাস্তায় চলিতে এক দিন অকস্মাৎ একটা দৈববাণী শুনিলেন "আমাকে দুধ ভাত খাওয়াও।" চহিয়া দেখিলেন "বঙ্কবিহারী" বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়া

দুধভাত চাহিতেছেন। (খ) আবার নবদ্বীপে একদিন মহাপ্রভু দর্শন করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে বিগ্রহ মূর্ত্তি "হাঁপাচ্ছে"। তিনি বিগ্রহকে বলিলেন, "চুপকর্, হাঁপাসনে, দেবে, আমি বলে দেবো, সোণার বালা ও নূপুর দেবে।" শিষ্যেরা তখন বিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে "বিগ্রহের চক্ষুতে পলক পড়িতেছে এবং বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হওয়াতে বক্ষঃস্থিত পুষ্পের মালা নড়িতেছে"। (গ) পুরীতেও এই-রূপ জগন্নাথ বিগ্রহ প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করিতেন, একসঙ্গে আহারাদি করিতেন; জগদ্বন্ধু বাবু বলেন যে এমনকি "কাড়িয়া খাইতেন।" একদিন গোস্বামী মহাশয় ডাবের জল পান করিতে হঠাৎ থামিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল যে তিনি আর পান করিবেন না। সুতরাং তাঁহার হস্ত হইতে ডাব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি চমকিয়া বলিলেন "করকি, কর কি—জগন্নাথ ডাবের জল পান করিতেছেন।" ইত্যাদি। জড় জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগতের সহিত তাঁহার এইরূপ সম্বন্ধ বিচার বা স্বীকার করিয়া তদীয় জীবনে এই সমস্ত অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নয়। (৪) ইহা ছাড়া গোস্বামী মহাশয় ভূত প্রেত ও মৃত আত্মার দর্শন পাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত আত্মাকে তিনি স্বচক্ষে "দিব্যরথে আরোহন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন" করিতে দেখিয়াছিলেন। (কিন্তু আত্মার পারলৌকিক গতি ও স্বর্গ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মত খুব সুস্পষ্ট নয়।) (৫) একদিন ঢাকায় তিনি শৌচে যাইবার অভিপ্রায়ে ঘরের দরজা খুলিয়া দিতে বলায়, তাঁহার ছোটকন্যার বেশ ধরিয়া মা কালী দরজা খুলিয়া দেন (৬) আবার এক দিন সপ্তগ্রামে দেবমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বলায়, পূজারী দ্বারমুক্ত করিবার পূর্ব্বেই তাহা আপনা হইতে খুলিয়া গিয়াছিল। (৭) পুরীতে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কন্যা শান্তিসুধাকে বলেন যে "তুই কি প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনে যাস?" কন্যা বলিলেন "মধ্যে মধ্যে যাই"। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন "তুই মন্দিরে আর যাস্‌নে, জগন্নাথ ঘরে আসিয়া তোমাকে দর্শন দিবেন।" বলা বাহুল্য শান্তিসুধাকে জগন্নাথ তাহার ঘরে আসিয়াই "বিশ্বরূপ দর্শন করান।" (৮) একদিন পদ্মানদীতে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কন্যাকে দিয়া কিছু উপহার অর্পণ করেন। জলের মধ্য হইতে একখানি অতি সুন্দর সুশোভিত হস্ত উত্থিত হইয়া সেই সমস্ত উপহার দ্রব্য গ্রহণ করেন।

এখন বিজ্ঞ সমালোচক বিপিন বাবু যদি বলেন "*Yet* there was noth-

ing of So-called Snpernaturalism in him." তবে আমরা গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত উক্তি-গুলিকে বিপিনবাবু কি ভাবে গ্রহণ করিতেছেন ও তিনি নিজে "So called Supernaturalism" এর অস্বীকারোক্তি দ্বারাই বা কি বুঝিতেছেন ও বুঝাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই কৌতূহলাক্রান্ত হইতেছি। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার "খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের" গ্রন্থের ভূমিকায়, ঐতিহাসিক তুলনা মূলক বিচার পদ্ধতির ভ্রমসংশোধন উপলক্ষে ["a Suggested correction of the Historico-comparative Method"]জগতের বিভিন্ন সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য, উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্ধকার সমাজ বিজ্ঞানবিদের নিকট নূতন প্রশ্ন না হইলেও একটি বিরাট অমীমাংসিত সমস্যা। মহাজ্ঞানী ব্রজেন্দ্র বাবু বলেন যে প্রত্যেক ঐতিহাসিক সভ্যতারই উৎপত্তি, গতি, ও পরিণতি সম্বন্ধে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই স্বাতন্ত্র্য গুলির রক্ষা ও বিকাশই সমগ্র মানব সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন সভ্যতার বিশেষত্ব গুলিকে তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে বিচার করিতে হইবে; বাহিরের কোন আদর্শের অনুপাতে বিচার করিলে বা সেই দিকে জোর করিয়া হইার গতিকে ঠেলিয়া দিলে, মানব সভ্যতার বিশেষত্ব গুলির প্রতি অবিচার করা হইবে।

বিপিনচন্দ্র পাল ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে অতি প্রকৃত ঘটনা।

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও সভ্যতার বিশেষত্ব।

ব্রজেন্দ্র বাবুর এই মত দ্বারা যে বিপিন বাবু প্রভাবান্বিত তাহার পরিচয় আমরা বিপিন বাবুর লেখা হইতে বহুপূর্ব্বে ও বহুবার পাইয়াছি! হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্বকে রাখিতে হইবে ইহা রামমোহন রায় হইতে বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সাধু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্বন্ধে জগবন্ধু বাবু যে সমস্ত অতি প্রাকৃত ঘটনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ঐ গুলিকে হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব রূপে বর্ত্তমান যুগে গ্রহণ করা যায় কিনা, এবং বাস্তবিক পক্ষে উহাই হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব কিনা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেননা অধুনাতন সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) প্রত্যেক সভ্যতার বিশেষত্ব গুলিকে যুগধর্ম্মের উপযোগী করিয়া রক্ষা করাই সেই সভ্যতা বাঁচাইয়া রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিপিনচন্দ্র পাল।

এরূপ শুনা যায় যে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট একজন সন্ন্যাসী আসিয়া একদিন বলিয়াছিলেন যে "আমি ১২ বৎসর তপস্যা করিয়া এমন শক্তি লাভ করিয়াছি, যে ইচ্ছা করিলেই নদীর উপর দিয়া হাটিয়া পার হইতে পারি"। রাজা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে 'একটি পয়সা দিলেই যখন সাধারণতঃ নদী পার হওয়া যায়, তখন সেই কার্য্যের জন্ত জীবনের ১২টি বৎসর ব্যয় করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।"

রাজা রামমোহন।

স্বামী বিবেকানন্দকে একদিন আমেরিকায় Hartford এ বক্তৃতার পর খৃষ্টানধর্ম্মের অতি-প্রাকৃত ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায়। তদুত্তরে স্বামজী বলিয়াছিলেন—" I look upon miracles as the greatest stumbling block in the way of truth. * ** Let us brush them aside." স্বামীজী আরো বলিয়াছিলেন যে, একদিন বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য খুব অতি উচ্চ স্থান হইতে তাহার ভিক্ষা পাত্রটি স্পর্শ না করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই কথা সঙ্ঘের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। বুদ্ধদেব এই কথা শুনিয়া সেই ভিক্ষা পাত্রটী পদতলে বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "অতি-প্রাকৃত ঘটনার উপর কখনো ধর্ম্মবিশ্বাসকে স্থাপন করিও না। সত্যের জন্ত জগতের চিরস্থায়ী নৈতিক নিয়মগুলির উপর দৃষ্টিপাত কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ

রামমোহন রায়, ও বিবেকানন্দকে ছাড়িয়া দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে উক্ত মহাপুরুষের জীবনেও অতি প্রাকৃত ঘটনার কোন উল্লেখ মাত্র নাই। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে উল্লিখিত তিনটি মহাপুরুষও হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব গুলিকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা অতি-প্রাকৃত ঘটনাকে হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব বলিয়াত গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু ঘৃণা ও বিদ্রূপের চক্ষে ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, *"let us brush them aside !"*

দয়ানন্দ সরস্বতী

বর্ত্তমান যুগে হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসকে যিনি বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহনের যুগ পর্য্যন্ত, গভীর ভাবে সমালোচনা করিয়া সভ্য জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কি বলেন জানা আবশুক। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার History of Hindu Civilisation গ্রন্থের

প্রথম খণ্ডে বলেন (২৮৮ পৃষ্ঠা) যে পাতঞ্জলের যোগ-দর্শন ক্রমে তান্ত্রিক ধর্ম্মের মধ্য দিয়া হিন্দু ধর্ম্মে এই সমস্ত অতি-প্রাকৃত ও দুর্নীতিপূর্ণ ঘটনাকে প্রশ্রয় দিয়াছে। "The yoga system has degenerated into cruel & indecent Tantric rites, and into the *impostures and superstitions of the so cal led yogins of the present day.*" পরে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (৮৮ পৃষ্ঠা) এই সমস্ত অতি-প্রাকৃত ঘটনাকে হিন্দুর জাতীয় জীবনের এক অতি দুর্ব্বলতা ও কলঙ্কের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন "To the historian, the Tantra literature represents, *not a special phase of Hindu thought, but a diseased form of human mind,* which is possible only when the national life has departed, when all political consciousness has vanished, and the lamp of knowledge is extinct." রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন 'বিশেষত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু গৌরবের নহে, কলঙ্কের !!' কেননা ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন— "The dark * * practices for the acquisitions of supernatural powers,—are the *creations of the last period of Hindu degeneracy under a foreign rule*"! সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তান্ত্রিক ছিলেন এমত বোধ হয় না। কিন্তু বাবু জগবন্ধু মৈত্র বলেন " কোন তান্ত্রিক সাধক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে কারণ অর্থাৎ মদ্য আনিয়া দিতেন। যে সকল সাধু গাঁজা চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করেন' তিনি তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিতেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া সেই সকল সেবন করিতেন। ইহা তাঁহার নিকট অন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বোধ হইত না। এখন বিপিন বাবু ও জগবন্ধু বাবু এবং সর্ব্বোপরি হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব-রক্ষণকারীদিগের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা যে, ধর্ম্মের নামে এই গাঁজা, চরস, মদ্য ও মরফিয়া সেবন অন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কিনা ? এবং ইহা সেবনের ফলে যে সমস্ত অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রকাশ হওয়া সম্ভব, তাহাই হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া বর্ত্তমান যুগে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য কি না ? জগবন্ধু বাবুর পুস্তকে যে সমস্ত অতি-প্রাকৃত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সেই সমুদয়ের প্রতি বিপিন বাবুর মত সাধারণের নিকট স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত না হইলেও, বিপিন বাবুর 'The soul of India' গ্রন্থে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর উপর সে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণকে নিতান্তই সংশয়ের মধ্যে ফেলিয়া রাখিবে।

রমেশ চন্দ্র দত্ত ও হিন্দু ধর্ম্মের অতি প্রাকৃত ঘটনা।

এখন ব্যক্তি বিশেষকে ছাড়িয়া দিয়া জাতীয় জীবনে এই সমস্ত অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রশ্রয়ের জন্য কে দায়ী তাহা আমাদের দেশের সমাজ তত্ত্ববিদ্‌গণের ভাবিয়া দেখা উচিত। স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত জাতীয় জীবনের অধঃপতনকেই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কথার সাক্ষ্য আমরা অন্যান্য জাতীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া জানিতে পারি। Lecky তাঁহার History of European Morals গ্রন্থে মধ্যযুগে ইউরোপের দুরবস্থার সঙ্গে তৎকালীন অতি-প্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ দেখাইয়াছেন। Buckleও Scotland এবং Spain এর সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে জাতীয় জীবনের অধঃপতনের অবস্থাতেই অতি-প্রাকৃত ঘটনা সংক্রামক হইয়া পড়ে। এবং শুধু তাহাই নয় ইহার দূরীকরণ ব্যতীত জাতীয় জীবন সুস্থ ও সবল হইতে পারেনা। কিন্তু Lecky, Buckle বা রমেশ দত্ত এক শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখক। আমাদের দেশে Theosophical Society প্রভৃতি এমন দু একটি সম্প্রদায় আছে যাঁহারা অতি প্রাকৃতকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে কিছু মাত্র আলস্য করিতেছেন না।

Theosophical Society

এমন কি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই অতি প্রাকৃত দ্বারা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অথচ ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন। ইহারা Buckle or রমেশ দত্ত শ্রেণীর লেখককে esoteric departmentএর লোক নয় বলিয়া মনে করিবেন না। Comte যাহাই বলুন অতি-প্রাকৃতের আক্রমণ হইতে মনুষ্য সমাজ সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে পারে কি না, তাহা আমাদের দেশের সংস্কারেচ্ছু সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের অতি প্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া, স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অগস্থ কোমৎ।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ, Lead-beater সাহেবের "The Inner Life" গ্রন্থ গত নভেম্বর Modern Review পত্রিকায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবগত পার্থক্যই অতি প্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কারণ। "which is non-existent to others will be existent to him, if he has the will to believe." ইহা অনেকাংশে সত্য। কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের সমাজ সংস্কারক-গণেরাও, বিশে-

মহেশচন্দ্র ঘোষ ও Lead Beater

যত শেষ বয়সে, অতি প্রাকৃতের উপর যেরূপ বিশ্বাস প্রদর্শন করেন, তাহাতে জাতীয় জীবনের মূলেই এই অতি প্রাকৃতে বিশ্বাসের বীজ নিহিত আছে, অনেকে যদি এরূপ সন্দেহ করেন, তবে তাহা সম্পুর্ণ অমুলক হইবে না। অর্থাৎ সামাজিক জীবন (Social environ-ments) এদেশে তাঁহাদের মহাপুরুষের অতি প্রাকৃতে বিশ্বাস করিতে অনুপ্রাণিত করে। মহেশ বাবুর "Idiosyncrasies of present taste" এর উপর, আমরা এই কথাটী বলিতে চাই। যখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট মহাভারত পঠিত হইত তখন তাঁহার দেহে যুদ্ধের সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইত। নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত চিহ্নাদি লক্ষ্য করিবার জন্য তাঁহার চারি পার্শ্বে একদল বিশ্বাসী ভক্ত না থাকিলে কখনই এরূপ অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রকাশ হইত না। যে দেশ বা জাতি মানবীয় ভাবে তাঁহার মহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে অক্ষম, সে দেশে বা সে জাতির মধ্যে শক্তিশালী পুরুষ জন্মিলেই, সামাজিক জীবনের অত্যাচারের প্রাদুর্ভাবে তাঁহাকে অবতার হইতেই হইবে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে। বিদ্যাসাগর বা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বর্ত্তমান যুগের আর একদল, ধর্ম্মবীর পরমহংস রামকৃষ্ণকে, এই অবতার বাদের হাত হইতে দূরে রাখিবার জন্য যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইতেন, আশঙ্কা হয়, আজ তাহা বিফল হইয়াছে। এবং সে জন্যও পরমহংস অপেক্ষা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক জীবনই দায়ী। ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল একবার রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য আমাদের জাতির যে চরিত্র গত বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে "হে ভারত, তুমি চিরকাল 'অবতার' ও 'লীলার' দেশ। শুধু তাহাই নয়, যাহা মানুষ হইতে বড় (Supra human) বা মানুষ হইতে ছোট (infra human) তাহাই চিরকাল তোমার নিকট পূজা পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তুমি একবার মানুষকে মানুষ বলিয়া পূজা করিতে শিখ।"

অবতার বাদ বা অতি প্রাকৃতের জন্য ব্যক্তি অপেক্ষা সামাজিকজীবন দায়ী।

'যোগ' ও 'পূর্ব্ব মীমাংসা' এই দুইটী প্রবল দার্শনিক চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত এই দেশ কবে মানুষকে মানুষ বলিয়াই পূজা করিতে শিখিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা কঠিন।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ভাব ও রস।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথমেই রহিয়াছে

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো
রসিকা ভুবি ভাবুকা।" (১।১।৩)

"এই সংসারে যাঁহারা রসিক ও ভাবুক তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত এই ভাগবত রস পুনঃ পুনঃ পান করুন।"

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিতেছেন "ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যম্ * * নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব।" মোক্ষ হইলেও এই ভগবতামৃতের পান পরিত্যাজ্য নহে। যাঁহারা মুক্ত তাঁহারা স্বর্গাদি সুখকে অতি হেয় বিবেচনা পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ভাগবত রস সে প্রকারের বস্তু নহে, যাঁহারা মুক্ত পুরুষ তাঁহারাও অতি আনন্দ-:সহকারে ইহা পান করিয়া থাকেন।

মুক্ত পুরুষেরাও যে ভাগবত-রস অতীব আদর সহকারে পান করিয়া থাকেন তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বহুস্থলেই দৃষ্ট হইবে।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ে নিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়ং॥ ১।৭।১০।১১।

যাঁহারা আত্মারাম মুনি, তাঁহাদের কোনরূপ হৃদয় গ্রন্থি নাই, সুতরাং বিষয়বাসনা বলিয়া একটা জিনিষ অথবা ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতি তাঁহাদের মনে একেবারেই নাই। এই প্রকারের মুনিগণও হরিকে অহৈতুকী বা ফলাভি-সন্ধান রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন; হরির গুণরাশি এমনি অপূর্ব্ব যে আত্মা-রাম মুনিগণও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে উদাহরণ এই যে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব একজন মুক্ত পুরুষ (পরিনিষ্টিতোঽপি নৈর্গুণ্যে—ইতি ভাগবতঃ) তিনি হরির এই সমস্ত চিন্ময় গুণের দ্বারা আকৃষ্ট-হৃদয় হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বৃহৎ আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে রহিয়াছে—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ"।

যাঁহারা মুক্ত, যাঁহাদের বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে, এই বিনশ্বর ও পরিবর্ত্তন-

শীল জগতে যাঁহাদের কোন কামনা নাই, তাঁহারা এই ভাগবত কথা অধিক পরিমাণে (উপ আধিক্যেন ইতি শ্রীধরঃ) গান করিয়া থাকেন।”

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যাঁহারা লাভবান হইতে চাহেন, এই গ্রন্থের সাহায্যে যাহারা জীবনের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনে ইচ্ছুক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অতীব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। অবশ্য অন্ধভাবে এই কথাগুলি তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে না, ভাগবত শাস্ত্র প্রাচীন কালের সাধু ও মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে আলোচনা করিতে করিতে বুঝিতে পারিবেন যে বিষয় বাসনা-হীন আত্মারাম মুক্ত পুরুষগণেরও এই গ্রন্থ এতদূর আদরনীয় কেন। সাধারণ লোকের নিকট ভাগবতশাস্ত্রের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এই সমস্ত স্তুতি বাক্য লিখিত হয় নাই, এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য, একথা উপলব্ধি করা যে খুব কঠিন তাহা নহে।

অতীন্দ্রিয় ভাব ও চিন্ময় রস বলিয়া একটা জিনিস আছে, মানুষ তাহা অনুভব করিতে ও আস্বাদন করিতে পারে। ভাগবতে যে সমস্ত ইতিহাস বা আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ইতিহাস বা আখ্যান আমাদের কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অথবা স্থূল বা সূক্ষ্ম জগতের একটা ঘটনা নহে। এই সমস্ত ইতিহাস ও আখ্যানের মর্ম্ম আরও গভীর। এই জন্য গ্রন্থের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে যাঁহারা রসিক ও ভাবুক তাঁহারা এই ভগবত রস পান করুন।

ভাব ও রস এইদুইটি কথার মর্ম্ম খুব পরিস্কার ভাবে বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে ইহাদের সম্বন্ধে আভাসে যতটুকু বলা সম্ভব তাহা বলিতেছি। যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মবিৎ তাঁহারা ভাব ও রস এই দুইটি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা মহাত্মা কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন।—

“পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস”

বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণ পরকীয়াভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার বিশদ বর্ণনা আছে, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব লেখকগণ এ বিষয়ে নানাভাষায় বিবিধগ্রন্থ ও কবিতাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি এই ভাবে সাধনাও করিয়া গিয়াছেন। গোপীগণ পরস্ত্রী, অথচ পতিভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। আমাদের এই সুনীতি ও সুরুচি সম্পন্ন যুগে (?) ভগবানের নামে, ধর্ম্মের নামে এই সমস্ত কথা বলা বড়ই দুঃসাহ-

সের কথা! এই জন্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দ ইহার প্রতি অনেক গালাগালি বর্ষণ করিয়াছেন; তাহারা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে হিন্দু-জাতি যে অত্যন্ত বর্ব্বর, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। পারিবারই কথা, এই সভ্যযুগে সচ্চরিত্র ও সুনীতিসম্পন্ন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের স্বর্গীয় জ্ঞানালোক যখন আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে মূর্খ ও বর্ব্বর ছিলেন, নীতিশাস্ত্র বলিয়া একটা জিনিষ তাঁহারা আদৌ জানিতেন না, ধর্ম্মের নামে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিতেন, এ সমস্ত কথা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিতে পারে না। কাজেই আমরা বৈদেশিকদের সুরে সুর মিলাইয়া গোপীলীলাকে অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। সত্যইত; সাহেবদের শাস্ত্রের সঙ্গে যখন এই সব বিষয়ের মিল নাই এবং সাহেবরা যখন এই সমস্তকে খারাপ বলেন তখন আর অন্য কিছু ভাবিবার বা বুঝিবার নাই, ইহা অশ্লীল ও কদর্য্য।

এই গেল একদলের মত। আর একদল বলেন যে না, না, প্রাচীন হিন্দুরা ভাল লোক ছিলেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের সঙ্গে সাহেবদের শাস্ত্রের মিল আছে। এই বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা হিন্দুরা সকলেই অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে বটে তবে ইহা তাহাদের শাস্ত্র নহে। এ সমস্ত প্রক্ষিপ্ত, পরবর্ত্তীকালে দুষ্টলোকে এই সমস্ত রচনা করিয়া চালাইয়া দিয়াছে—এ সমস্ত কিছুই নহে, এই সব প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে দেখিতে পাইবেন আমাদের শাস্ত্র ঠিক সাহেবদের শাস্ত্রের মত।

আর একদল লোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে শাস্ত্র রাখিতেই হইবে, তাঁহাদের পণ বড়ই ভয়ানক। তাঁহারা এতদিন এই সমস্ত লীলা হিন্দুরা কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা আর আলোচনা করিয়া দেখিলেন না, তাঁহারা ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্য লইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যে প্রাচীন কালে ছিল না, কৃষ্ণলীলা যে আধ্যাত্মিক নহে, তাহা নয়, তবে সে কালের লোক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিতে যাহা বোঝেন, এ কালের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তাহা নহে। বিলাতে যাহাকে Allegory বলে, তাঁহারা ভাগবত কৃষ্ণলীলা এমন কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্য্যন্ত সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। হিন্দুচিত্তের যাহা বিশেষত্ব, হিন্দুর বিসব ব্যাপার পরিদর্শনের যে একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে, সেই বিশেষ পদ্ধতিটি না জানার জন্যই এই চেষ্টার উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু চিত্তের এই বিশেষত্বটুকু কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রে নহে হিন্দুর কাব্যে,

নাটকে, শিল্পে, সমাজে ও গার্হস্থ্য জীবনে সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইবে, আমরা ক্রমশঃ তাহার বিস্তৃতরূপ আলোচনা করিব।

কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস বলিলেন—পরকীয়া একটি ভাব, ইহার ফলে রসের উল্লাস হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক্ষণে এই ভাব ও রস কি তাহার আলোচনা করা দরকার।

এ বিষয় বুঝাইতে একটি অতি সুন্দর ইতিহাস আছে। একদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার অন্ত্যলীলায় অর্থাৎ জগন্নাথ ধামে অবস্থান কালে, জগন্নাথ দেখিয়া ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে নৃত্য করিবার সময় তিনি একটি শ্লোক বার বার পাঠ করিতে লাগিলেন, শ্লোকটি এই—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিতমালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চেবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥

এই শ্লোকটি কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার গ্রন্থে আছে। ইহার অর্থ এই কোনও নায়িকা (প্রাকৃত নায়িকা) তাঁহার সখীকে বলিতেছেন—"হে সখি! যিনি কৌমারকালে অথবা প্রথম যৌবনে আমার মন হরণ করিয়াছিলেন, সেই তিনিই আবার আসিয়াছেন, আবার আমাদের মিলন হইয়াছে। সেই চৈত্রমাসের মধুযামিনী-সমূহ, সেই প্রস্ফুটিত মালতী ফুলের সৌরভ, সেই কদম্বকাননের মধুর বায়ুহিল্লোল সমস্তই আসিয়াছে এবং সেই আমিও আছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ আর বেশ মনের তৃপ্তি হইতেছে না, রেবানদীর তীরে অশোককুঞ্জে আমাদের যে মিলন হইত সেই মিলনের জন্য আজ প্রাণে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।"

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতেছেন আর বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভু নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য! একজন প্রাকৃত নায়িকার প্রেমের কথা কাব্যে তাহা বর্ণিত হয়, সংসারী মানব তাহা আলোচনা করিয়া আনন্দ পাই। মহাপ্রভু সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, এ শ্লোক তিনি এমন ভাবে পড়িতেছেন কেন? কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কেবলমাত্র বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকিতেন, সেবার দৈবক্রমে তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোক শুনিয়া, সেই শ্লোকের অর্থ লইয়া একটি শ্লোক রচনা করিলেন, এই শ্লোকটি উচ্চারণকালে মহাপ্রভুর মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, রূপগোস্বামী স্বরচিত শ্লোকে তাহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিলেন। রূপগোস্বামী শ্লোকটি রচনা করিয়া এক তালপত্রে লিখিলেন ও আপনার বাসার চালে তাহা গুঁজিয়া রাখিলেন। শ্লোক রাখিয়া রূপগোস্বামী সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন, এমন সমন সময় জগন্নাথ দেবের উপলভোগ (প্রাতর্ভোগ) দেখিয়া ফিরিবার সময় মহাপ্রভু রূপগোস্বামীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর, রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে যাইতেন না, এই জন্য প্রাতঃকালে জগন্নাথের মন্দির হইতে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু এই তিন জনকে প্রত্যহ দর্শন দিয়া যাইতেন।

আজ রূপ গোস্বামীর বাসায় আসিতেই মহাপ্রভু চালে গোঁজা সেই তালপত্র খানি দেখিতে পাইলেন এবং তালপত্রে লিখিত শ্লোকটি পড়িলেন। শ্লোক পড়িয়া মহাপ্রভু অবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রূপ গোস্বামী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ও মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হইলেন। মহাপ্রভু আদর করিয়া রূপ গোস্বামীকে এক চাপড় মারিলেন ও কোলে করিয়া স্নেহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শ্লোকের অভিপ্রায় কেহই জানে না, আমার মনের কথা তুই কেমন করিয়া জানিলি ?

(ক্রমশঃ)

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩১৮।

সুপ্রতিষ্ঠ।

১

জীবনের পরিণতি সহ
ঘুচিতেছে নয়নের ভুল,
অমঙ্গল-বিষদ্রুম, দেখি,
মঙ্গলে লভেছে দৃঢ়মূল;
অন্তর্লীন পাবকের মত,
দেখি, প্রতি বেদনার মাঝে
(বুঝে না তা বিমূঢ় হৃদয়)
গূঢ় শুভ ইচ্ছাই বিরাজে।
দিবে যথা রবি অধিষ্ঠান,—
সুপ্রতিষ্ঠ ধাতার বিধান।

২

অন্ধকার, অমা-সহচর;
যাতনাও পাতকের রীতি;
জানি স্থির, পাপ দণ্ড পাবে,
কোন খানে চিরে বা ঝটিতি;
জানি, দুঃখ-কঠোর-মন্থনে
আলোড়িত হলে হৃদিতল,
পশে আত্মা পরম কল্যাণ,
অমৃত-প্রবাহে লভি বল।
বিকাশের ক্লেশই নিদান,—
সুপ্রতিষ্ঠ ধাতার বিধান।

৩

ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট-গ্রন্থনে,
জানি, নাহি তিলমাত্র ভ্রান্তি ;—
সার্থক সকল সত্ত্বা, সাধি
চরমেতে মানবের শান্তি ;
জানি, যবে দেহ-কারামুক্ত
আত্মা মোর করিবে প্রয়াণ,
দেশ-কাল-বিরহিত পথে,
মহানন্তে হ'তে অন্তর্ধান,
ধ্বনিবে ওঁকার মাঝে তার,—
সুপ্রতিষ্ঠ বিধান ধাতার।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

উদ্বোধন।

সম্মুখে শত শত বাধা পুঞ্জীভূত হইয়া ঐ বিরাট হিমাচলের মত আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; যখন এই সমস্ত বাধার দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন কেবল নিরাশা ও অবসাদ আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত ও অবসন্ন করে। কিছুতেই মনে করিতে পারা যায় না এই সমস্ত বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সফল করিতে পারিব। মনে হয় আমাদের এই যত্ন ও চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল ;—আমরা কেবল অরণ্যে রোদন করিয়াই চলিয়াছি—আমরা কল্পনাপ্রবণ ও অনিশ্চিতের উপাসক। আমরা দুর্ব্বল ও অসহায়, এই প্রকারের অবসাদ যে কতবার আসিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। যাঁহারা আশ্বাস দিয়াছিলেন তাঁহারা নিরুত্তর, যাঁহাদের ভরসা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক তাঁহাদেরও সাড়া নাই। যে আহ্বানের অন্তরালে তাড়নার আশঙ্কা নাই সে আহ্বান কে শুনিবে ?

কিন্তু আমাদের সে বাধা ও উপেক্ষার দিকে, সে অকৃতকার্য্যতার সহস্র সহস্র নির্ম্মম সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করার সময়ও নাই, আবশ্যকও নাই। এখন কেবল আশার মন্ত্রে মত্ত হইয়া, হৃদয়ে উৎসাহের প্রখর বহ্নিশিখা প্রজ্বালিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ যতটুকু সুবিধা ঘটিয়াছে

প্রাণপণে তাহারই সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আরও অধিক সুবিধার আশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে বর্ত্তমান সুবিধাটুকু হইতেও হয়ত বঞ্চিত হইতে হইবে।

ঐ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, তথায় অভাবের সীমা নাই, অসংখ্য প্রকারের কাতর আহ্বান-ধ্বনি ঐ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া কর্ণে নিনাদিত হইতেছে, সহস্র সহস্র করুণ দৃশ্যে হৃদয় প্রত্যেক মুহুর্ত্তেই ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বানধ্বনি যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, আমরা তাঁহাদেরই ডাকিতেছি, তাঁহারা আসিয়া আমাদের সহায়তা করুন, আমাদের বল দান করুন, আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। সে আহ্বান কাণ পাতিয়া শুনিতে হয়, যাঁহারা সে আহ্বান শুনিতে চাহেন তাঁহারাও আসুন আমাদের সহিত মিলিত হউন। যাঁহারা বধির, শুনিয়াও যাঁহারা শুনিবেন না, জানিয়াও যাঁহারা ভুলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টান্বিত, তাঁহারা দূরে থাকুন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি নাই—সম্রমে তাঁহাদের প্রণাম করিতেছি, তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমরা কেবল এইটুকু বুঝিয়াছি যে বিধাতার রাজ্যে মেকি চলিবে না, ভাবের ঘরে চুরি করিয়া এই প্রাচীন ও অত্যুন্নত দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে: আর বাকি কি? এখন সাবধান হইতে হইবে। নামের জন্য দেশের সেবা, অর্থের জন্য সাহিত্যের সাধনা, অক্ষম ব্যক্তির সুলভে গৌরবান্বিত হইবার চেষ্টাকে পরোপকারের নামে বাজারে বিক্রয়!—সে ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইবে, সে মোহের ভূমি, সে অহঙ্কারের ভূমি, সে ভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন ব্যক্তি বা জাতি কখনও কোন উন্নততর সফলতা পায় নাই; এখন আমাদিগকে সত্যের ভূমিতে দাঁড়াইতে হইবে। বাধার দিকে চাহিব না, চাহিব নিজের হৃদয়ের দিকে, আর ঐ কর্ম্মভূমির দিকে!

যখন মনে হয় আমরাই এই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, যখন সফলতার গৌরব-মুকুটের প্রতি অজ্ঞাতসারেও অন্তরমধ্যে লোভ জাগিয়া উঠে, তখনই ভয় হয়, এই বুঝি, সমস্ত যত্ন, সমস্ত পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়া গেল, মানবকে বা মানব সমাজকে যখন আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দাতা বলিয়া মনে করি তখনই ভয়, তখনই অবসাদ। প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যের যিনি অধিকারী, যদি হৃদয়মধ্যে তাঁহার প্রেরণা অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের এই চেষ্টাময় ব্যর্থতাগুলিকেও সান্ত্বনা ও আনন্দের নিদান বলিয়া মনে হয়। তাই বলিতেছিলাম বাধার

দিকে চাহিব না, বাহির হইতে যে বল ও যে সহায় আসিবে, তাহার আশায় উৎকণ্ঠিত হইব না—যিনি সকল শক্তির উৎস, এই মহাজাতির জীবনধারার যিনি একমাত্র নিয়ামক, এই প্রাচীন দেশের প্রাণের মধ্যে বসিয়া যিনি সুখ দুঃখ ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়া আপনার রহস্যময় লীলার জাল বয়ন করিতেছেন আমাদিগকে সেই পরম পুরুষেরই আদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, আমরা তাঁহারই যন্ত্র এই ভাবে আমাদের নিজ নিজ শক্তির ব্যবহার করিতে হইবে। কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া শ্রদ্ধান্বিত ভাবে কর্ম্মভূমির দিকেই চাহিতে হইবে।

ঐ আমাদের স্বদেশ, ঐ আমাদের কর্ম্মভূমি!—ঐ কোটি কোটি নরনারী, কেহই তাহাদের কথা শোনে না, কেহই তাহাদের অভাব বুঝিতে চেষ্টা করে না! মহানগরীর ব্যস্ততাময় বক্ষোদেশ, সভায় ও সমিতিতে, জল্পনায় ও কল্পনায়, বক্তৃতায় ও মসীযুদ্ধে ভারাক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু হে বুভুক্ষু দেশবাসীগণ, হে সহিষ্ণু, হে দরিদ্র, হে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণ, তোমাদের নিত্য অতৃপ্ত জঠরানলের শান্তির জন্য এক মুষ্টি অন্নও আসিতেছে না, তোমাদের শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত্ত তালু সরস করিবার জন্য এক গণ্ডুষ জলও আসিতেছে না। তুমি কেবল পরের জন্য নীরবে ও অশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াই চলিয়াছ—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে, তোমার মুখে একটিও কথা নাই। তোমরাই যথার্থ ভারতসন্তান, প্রাচীন ভারতবর্ষ তোমাদের মধ্যেই অবিকৃতভাবে সমাধিমগ্ন, আমরা যে তোমাদেরই পূজা করিতে আসিয়াছি, তোমাদের হৃদয় মধ্যে যে ব্রহ্ম-সত্ত্বা সমাধিস্থ আমরা যে তাঁহারই উদ্বোধন করিতে চাই।

তোমাদেরই শ্রমলব্ধ অর্থে মহানগরীর বিলাস কৌতুক নিত্য নব নব অকিঞ্চিৎকরতার মধ্য দিয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে; ঐ দেখ তোমাদের যাঁহারা রক্ষকও নেতা তাঁহারা কি বিফল আড়ম্বড়েই আত্মহারা হইয়া কি মোহমরীচিকারই না অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু সে জন্যই বা কে দায়ী কেমন করিয়া জানিব? কেমন করিয়া তাহার প্রতিকার হইতে পারে তাহাই বা কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে? আজ, তোমার দিকে চাহিয়া, তোমার কথা ভাবিয়া, কেবল সেই মহা তপস্বী ভারতবর্ষকেই স্মরণ হইতেছে, দ্বারে দ্বারে সেই ভারতবর্ষের মহিমাই ঘোষণা করিতে আগ্রহ জাগিতেছে।

একদিন ভারতবর্ষ এই পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর জগৎকে এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরাজ্যের সোপান বলিয়া ইহার কর্ত্তব্যগুলি অবহিতচিত্তে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল ব্রহ্মেরই উপাসক ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে পুত্র

অপেক্ষা, বিত্ত অপেক্ষা, ইহলোকে প্রাপ্য অন্যান্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তর ও অন্তরতম জানিয়া পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, শিল্পে ও সাহিত্যে সেই তত্ত্বই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকল বলের ঊর্দ্ধে তপোবলের মহিমা কেবল যে কীর্ত্তন করিয়াই গিয়াছেন তাহা নহে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে বলীয়ান হইয়া রোষহীন ভাবে শত্রু জয় করিয়াছেন, সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যপালন করিয়াছেন, কামনাহীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অনাসক্তভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সেই জাতিই সাধনার পরিণত অবস্থায় সমস্ত বিশ্বে এক চিন্ময়-সুন্দরের মহতী লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মানবে ও ঈশ্বরে যে দুরতিক্রমনীয় ব্যবধান তাহা অতিক্রম করিয়া গৃহে গৃহে গৃহদেবতারূপে, গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবতারূপে সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, স্নানাহার শয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম একেবারেই ভৌতিক বলিয়া স্থূলদর্শীর অবজ্ঞার বিষয়, তাহার মধ্যেও পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই "অবাঙমানসগোচর" এর সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন। সে এক অতি আশ্চর্য্য মহাসাধনার পরিণত ফল! সেই মহাজাতিরই সাধনার নিকট নারায়ণ মানবের গৃহে গৃহে মানবশিশুরূপে আবির্ভূত হইয়া এই মাটির পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ-লাঞ্ছিত চিন্ময় জ্যোতির মহাপ্রকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন, আদ্যাশক্তি মহামায়া মাতৃরূপে পৃথিবীর প্রত্যেক নারীর মধ্যে আপনার মহিমা দেখাইয়াছেন; মানব যে অমৃতের সন্তান, মানব যে মানব হইয়াই ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা এই জাতির সাধনাতেই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবের এই স্নেহে ও প্রেমে, এই সহস্র প্রকার ভালবাসাবাসির মধ্যে নিখিল-রসামৃত-সিন্ধুর মধুর রসের প্রবাহ এই জাতিই একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ইহারা যে সেই জাতি! ইহারা ব্রহ্মকে কেবল কল্পনামাত্রই করে নাই, ব্রহ্মের জন্য ইহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহার ফলে আর একদিন সকল রস ও সকল ভাবের মধ্যে পূর্ণতমরূপে সেই চিন্ময় সুন্দরকে ফিরাইয়া পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। এ যে সেই মহাজাতি! আজ এই দুর্দ্দিনের অমানিশার মধ্যেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছি ইহাদের অস্থি মজ্জায় এখনও সেই স্পর্শমণির স্পর্শ লাগিয়া রহিয়াছে। দোহাই তোমাদের! অনাহারে শীর্ণ বলিয়া ইহাদের ঘৃণা করিও না, দুর্ব্বল অথচ শ্রমশীল বলিয়া ইহাদের অনাদর করিও না, আমাদের এই মসী-অঙ্কিত অক্ষরের সহিত পরিচয় না থাকিলেও তাহারাই একদিন অক্ষর ব্রহ্মের নিবিড়তম পরিচয় পাইয়াছিল, সে দিনের সে কথা ইহারা এখনও ভোলে নাই। এই জাতির গ্রামে গ্রামে এখনও দেব মন্দিরের চূড়া

মানবের সমস্ত গৃহকে অধঃকৃত করিয়া গৌরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক উপবন, প্রত্যেক তিথি এক এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তিশালী মহাপুরুষের স্মৃতি বহন করিয়া এই জাতির জীবনকে এখনও গৌরবে ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ করিতেছে। ধন্য এই জাতি! কি কঠোর ব্রতশীল ইহারা! ইহারা ব্রহ্মের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, অনন্ত জীবনের জন্য, কত ক্লেশ, কত অনাহার, কত স্বেচ্ছাব্রত অসুবিধা সানন্দে ভোগ করিতেছে। আজ ইহাদের ব্রতমাহাত্ম্য, আমরা বুঝিতে পারি না, ভোগ-সুখ-সর্ব্বস্ব, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ আমরা, ঋষিত্বের মেষচর্ম্মে আমরা আমাদের ব্যাঘ্রপ্রকৃতি গোপন করিয়া বাক্যের কুহকে অতীতের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া নিজেদের যশোমন্দির নির্ম্মাণ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছি, তাই আমরা ভারতবর্ষকে বুঝিলাম না। তাই ভারতের তীর্থসেবা, ভারতের ব্রতপালন, মন্ত্রসাধন আমাদের উপহাসের বিষয় হইল!

তুমি ইহাদের নাকি তুলিতে চাহিতেছ? তুমি নাকি ইহাদের মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর, দোহাই তোমার! ইহাদের বিপথে লইয়া যাইও না, ইহাদের সেই প্রাণের কথা, সেই স্পর্শমণির নিবিড় স্পর্শের কথা একবার ইহাদের স্মরণ করাইয়া দাও, দেখিবে ভারতবর্ষ কি, ভারতের মহাতপস্যার প্রকৃতি কি? ইহারা পূজ্য, ঘৃণ্য নহে, ইহারা দেবতা, বর্ব্বর নহে; নারায়ণ ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন, তবে বুঝি তিনি কারণার্ণবশায়ী—এস দেখি তাঁহার উদ্বোধন করি। প্রাচীন মন্ত্রে উদ্বোধন করিতে হইবে নূতন কথায় ভুলিও না, এ যে কেবল কথা, কেবল ছলনা! ইহাতে সিদ্ধ পুরুষের শক্তি নাই। কেবল মুখের কথায় নারায়ণ জাগিবেন না, সিদ্ধমন্ত্রে সাধনা করিয়া তাঁহাকে জাগাইতে হইবে।

আজ আমরা আমাদের এই পৃথিবীকেই সকলের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, আজ ইন্দ্রিয়ের সুখ সুবিধার বাহিরে যাহা কিছু আছে বলিয়া মানব ভাবিতে পারে বা ভাবিয়াছে, আমরা সে সমস্তকে কাল্পনিক বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, তাই আজ এই প্রাচীন জাতির সাধনা আমাদের অবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ বড় বড় নূতন নূতন কথা লইয়া আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। হায় এতকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুই কি করেন নাই? আমরা ভাবিতেছি আমাদিগকে বুঝি সব নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। আমাদের কি আছে, এত যুগ যুগান্তের মধ্য দিয়া এত বড় একটা জাতি কি করিয়াছে, বা কি করিতে চাহিয়াছিল তাহা হিসাব করিবার সময়ও নাই, শক্তিও

নাই, অথচ কেমন একটা কর্ম্মের মাদকতাময় উত্তেজনা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়া বসিয়াছে, দেশের জন্য, সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, যাহা হউক একটা কিছু করিতেই হইবে। যাহা করিতেছি তাহা অকর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম, কি কর্ম্ম, তাহার প্রয়োজন আছে কি নাই, তাহা ভাবিবার সময় নাই।

এই মহাজাতির বিশাল সাধনারাজ্যের মধ্যে যে কি মহৎ রহস্যসমূহ লুক্কায়িত আছে, তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিবার ও শ্রদ্ধান্বিতভাবে উপলব্ধি করিবার আমাদের অবসর নাই। একদিন এই জাতি নানাবিপদে আক্রান্ত হইয়া, বহিঃ-প্রকৃতির বিবিধ উপদ্রব ও অন্তঃপ্রকৃতির সীমাহীন বিদ্রোহে কাতর হইয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার শরণাপন্ন হইয়াছিল, সেদিন তিনি "পরিভবঘ্ন", সকল প্রকার বিপদ ও পরাভবে একমাত্র রক্ষাকারীরূপে, শরণাগত-বৎসল বেশে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন—সেই একদিন এক ভাবের পরিচয়। ক্রমে পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ট হইয়াছিল, তখন তিনি "অভীষ্টদোহ", বাঞ্ছাকল্পতরু,—মানব যাহা কিছু চাহি-য়াছে, তাঁহারই নিকট চাহিয়াছে, অন্যের শরণাপন্ন হয় নাই। তাহার পর ক্রমে সেই পরম দৈবতের সহিত পরিচয় নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়াছে—তিনিই জীবনের একমাত্র সম্বল, তিনিই একমাত্র আশ্রয় ও অন্বেষণীয়রূপে মানবের সাধনার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। তখন তিনি "তীর্থাস্পদ", তীর্থে তীর্থে তাঁহার অন্বেষণের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের পবিত্র তীর্থগণ! তোমরাই এই প্রাচীন ব্রহ্ম-সর্ব্বস্ব সমাজ ও সভ্যতাকে তাহার সাধনার পারম্প-র্য্যের মধ্য দিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছ, কতযুগ আসিয়াছে, কতযুগ গিয়াছে. মন্বন্তরে মন্বন্তরে কত সহস্র নব নব সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষগণ নিষেবিত তোমাদের নিষ্কলঙ্ক বক্ষে হিন্দুর প্রতিভা-প্রদীপ অম্লান জ্যোতিতে চিরভাস্বর। হিন্দু তাহার প্রাণারাম হৃদয়-ধনকে, সেই শরণা-গত পালককে খুঁজিবার জন্য তীর্থে তীর্থে কি বিপুল ক্লেশই না সহ্য করিয়া ভ্রমণ করিয়াছে। দূরদূরান্তে পবিত্র তীর্থগুলির অবস্থান, কোথায় হিমাচলের অভ্রংলিহ তুঙ্গ শৃঙ্গ,—দুরারোহ ও তুষারময়, আর কোথায় কুমারিকা ও কামরূপ, গিরি, দরী, নদী, প্রান্তর—সীমা নাই, সংখ্যা নাই। শত শত তীর্থযাত্রী সংসারের সকল আশায় বিসর্জ্জন দিয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলিয়াছে—কণ্টকাকীর্ণ, অতিদুর্গম পথ দস্যুতস্করে উপদ্রুত ও শ্বাপদ-সঙ্কুল, —মস্তকে নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্যাকর, চরণে তপ্তবালুকা ও কুশাঙ্কুর, অঙ্গে কণ্টক-

ক্ষত—আবার বর্ষার বৃষ্টিধারা ও করকাপাত, হেমন্তের ভীষণ শিশির, তাহারই মধ্য দিয়া শত শত মুমুক্ষু তীর্থযাত্রী সেই ব্রহ্মের অন্বেষণ করিয়াছে। সে কি মহাসাধনা! আজ এই সুখ সুবিধা ও ইন্দ্রিয়ভোগের দিনে আমরা তাহা ধারণা করিতেও পারি না।

এই ভাবে মানব, সাধনার মধ্যদিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছে, যিনি রস-স্বরূপ, আনন্দই যাঁহার প্রকৃতি, সাধকের এই ব্যাকুল অন্বেষণে তিনি কি নিরুত্তর হইয়া বসিয়াছিলেন? হিন্দুর ইতিহাস বলে, না; মানব যত জোরে তাঁহাকে খুঁজিয়াছে, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক জোরে তিনি মানবকে খুঁজিয়াছেন, তাই তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ মানব—মানব-ঈশ্বর—নর-নারায়ণ—এই দেশেই তিনি আসিয়াছিলেন, যে লীলার মধ্য দিয়া বৈকুণ্ঠ আসিয়া এই মরজগতকে আলিঙ্গন করিয়াছিল সেই মহতী লীলা এই প্রাচীন জাতির অস্থিমজ্জায় এখনও গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। যখন শ্রীরামচন্দ্র, পিতার আদেশে "সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্য-লক্ষ্মী" ত্যাগ করিয়া রাজসিংহাসন ছাড়িয়া জটা বল্কল ধারণপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিলেন, যখন অনুজ লক্ষ্ণ, প্রিয়তমা সীতা সানন্দে সেই মায়া-মনুষ্যের অনুবর্ত্তন করিলেন, তখন কি মানবের পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও পতিত্ব বৈকুণ্ঠের অমর রশ্মিতে অভিরঞ্জিত হয় নাই? সেদিন কি মানব এই জগতেই বৈকুণ্ঠও বৈকুণ্ঠপতির আবির্ভাব ও লীলা দেখে নাই? এই প্রাচীন জাতির ইতিহাসে জানিনা এই প্রকারের কত পবিত্র ও কত আশ্চর্য্য কথাই না রহিয়াছে! আজ আবার কে আমাদিগকে সেই 'অমৃত সমান' কথার রস আস্বাদন করাইয়া অমর করিবে, ধন্য করিবে? হে ভারত, এসমস্ত মহাবাণী তুমি বিস্মৃত হইও না। তোমার জীবনের গূঢ় তথ্য এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। হে আমাদের সাহিত্য! জানিনা সে কবে, যে দিন আবার তোমার বক্ষোদেশে আমরা এই প্রাচীন জাতিকে পুনর্জ্জীবিত দেখিতে পাইব! যেদিন তুমি সহস্র ধারায় এই শস্যশ্যামল দেশের পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া যাইবে—নীরস, শুষ্ক, সংসারভারজর্জ্জরিত ও কুশিক্ষা প্রভাবে বিলাস-লালসা-কাতর হৃদয়গুলি তোমার অমৃতময় কোমল স্পর্শে আবার সরস ও সবল হইয়া উঠিবে—আবার কবে মৃততরু মুঞ্জরিত হইবে,—ভক্তিপ্রেমের মন্দাকিনীতে আবার কবে ত্যাগ-মন্ত্রের কল্লোলধ্বনি জাগিয়া উঠিবে?—আমরা যে সেই দিনেরই আশায় বসিয়া রহিয়াছি—সেই মহাসাধনাতেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক—কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র ও অসহায়, কত অসহায় তাহা কেহই জানেনা,

কারণ তাহা ধারণাতীত, তাই কেবল তাঁহাকেই ডাকিতেছি, যাঁহাকে এই প্রাচীন জাতি প্রত্যহ ডাকিয়া থাকে—

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্য-লক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য-বচসা যদগাদরণ্যং,
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥"

অশ্রু।

চির-সাথী তুই, জীবনের পথে
আয়, অশ্রু, আয় উজলি আঁখি
গাঁথিয়া যতনে মুকুতার মালা
আদরে এ বুকে সাজায়ে রাখি।
নব আষাঢ়ের স্নিগ্ধ শীতল
হৃদয়-জুড়ানো মাধুরী ল'য়ে
আয় অশ্রু, আমি কাঁদি একবার
আয় মোর বুকে নয়ন ব'য়ে।
নিভে যাক্ জ্বালা; যত পাপ তাপ
ধুয়ে মুছে যাক্ চাতুরী ছলা,
আয় রে অশ্রু, কাঁদি একবার
বালকের মত ছাড়িয়া গলা।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে হৃদয়,
দারুণ নিরাশা অশনি ঘায়,
শত উপেক্ষায় জর জর প্রাণ
অনুতাপানলে জ্বলিছে হায়।

আয় আঁখি-জল, আয় আজি তোরে,
প্রাণের আবেগে ডাকিরে তাই।
শৈশবের যাহা গিয়াছে চলিয়া,
আমি তো তাহার কিছুনা চাই॥
শুধু চাই তোরে, তুই শুধু আয়,
শৈশবের পূত অমূল্য-নিধি।
আয় তোরে পেয়ে ভুলে যাই সব
কাদিয়া কাঁদিয়া জুড়াক হৃদি॥
আয় চির সাথি! থাক্ মোর সাথে,
মরুময় এই ধরণী বুকে,
বিপদের মাঝে এ দুঃখ-আগারে
তোরে সাথে ল'য়ে থাকিব সুখে।
কাঁদিয়া জনম, কাঁদি চিরকাল
অতীতের স্মৃতি রোদন-ময়,
নয়ন-সলিলে ভাসিয়া ভাসিয়া
নীরব মরণে লভিব লয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

নাট্য-সাহিত্যে দীনবন্ধু।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাটকের বিশেষ অভাব থাকিলেও, নাটক রচনা আমাদের দেশে নূতন নহে। সংস্কৃত-সাহিত্য দৃশ্যকাব্যে এত সমৃদ্ধিশালী ছিল যে বোধ হয় এক গ্রীক ভিন্ন অন্য কোনও প্রাচীন সাহিত্য সেরূপ ছিল না।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে নাট্যচর্চ্চা।

আলঙ্কারিকদিগের গ্রন্থে রূপক ও উপরূপকের যে লক্ষণ ও দৃষ্টান্তাদি আছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সকল বিভিন্ন প্রকার দৃশ্যকাব্য প্রচলিত আছে, সে সমস্তই সংস্কৃতভাষায় বর্ত্তমান ছিল। তথাপি, এরূপ উন্নত-আদর্শ-পুরঃসর হইয়াও প্রাচীন বঙ্গভাষা যে কেন নাট্য-সাহিত্যে এত দরিদ্র তাহা বলা কঠিন। প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে যদিও 'বিদগ্ধ-মাধব', 'ললিত-মাধব', 'দানকেলিকৌমুদী', 'জগন্নাথবল্লভ', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি কতকগুলি ভক্তিরসাশ্রিত ধর্ম্মপ্রধান নাটক সংস্কৃতভাষায় রচিত হইয়াছিল, তথাপি দেশীয় ভাষায় নাটক রচনা করিতে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। * শুধু যে নাট্যকলার চর্চ্চা ছিল না এমন নহে, বোধ হয় বঙ্গদেশে নাটকের বহুল প্রচারও ছিল না। আলোচনা থাকিলে, বোধ হয় প্রচারও বহুল হইত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় অধ্যাপকগণের নাটকসম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতা ছিল, যে স্যার উইলিয়াম জোন্স সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে নাটকের প্রকৃত বিবরণ অবগত হইতে পারেন নাই।

কিন্তু নাটকের অভাব থাকিলেও, একশ্রেণীর খাঁটী দেশী নাট্যাভিনয় বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। ইউরোপে যেরূপ মধ্যযুগ (১০ম-শতাব্দী) হইতে ধর্ম্ম-বিষয়ক 'মিষ্ট্রী' (Mystery) বা 'মিরাকেল্' (Miracle-plays)এর প্রচলন ছিল, আমাদের দেশে সেইরূপ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের

ধর্ম্ম বিষয়ক যাত্রা।

বহুপূর্ব্ব হইতে, শিব বা শক্তিমাহাত্ম্য অথবা রামায়ণ-কথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক 'যাত্রা' প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলারও অভিনয় হইতে আরম্ভ হইল। এই কৃষ্ণযাত্রা পরে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এবং সাধারণতঃ ইহা 'কালীয়-দমন' যাত্রা নামে অভিহিত হইত। কালীয়-দমন

* এই সময় গ্রন্থ পয়ারাদিছন্দে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অভিনয়ের কতদূর উপযোগী হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

নাম হইলেও, এই যাত্রায় দান, মান, মাথুর, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাও অভিনীত হইত। এই যাত্রা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উত্থান সময় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্থান পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর জীবিত ছিল।

যাত্রা ও মধ্যযুগের 'মিষ্ট্রি' (Mystery-plays) উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈষম্য।

মধ্যযুগের ধর্ম্মাত্মক 'মিষ্ট্রীস্' হইতে যেমন চারিশত বৎসরের চেষ্টার পর ইংলণ্ডের নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, কালে আমাদেরও এই যাত্রা হইতে তেমনি জাতীয় নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি হইত। কেন এরূপ হয় নাই, তাহা বলা কঠিন। 'মিষ্ট্রী' ও 'মিরাকেলের' সহিত যাত্রার উৎপত্তি ও প্রকৃতি-গত যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং নাটকত্বের বীজ বোধ হয় উভয়ের মধ্যে সমান পরিমাণে রহিয়াছে। তথাপি স্থান, কাল, ও অবস্থাভেদে এক দেশে যাহা হইয়াছে, অন্যদেশে তাহা বিকশিত হইতে অবকাশ পায় নাই।

যে অবস্থায় ইউরোপে 'মিষ্ট্রীস্' আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গালায় অনেকটা সেই অবস্থায় যাত্রা আরম্ভ হয়। জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বগুলি অভিনয়ছলে বুঝাইয়া দিবার জন্যই, উভয়ের প্রথম সৃষ্টি। কিন্তু ইউরোপে মধ্যযুগের পর নবযুগ (Renaissance)এর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকের অত্যধিক ধর্ম্মানুরক্তি ও বৈরাগ্যপ্রিয়তার মোহ কাটিয়া গিয়াছিল, তখন অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের ন্যায় এই লোক-রঞ্জনের উপায়টিও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আদর্শও বদ্‌লাইয়া গেল। অন্তর্জ্জগৎ, বহির্জগৎ, সমাজ, ইতিহাস, মানবজাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। লোকে বুঝিতে লাগিল যে ইহলোক ছাড়িয়া পরলোক নহে; সংসার ও সন্ন্যাস, উভয়কে সমান আদরের সহিত, এক মহা-সমন্বয়ের ভূমিতে দাঁড় করাইতে হইবে। এই নূতন আদর্শের আলোকে, এবং জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, নাট্যসাহিত্য ধর্ম্মের নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ শিখর ত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবনের কলরবপ্রীতিমুখরিত বিপুল সমতলভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাত্রা হইতে নাটকোৎপত্তি হয় নাই কেন?

কিন্তু সন্ন্যাসপ্রবণ বৈরাগ্যপ্রিয় হিন্দুহৃদয়ে এরূপ বিপর্য্যয় আসে নাই। অধিকন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব, স্বাভাবতঃ ঐহিক সুখে বীতস্পৃহ হৃদয়কে আরও সংসার-বিমুখ করিয়া তুলিল। তারপর শাক্ত বৈষ্ণবের দলাদলির মধ্যে পড়িয়া, লোকে অভিনীত বস্তুর ধর্ম্মমূলক তাৎপর্য্যটুকুই গ্রহণ করিত, নাট্য-রসের

দিকে লক্ষ্য রাখিত না। এরূপ ক্ষেত্রে কৃষ্ণযাত্রা বা ধর্ম্মাত্মক অভিনয় ভিন্ন নাট্যসাহিত্যের আর প্রসর কোথায় ?

হিন্দুর মজ্জাগত বৈরাগ্য ও আত্মতৃপ্তির ভাব।

হিন্দুহৃদয় স্বভাবতঃ বৈরাগ্যপ্রবণ। এই মজ্জাগত বৈরাগ্যের ভাব তাহাদিগকে চিরকাল নিস্পৃহ, কর্ম্মবিমুখ ও অসাড় করিয়া রাখিয়াছে। আবার যেমন ইহলোকে এই Pessimism (দুঃখবাদ) এর ভাব, পরলোক সম্বন্ধে তেমনি বিপুল Optimism, আত্মপ্রসাদ, আশা ও বিশ্বাস। সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন সমস্যাগুলি ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে যাঁহাদের নিকট এত সহজ ও স্পষ্ট সামান্য বিষয়ে কাজেই তাঁহাদের অমনোযোগ। কিন্তু যে আত্মতৃপ্ত জাতির জীবনে বৈচিত্র্য নাই, মারামারি নাই, ঘাত প্রতিঘাত নাই, যাহাকে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অবস্থাগুলি বিচলিত করিতে পারে না, তাহার অন্তর্লীন শক্তি কিরূপে বুঝা যাইবে ? তাহার বহির্মুখ জীবনের বিকাশ কোথায় ? বাস্তবিক, জাতীয় জীবনের এই বহুশতাব্দব্যাপী নির্জ্জীবতাই জাতীয় নাট্যসাহিত্যের অভাবের একটি প্রধান কারণ। জাতীয় নাট্যশালা জাতীয় গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ ও সমাজের বহির্মুখ জীবনের একটি সচেতন ভাবের পরিচায়ক। ইংলণ্ডেই বল, গ্রীসেই বল, নাট্যসাহিত্য জাতীয় অভ্যুদয়ের সমকালবর্ত্তী। কিন্তু "থর্ম্মপলি" বা "আর্মাডা" (Armada) পরাজয়ের অপেক্ষা একটা বিশালতর ঘটনা আমাদেরও জাতীয় জীবনে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ের কথা বলিতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসারদাচরণ মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার এই অভ্যুদয়ের দিনকে বাঙ্গালায় Renaissance period বলিয়াছেন।* কিন্তু এইরূপ একটা বিশাল বিপ্লবও জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় চিন্তার গতি ফিরাইয়া দিতে পারে নাই, নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টির কথাত দূরে থাকুক। চৈতন্যের আবির্ভাবে একটা নবযুগের আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা (cosmopolitanism) ও অতিব্যাপক প্রেমের আদর্শ জাতীয়ত্বের বিকাশ বা জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না। আমাদের জড়ত্বাভিশপ্ত দেশের জীবনে নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু এই ধর্ম্মোন্মত্ততা মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে দিল না, তারল্যে মাধুর্য্যে

জাতীয় সজীবতার অভাব।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব।

* সাহিত্য ১৩১৫।

ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই জন্য নাট্য সাহিত্যের পরিবর্ত্তে আমরা প্রেমামৃত-পরিপ্লুত এক বিপুল গীতি-সাহিত্যের অধিকারী হইলাম।

জাতীয় প্রতিভার বিশেষত্ব।

হিন্দু প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে ইহা চিরকাল পূজাগৃহে, মন্দিরমণ্ডপে, বিকশিত হইয়াছে। দেবলীলা ও অদৃষ্টবাদের দ্বারা অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতেছি না, সংস্কৃত সাহিত্যেও এইরূপ দেখা যায়। আমাদের দেশে সন্ন্যাসাদর্শের প্রাধান্য ও সাত্ত্বিকগুণের প্রাবল্যে, শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি তত অপ্রাতহত ভাবে হয় নাই। কারণ লৌকিক বা ব্যবহারিক জীবনের প্রতি পরাঙ্মুখতা এতৎ সমুদয়ের বিকাশের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়। সেই জন্য যেটুকু স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল তাহাও অতি বিলম্বে ও অনেক পরবর্ত্তী যুগে হইয়াছিল। রাজসিক-গুণ-প্রধান বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের যুগেই সংস্কৃত নাট্য কলার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে এই সজীবতার অভাব যে শুধু আমাদের সমাজ ও জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের জন্য হইয়াছিল, তাহা নহে, রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য অবস্থাগুলির বিশেষত্বও ধরিতে হইবে। বিক্রমাদিত্য বা শ্রীহর্ষের

প্রাচীন বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা।

যুগের ন্যায়, মুসলমানাধিকৃত প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক জীবনের সে স্ফূর্ত্তি কোথায় পাওয়া যাইবে? বহু শতাব্দীর পরাধীনতায় ও অত্যাচারে অশক্ত দুর্ব্বল মন্দভাগ্য বঙ্গ সমাজের সে প্রাচীন গৌরব বহুকাল অস্তমিত হইয়াছিল। পরাধীন জাতির জাতীয় সাহিত্যের স্পর্দ্ধার ন্যায় হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। বিক্রমাদিত্য বা হর্ষবর্দ্ধনের ন্যায় রাজার অনুরাগ ও উৎসাহ না পাইলে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি আশা করিতে পারা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের মুসলমান রাজাগণ নৃত্য কৌতুকের অনুরাগী হইলেও, শিক্ষার অভাবেই হউক অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধের জন্যই হউক, নাট্য শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। জাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালাও অন্তর্হিত হইয়াছিল।

যাত্রা ও 'মিষ্ট্রী' উভয়ের মধ্যে নাটকত্বের বীজ।

এই সমস্ত প্রতিকূল কারণ বশতঃ জাতীয় রঙ্গভূমির উৎপত্তি সম্ভব না হইলেও, 'মিষ্ট্রী' ও 'মিরাকেল' এর ন্যায় যাত্রার ও নাটকের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, যাত্রার প্রতিপাদ্য বিষয় দেবদেবী বা সাধুদিগের প্রসঙ্গ হইলেও, যাত্রাকার আপনার অভিনয়ে একটি জীবন্ত চিত্রের

ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেন। এই realism বা স্বভাবাঙ্কন চেষ্টা-টুকু নাটকের একটি বিশেষ উপাদান। দ্বিতীয়তঃ, এই স্বভাবাঙ্কনের ফলে, যাত্রায় হাস্য ও করুণরসের একটা বেশ অম্ল-মধুর সংমিশ্রণ হইত। নিরবচ্ছিন্ন হাস্য বা নিরবচ্ছিন্ন করুণরস থাকিলে যেমন জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠে, নাটকেও অনেকটা সেইরূপ। এই হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রণও উচ্চ শ্রেণীর নাটকের একটি বিশেষ লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক যাত্রা একটা নির্দ্দিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনীয় বস্তু (plot) প্রতিপাদন করিত; শুধু কতকগুলি সামঞ্জস্যহীন অসংলগ্ন দৃশ্যের সমাবেশে পর্য্যবসিত হইত না। এই জন্যই যাত্রাকার বিমুগ্ধ শ্রোতার হৃদয়পটে অভিনয়ের উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলি বেশ সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। দক্ষ যাত্রাকারের এইটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুরাতন পর্য্যায়ের ‘বঙ্গদর্শনের’ জনৈক লেখক বীরভূম নিবাসী পরমানন্দের বিখ্যাত যাত্রা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে “তাহার যাত্রা আদ্যন্ত শুনিতে হইত। তাহার যাত্রা শুনিতে গিয়া একটি কি দুইটি গান শুনিয়া আসিলে রসের কিছুই অনুভব হইত না।”*

কিন্তু নাটকের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে, যাত্রার একটি বিশেষ বাধা ছিল। কথোপকথন বা অভিনয় থাকিলেও, যাত্রা প্রায়ই সঙ্গীত-প্রধান ও ভাবপ্রবণ।

যাত্রায় সঙ্গীত-বাহুল্য ও ভাবপ্রবণতা।

মহাজনী পদ “পত্তন” দিয়া, অথবা চৌপদী গাহিয়া, অথবা কীর্ত্তনের সুরে “তুক্কো” করিয়া, অমৃতের লহরী ছুটাইয়া শ্রোতার মন আর্দ্র করিয়া দেওয়াই, যাত্রাকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য অনেক প্রতিভাশালী যাত্রাকার এ সমস্ত নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে পারিতেন না। ‘বঙ্গদর্শনে’র পূর্ব্বোল্লিখিত লেখকের নিকট হইতে আমরা জানিতে পারি যে “পরমা অধিকারীর যাত্রায় গীতের ভাগ অধিক ছিল না, কাব্যরস (নাট্যরস ?) ঘটাইবার নিমিত্ত পরমা কথাবার্ত্তাই অধিক কহিত।” তথাপি অনেকেই অবগত আছেন, পরমার ‘তুক্কো’র ন্যায় সুশ্রাব্য সুর আর কিছুই বাঙ্গালায় হয় নাই, এবং এই ‘তুক্কো’ই তাহার যাত্রার প্রধান আকর্ষণ ছিল।

কালে এই সঙ্গীত-বাহুল্য ও প্রেম-রসাচ্ছন্নতা ঘুচিয়া গিয়া, যাত্রায় প্রকৃত নাট্যরসের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছিল। পরমার ন্যায় পরবর্ত্তী (১৮শ শতাব্দের শেষভাগে) অনেক যাত্রায় কথাবার্ত্তা ও অভিনয়ের আধিক্য থাকিত।

* বঙ্গদর্শন ১২৮৯—৯০।

কালীয় দমন যাত্রার নিবৃত্তির পর সখের দল প্রভৃতি যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক যাত্রা উঠিয়াছিল, তাহা গীতবাদ্যে রঙ্গদার হইলেও, তাহাতে নাটকীয় ভাব ও পদ্ধতি আপনা-আপনি যথেষ্ট বিকশিত হইতেছিল। বেলতলা ও এঁড়েদার যাত্রা, গোপাল উড়ের যাত্রা, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে। এমন কি সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার অনুকরণে, কালুয়া ভুলুয়া, মেথর ও মেথরাণী প্রভৃতির হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ, যাত্রার প্রারম্ভে দেখা যাইতে লাগিল। এইগুলি অনেকটা ইংরাজী Interludeএর মত। এই সকল যাত্রার আর একটু বিশেষত্ব ছিল। কালীয় দমনাদি যাত্রায় কেবল দেবতার প্রসঙ্গ হইত, এই সকল যাত্রায় বিদ্যাসুন্দর নলদময়ন্তী প্রভৃতি মনুষ্যের ঘটনারও স্থান ছিল।

যাত্রায় নাট্যকলার বিকাশ।

কিন্তু এসকল উন্নতি সত্ত্বেও, আর একটী বিশেষ আপদ উপস্থিত হইল, এবং তজ্জন্য নাট্যকলার স্বাভাবিক বিকাশ আর অপ্রতিহতভাবে হইতে পাইল না। কালীয় দমন যাত্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, শুধু যে সাবেক অভিনয় প্রণালী অন্তর্হিত হইল এবং তাহার স্থানে শামলা, পেণ্টুলুন্, সাধুভাষা, বক্তৃতা, চাৎকার, পতন প্রভৃতি উপস্থিত হইল তাহা নহে, মহাজনী পদের স্থানে টপ্পার সুর ও বাইজীর আমদানী হইল, খোলের পরিবর্ত্তে তব্‌লা বাজিল, নূপুরের পরিবর্ত্তে ঘুমুর চলিল। স্রোত ক্রমশঃ আরও নাচে গড়াইতে লাগিল। এতদিন দেবদেবীর লীলার পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে 'নল দময়ন্তী' প্রভৃতি যাত্রা হইত, শেষে একা 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা সমস্ত অধিকার করিয়া বসিল।

যাত্রার ক্রমিক অধঃপতন।

যদি যাত্রার ইতিহাস এরূপ শোচনীয় অবস্থায় গিয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে বোধ হয় আজ এই দেশীয় যাত্রার দৃঢ়ভিত্তির উপর আমাদের আধুনিক জাতীয় নাট্য সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইত। ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশের নাট্য সাহিত্যও একদিন এইরূপ প্রচলিত 'মিষ্ট্রী' ও 'মরালিটি'র উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠাকল্পে ইংরেজী প্রভৃতি নাট্য সাহিত্য গ্রীক ও রোমক সাহিত্য হইতে সাহায্য পাইয়াছিল। আমরাও আমাদের নবযুগের প্রারম্ভ ইংরাজী সাহিত্যের নিকট এরূপ সাহায্য পাইয়াও, এই দেশীয় অভিনয়প্রথার উপর আমাদের জাতীয় নাট্য সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। কারণ তখন আমাদের এই জাতীয় অভিনয় প্রথার অত্যন্ত দুর্গতির দিন।

তাহার ফল।

যখন দেশীয় নাট্যাভিনয়ের অধঃপতনের জন্ম তাহার উপর দেশের লোকের স্বভাবতঃ একটা বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল, সেই সময়ে আর একটি বিশালতর বিপ্লবসূচক ঘটনা আমাদের নব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তবিপর্য্যয়ের পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিল। এই সময়, এইচ এইচ উইলসন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিপোষকতায় কলিকাতায় সাঁস্‌চী (Sans-Soci) নামক একটি ইংরাজী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার প্রায় সমকালেই কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন হিন্দু কালেজে তাঁহার অপূর্ব্ব সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি ও অধ্যাপনার দ্বারা নব্যশিক্ষিতগণের মনোহরণ ও বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিতে লাগিলেন। দেশীয় যাত্রা প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃত নাট্যরসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়া নব্য যুবক দ্বিগুণ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত এই বিজাতীয় নাট্যশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজী নাট্যাভিনয়ের চমৎকারিতা দিনের পর দিন তাঁহাদের মুগ্ধ করিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা পাঁচালী প্রভৃতি প্রচলিত আমোদপ্রমোদের উপর তাঁহাদের বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে লাগিল। "নাটুকে রামনারায়ণ" তাঁহার "রত্নাবলী"র ভূমিকায় এই চিত্তবিপর্য্যয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটক সমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকর-বিনিঃসৃত সুধাধারের আস্বাদ পাইয়া, কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না।" ইহা হইতে পাঠকগণ তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিবেন।

যাত্রার প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের আনুসাঙ্গিক বিরাগ।

ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও ইংরাজী নাটকের অনুশীলন।

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রচার ও ইংরাজী নাট্যাভিনয়ের প্রতি নবোদ্দীপিত অনুরাগ হইতেই আমাদের দেশীয় নাট্যশালার অভ্যুদয়। এই দেশীয় নাট্যশালা কতদূর জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়াছে, তাহা পরে বিবেচ্য। কিন্তু আমাদের যাত্রাদি নাট্যাভিনয়ের অধঃপতনের পর যদি ইংরাজী সমাজের সহিত আমাদের এ সম্পর্ক না ঘটিত, তাহা হইলে আমাদের নাট্য সাহিত্য আজ কোথায় থাকিত তাহা বলা যায় না। প্রকৃত বাঙ্গালা নাটক রচনার সূত্রপাত ইংরাজী আমল হইতে।

আধুনিক নাট্য সাহিত্যের অভ্যুদয় ও তাহার উপর অনিবার্য্য ইংরাজী প্রভাব।

আধুনিক সময়ে কোনখানি সর্ব্ব প্রথম রচিত নাটক তাহা বলা কঠিন।

রামমোহন রায়ের 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় (১৮২১ খৃঃ অঃ) আমরা প্রথম "কলি রাজার যাত্রা নাটক" নামে একখানি নাটকের উল্লেখ পাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় এক ভারতচন্দ্ররচিত অসমাপ্ত "চণ্ডী নাটক" ভিন্ন কোনও নাটকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই নাটকের বর্ণনীয় বস্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত মহিষাসুর বধ, কিন্তু গ্রন্থ শুধু আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহার রচনাকাল ইংরাজী আমলের বহুপূর্ব্বে। অনেক লেখকের মতে * জেনেরাল এসেম্ব্লির গণিতশিক্ষক তারানাথ শিকদারের রচিত "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকই বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। কিন্তু ইহার রচনার সময় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। যাহা হউক, ১৮৩১ খৃঃ অঃ বোধ হয় প্রথম নাটকাভিনয় (বিলাতী ছাঁচে) হইয়াছিল। কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় অনেক আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া আপনার বাটীতে "বিদ্যাসুন্দর" নামক নাটকের অভিনয় করান। কিন্তু এই নাটক নব্যবঙ্গের রুচির অনুযায়ী হয় নাই। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫২ পর্য্যন্ত, রামগতি কবিরত্নের "মহানাটক," যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের "কীর্ত্তি বিলাস" প্রভৃতি কতকগুলি অধুনা বিস্মৃত নাটক রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় সমকালেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরিপোষকতায় এ দেশে ইংরাজী বাঙ্গালা বিবিধ নাটকের অভিনয় দর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৫৩। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উহা ১৮৫৬ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই থিয়েটারে ইংরাজী নাটকই বেশীর ভাগ অভিনীত হইত। একবার শুধু মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাবে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন-কুল সর্ব্বস্ব"এর অভিনয় হয়। ১৮৫৭ সালে সিমলার ছাতু বাবু আপনার গৃহে "শকুন্তলা" ও "মালবিকাগ্নিমিত্রের" অভিনয় করান, ও পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সেইরূপ নিজের বাটীতে আপনি অনুবাদ করিয়া "বেণীসংহার" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" অভিনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কোনটাই স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ হয় নাই।

নব্যবঙ্গে নাটক-রচনা (১৮২০—১৮৫৮)

ও নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা।

* যথা রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি।

ইহার কিছুকাল পরেই, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজা প্রতাপচন্দ্রের চেষ্টায় বেলগেছিয়া উদ্যানে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হইল। ইহাতে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অভিনয় করিতেন। এই নাট্যশালাই আমাদের দেশে বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয়ের পথপ্রদর্শক। এই রঙ্গভূমি শুধু দুএক দিবসের আমোদপ্রমোদেই পর্য্যবসিত হয় নাই রামনারায়ণ, মাইকেল প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকের সংস্পর্শে আসিয়া ও দেশের কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরিপোষকতায়, এই নাট্যশালা আমাদের বহুকাল বিস্মৃত নাট্যশাস্ত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এব নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।

বেলগেছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮)

এই নাট্যশালা হইতে আমাদের সাহিত্যের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা এই যুগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। রামনারায়ণ তর্করত্নের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সমাদর করিলেও, এই নাট্যশালা মাইকেলের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণকে উৎসাহিত করিয়া ও তাঁহাদের প্রতিভাবিকাশের সহায়তা করিয়া, বঙ্গনাট্যসাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিল। এতকাল কেবল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের রচিত নাটকেরই অভিনয় হইত; এখন হইতে ইংরাজীশিক্ষিত নবসম্প্রদায় নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে নূতন আদর্শ ও নূতন পদ্ধতি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। নাট্যসাহিত্যে ইংরাজী আদর্শের জয়, এই নাট্যশালা হইতে একেবারে চিরকালের জন্য ঘোষিত হইয়া গেল। জাতীয় রঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনমন্ত্র আমাদের ইংরাজী সাহিত্য হইতেই লইতে হইবে, তাহার আভাস আমরা এই নাট্যশালা হইতে প্রাপ্ত হইলাম। এতদিন বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য বিবিধ চেষ্টার মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আজ বুঝি সে চিরপ্রার্থিত আদর্শের আভাস চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত দেখিতে পাইল। আর পথভ্রান্ত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ফিরিবার আশঙ্কা রহিল না; এখন কেবল এই সাধনার পথ লক্ষ্য করিয়া, ধীরে অথচ অস্খলিতপদে, ভবিষ্যতের দিকে চরমোন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে হইবে।

নাট্যসাহিত্যে নবযুগ।

ও পাশ্চাত্য আদর্শের জয়;

সুতরাং, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতা যে দিন আমাদের জাতীয় জীবনে আবার নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিল,সেইদিন হইতেই আমরা আমাদের আধুনিক

নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইতে পারি। কি প্রকারে এই দেশীয় রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। ইংরাজী নাট্যাভিনয় যে এত সহজে ও এমন অনিবার্য্যরূপে আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা কেবল কতকগুলি বাহ্যকারণপরম্পরার ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না। সে সময় আমাদের জাতীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই ইহার অনুকূল ছিল, নচেৎ এরূপ সম্ভব হইত না। যে সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শক্তি এই বিজাতীয় সাহিত্যের বিস্তারের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, তন্মধ্যে দেশীয় যাত্রাভিনয়ের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরাগের কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দেশীয় নাট্যানুষ্ঠানে যেরূপ অসঙ্গতি ও সুরুচির অভাব ছিল, তাহাতে শিক্ষিত যুবকগণের মন অতি সহজেই নূতনত্বের মনোহারিতায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার উপর ইংরাজী নাট্যশালার অভিনয়োৎকর্ষ ও হিন্দুকালেজে ডি, এল রিচার্ডসন প্রভৃতির নিকট নাট্যশাস্ত্রের চর্চ্চা এই নবোদ্বোধিত অনুরাগকে আরও উদ্দীপিত করিয়াছিল।

যাহা হউক, ইংরাজী প্রভাবে, আমাদের দেশীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইলেও, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে ইহার উপর একেবারে ছিল না, একথা বলা যায় না। জগতের সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যখন কোনও জাতি বহু বর্ষের নির্জ্জীবতার পর নূতন জীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠে, তখন সেই জাতির মধ্যে পুরাতন লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইউরোপে নবযুগ(Renaissance) এর সময় গ্রীক ও ল্যাটিন্ সাহিত্যের প্রত্যানয়নের জন্য একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা (Revival of letters) ইউরোপবাসিদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেশেও উনবিংশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে জাতীয় জীবনের নবোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য এইরূপ একটা চেষ্টা অনুভূত হইয়াছিল। এজন্য তৎকালীন রাজা রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখক, ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করিলেও সংস্কৃত সাহিত্যকে ভুলেন নাই। বঙ্গভাষার যে দুইজন প্রতিভাশালী লেখক প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেন এবং যাঁহারা বেলগেছিয়া নাট্যশালার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই, ইংরাজী পদ্ধতির অনুরাগী হইলেও, সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত। তন্মধ্যে

নব্য নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব।

রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত কালেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন, এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে শুধু যে তাঁহার অধিকার ছিল এমন নহে, তাঁহার অনেকগুলি নাটক (যথা "রত্নাবলী", "বেণী সংহার", "শকুন্তলা" "মালতীমাধব" প্রভৃতি) সংস্কৃত মূল হইতে অনূদিত। আধুনিক নিয়মানুসারে অনেকস্থলে ভাব-রসাদির পরিবর্ত্তন করিলেও, তিনি সর্ব্বত্র (অনুবাদ ভিন্ন মৌলিক রচনাতেও) সংস্কৃত নাটকের রীতি ও ভাব রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন *। আধুনিক নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক মাইকেলও, স্বয়ং ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, তথাপি সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম চেষ্টা—"রত্নাবলী"র অনুবাদ। তখন পর্য্যন্ত "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি যে কয়খানি নাটক বঙ্গভাষায় বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, তৎসমুদয় সংস্কৃত রীতি অনুসারেই রচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ "রত্নাবলী" তখন জনসমাজে এত আদৃত হইয়াছিল, এবং "রত্নাবলীর" ভাব মাইকেলের চিত্তে এত দৃঢ়রূপে অ[ঙ্কি]ত হইয়া গিয়াছিল যে তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় "শর্ম্মিষ্ঠায়" (১৮৫৮), ইংরাজী ভাব ও রীতির অনুবর্ত্তন করিলেও "রত্নাবলীকেই" আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক "শর্ম্মিষ্ঠার" সহিত "রত্নাবলীর" সাদৃশ্য এত সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। শুধু "শর্ম্মিষ্ঠা" কেন, তাঁহার "পদ্মাবতী"তেও (১৮৫৯), তিনি, গ্রীক্ পুরাণ হইতে নাট্যবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন বটে, তথাপি সমস্ত নাটকটি এরূপ সুন্দর দেশীয় ভাবে মণ্ডিত করিয়াছেন যে তাহা আর বিজাতীয় বলিয়া বোধ হয় না। যেমন "শর্ম্মিষ্ঠার" উপর "রত্নাবলী"র প্রভাব, তেমনি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে "পদ্মাবতী"র উপর "শকুন্তলা"র প্রভাব সুস্পষ্ট।* ইন্দ্রনীল রাজার মৃগয়া, দেবদেবীর অবতারণা, অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত ইন্দ্রনীলের

ও তাঁহার উপকারিতা।

মিলন প্রভৃতি দৃশ্যগুলি সংস্কৃত নাটককে মনে করাইয়া দেয়; তাহার উপর সূত্রধার নটী, বিদূষক কঞ্চুকী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের বহিরাবরণগুলিও যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। ("কুলীন কুলসর্ব্বস্বের" উদরপরা-

---

* তাহার "নবনাটক" ও রুক্মিণীহরণ" এ ইহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য হইলেও, মূলতঃ তিনি সংস্কৃত পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন।

* "শকুন্তলা পাঠের পরই যে কবি এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হয়।" (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পৃঃ ২৬০।

রণও এই বিদূষকজাতীয় পেটুক ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত।) এই সংস্কৃত প্রভাবের দ্বারা অন্য কোনও উপকার না হউক, উহা তাহাকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইতে দেয় নাই। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা এই যে, এই সময়ে আমাদের নাট্যসাহিত্যের যাঁহারা কর্ণধার ছিলেন, তাঁহারা কেহই সংস্কৃত প্রভাবকে অগ্রাহ্য করেন নাই। যদিও আমাদের দেশীয় যাত্রাভিনয়ের উপর আমাদের নাট্যসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি সংস্কৃতের সহিত এই যোগসূত্র তাহাকে অবিমিশ্র বিজাতীয়তার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

আধুনিক নাট্যসাহিত্য সম্পূর্ণ বিজাতীয় নহে।

কিন্তু যখন "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" বা "শর্ম্মিষ্ঠা" (১৮৫৮) রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত শৈশবাবস্থা। নবধাত্রীস্বরূপা ইংরাজী ভাষার নিকট চলিতে ফিরিতে শিখিলেও, তখনও মাতৃস্থানীয়া সংস্কৃত ভাষার ক্রোড় পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় নাই। তখনও তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পূর্ণতা বা সৌষ্ঠব কান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তাহার সমস্ত অন্তর্লীন শক্তির আভাস তখনও পাওয়া যায় নাই। "শর্ম্মিষ্ঠা" বা "কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের" চরিত্রাঙ্কন সুন্দর হইলেও পূর্ণাঙ্গ নহে, * এবং বিশেষ নিপুণতার পরিচয়ও দেয় না। তারপর ভাষা কবিত্বপূর্ণ হইলেও সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক বা অভিনয়োপযোগী নহে। মাইকেলেরত কথাই নাই, তর্করত্ন মহাশয়ও "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের" ভূমিকায় "সাধুভাষায়" গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, স্থলে স্থলে যে পাণ্ডিত্যের বহর দেখাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র আরামদায়ক নহে। তারপর লম্বা লম্বা স্বগতোক্তি, বিলাপ, লেকচার, সংস্কৃত শ্লোকের ছড়াছড়ি, রসিকতার বাড়াবাড়ি, অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যের বা চিত্রের সমাবেশ প্রভৃতি নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়াছে।

নব্য নাট্য-সাহিত্যের অপরিপক্কতা।

অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতি দোষ থাকিলেও এই নাট্যসমূহে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না এমন নহে। শিশু হইলেও, এই শিশু যে শুভ মুহূর্ত্তে ও অসাধারণ প্রতিভার টীকা ললাটে ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে

---

* "অতি সুন্দর মূর্ত্তি কৃশ দেখিলে যেমন ক্লেশ হয়, শর্ম্মিষ্ঠার চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে সেইরূপ ক্লেশ জন্মে।" (শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেলের জীবনচরিত)

সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এমন কি বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে" যে নাটকীয় প্রতিভা দেখা যায় তাহা অসাধারণ না হইলেও, খুব উচুঁদরের, একথা অস্বীকার করা যায়না। এমন কি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু এই উভয় "প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটকের রচয়িতার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ।" তিনি এরূপ উক্তির সমর্থনের জন্য বেশী কিছু বলেন নাই, ইহা শুধু তাঁহার মত ; তথাপি যখন এরূপ একজন বিজ্ঞ সমালোচক তর্করত্ন মহাশয়কে এত উচ্চ স্থান দিয়াছেন, তখন কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

রামনারায়ণ তর্করত্ন
(১৮২৩—১৮৮১)।

তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে রাজনায়ণ বাবুর মত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দে।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "চোখের বালি"

(প্রতিবাদ)

গত পৌষের 'প্রতিভা'য় 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে সমালোচক শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় মহাশয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অপেক্ষা 'চোখের বালি' শ্রেষ্ঠতর উপন্যাস ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ চেষ্টা বাঞ্ছনীয় কি না বলিতে পারি না ; তবে এরূপ তুলনামূলক সমালোচকের যেরূপ নিরপেক্ষতা ও রসগ্রাহিতার আবশ্যক তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মুগ্ধ বিহ্বল সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যেরূপ ভাব দেখাইয়াছেন তাহা কোনও রসজ্ঞ পাঠক বা নিরপেক্ষ সমালোচক দেখাইতে সাহস করিবেন কি না সন্দেহ। এরূপ একদেশদর্শিতা সাধারণ পাঠকের থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু যিনি সমালোচকের উচ্চ আসন গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন তাহার মধ্যে এরূপ সঙ্কীর্ণতা হাস্যাস্পদ না হইলেও দুর্ভাগ্যের কথা বটে। রবীন্দ্রনাথ বড় কি বঙ্কিমচন্দ্র বড়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বড় না 'চোখের বালি' বড়, এরূপ ধৃষ্টতামূলক সমালোচনায় আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার আমরা প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। একজন লেখককে ডুক

করিতে হইলে, আর একজনকে ছোট করিতে হইবে এরূপ যিনি বিবেচনা করেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভার তুলনায় সমালোচনা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দু একটি কথায় দু চারিটি পংক্তির মধ্যে যিনি এরূপ জটিল ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া 'ডিক্রি' দিতে পারেন, তিনি যে শুধু ভ্রান্ত তাহা নহে, তাঁহার সাহসিকতা দেখিয়াও আমরা চমকিত হইয়াছি।

প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই গালাগালি দিতে হইবে এমন কথা নাই। সত্যই, লেখকের 'চোখের বালি'র সমালোচনা টুক্ বেশ ভালই লাগিয়াছে এবং সব বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হইতে না পারিলেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে প্রবন্ধটি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। তিনি যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উপসংহারটুকু ঐ প্রবন্ধের অংশীভূত না করিতেন তাহা হইলে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য, প্রবন্ধটি সমাদরে গ্রহণ করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু যিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা ও কর্ণধার স্বরূপ, যাঁহার অলক্ষিত অঙ্গুলীচালনায় অদ্যাবধিও বঙ্গ সাহিত্যের গতি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অনবহিত ও যথেচ্ছ-বাক্য প্রয়োগ আদৌ মার্জ্জনীয় নহে। আমরা বলিতেছি না যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সমালোচনার অতীত; তাঁহার লেখা যতই সমালোচনা হয় ততই দেশের মঙ্গল; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইবে তাহা সুচিন্তিত হওয়া আবশ্যক।

আমরা এখানে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর বিস্তৃত সমালোচনা করিব না। অন্য কোন উপন্যাসের সহিত কোনরূপ তুলনামুলক সমালোচনা লেখাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুধু দেখাইতে চাই যে উক্ত গ্রন্থে সমালোচককর্ত্তৃক বর্ণিত অভাবগুলি নাই—সমালোচক গ্রন্থখানির রসগ্রহণ করিতে পারেন নাই।

উপন্যাস দুইখানি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, যে সমস্ত কারণে 'চোখের বালি' উপভোগ্য হইয়াছে, লোকরঞ্জনের এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার (সেইটুকুই ইহার বাহাদুরী) সেই সেই উপাদান কৃষ্ণকান্তের উইলে বিশেষ ভাবেই বর্ত্তমান। 'চোখের বালি"র দোষ দিতেছি না তবে সমালোচকের দোষ না দিয়া পারি না। আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি একবার রঙ্গীন কাঁচখানি চোখের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিয়া ভাল করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করুন, তাহা হইলে তেজঃপূর্ণ ভাষার আধারে তেজঃপূর্ণ ভাব ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ

দেখিয়া মোহিত হইবেন এবং প্রত্যেক অক্ষরটীর কবিত্ব-সম্পদ এবং চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা উপলব্ধি করিবেন।

১। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন বাবুর প্রথম যুক্তি, কৃষ্ণকান্তের উইলে জটিলতার অভাব আছে তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে কৃতী শিল্পীর নৈপুণ্যে জটিলতা সরলতায় পরিণত হয়। যাঁহারা যে বিষয়ে পারদর্শী তাঁহাদের লেখা সে বিষয়ে ততই প্রাঞ্জল ও মনোহর হইবে। অনেক সময় মুল দর্শন গ্রন্থের চেয়ে তাহার টীকা দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে ইহা উপরোক্ত বাক্যের একটি উদাহরণ। আখ্যান বস্তু বা প্রতিপাদ্য চরিত্র অনর্থক জটিল করিয়া তোলাই কিছু বাহাদুরীর কাজ নহে। জটিলতা হিসাবে সেক্সপিয়ারের 'কিংলিয়ারে'র অপেক্ষা ব্যালজাক (Balzac) এর 'Old Goriot' কে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্য-চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ শক্তি কি এই জটিলতার উপর নির্ভর করে। এই-রূপ অসাধারণ যুক্তি অবলম্বন করিলে আমরা আধুনিক Psychological Novelist দিগকে সেক্সপিয়ার এর অনেক উপরে স্থান দিতাম।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে জটিলতার অভাব নাই, কিন্তু সে জটিলতা এত স্বাভাবিক হইয়াছে যে তাহা আর জটিলতা বলিয়াই বোধহয় না। ভ্রমরচরিত্র জটিল নহে ত কি ? জটিলতা কাহাকে বলে ? সাধারণের চেয়ে যা বিভিন্ন,যাহাতে যুগপৎ অনেকগুলি বৃত্তির অন্তর্যুদ্ধ চলিতে থাকে,তাহাকেই আমরা জটিল বলিব ; পরদারনিরত হত্যাকারীর কল্পনা হৃদয়ে বদ্ধমূল ; এবং তিনিই আবার স্বামী। অন্তর একবার স্বামী ভাবিয়া ডাকিতেছে অন্যবার অপরাধী বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছে, একবার পিত্রালয়, একবার হরিদ্রাগ্রাম—করিয়া বেড়াইতেছে, কিছু-তেই স্বস্তি পাইতেছে না। হত্যাকারী স্বামীকে না দেখিয়াও মরিতে চাহিতেছে না ; ইহা অপেক্ষা জটিলতা আর কি হইতে পারে ? অহঙ্কারী অথচ এমন কোমল ভাবাপন্না ভ্রমরের চরিত্রাঙ্কণ এত নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে যে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার, স্বামী প্রেমে এত বিশ্বাসবতী হইয়াও আবার এত সহজে * ভ্রমর সে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল। ভ্রমর দুঃখী অথচ কাহারও সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে না।

এই হিসাবে গোবিন্দলাল, রোহিণী প্রভৃতির চরিত্রও জটিল। কিন্তু এই জটিলতার ভিতরই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত নাই। সেই উপন্যাসই শ্রেষ্ঠ

* অনেকে বলিবেন—স্বামী পরদারনিরত এই প্রমাণ স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে।

শ্রেণীভুক্ত যে উপন্যাসে চরিত্রের ক্রমবিকাশ * দেখান হয়। আবার যে উপন্যাসে চরিত্রের ক্রমবিকাশের পরিণতিতে একটি সুন্দর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয় তাহা শ্রেষ্ঠতর। গার্হস্থ্য সুখ দুঃখ ঠিক মনুষ্যের জীবনে যেমন ভাবে ঘটে—তাহারই মধ্য দিয়া—ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত বা সংঘর্ষ না দেখাইয়াই শিক্ষা-প্রদ অথচ উপভোগ্য গোবিন্দলাল রোহিণী এবং ভ্রমরের চরিত্র, লেখক পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপরেই উপন্যাসের ভিত্তি, গোবিন্দলাল যে কি তাহা গ্রন্থ শেষ না করিয়া উপলব্ধি করা যায় না; তার নিজের এমন একটা স্বাত আছে যাহা তাহাকে সাধারণ শ্রেণীর লোক হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে; কোন্ ঘটনায় সে কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহাই দেখাইয়া লেখক তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রের উপর রং ফলাইতেছেন, প্রত্যেক পোঁচেই চিত্র বেশী ফুটিয়া উঠিতেছে, বেশী উজ্জ্বল হইতেছে।

যাহা হউক যখন আমাদের সমালোচক এই জটিলতার কথা তুলিয়াছেন, তখন আমরা এসম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এর (অন্ততপক্ষে আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে) চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ-প্রণালী এক নহে, উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বঙ্কিমবাবুর চরিত্র-চিত্র Synthetic, রবিবাবুর চরিত্র চিত্র Analytic, ইহাতে অবশ্য এমন বলিতেছি না যে Analytic পদ্ধতি বঙ্কিম বাবু আদৌ অনুসরণ করেন নাই অথবা রবি-বাবুর চরিত্র সৃষ্টি আদৌ Synthetic নহে। তবে প্রধানতঃ উভয়ের পদ্ধতি মধ্যে এই প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যে ও উপন্যাসে এই Analytic প্রথার অত্যন্ত আদর বাড়িয়াছে; তাই দেখা দেখি আমাদের দেশের পাঠকগণেরও রুচি সেই দিকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। Analytic ঔপন্যাসিক, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্র কিরূপ পরিবর্ত্তিত, গঠিত হয়, আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়, তাহাই দেখান। কিন্তু Synthetic কবি মানুষ কিরূপে অবস্থা ও অনুবর্ত্তী ঘটনার সহিত সংগ্রাম করে তাহাই দেখান। এক জন জীবন্ত মানুষ গড়িয়া তোলেন, অন্য একজন শবচ্ছেদকারীর মত মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ধমনীর রক্ত কোনদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার হৃদয়ের অবস্থান কিরূপ, তাহার আভ্যন্তরীণ ক্ষতের মুখ কোথায় ইত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করেন। Synthetic নভেলিষ্ট খুঁটী নাটী চিত্রিত

* একটি কল্পিত চরিত্রের মানসিক ভাবগুলির বিশ্লেষণেও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস উদ্ভূত হইয়া থাকে। কৃষ্ণকান্তের উইল সে শ্রেণীর উপন্যাস হইতে বিভিন্ন।

করিতে চান না, তাঁহার ছবি অয়েল পেণ্টিং। কিন্তু Analytic ঔপন্যাসিকের সহিষ্ণুতা অধিক, তিনি খুঁটী নাটী, সূক্ষ্ম লাইন সমস্তই অঙ্কিত করেন; তাঁহার Water colour painting। অয়েল পেণ্টিং নিকট হইতে কতকগুলি বর্ণ-পুঞ্জের যথেষ্ট সমষ্টি মাত্র। কিন্তু উপযুক্ত perspectiveএ ধরিলে তাহাই পুনঃ চিত্রনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু Water colour painting প্রথমতঃ হাজার সূক্ষ্ম ও মনোহারী হউক না কেন Oil painting এর নিকট দাঁড়াইতে পারে না। Water colour painting সূক্ষ্ম (বা 'জটিল') বটে কিন্তু তত আদরণীয় নহে।

তারপর, সমালোচক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' টাকে যত সহজ ভাবিয়াছেন জিনিসটা তত সহজ নহে। বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই পুস্তকে মানুষের চরিত্র ও সমাজতত্ব সম্বন্ধে অনেক কঠিন সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কলা নৈপুণ্য ও আখ্যান বস্তুর মনোহারিতা এত অধিক যে এ সমস্ত সহজে আমাদের চক্ষে ঠেকে না। সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা এখানে সম্ভব নহে; তবে আভাসে দু একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গ সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন তখন ইংরাজী শিক্ষার স্রোত বঙ্গসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একটা যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিল। আমাদের সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম—এই তিন দিকে আমাদের জাতীয় আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্যতার নূতন আদর্শের সংঘর্ষে আসিয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই দুইটি বিপরীতগামী সভ্যতার সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন যে প্রাচীন আদর্শ বহুকালের সংস্কারাগত ও স্বতঃসিদ্ধ হইলেও তাহা নবীনআদর্শানুযায়ী জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নহে, কিন্তু তেমনি অন্য দিকে নূতন আদর্শ সম্পূর্ণ বিজাতীয় জিনিস ও আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের সহিত সর্ব্বত্র খাপ খায় না। কিন্তু তিনি আরও দেখিলেন যে এই নূতন সভ্যতা ও জ্ঞানের আদর্শও সর্ব্বতোভাবে না হউক কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ না করিলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিলেও আমাদের জাতীর নিজস্ব জিনিস যেটুকু, যেটুকু আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব, তাহা হারাইলেও চলিবে না। এইজন্য নূতন ও পুরাতন আদর্শের একটা সামঞ্জস্যই সেই সময়ের এবং আধুনিক যুগের প্রধান সমস্যা।

ইউরোপীয় জাতির যাহা প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, আমাদের তাহা নহে। সে

দেশের সমাজ ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবন আমাদের সহিত তুলনায় সমান হইতে পারেনা। নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির আদর্শে যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়। এই প্রণয় বা যৌন সম্বন্ধ লইয়াই ঔপন্যাসিকের কার-কারবার। এবং স্থান ও কালের নিয়মে এই বিষয় লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হইয়াছিল; তাঁহার প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই এই সমস্যা বিভিন্ন প্রকারে উত্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রণয়ের ভাব এদেশে ও বিলাতে এক নহে। ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, ইংরাজ জাতি স্বাধীনতা প্রিয়; প্রণয় ব্যাপারেও তাহাদের স্বাধীনতা যথেষ্ট। তাহাদের মতে প্রণয় হৃদয়ের কার্য্য—ভালবাসা সম্বন্ধে প্রাণ যাহাকে চায় তাহাকে ভালবাসিব, সমাজের কথা মানিব না। অবশ্য সমস্ত বিষয়ে হৃদয়ের কথা মানিলে চলে না; হৃদয় বলিতেছে অমুকের অনেক টাকা সেগুলি হস্তগত করিতে হইবে, তাহাত সম্ভব নয়। কিন্তু প্রণয়ের বেলা হৃদয়ই প্রামাণ্য। সমাজজীবনের বিভিন্নতার জন্য আমাদের আদর্শ অন্যরূপ। হৃদয় অমুককে ভালবাসিতে বলিতেছে বটে কিন্তু হৃদয়কে সমাজের বশে চলিতে হইবে। যেমন অন্য সকল স্থলে সমাজের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকি, প্রণয়ের বেলাও সেইরূপ। যদি হৃদয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হয় তবে পাপিষ্ঠ হৃদয়কে পদদলিত করিব, তথাপি যাহাতে সমাজের অনিষ্ট, জাতির অনিষ্ট হয় তাহা করিব না। ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা বা সতীত্ব অথবা আত্মসংযম রক্ষায় যদি সমাজের সুখ বৃদ্ধি হয় তবে সেই জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হওয়া মঙ্গলকর নহে কি? আমি সমাজের অঙ্গস্বরূপ, সমাজের সুখবৃদ্ধিতে আমার সুখবৃদ্ধি, তখন সমাজের মঙ্গল কামনা কি আমারও সাধনার বিষয় নহে?

সুতরাং যাহা বিলাতী প্রণয়ের আদর্শ তাহা আমাদের সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য ও লাম্পট্যসূচক। সতীত্ব বা আত্মসংযমটুকু যদি প্রণয় হইতে বাদ দেওয়া যায় তবে পাশব ভাব ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই ইংরাজী প্রণয়ের আদর্শ আমাদের দেশে আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সহিত কতটা খাপ খায় এবং প্রণয় সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন আদর্শের রক্ষণও কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুইটী উপন্যাসে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। উভয় পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়, পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম ও তজ্জনিত মনের দুর্ব্বহ আবেগের সহিত সংগ্রাম, পরিশেষে সুখময় সংসারের সর্ব্ব সুখের ধ্বংস! উভয় উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন যে হিন্দুর পক্ষে প্রাচীন আদর্শে কত সুখ কত শান্তি ও নূতন আদর্শ সর্ব্বত্র কিরূপ সুফল-প্রসূ নহে। সূর্য্যমুখী হিন্দু স্ত্রী, সাধ্বী পতিপরায়ণা হইয়াও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়া দেখিলেন তাহাতে সুখ নাই, তাই পুনঃ সপত্নীর সহিত ঘর করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের কোন শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে—সাবিত্রী মাঝে গাউন পরিয়াছিলেন কিন্তু শেষে তাহা ছাড়িয়া শাড়ী পরিলেন। তাই পরিশেষে তিনি মুমূর্ষু কুন্দকে বলিতে পারিয়াছিলেন—"ভাগ্যবতি! এরূপ অদৃষ্ট যেন আমার হয়।" কিন্তু ভ্রমরের চরিত্রে দেখিলাম যে এ সাবিত্রী গাউন ছাড়িল না। তাই মানে, গর্ব্বে স্বামীকে লিখিল—"যত দিন তুমি আমার ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি।" কিন্তু গাউন পরিলেও সাবিত্রী পুরা মেম হইতে পারিল না, তাই পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল এবং শেষে স্বামীকে বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে সুখী হই।" গ্রন্থকার দেখাইলেন যে জাতীয় আদর্শচ্যুত হইলে কত অশান্তি, কত অসুখ।

অবশ্য আমরা এরূপ বলিতেছি না যে তুলনায় আমাদের জাতীয় আদর্শ বড় অথবা পাশ্চাত্য আদর্শ ছোট। সে বিষয়ের আলোচনা সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর অর্পণ করিলাম। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে সমাজ ও জাতীয় প্রকৃতির বৈলক্ষণ্যে এক জাতির পক্ষে যাহা কল্যাণপ্রদ অন্যের পক্ষে তাহা নহে। ইংরাজী আদর্শের অনুকরণের সময় আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে আমাদেরও কতকগুলি নিজস্ব জিনিস আছে, আমাদেরও প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মের বহুকাল-ব্যাপি সংগ্রামলব্ধ কতকগুলি অমূল্য বিশেষত্ব আছে তাহা হারাইলে চলিবে না। যখন আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য লইয়া পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে দাঁড়াইব, তখন যেন আমরা বলিতে পারি যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার এমন কতকগুলি জিনিস আছে যাহা আজও ইউরোপ আমাদের নিকট আদরে গ্রহণ করিতে পারে।

আমাদের সমালোচকের আলোচ্য "চোখের বালি" কতদূর আমাদের এই জাতীয় ভাব ও জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্বটুকু রক্ষা করিয়াছে তাহা সুধীগণের প্রণিধান যোগ্য। আর্ট বা কলা নৈপুণ্য হিসাবে অথবা মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হিসাবে 'চোখের বালি' অসাধারণ হইলেও ইহা আধুনিক হিন্দু সমাজ প্রকৃত ভাবে চিত্রিত করিতেছে কিনা তাহা বিশেষ সন্দেহের স্থল।

আধুনিক ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের রচনা ইংরাজী ছাঁচে

চালিতে চাহেন তাঁহারা আমাদের জাতীয় জীবন ও আদর্শের এই বিশেষত্বটুকু ভুলিয়া যান। তাঁহারা প্রতিভাশালী লেখক হইলেও ইংরাজী লেখার এইরূপ তর্জ্জমা বা অনুকরণে দেশের বা জাতির যথার্থ হিতৈষী বলিয়া মনে করিতে পারি না।

২। ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব সম্বন্ধে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার উত্তরে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই গ্রন্থে, জগতে সচরাচর যেরূপ ঘটনা ঘটে—সেইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা দ্বারাই অঙ্কিত চরিত্রের বর্ণনা পরিস্ফুট হইয়াছে। নূতন ধরণের নূতন নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়া অনর্থক বৈচিত্র্যের আবশ্যক হয় নাই! তাহা করিলেও লেখকের বাহাদুরী হইত না, শুধু অক্ষমতারই পরিচায়ক হইত। যেটুকু ঘটনার সমাবেশ চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য আবশ্যক সেইটুকুই দেওয়া হইয়াছে।

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত মরিয়া যাইবে; লালসা-তাড়িত রোহিণী স্বরূপ, ধনী গোবিন্দ লালকে দেখিয়া মজিবে; আবদারী ভ্রমর না বলিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে; রূপ-পিপাসু গোবিন্দলালের মন সহজেই রোহিণীতে আকৃষ্ট হইবে; এ সমস্ত বিষয় বৈচিত্র্যের খাতিরে অন্যরূপ করিতে গেলে অস্বাভাবিক হইয়া উঠিত। অথচ এই সমস্ত ঘটনার দ্বারাই প্রত্যেক চরিত্রের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

৩। রস বৈচিত্র্য। (ক) করুণরস। ভ্রমরকে, সরলা নির্দ্দোষী বালিকাকে যখন সকলে শুনাইতে আসিল যে 'ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে' তখনকার বর্ণিত সে অংশটুকু পড়িতে কোন্ পাষাণ হৃদয় বিগলিত না হইয়া পারে। তাহার মনে তখন যে তীব্র জ্বালা জ্বলিয়াছিল তাহা কেবল অনুভূতির বিষয়। এত জ্বালা এত সহজে অনুমান করাইবার ক্ষমতা অন্য কোন লেখকের নাই। সত্যই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' করুণরস কম আছে ইহা শুনিয়া আমরা না হাসিয়া পারি না। গ্রন্থখানির আগাগোড়া এমন করুণরস মাখানো যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে তার উপর অন্য কোন রস ভালই লাগে না। নিশাকরের ভ্রমর নামোল্লেখে গোবিন্দলালের মনের অবস্থা বর্ণনা পড়িতে পড়িতে না কাঁদিয়া পারে কে? মুমূর্ষু ভ্রমরের কক্ষে গোবিন্দলালের নিঃশব্দ পাদসঞ্চার প্রবেশে কত কারুণ্যই না নিহিত আছে! তনয়াবৎসল মাধবী নাথ পাঠকের অজ্ঞাতসারে গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা বলিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন পত্নীশোকে অধীর গোবিন্দলালের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না, তখন গোবিন্দলালের অবস্থা স্মরণ করিয়া কে না

কাঁদিবে! এরূপ অবস্থায় অন্য লেখক হইলে নির্দ্দোষীর দ্বারা দোষীকে একটু সান্ত্বনা দেওয়াইতেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু এক গুলিতে দুই পাখী মারিলেন, পাঠকের মন বাৎসল্যরসে পূর্ণ করিলেন সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি আশ্চর্য্য কারুণ্যের চিত্র পাঠকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন।

(খ) হাস্যরস। "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন"। * ছোট ছোট কথায় বঙ্কিম যেমন হাসান এমন আর কেহই পারেন না। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

১। "হরলাল। কিছু টাকা রোজগার করিবে?

ব্রহ্মানন্দ। বিধবা বিয়ে করে নাকি?"

(প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

২। "হায় ফলাহার.....................ইত্যাদি।"

৩। "সুবিধা হউক কুবিধা হউক যাহার চাকরাণী নাই তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা এই চারিটী বস্তু নাই......"

(প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

৪। "গোবিন্দ। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

ভ্রমর। কেন, এই মাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ।"

(প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ)

৫। "কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?" (প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ)।

৬। "দানেশ খাঁ বলিল দোয়াত ছোড়কে তিন বাত হুয়া?" (২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পাঠক একবার 'আদালতের সাক্ষীর বিবরণের' অধ্যায়টা এবং 'মাধবীনাথ ও পোষ্টমাষ্টারের' অধ্যায়টা পড়িবেন। প্রকৃত পক্ষে এইগ্রন্থে হাসান লেখকের উদ্দেশ্য নয়। যদি এইরূপ ধরণের কোন উদ্দেশ্য খুঁজিতেই হয় তবে সেটা কাঁদান। হাসাইবার দরকার হইলে তিনি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে আবার আহ্বান করিয়া আনিতে পারিতেন।

তদুপরি করুণ রস বর্ণনায়ও লেখক এমন ভাবে প্রচ্ছন্ন হাস্য রাখিয়া দিতে পারেন যে তাহাতে পাঠকের মনে হাস্য-করুণমিশ্র এক অভিনব ভাব জাগাইয়া

* রবীন্দ্রনাথ। (হাসাইবার জন্য নহে অন্য উদ্দেশ্য লইয়া)।

ভোগে। মরিবার সময় রোহিনীর বাঁচিবার জন্য কাতরোক্তি যুগপৎ দয়া এবং হাস্যের উদ্রেক করে অথচ তাহাতেই রোহিনীর চরিত্রের স্ফূর্ত্তি। কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ বর্ণনা করিতে হইবে। শোক করিবার ভার ভ্রমরের স্কন্ধে চাপাইয়া লেখক খালাস হইলেন। কোন রকম আধ্যাত্মিক প্রবন্ধের (theological lecture) অবতারণা নাই, আছে একটী সুন্দর হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা, আর আছে শ্রাদ্ধে কত টাকা কত আনা খরচ হইল কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত তাহার হিসাব। মাধবীনাথের হাসিবার অবকাশ নাই, তবুও ব্রহ্মানন্দের অমূলক পুলিষের ভয় দেখিয়া না হাসিয়া পারেন না, পাঠককেও এই সঙ্গে হাসিতে হয়। গোবিন্দলালের সোণা রূপা চাকরদের ব্যবহারও হাস্যরসাশ্রিত। বাস্তবিক এই হাসি ও অশ্রুর পরস্পর সংমিশ্রণই বঙ্কিমের কলানৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ। জীবনে যেমন আমরা নিরবচ্ছিন্ন হাস্য বা নিরবচ্ছিন্ন অশ্রু ভালবাসিনা, উপন্যাসেও সেইরূপ। অবিরত মিষ্টান্ন ভোজনের সঙ্গে অম্লরসের মত অবিরত করুণরসোদ্রেকের সহিত হাস্যরসের স্ফূর্ত্তি বড়ই উপাদেয়।

(গ) সমালোচক বলিয়াছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' শান্তিরস নাই। তাহা স্বীকার করি না। ভ্রমর ও গোবিন্দলাল একত্রে প্রথমে আমাদের সম্মুখে যখন উপস্থিত হইয়াছেন তখনকার সেইস্থান ও সময় নির্ব্বাচন শান্তিরসে প্রধান উপাদান যোগাইয়াছে। তার উপর দম্পতির অন্যাপর প্রাণ প্রেমে মধুর শান্তিরসের যে উৎস খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে কোন করুণ কাহিনী ও মনকে অত সহজে বিগলিত করিতে পারিত না। উপন্যাসে বিশুদ্ধ শান্তিরসের স্থান নাই। উপন্যাসোক্ত শান্তিরস অন্য একটা রসের মিশ্রণে খাড়া করিতে হয়। ভ্রমরের বিরহেও এই শান্তির আভাস পাওয়া যায়।

স্থূলভাবে বলিতে গেলে গ্রন্থের প্রথম ও শেষ ভাগটা শান্তি রক্ষিত, অপর ভাগ কারুণ্যের অধিকারে। উইল প্রস্তুত এবং আনুসঙ্গিক কয়েকটী ঘটনা শান্তিরসাশ্রিত। পরিশিষ্ট একটী বিরাট বিমল শান্তির সৃষ্টি, ঝঞ্ঝার পর প্রভাত সূর্য্যোদয়ে পৃথিবীকে শান্তি সাগরে ভাসিতে দেখিলে যেরূপ ভাবের উদয় হয় জীবনের কিয়দংশ অবহনীয় দুঃখে কাটাইয়া গোবিন্দলালের শান্তি দেখিয়া হৃদয় সেইরূপ একটা অননুভূত শান্তিরসে আপ্লুত হয়। আবার গোবিন্দলালের শান্তি প্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ কি মধুর, কি অব্যর্থ, আবার সামাজিক হিসাবে কি শিক্ষাপ্রদ!

৪। মনস্তত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমরা স্বীকার করি রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট

আছে, তাই বলিয়াই বঙ্কিমের সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব হাস্যাস্পদ একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। আমাদের মনে হয় এই সুমতি কুমতির দ্বন্দ্বের দ্বারা মনুষ্যের মানসিক অন্তর্যুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার হ্রাস হয় না কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।" মানব জীবনে যত ঘটনা সম্ভব প্রত্যেক জটিল ঘটনাই সুমতি কুমতির দ্বন্দ্বরূপে কথোপকথনচ্ছলে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এক কথা দশবার বলিয়া, ঘটনার সংঘর্ষ বাধাইয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় নিম্নশ্রেণী ঔপন্যাসিকের; বঙ্কিমের হয় না। Victor Hugoর Les Miserablesএ এইরূপ সুমতি কুমতির 'চুলোচুলী' ছলে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

৫। ভাষা এবং রচনা ভঙ্গী। সমালোচক নিজেই বলিয়াছেন যে নির্দ্দিষ্ট রচনা ভঙ্গী ভাল লাগে না। ভাল লাগা না লাগা পাঠকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তিনি যখন বলিয়াছেন যে বঙ্কিমের রচনা কবিত্ব-সম্পদ-হীন তখন তিনি আত্মহারা বা লুপ্ত চেতন হইয়াছেন। বঙ্কিমের রচনার সপক্ষে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না, যাহা বলিবার দরকার তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস (অতীত ও ভবিষ্যত) বলিবে। কোন বিশিষ্ট সমালোচকের ওকালতি লাগিবে না।

আমাদের সহিত সুখরঞ্জন বাবুর আলাপ পরিচয় নাই। কর্ত্তব্যানুসারে যদি প্রতিবাদ রূঢ় হইয়া থাকে, আশা করি তিনি আমাদের ক্ষমা করিবেন। শুনিয়াছি তিনি রবীন্দ্রনাথের এক 'কবিযশঃ প্রার্থী' ভক্ত শিষ্য; তাঁহার সাধনা সফল হউক। কিন্তু এইরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা লইয়া জনসাধারণের নিকট 'উপহাস্যতা' প্রাপ্তি আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ভাব ও রস। (২)

জগন্নাথের রথের সম্মুখে যে শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ভাবাবিষ্ট হইয়া চৈতন্ত-দেব নৃত্য করিতেছিলেন, সেই শ্লোকটি সাধারণ ও বহির্ম্মুখী দৃষ্টিতে কোনরূপ ধর্ম্মমূলক শ্লোক নহে। প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রেমের ব্যাপার লইয়াই শ্লোকটি রচিত। এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে অথবা এই শ্লোকটির যাহা অর্থ তাহা উপলব্ধি করিলে, হৃদয়মধ্যে কোনরূপ আধ্যাত্মিকতার স্পন্দন বা ভগবদ্ভক্তির আবেগ জাগিয়া উঠার যে কিছু সম্ভাবনা আছে তাহা আমাদের ন্যায় স্থূলদর্শীর মোটেই মনে হয় না। কাজেই আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন হয়, চৈতন্তদেব এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া এরূপ ব্যাকুল হইলেন কেন? চৈতন্তদেবের সহচর-বৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এই প্রকারের একটা সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। রূপ গোস্বামী যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটি এই প্রকারের সন্দিহান ব্যক্তিগণকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবার জন্তই রচিত হইয়াছিল।

রূপ গোস্বামী যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

শ্লোকটির অর্থ এই। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা কুরুক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র এদুইএর মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ছিলেন নন্দ যশোদার পুত্র, সেখানে তিনি বনফুলের মালা গলায় দিয়া সখা ও সখীগণের সহিত গোচারণ ও খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আর এখানে তিনি অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্তের কল কোলাহলে মুখরিত কুরুক্ষেত্রে যদিও সারথীর কার্য্য করিতেছেন তথাপি সকলেই জানেন তিনিই এই বৃহৎ ব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক। বৃন্দাবন মাধুর্য্য-ধাম, কুরুক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্যের লীলা। তাই রাধিকা বলিতেছেন "হে সখি এই সেই প্রিয় কৃষ্ণ, আজ কুরুক্ষেত্রে আবার তাঁহার সহিত আমার মিলন হইয়াছে। আমিও সেই রাধা, কিন্তু আজিকার এই মিলনে মনে সে তৃপ্তি সে

আনন্দ হইতেছে না। সেই যমুনার তীর, যথায় শ্যামের বাঁশি পঞ্চমে বাজিত সেই যমুনাপুলিন বিপিনের জন্ত আমার চিত্তে স্পৃহা জাগ্রত হইতেছে।”

চৈতন্ত মহাপ্রভু যে সময়ে নৃত্য করিতে করিতে “যঃ কৌমারহরঃ” প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহাই আলোচ্য। তাঁহার মনে সে সময়ে রাধাভাবের উদয় হইয়াছিল তিনি তাঁহার সম্মুখে রথারূঢ় জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া মনে করিতেছিলেন যে তিনি বিরহিনী রাধা আজ অনেক দিন পরে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া হৃদয়রাসবিহারী বনমালীর দেখা পাইয়াছেন। কিন্তু একি ভাব! আজ আর সে বৃন্দাবন নাই, সেই কৃষ্ণ নাই। এই ভাবের প্রেরণায় মহাপ্রভু এক অপূর্ব্ব চিন্ময় রস উপভোগ করিতেছিলেন।

জগতের ঘটনা ঘটিতেছে, জীবনে পরিবর্ত্তন হইতেছে, এসমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। এই ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর বস্তুর মূলে যে ভাবের প্রকাশ হইতেছে, সেই ভাব শাশ্বত ও অবিনশ্বর। ভাব ও রস এক হিসাবে একই জিনিসের দুইটি দিক। অনুদর্শনের ন্যায় ভাব ও রস গ্রহণের শক্তি এক বিশেষ অবস্থায় জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ‘ভাবুক ও রসিক’ হইয়া ভাগবত রস পান করিতে হইবে, এই উপদেশ অতীব গভীরার্থপূর্ণ, আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার অর্থ নির্ণয়ে চেষ্টা করিতেছি।

আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ও মনের দ্বারা যে জগৎব্যাপার অনুভব করিতেছি—এই জগৎটা কি? একটা মত আছে যে এই জগৎটা কিছুই নহে, আমরা যে ভাবিতেছি যে এই প্রকারের একটা জগৎ আছে ইহাই আমাদের ভুল। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পায়, আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, এ জগৎটাও ঠিক তেমনি একটা ভ্রান্তি মাত্র। জগৎ মিথ্যা। এই একটা অতি প্রকাণ্ড মত। অবশ্য এ মত যে মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু এ মত ভাগবতের মত নহে। ভাগবত পূর্ব্বোক্ত মতের মধ্যে যে সত্যটুকু রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। সাধনক্ষেত্রে বা জীবনকে সংযত ও উন্নত করিতে হইলে এই মতটিকে যে ভাবে বুঝিতে ও লইতে হইবে, ভাগবত তাহা করিয়াছেন। এই মতকে এক কথায় বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ বলা যায়। যাহা হউক বড় বড় দার্শনিক কথায় এখন প্রয়োজন নাই। ভাগবতের মত এই যে জগতটা মিথ্যা নহে, তবে নশ্বর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। এই কথাটা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। প্রথম

শ্লোকে ভাগবত ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ঈশ্বরের সহিত এই জগতের সম্বন্ধ কি তাহা বর্ণনা করিবার জন্ত বলিলেন—

"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা"

এই জগতটাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ভূত, ইন্দ্রিয়, ও দেবতা। হিন্দু দার্শনিকদিগের মতে প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই তিন গুণ হইতে জগতের এই তিনটি উপকরণ সৃষ্ট। এই তিনটি উপকরণেই জগৎ—আমাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগং। এই জগতের নাম ত্রিসর্গ। এই ত্রিসর্গ মিথ্যা, অথচ সত্যের ন্তায় প্রতীত হইতেছে। যাহা মিথ্যা তাহা সত্য হইল কি করিয়া? ভাগবত বলিতেছেন "অধিষ্ঠান সত্তয়া" অর্থাৎ এই সমস্ত ভগবানে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তাহারা সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে। এ বিষয়ে ভাগবত একটি উদাহরণের অবতারণা করিয়াছেন, এই উদাহরণটিকে দার্শনিকগণ "ব্যত্যাস" বলিয়া থাকেন। মনে করুন, কাচ, জল ও আলো এই তিনটি জিনিস, ইহাদের লইয়া অনেক সময়েই আমাদের ভুল হইতে পারে। রাজসূয় যজ্ঞের সময় রাজা দুর্য্যোধন কাচ দেখিয়া জল মনে করিয়াছিলেন, আবার স্বচ্ছ ও নিস্তরঙ্গ জল দেখিয়া কাচ মনে করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে আলো দেখিয়া জল বা কাচ বলিয়া মনে হইতে পারে—এই প্রকার ভুল হয়। এই ভুলটার প্রকৃত তত্ত্ব একটু গভীর ভাবে আলোচনা করা দরকার। কাচ দেখিয়া জল মনে হয়, জল দেখিয়া কাচ মনে হয়, যাহা হউক একটা কিছু দেখিয়া আর একটা কিছু বলিয়া মনে হয়। আমি জিনিসটাকে যাহা মনে করি তাহা ঠিক নহে, কিন্তু জিনিসটা যাহা হউক একটা কিছু। 'কিছুই না' কখনও 'একটা কিছু'রূপে প্রকাশিত হইতে পারেনা। এই জগৎ ক্ষয়শীল ও পরিবর্ত্তনশীল সত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে—এই জগৎব্যাপারের মূলে একটা পারমার্থিক সত্য আছে ইহাই ভাগবতের মত। ভাগবতশাস্ত্রের প্রথম শ্লোকেই এই তত্ত্ব অতীব পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ভাগবতের এই মতকে লক্ষ্য করিয়া জীব গোস্বামী বলিয়াছেন "এবং শূন্তবাদারম্ভবাদৌ পরিহৃতৌ" অর্থাৎ ভাগবত এই মতের দ্বারা শূন্তবাদ ও আরম্ভবাদ নামক দুইটি দার্শনিক মত খণ্ডন করিলেন।

তাহা হইলেই ভাগবত বলিতেছেন যে এই জগতে আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতেছি তৎসমুদয়ের দুইটি করিয়া দিক আছে, একদিক হইতে দেখিতে গেলে এগুলি নশ্বর, আর একদিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাদের মধ্য দিয়া এক নিত্য সত্য বা এক অপ্রাকৃত চিন্ময় জগৎ নিজেকে প্রকাশ

করিতেছে। এই জগতের সুখ সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র প্রকারের অনুভূতির মধ্যে সেই অপ্রাকৃত নিত্য জগতের অন্বেষণ করিতে হইবে। দেখিতেছি জগতে রূপ আছে, রস আছে, গন্ধ স্পর্শ শব্দ আছে, মানব হৃদয়ে প্রেম স্নেহ দয়া প্রভৃতি অসংখ্য মধুময় ভাব আছে এই সমস্তই সর্ব্বদাই আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে নিজেদের অস্তিত্ব জানাইতেছে। আমরা কেবল যে জানিতেছি ইহারা আছে তাহা নহে এই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেছি। এই প্রকারে আমরা যখন মুগ্ধ হই সেই সময়ে আমাদের সমক্ষে এক নিত্য ও অপ্রাকৃত জগৎ অন্ততঃপক্ষে অস্পষ্ট ভাবেও প্রকাশিত হয়, কিন্তু আমরা এই অপ্রাকৃত জগতের তথ্য নিরূপণে চেষ্টা করিনা, কারণ আমরা স্বভাবতঃই বহির্মুখী, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, দেহের দ্বারা সৌন্দর্য্যকে আয়ত্ত করিতে চাই। এই প্রকারে বহির্মুখী হইয়া আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বে প্রকাশিত সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্যকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি সে অবস্থায় আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আর যে অবস্থায় এই বিশ্বে প্রকাশিত সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্যের দ্বারা এক অপ্রাকৃত শাশ্বত জগতের উপলব্ধি ও অন্বেষণে আমরা স্বভাবতঃই নিযুক্ত হই সেই অবস্থায় আমরা 'রসিক' ও 'ভাবুক' অর্থাৎ বিশ্বের মূলে যে ভাব (idea) ও রস নিহিত রহিয়াছে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। রসিক ও ভাবুক হইয়া ভাগবত শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই আমরা এই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিব।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলা আলোচনা করিলে আমরা এই 'ভাব ও রস'এর তত্ত্ব বেশ সহজে বুঝিতে পারিব। নদীর তীর, সুন্দর উপবন, বাতাস বহিতেছে, চাঁদ উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে এইরূপ স্থানে চৈতন্যদেবের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে? ভক্ত কবি বলিতেছেন,

"মুহুর্ব্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।"

পুনঃ পুনঃ সেই বৃন্দাবনের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠিতেছে এবং তিনি প্রেমে বিবশ হইয়া পড়িতেছেন; আবার ভক্ত কবি তাঁহার রূপবর্ণনায় বলিতেছেন

"ভূষণনবরসভাবাবিকারঃ।"

এই 'ভাব ও রস'এর তত্ত্ব আমরা নানাপ্রকারে বুঝিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সমস্তেরই দুইটা দিক আছে। একটা নশ্বরতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের দিক এবং ব্যবহারিক (phenomenal), আর একটা নিত্যতার দিক এবং পারমার্থিক (noumenal), এই দুইটি দিক একসঙ্গে

অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত, সসীমের সহিত অসীমের মহাসম্মিলন, একটিকে ছাড়িয়া আর একটি থাকিতে পারেনা।

"ঈশাবাস্তমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

এই বিশ্বে যাহা কিছু চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতেও ঈশ্বর আছেন, তাহারও একটা শাশ্বত ও ধ্রুব দিক আছে। হিন্দুজাতি তাহার বিশেষপ্রকার সাধনার মধ্যে এই শাশ্বত দিকটাই বেশী জোরে ধরিয়াছিল। হিন্দুর পৌত্তলিকতা (অবশ্য 'তথাকথিত), অবতারবাদ, গুরুবাদ, প্রভৃতি ব্যাপার যাহা সহস্র প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য সমালোচনার মধ্য দিয়া বিজয়ী বীরের মত, গঙ্গার পবিত্র জলধারার মত চলিয়া আসিতেছে, এই সমস্তের মূলেও হিন্দু চিত্তের ও হিন্দু সাধনার এই বিশিষ্টতা টুকু বিদ্যমান। অবশ্য সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক, কিন্তু এই জাতীয় বিশিষ্টতাটুকু অবলম্বন করিয়া সংস্কার ও উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা বাক্সের কলে ভুল চাবি লাগাইয়া, ঐ চাবি যতই ঘুরাণ যাউক না কেন, সে কল যেমন কিছুতেই খুলিবে না, তেমনি অন্য জাতির বা অন্য সমাজের সাধারণ সূত্রগুলি বেদবাক্য রূপে গ্রহণপূর্ব্বক যতই চেষ্টা করা যাউক না কেন এ প্রাচীন সমাজ কিছুতেই নড়িবে না। এ কালে সংস্কারের যে বিচিত্র চেষ্টাসমূহ হইতেছে তাহার অনেকগুলিরই প্রকৃতি এইরূপ বলিয়া চেষ্টার প্রারম্ভে যে সফলতার আভাস পাওয়া যায়, কিছু দিন পরে আর তাহা থাকে না।

যাজ্ঞবল্ক ঋষি মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন "ন বা অরে পতিঃ পত্যুঃ কামায় প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।"

স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে তাহা স্বামীর কামনায় জন্য অথবা কামনার মধ্যে প্রকাশিত স্বামীর যে নশ্বরভাব তাহার জন্য নহে, আত্মার জন্য বা ঈশ্বরের জন্যই স্ত্রী পতিকে ভালবাসে, অর্থাৎ পতির মধ্য দিয়া যে 'নিত্যত্ব' প্রকাশিত হইতেছে তাহারই জন্য। মানুষের মধ্যে "প্রীতি" বা ভালবাসা বলিয়া যে জিনিসটা রহিয়াছে, তাহা স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা প্রভৃতি এবং বিত্ত; সম্মান প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই প্রীতির মূলে পূর্ব্বোক্ত রহস্য নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত বস্তুরই দুইটা দিক আছে, এক নশ্বরতার দিক আর এক নিত্যতার দিক। ভালবাসা বলিতে ঐ নশ্বরতার দিককে উপেক্ষা করিয়া বা বিস্মৃত হইয়া ঐ নিত্যতার দিককে জোর করিয়া চাপিয়া ধরা বুঝায়।

ভাগবত ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে, 'ভাব ও রস' কি তাহা বুঝিতে হইলে এই কথাটি বেশ ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা বেশ পরিস্কার হইবে।

মনে করুন, আমি আমার পুত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, নিজে না খাইয়া তাহাকে খাওয়াইতেছি, মাথার ঘামে পা ভিজাইয়া দিন রাত্রি খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক তাহার জন্ত জমাইতেছি। মহামায়ার মায়ায় বদ্ধ হইয়া ছেলেটিকে ভালবাসিয়া জীবনের দিন গুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছে। ছেলে-টিকে দেখিলে কত আনন্দ হয়, তাহার একটু অসুখ হইলে কত ব্যাকুল হইয়া পড়ি। মনে করুন, আমি দৃঢ়ভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিলাম যে আমার এই ছেলেটি একটি নশ্বর বস্তু, এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর শীতল হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহার এই সুন্দর সুকুমার দেহ এখনি স্পন্দহীন ও বিকৃত হইয়া পরমুহূর্ত্তেই শ্মশানের এক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হইবে। কতক্ষণের কথা, এই মুহূর্ত্তেই এই দুঃসহ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। পুত্রের এই নশ্বরতার দিক যদি সর্ব্বদা দৃঢ়ভাবে চিন্তা করি তাহা হইলে এমন সর্ব্বান্তঃকরণে কি পুত্রকে ভালবাসা যায়? কখনই যায় না। যে সময়ে আমি আমার পুত্রকে বা স্ত্রীকে অথবা আমার ধন সম্পত্তিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেছি, সেই সময়ে আমি ভুলিয়া যাইতেছি যে এই পুত্র, এই স্ত্রী বা এই ধন-সম্পত্তি বিনাশশীল। নশ্বরতার দিক ভুলিয়া যাইয়া নিত্যতার দিকে চিত্তকে নিবদ্ধ করাই ভালবাসা। মানব জগতকে ভালবাসিয়া জীবনপথে পর্য্যটন আরম্ভ করে, কিন্তু জগৎ 'জগৎ' বলিয়া তাহার ভালবাসার আশ্রয় হইতে পারে না, ভগবানকে ভালবাসিয়া মানবের এই পর্য্যটন সফল হয়। জগৎ বা জাগতিক বস্তু প্রেমের 'উদ্দীপন' মাত্র 'আলম্বন' নহে। ভগবান ও মানব আত্মা এই উভয়ে আলম্বন। একটি বিষয়, আর একটি 'আশ্রয়'।

এইবার গীতা ও ভাগবতের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখা যাউক আমরা এই ভাবতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও উপদেশ পাইতে পারি কি না।

গীতার সহিত ভাগবতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধটা কি তাহা মোটামুটি বুঝিয়া লওয়া দরকার। গীতায় যাহা উপসংহার বা শেষ কথা, ভাগবতের তাহাই আরম্ভ, অথবা গীতাই ভাগবতের বীজ স্বরূপ। ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন শাস্ত্র সমূহ যে সমস্ত তত্ত্বের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, গীতাও ঠিক সেই

সমস্ত তত্ত্বেরই মীমাংসা করিয়াছেন। সমুদয় দর্শন শাস্ত্রের সহিত গীতার প্রভেদ এই যে গীতা এই সমস্ত তত্ত্বের মীমাংসায় মুখ্যভাবে ঈশ্বরবাদের অবতারণা করিয়াছেন। এই ঈশ্বরবাদই গীতার বিশেষত্ব এবং এই জন্যই গীতার আদর অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রের অপেক্ষা অধিক। ভাগবত এই ঈশ্বরবাদ ও ঈশ্বর উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কল্পের ইতিহাস অথবা ইতিহাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়া এই ঈশ্বরবাদ ও উপাসনাকে উজ্জ্বলতম আকার প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ গীতা ভাগবতের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আজকাল অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে গীতার শ্রীকৃষ্ণই যথার্থ শ্রীকৃষ্ণ, গীতার উপদেষ্টা ও কুরুক্ষেত্রের সারথী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে যাপিত বাল্যলীলা ও গোপীবিলাস প্রভৃতির দ্বারা কৃষ্ণের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে। এই প্রকারের মত আজকাল অনেকেই পোষণ করেন, তাঁহাদের ধারণা এই যে বৃন্দাবনলীলা যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র হইতে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলেই কৃষ্ণের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, বৃন্দাবনলীলা দ্বারা কৃষ্ণের মহিমা বর্দ্ধিত হয় নাই বরং তাহার হানি হইয়াছে। তাঁহাদের মতে গীতাই হিন্দু সাধনার চরমগ্রন্থ, ভাগবতের মধ্যে হিন্দুচিত্তের একটা অবনত বা অধঃপতিত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাটা বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করা উচিত। ভাগবত খুব বড় গ্রন্থ, তাহার পর নিতান্ত সহজ গ্রন্থ নহে, ভাগবতধর্ম্ম বেশ ভালরূপে প্রচারিত হয় নাই, এই জন্যই এ প্রকারের একটা মত দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র যে ভাবে কৃষ্ণকে বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় যে তাঁহারা বৃন্দাবন লীলা বা ভাগবত ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বাঙ্গালাদেশে ভাগবত বুঝিবার একটি বিশেষ সুবিধা আছে। আমরা সেই সুবিধাটির যদি সদ্ব্যবহার করি তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত সহজে আমরা ভাগবতের মর্ম্ম অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। চৈতন্যলীলার মধ্যদিয়া কৃষ্ণলীলা বুঝিবার চেষ্টা করাই এই সহজ উপায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, চৈতন্যলীলা কৃষ্ণলীলার পুনরভিনয়ই। চৈতন্যদেবই কৃষ্ণ, তিনি রাধার প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য রাধার অঙ্গকান্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রেমস্রোতে জগতকে ভাসাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সমস্ত সখীগণ ভক্তরূপে চৈতন্যলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চৈতন্যলীলায় যাহা মহা-সঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণলীলায় তাহাই মহারাস। কৃষ্ণ-

লীলা ও চৈতন্যলীলা অভিন্ন। এই সমস্ত কথায় গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করা যে কঠিন তাহা নহে। যাঁহারা বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত প্রাচীন আচার্য্যগণের এই সমস্ত কথা শিরোধার্য্য করিবেন, যাঁহারা সংশয়ী তাঁহারা যদি প্রথমে ধরিয়া লয়েন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম (Spirit) এক ও অভিন্ন (Identical) অর্থাৎ এই উভয় লীলায় মধ্যে সাধকের যে অনুভূতি বা উপভোগ রহিয়াছে, (spiritual experiences) তাহা একই। এই কথাটি যদ্যপি তাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচনা করেন এবং হৃদয়ের দ্বারা এই কথাটির তত্ত্ব নির্ণয়ে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম নিশ্চয়ই সফল হইবে। যাহা হউক এবারে কেবলমাত্র এই বিষয়ের আভাস দেওয়া রহিল, ক্রমশঃ ইহার আলোচনা করা যাইবে।

ভাগবতের কৃষ্ণ ও গীতার কৃষ্ণ এতদুভয়ের মধ্যে বা শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বিবিধ প্রকাশের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, তাহা প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার কথা বলিতেছি। ভগবান সচ্চিদানন্দ। কৃষ্ণ, যিনি ভাগবতের মতে স্বয়ং ভগবান (কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং) তিনিও তাঁহার প্রকট লীলায় পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই তিন ভাবে প্রকাশিত। বৃন্দাবনে তিনি পূর্ণতম, পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরায় ও দ্বারকায় তিনি পূর্ণতর, আর কুরুক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ। কুরুক্ষেত্রে মুখ্যভাবে তাঁহার সৎভাবের লীলা—কুরুক্ষেত্রে প্রধানতঃ জ্ঞান-ধাম—ইংরেজীতে বলিলে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ The Guide and the Philosopher. মথুরায় ও দ্বারকায় তাঁহার চিৎ ভাবের লীলা—পুরদ্বয় প্রধানতঃ কর্ম্মধাম, ইংরাজীতে বলিলে এখানে কৃষ্ণ The Ruler and the King. বৃন্দাবনে মুখ্যভাবে তাঁহার আনন্দ ভাবের লীলা—বৃন্দাবন প্রধানতঃ শুদ্ধাভক্তিধাম—বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষায় "অপ্রাকৃত নবীন মদন"—The Object of transcendental and spiritual love.

ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব প্রতিষ্ঠা করা বা ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাই গীতার উদ্দেশ্য। মানব স্বভাবতঃ অহঙ্কার ও মোহ এই দুইটি ভূমি আশ্রয় করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, এই দুইটি ভূমিই বালির উপর ঘরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই দুই ভূমি ছাড়িতে হইবে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥"

যদি তুমি অহঙ্কারের ভূমি আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না (বা অন্য কোন কার্য্য করিব না) এইরূপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। প্রকৃতি তোমাকে বাধ্য করিয়া সে স্থান হইতে বিতাড়িত করিবে।

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

আবার যদি মোহের ভূমি আশ্রয় কর তাহা হইলে আপনার স্বভাবজ কর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছ সেই বিশিষ্টতার দ্বারা সে ভূমিতেও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না এবং যাহা করিব না ইচ্ছা করিতেছ, বাধ্য হইয়া তাহাই তোমাকে করিতে হইবে।

তাহা হইলে মানবের আশ্রয়নীয় ভূমি কোথায়? গীতা বলিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে বিদ্যমান। ভূত সকল মায়ামুগ্ধ হইয়া যন্ত্রারূঢ়বৎ পরিচালিত হইতেছে। অবশ্য মায়ামুগ্ধ হইয়াই জীবকুল যন্ত্রারূঢ়বৎ। এই গুণময়ী দৈবীমায়া অতিক্রম করিলে জীব আর আপনাকে পরাধীন বিবেচনা করিবে না. ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তনের মধ্যেই তাহার যে যথার্থ স্বাধীনতা ও সার্থকতা নিহিত আছে তাহা বুঝিতে পারিবে। ইহাই গীতার শেষকথা। এই কথা বলিয়াই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন :—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

সকল ভাবের দ্বারা ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে শীঘ্রই পরমাশান্তি লাভ করিবে।

সকল ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, ইহাই গীতার শেষতত্ত্ব ও চরম উপদেশ। এই উপদেশ কিরূপে পালন করা যায়, লীলার মধ্যে লীলাময়কে দেখিয়া কেমন করিয়া সকল ভাব ও সকল রসের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় ইহাই ভাগবতের অভিপ্রায়। ভাগবত কি প্রকারে এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইব। শ্রীধর স্বামী যে

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাতেই—"কেবলমীশ্বরারাধন-লক্ষণো ধর্ম্মঃ নিরূপ্যতে" এই বলিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এবং ভাবুক ও রসিক হইয়া ভাগবত রস পান করিবার তাৎপর্য্যই বা কি তাহাও বুঝিলাম।

ঐতিহাসিক বুদ্ধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যের বিষয় ইউরোপে প্রচারিত হয় তখন অনেকেই "গৌতম বুদ্ধ" নামক উক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-স্থাপন-কর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মনস্বী ওয়েবার তাঁহার "History of Indian Literature" নামক গ্রন্থে স্পষ্টতঃ এই সন্দেহের উল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধের গল্পটি যে রূপক মাত্র কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, স্বয়ং উইলসন সাহেব পর্য্যন্ত এই ধারণার বশীভূত ছিলেন। রাজপুতানার ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ টড পুরাণবর্ণিত বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার স্বামী বুধের সহিত বুদ্ধের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া ইহাকে স্কান্দি-নবীয় দেশের দেবতা ওডিনের নামান্তর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরি-শেষে সেনার্ট এবং কার্ণ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে সূর্য্যদেবতা-কেই বুদ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত আমূল সূর্য্য-রূপক-ইতিবৃত্ত (solar mythology) হইতে গৃহীত।

সৌভাগ্যের বিষয় সুবিপুল পালিসাহিত্য আবিষ্কারের পর হইতে গৌতম বুদ্ধের অস্তিত্ব বিষয়ে আর কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও তাঁহার যে অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ জীবন-কাহিনী সাধারণ্যে সুপরিচিত তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই আস্থাবান হইতে পারেন নাই। সন্দেহের প্রধান কারণ এই যে প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ কোথাও বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই। তাঁহার যে কয়েকখানি জীবনচরিত পাওয়া যায় তৎসমুদয়ই পরবর্ত্তীকালে রচিত। আমরা কালক্রমা-নুসারে নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি।

প্রথম—বুদ্ধচরিত, সংস্কৃত কাব্যাকারে লিখিত এই গ্রন্থখানির কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত।

দ্বিতীয়—ললিত বিস্তর, এখানিও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ এবং বুদ্ধচরিতের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত।

তৃতীয়—বৌদ্ধজাতকগ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম ছত্রিশ বৎসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত।

চতুর্থ—জিন চরিত, দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহল নিবাসী বুদ্ধদত্ত কর্তৃক পালি কবিতাতে লিখিত হয়। ইহাতে বুদ্ধদেবের প্রথম ছত্রিশ বৎসর ও শেষ কয়েকমাসের জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম—মালালঙ্কার বত্থু, সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা ব্রহ্মদেশে লিখিত হইয়াছে।

এই তালিকা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, যে কয়েকখানি গ্রন্থ বুদ্ধদেবের জীবন চরিত সঙ্কলনে প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ সে সকলই তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর ছয়শত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া দুই হাজার বৎসরের মধ্যে লিখিত। সুতরাং উক্ত গ্রন্থাবলী যে বুদ্ধদেবের জীবনের খাঁটী ঐতিহাসিক তত্ত্ব নহে, তৎসমুদয় ছয়শত বৎসর ও তদধিক কাল লোকমুখে রূপান্তরিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছিল কেবলমাত্র তাহারই কবিত্বময় আলেখ্যমাত্র—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে। ভক্তগণের ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে উপাস্য দেবতার ছবি কত শীঘ্র এবং কত অদ্ভুত রকমে রূপান্তরিত হয় তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য আমাদিগকে অধিকদূর যাইতে হইবে না। এই বঙ্গদেশেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই বৈষ্ণবমণ্ডলী কর্তৃক তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যবর্গের চিত্রের যে অলৌকিক রূপান্তর সংসাধিত হইয়াছিল তাহা লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ এবং লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠকবর্গ মাত্রেই সম্যক অবগত আছেন। *

বুদ্ধদেবের যে কয়েক খানি জীবন চরিতের বিষয় উপরে লিখিত হইয়াছে তাহা এই শ্রেণীরই গ্রন্থমাত্র—ঐতিহাসিক জীবন চরিত নহে। প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগকে এই গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অনতিকাল পরেই যে সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। যদিও এই সমুদয় গ্রন্থে বুদ্ধদেবের ধারাবাহিক জীবনচরিত নাই তথাপি আনুসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁহার জীবনের যে সকল বৃত্তান্ত এই গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদয় ও উল্লিখিত কাব্যেতিহাসগুলির সমন্বয় সাধন করতঃ বুদ্ধদেবের জীবনের একটী মোটামুটি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩২৮, ৩৫৬ ৩৫৭ পৃঃ।

বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যদিও এ কার্য্য সময়সাপেক্ষ এবং ইহার পরিণতি সাধনে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তথাপি কয়েকটি মনীষি কর্ত্তৃক যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে আমরা অদ্য তাহাই বিবৃত করিব।

আমরা সকলেই জানি বুদ্ধদেব রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজৈশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেই আমরা বুদ্ধদেবের নাম করি। বিভিন্ন দেশীয় কবিগণ এই অতুলনীয় ত্যাগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কবিবর নবীনচন্দ্র বাঙ্গালীর নিকট তাহা চির সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। গত পৌষমাসের 'বীরভূমি'তে বন্ধুবর গিরিজাশঙ্কর তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় এই ত্যাগের কোমল-কঠোর মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। কিন্তু এক সম্প্রদায় 'নির্ম্মম নিষ্ঠুর' ঐতিহাসিক গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব যে রাজপুত্র ছিলেন বলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহারা বলেন 'প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি হইতে যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে ধারণা হয় শাক্য জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে কোন রাজাই ছিলেন না। তাঁহারা সাধারণতন্ত্র অনুসারে শাসিত হইতেন। যুবা বৃদ্ধ সকলে "সন্থাগারে" মিলিত হইয়া শাসন ও বিচার সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। একজন প্রধান ব্যক্তি কিছুকালের জন্য "অধিনায়ক" নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার পদবী রোম নগরের 'কন্‌সাল'এর অনুরূপ ছিল এবং তিনি 'রাজ' নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেবের পিতা শুদ্ধোদন কিছুকালের জন্য এই পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।' এবিষয়ে উক্ত ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

অঙ্গুত্তর বিনয়সূত্র প্রভৃতি প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে তৎকালে মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের পার্শ্বে শাক্য, মল্ল, বৃজি প্রভৃতি সাধারণ তন্ত্রানুযায়ী শাসিত কয়েকটি জাতিও বর্ত্তমান ছিল। ঐ সকল ও অন্যান্য গ্রন্থের কয়েকটি আনুসঙ্গিক বিবরণ এই মতের সমর্থন করে। কোশলরাজ শাক্যবংশের একটি কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব করিয়া পাঠান—শাক্য জাতীয় যুবা বৃদ্ধ সকলে সন্থাগারে মিলিত হইয়া এই প্রস্তাব আলোচনা করেন। অম্বট্‌ঠ সুত্তান্তে বর্ণিত আছে, অম্বট্‌ঠ কোন কার্য্যোপলক্ষে কপিলবস্তু গিয়া দেখিলেন শাক্য জাতীয় সকলে "সন্থাগারে" মিলিত হইয়া শাসন ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। মহাপরিনির্ব্বাণসুত্তে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধদেব মল্লদের

শালবনে দেহত্যাগ করিলে আনন্দ এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাইয়া দেখেন মল্লগণ সন্থাগারে মিলিত হইয়াছে এবং তথায়ই তিনি তাহার বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন।

শুদ্ধোদন যে কেবল কিছুকালের জন্য 'রাজ' বা সাধারণ তন্ত্রানুযায়ী 'অধিনায়ক' হইয়াছিলেন তাহা বিনয়পিটকের দুইটি স্থান হইতে সপ্রমাণ হয়। একস্থানে তাঁহাকে কেবলমাত্র শুদ্ধোদন শাক্য এইরূপ সামান্য নগরবাসীর ন্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর স্থানে বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা ভদ্দিয়কে 'রাজা' বলা হইয়াছে।

শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের মতিগতি ফিরাইবার জন্য যে অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগের আয়োজন করিয়াছিলেন অনেক গ্রন্থে তাহার ভূয়সী বর্ণনা আছে। এই প্রসঙ্গে বিশাল শাক্য রাজ্যের সমৃদ্ধির বিষয়ও বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে শাক্যরাজ্যের এইরূপ সুসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যের ও বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং ইহাই প্রতীয়মান হয় যে শাক্য রাজ্যের বিস্তৃতি দেড়শত কি দুইশত বর্গমাইল মাত্র ছিল, তাহার অধিবাসীগণ কৃষিজীবি ছিলেন এবং তাহাদের প্রধান ব্যক্তিগণও সাধারণ ভাবেই জীবন যাপন করিয়াছেন।

বুদ্ধ দেবের প্রচলিত জীবন বৃত্তান্তের সহিত উল্লিখিত যে অনৈক্যটুকু ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন আমরা তাহা যথাযথ বিবৃত করিলাম। ইহা এখনও সর্ব্ববাদী সম্মত হয় নাই—কয়েকটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত মাত্র।

বুদ্ধদেবের জন্ম শতাব্দী সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ মত ভেদ চলিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং উত্তর ভারতবর্ষে এবিষয়ে পাঁচটি বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই জন্মবর্ষ এখনও নিঃসন্দেহরূপে নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমানকালে তিন চারিটি বিভিন্ন উপায়ে ইহার অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। পণ্ডিতগণ এই প্রকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা যথাক্রমে তাহার আলোচনা করিতেছি।

১। সিংহলে বুদ্ধবর্ষ বলিয়া একটী নির্ব্বাণাব্দ প্রচলিত আছে। তদনুসারে ৬২৪ কি ৬২৩ খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল। এই নির্ব্বাণাব্দের উপর যদি বিশ্বাস করা যায় তবে সকল গোলের অবসান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নির্ব্বাণাব্দ যে ভ্রমাত্মক তাহা একরূপ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ খ্রীষ্টির দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই অব্দ সিংহলে প্রচলিত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে অব্দ সম্বন্ধে উত্তর ভারতবর্ষে খ্রীষ্টির সপ্তম শতাব্দীতেই এত মতভেদ তাহা যে সুদূর সিংহলে দ্বাদশ শতাব্দী বা তাহার দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বেও সুনিশ্চিত ছিল ইহা অসম্ভব না হইলেও যথেষ্ট সন্দেহ জনক বটে। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ ঘোষ ও মহাবংশ অনুসারে অশোক বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২১৮ বৎসর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভকাল ইহার ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে। সুতরাং সিংহল-প্রচলিত নির্ব্বাণাব্দ ঠিক হইলে ৩৮২ বা ৩৮১ খ্রীঃ পূঃ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত যে বীরবর আলেকজান্দারের সমসাময়িক তাহা অবি-সংবাদী সত্য। সুতরাং সিংহল প্রচলিত নির্ব্বাণাব্দ যে ভ্রমপূর্ণ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে এই নির্ব্বাণাব্দ কোথা হইতে আসিল। সাত শত বৎসরেরও অধিক যে অব্দ সর্ব্বসম্মতিক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহার মূল একেবারে কোন প্রকার ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিরুদ্ধ বাদীরা ইহার উত্তর দিয়া থাকেন যে সাধারণতঃ কোন অব্দ প্রচলিত হইলেই তাহার পর হইতে প্রতিবৎসর লোক মুখে গণনা হওয়ায় তাহা ঠিক থাকে। বুদ্ধবর্ষ অর্থাৎ সিংহল প্রচলিত নির্ব্বাণাব্দ যদি বুদ্ধের মৃত্যুর পর হইতেই গণনা করা হইত তবে তাহাও এইরূপ ঠিক থাকিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলে কোন প্রকার অব্দের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় 'বুদ্ধবর্ষ' উদ্ভাবিত হয়। তখন ধর্ম্মগ্রন্থ দৃষ্টে যথাসাধ্য অনুসন্ধান দ্বারা বুদ্ধের মৃত্যুর পর হইতে সেই সময় পর্য্যন্ত কত বৎসর অতীত হইয়াছে তাহা স্থির করতঃ বুদ্ধ-বর্ষের কাল নিরূপিত হয়। তখন হইতে ইহা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এই আদিম গণনাতেই ভুল রহিয়া গিয়াছে।

২। বৌদ্ধ গ্রন্থে একটি প্রবাদ আছে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিলে বুদ্ধদেবের জন্মকাল নিরূপণ করা যায়। প্রবাদ এই যে বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য উপালি বিনয়পিটক সংগ্রহ করেন এবং 'প্রবারণা'র দিন গ্রন্থের একটি পত্রে একটি বিন্দু চিহ্ন অঙ্কিত করেন। যতকাল তিনি জীবিত ছিলেন প্রতি বৎসর প্রবারণার দিন ঐরূপ একটি বিন্দু চিহ্ন যোগ করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও ঐরূপ করা হইত। পরিশেষে উক্ত বিনয়পিটক সংগ্রহ চীনদেশে সংঘভদ্রের হস্তগত হয় এবং তিনি ৪৮৯ বা ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে

৯৭৬ সংখ্যক বিন্দু চিহ্ন যোগ করেন। ইহা হইতে ৫৬৫ খ্রীঃপূঃ বুদ্ধদেবের জন্মকাল বলিয়া নিরূপিত হয়।

৩। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উপরোক্ত উভয়বিধ গণনায়ই আস্থা শূন্য হইয়া স্বাধীনভাবে বুদ্ধদেবের কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইতে চন্দ্র গুপ্ত ও অশোকের রাজ্যারম্ভের ব্যবধান যে যথাক্রমে ১৬২ ও ২১৮ বৎসর বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়া অন্য উপায়ে এই দুইজনের রাজত্বকাল নিরূপণ করতঃ তৎসাহায্যে বুদ্ধদেবের মৃত্যু বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। গ্রীক ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৩১২ খ্রীঃ পূঃ মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পণ্ডিত প্রবর ম্যাকস্ মূলার চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ ৩১৫ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। তদনুসারে তিনি ৪৭৭ খ্রীঃ পূঃ (৩১৫ + ১৬২ = ৪৭৭) বুদ্ধদেবের মৃত্যুকাল এবং ৫৫৭ খ্রীঃপূঃ তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।*

৪। ডাক্তার ফ্লীট দুইটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন মন্তব্যে উপনীত হইয়াছেন। সিংহল দেশীয় প্রিয়তিষ্য নামক নরপতি অশোকের অষ্টাদশ বর্ষ পরে সিংহাসন লাভ করেন। আষাঢ়া নক্ষত্রে তাঁহার অভিষেক হইয়াছিল। নক্ষত্র মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ২৪২ অথবা ২৪৭ খ্রীঃ পূঃ এই অভিষেক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরা অশোকের রাজ্যাভিষেক ২৬০ (২৪২ + ১৮) বা ২৬৫ (২৪৭ + ১৮) খ্রীঃ পূঃ, এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক ৩১৬ (২৬০ + ৫৬) বা ৩২১ (২৬৫ + ৫৬) খ্রীঃ পূঃ সম্পাদিত হইয়াছিল। ফ্লীট বলেন ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে আলেকজান্দারের মৃত্যুর অনতি কাল পরেই চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ আলেকজান্দারের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং উল্লিখিত ২১৬ ও ৩২১ খ্রীঃ, এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্তটিকেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারম্ভকাল বলিয়া গণ্য করা অধিকতর সমীচীন। এই অনুসারে ৫৬৩ (৩২১ + ১৬২ + ৮০) খ্রীঃ পূঃ বুদ্ধদেবের জন্মকাল বলিয়া নিরূপিত হয়। বুদ্ধদেবের জন্মকাল সম্বন্ধে এই দুইটি সুপ্রসিদ্ধ মত ভিন্ন আরও কয়েকটি মত প্রচলিত আছে, আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

বুদ্ধদেবের জন্মস্থান নিরূপণ গত শতাব্দীর একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।

---

* বুদ্ধদেবের অশীতি বৎসর পরমায়ু সর্ব্ববাদী সম্মত।

কিছুকাল পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিস্তর বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের নেপাল রাজ্যের রুমিনদাই তপ্পার অন্তর্গত পাদারিয়া নামক স্থানের নিকটে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ায় বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীবনের অবস্থিতি নিঃসন্দেহ রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই ভূপ্রোথিত স্তম্ভগাত্রে অতি পরিষ্কার অক্ষরে খোদিত মহারাজা অশোকের একখানি উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় "মহারাজা অশোক এইস্থলে আসিয়া পূজা করিয়াছিলেন—কারণ এই স্থানে লুম্বিনীবনে শাক্য মুনি ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই লিপি পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে গোরক্ষপুর জেলার সীমান্ত হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক জন হীন প্রান্তরে যে স্তম্ভটি এতদিন অনাদৃত ও অলক্ষিত ভাবে পড়িয়াছিল তাহা সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া জগতের এক মহা পুণ্যক্ষেত্রের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে।

আমরা বুদ্ধদেবের কুলপরিচয় জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। অতঃপর আমরা তাঁহার জীবন চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনী তিনভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে।—প্রথম, জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ; দ্বিতীয়, সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে সিদ্ধিলাভ; তৃতীয়, অবশিষ্ট জীবন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের আলোচনা করিব।

বাল্যকালে গৌতম যে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। উত্তর কালে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমুদয় অলৌকিক উপখ্যান প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে কোনমতেই আস্থা প্রদান করা যায় না। এই অলৌকিক গল্প গুলির কোথা হইতে উৎপত্তি মাঝে মাঝে তাহার বেশ সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি উপাখ্যান এইরূপ। গৌতম তাঁহার শারীরিক ক্ষমতা কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য একদিন সমুদয় নগর বাসীকে একত্রিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে বিবিধ প্রকার ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিলেন। একটি হাতীর লেজ ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহাকে বধ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। শর নিক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে নির্ঝর সৃষ্টি করিলেন।

বুদ্ধের ভক্তগণ তাঁহার অসাধারণত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই এ সকল ক্ষমতা তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ছাড়াও এ গল্পগুলির মধ্যে একটু রহস্য আছে। পাঠকগণ একটু অনুধাবন করিয়া পড়িলেই উল্লিখিত দুইটি ঘটনাতে মহাভারতের দুইটি সুপ্রসিদ্ধ আখ্যা-

নের ইঙ্গিত দেখিতে পাইবেন, যথা কৃষ্ণের কুবলয়াপীড় বধ বা কুরুক্ষেত্রে ভীমের যুদ্ধ-কাহিনী এবং শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের তৃষ্ণা দূর করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের ভূপৃষ্ঠে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক উৎসসৃজন। অসম্ভব নহে যে এই প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যানগুলিই গৌতমের জীবন-চরিতে স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান কালেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চৈতন্যদেবের জীবনেও কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আরোপ করিয়াছেন।

শুদ্ধোদন বহুদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন, পরে তাহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে গৌতমের জন্ম হয়। বাল্যকালেই গৌতমের মাতৃবিয়োগ ঘটে, এবং তিনি বিমাতার ক্রোড়ে পালিত হন। এ সকল অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। যে প্রকার "স্বয়ংবর" প্রথানুযায়ী তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না—ঐ প্রকার মনোনয়ন প্রথা শাক্যরাজ্যে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনতম গ্রন্থ সমূহে 'যশোধরা' নামে তাঁহার পত্নীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরে এই পত্নীর নাম গোপা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। চীন ও তিব্বত দেশীয় গ্রন্থে গৌতমের তিন স্ত্রীর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ অনুসারে ইহাদের নাম, যশোধরা, গোপা, ও উৎপলবর্ণা। এই সমুদয় হইতে অনুমান হয় গৌতমের এক স্ত্রী ছিলেন তিনি যশোধরা, গোপা, ও উৎপলবর্ণা এই তিন নামেই অভিহিত হইতেন।

রাহুল নামে গৌতমের এক পুত্র হইয়াছিল তাহাও সত্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রাচীনতম গ্রন্থেও 'রাহুল বাদ' বলিয়া একটি সূত্রের উল্লেখ আছে এবং রাহুল পরে একটি বৌদ্ধ সংঘের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ও সন্ন্যাস এই চারি দৃশ্যই গৌতমের গৃহত্যাগের প্রধান কারণ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এই চারি দৃশ্য তিনি প্রকৃতই চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন অথবা মানুষের এই স্বাভাবিক শোচনীয় পরিণামের বিষয় মানসনেত্রে কল্পনা করিয়াই তিনি গৃহত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহা একটি সমস্যা বটে। ব্যাধি জরা প্রভৃতির দৃশ্য বিরল নহে এবং এই সকল নিত্য দৃষ্ট ঘটনাও যে সহসা এক মুহূর্ত্তে মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় করিতে পারে তাহাও সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু অপর পক্ষে ইহাও অসম্ভব নহে যে গৌতম ব্যাধি জরা মৃত্যু প্রভৃতি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়াই মানবজীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মানসচক্ষে যাহা প্রতিভাত হইয়াছিল পরবর্ত্তী লেখকগণ তাহাই বাহ্যদৃষ্টে

রূপান্তরিত করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত গৌতমের জীবনীতে আরও পাওয়া যায়। মার নামক অপদেবতার প্রসঙ্গ ইহার অন্যতম উদাহরণ।

কয়েকটি কারণবশতঃ এই শেষোক্ত অনুমানই সত্য বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ সমগ্র উপাখ্যানটিতে যে কল্পনার বেশ একটু হাত আছে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়:। গৌতম জন্মিবার পরেই দৈবজ্ঞগণ বলিলেন যে ব্যাধি জরা প্রভৃতি চারি দৃশ্য দেখিয়া এই শিশু গৃহত্যাগ করিবে। শুদ্ধোদন এমন বন্দোবস্ত করিলেন যে ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৌতম এই নিত্যদৃষ্ট চারি ঘটনার একটিও প্রত্যক্ষ করিলেন না। পরে দেবগণ অনুপায় দেখিয়া এই চারি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গৌতমকে দর্শন দিলেন। সারথি ছন্দক দৈবজ্ঞের গণনার বিষয় এবং শুদ্ধোদনের নিষেধ জানিয়াও এই চারি দৃশ্য গৌতমকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এমন বক্তৃতা করিল যাহাতে সাধারণ লোকের চিত্তেও বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। অবশ্য ইহা হইতে সমস্ত গল্পটিই যে কল্পনা তাহা বলা যায় না। এরূপ হইতে পারে যে ব্যাধি জরা প্রভৃতি সন্দর্শনরূপ মূল কথাটি খাঁটি সত্য এবং পরে তাহার চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ উপাখ্যান জড়িত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যবিধ প্রমাণ আছে। সূত্র পিটকান্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় নামক প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে গৌতম ব্যাধি জরা প্রভৃতির রূপ মনশ্চক্ষে কল্পনা করিয়াই বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়টি লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে বলিয়াই আমরা সবিস্তারে ইহার উল্লেখ করিলাম। তখনকার দিনে বেদান্তধর্ম্ম-অনুপ্রাণিত ভারতবর্ষে সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করা ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। বিশেষ কোন ঘটনা ব্যতিরেকেও গৌতম তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। সুতরাং তিনি ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অথবা কেবলমাত্র কল্পনা-গোচর করিয়াই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতে পারিলেও আমরা গৌতমের জীবনের কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইব না।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৌতম প্রথমতঃ রাজগৃহে আলাঢ় ও উদ্রক নামক দুই জন শাস্ত্রজ্ঞের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। এই রূপে তৎকালপ্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র এই শিক্ষালাভ করিয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তখনও ভারতবর্ষের চিন্তা-জগতে জড়তার যুগ আসে নাই। চারিদিকে নূতন নূতন দার্শনিকতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইতে

ছিল। এই নূতন যুগের প্রকৃতি অনুসারে গৌতমও কেবলমাত্র প্রচলিত শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হইয়া নূতন কিছু উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবর্ষের চিরাগত প্রথা অনুসারে তিনি নির্জ্জন সাধনে অভিলাষী হইয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে গমন করিলেন। বোধ হয় শাস্ত্রজ্ঞানে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একটু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাই কৌণ্ডিল্য প্রভৃতি পাচ জন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

প্রচলিত জীবন বৃত্তান্ত অনুসারে গৌতম উরুবিল্বে ছয় বৎসর কঠোর যোগ সাধনা করেন—কখনও বা একেবারে উপবাস কখনও বা সপ্তাহান্তে একটি বদরী-ভক্ষণ। ক্রমে তাঁহার শরীর নিতান্ত কৃশ হইয়া পড়ে এবং একদিন তিনি সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। অতঃপর তিনি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে কঠোরতায় শরীর ধ্বংস হইতেছে মাত্র কিন্তু প্রকৃত কার্য্য কিছু সাধিত হইতেছে না। সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিলাসিতা ও কঠোরতা এই উভয়ের 'মধ্যবর্ত্তী' পথ অবলম্বন করিলেন। সুজাতা নাম্নী একটি রমণী প্রদত্ত 'পায়স' ভক্ষণ করিয়া তাঁহার দেহে কিছু শক্তিসঞ্চার হইল এবং তৎপরে তিনি বোধিদ্রুমের তলে সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করেন।

এখন প্রশ্ন এই যে ইহার কতটুকু বিশ্বাস যোগ্য। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত উপবাস বা সপ্তাহান্তে একটি বদরী-ভক্ষণ আমাদের বর্ত্তমান ধারণানুসারে অবশ্যই একেবারে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এইটুকু বাদ দিলে মূল ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গ্রাম-সন্নিহিত নির্জ্জন প্রান্তরে সাধন-নিরত কোন সন্ন্যাসীর ছয় বৎসর অবস্থান, প্রাচীনকালে তো দূরের কথা এই আধুনিক অধঃপতিত ভারতবর্ষেও অসম্ভব নহে। ভারতবর্ষে কখনও সাধুসেবা-পরায়ণা মাতৃরূপিণী সুজাতার অভাব হয় নাই। সুজাতা যে কেবল একজন ছিলেন এবং কেবল এক দিনের জন্যই গৌতমকে পায়স ভোজন করাইয়াছিলেন তাহা নহে। এই প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি নবীন সন্ন্যাসী ছয় বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্মশীলা সুজাতা (ভদ্রবংশোৎপন্না) ভারত-মহিলার ভক্তি ও স্নেহের দানে পরিপুষ্ট হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় নিরত ছিলেন, তাঁহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া সুজাতা নামটি আমাদের কাছে পৌছিয়াছে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। * কারণ ললিতবিস্তারেও সুজাতা ব্যতীত আরও একাদশ জন এই রূপ মহিলার নাম পাওয়া যায়। প্রচলিত জীবন বৃত্তান্ত পাঠে এইরূপ ধারণা হয় যে

* Bodh Gya—Dr. Rajendra Lal Mitra.

এই ছয় বৎসর তপ করিয়া গৌতমের কোন ফলই লাভ হয় নাই। পরে বোধি দ্রুমতলে এক সপ্তাহ ধ্যান করিবার পরেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু মনুষ্যের কর্ম্মজীবনের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যেই ভাবী সফলতার বীজ নিহিত থাকে। আমাদের মনে হয় গৌতম যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহারও মূলে এই ছয় বর্ষব্যাপী সুকঠোর নিষ্ফল সাধনা।

বোধিদ্রুমতলে গৌতমের 'নির্ব্বাণ' অথবা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'মারের' সহিত সংঘর্ষ। বৌদ্ধগ্রন্থে 'মার' একটি উপদেবতা রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই উপদেবতা গৌতমকে নানা সময়ে লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। যখন ছয় বৎসর কৃচ্ছ সাধনায় গৌতমের অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে তখন কপিলবস্তুর রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্য কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। প্রতিবারই বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে গৌতমের নির্ব্বাণ লাভের অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে শেষ চেষ্টা করে। প্রথমে তাহার রূপযৌবনসম্পন্না কন্যাদ্বয় নানারূপ হাবভাব ও কটাক্ষ দ্বারা গৌতমকে মোহিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মুনির মন তাহাতে টলিল না দেখিয়া অবশেষে মার সৈন্যসংগ্রহ ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গৌতমকে ভীতি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইল। এই উপলক্ষে ভীষণ সমর হয়, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপ্লবও পরিলক্ষিত হয়।

একটু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সহজেই অনুভূত হয় যে মারের উপাখ্যানটি রূপক মাত্র। অন্তর্জগতে যে লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুর ক্রিয়া তাহাই মারের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে যাহা রূপকমাত্র ছিল ক্রমে তাহাই বাস্তবে পরিণত হইল। আর সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে মারের ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি যে কেবল বৌদ্ধগণের দ্বারাই কল্পিত হইয়াছে তাহা নহে। হিন্দু শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে যে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে পিশাচ প্রেত প্রভৃতি নানাবিধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সাধককে বিচলিত করিতে চেষ্টা করে।

গৌতমের সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কখনও বিশ্বাস করিবেন না যে সাধনা করিতে করিতে কোন এক মুহূর্ত্তে সহসা দিব্যালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাঁহাদের মতে সিদ্ধিলাভের অর্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা ক্রমে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা। আমাদের মধ্যে একদল "সবজান্তা" লোক আছেন তাঁহা-

রাও এই মতের প্রতিধ্বনি করিবেন। হিন্দু ধর্ম্মের যোগ বা অন্য প্রক্রিয়ার সহিত ইহারা একেবারেই পরিচিত নহেন, কখনও সে বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন বা শ্রমব্যয় করেন নাই অথচ খুব দৃঢ়তা সহকারে "সিদ্ধি" প্রভৃতির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। আমরা কিন্তু এই গুরুতর বিষয়ে কোন বাচালতা প্রকাশ না করিয়া একেবারে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করি।

কথিত আছে বুদ্ধদেবের মনে প্রথম এই সমস্যা হইল যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিবেন কিনা, পরে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন। বুদ্ধদেবের মনে প্রথম একটা সন্দেহ আসা খুবই স্বাভাবিক। সে সময়ে বৈদিক পূজার্চ্চনা কতকগুলি জটিল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে—এই বাহ্যাড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে, সত্য, অহিংসা ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম সদাচার প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সরল ধর্ম্ম জনসমাজে প্রচলিত করা কত সুকঠিন ব্যাপার ইহা ভাবিয়া স্বভাবতই তাঁহার আশঙ্কা হইতে পারে। ব্রহ্মাদেবের স্বর্গ হইতে অবতরণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আমরা কল্পনা করিতে পারি যে মনুষ্য জাতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক করুণাই তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৌতমের সহিত পাঁচটী শিষ্য উরুবিল্বে আসিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতম যখন ছয় বৎসর পর কঠোর যোগমার্গ ত্যাগ করিলেন তখনই তাঁহাকে ভণ্ড সন্ন্যাসী মনে করিয়া উক্ত পাঁচটি শিষ্য চলিয়া যান। গৌতম যখন সিদ্ধিলাভ করেন তখন তাঁহারা বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বুদ্ধ প্রথমে তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। সারনাথ * নামক স্থানে তাঁহাদের নিকট বুদ্ধদেব তাঁহার নবধর্ম্মের প্রথম উপদেশ দান করেন। ইহাই ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন সূত্র নামে সমুদয় বৌদ্ধ জগতে সুবিখ্যাত এবং ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত আছে। অবশ্য এই ঘটনার সঙ্গে নানাবিধ অলৌকিক উপাখ্যান ও কবিত্বময় বর্ণনা জড়িত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে মতভেদ থাকিলেও এই উপদেশে বুদ্ধ যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা মোটামুটি সমুদয় গ্রন্থেই একরূপ লিখিত হইয়াছে।

আমরা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষেপে এই যুক্তির মূল সূত্রটি নিম্নে দিলাম।

---

* এই স্থান কাশীর ৪ মাইল উত্তরে। ইহা ভূপ্রোথিত ছিল গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"মনুষ্যেরা মোহ বশতঃ বিপথে পদার্পণ করে—একদিকে বিষয়লালসা ভোগসক্তি—অন্যদিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর-শোষণ। আমি মধ্য-পথ আবিষ্কার করিয়াছি ইহাই 'আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ'—ইহা অবলম্বন করিলে ক্লেশের মূলচ্ছেদ হইবে, শান্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইবে। এই আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ কি ? না ;—

১। সম্যক দৃষ্টি ; ২। সম্যক সঙ্কল্প, সঙ্কল্প ঠিক রাখা ; ৩। সম্যক বাক্য—সত্য সরল প্রিয়বাক্য বলা ; ৪। সম্যক কর্ম্মান্ত—সদাচরণ ; ৫। সম্যক আজীব—সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধুজীবিকা ; ৬। সম্যক ব্যয়াম—আত্মসংযম অবলম্বনে আত্মোৎকর্ষ সাধন ; ৭। সম্যক স্মৃতি—ধারণা ঠিক রাখা ; ৮। সম্যক সমাধি—জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সকলের ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন।

এই প্রণালী আমি বেদপাঠে প্রাপ্ত হই নাই বা আর কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা করি নাই। স্বীয় প্রজ্ঞা ও অন্তর্জ্ঞান হইতেই লাভ করিয়াছি। যদি বল তবে কেন এই আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অবলম্বন করিব, তাহার উত্তর—

১। সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় (জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণদুঃখ-ময়। যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ দুঃখময়)।

২। এই দুঃখের মূল কারণ বিষয়তৃষ্ণা।

৩। এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখ নিবৃত্তি।

৪। পূর্ব্বোক্ত আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অবলম্বন করিলেই দুঃখ-নিবৃত্তি লাভ হয়।

এই আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে পথে কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে তাহা ছেদন করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট পুণ্য পথে চলিলে দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া জীব নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইবেন।"

এই প্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে কৌণ্ডিন্য বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিছুকাল পরে অন্য চারিজনেও তাঁহার অনুসরণ করেন।

যে স্থানে বসিয়া বুদ্ধ এই উপদেশ দান করেন, সমুদয় বৌদ্ধজগতে তাহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক এই স্থান-টির স্মৃতিরক্ষার্থে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন, আজিও সারনাথে তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

এই পাঁচজন শিষ্য হইবার পর ক্রমে আরও অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা এইখানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। বারান্তরে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনী আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। *

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

কবি-কথা।

১। কবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-সভা।

গত ১১ই মাঘ স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের হলে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুধী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় কয়েকজন সাহিত্যসেবক ও খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তির সামাগম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা নবীনচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আসিয়াছিলেন কি সভাস্থলে পদধূলি দান করিয়া বঙ্গের জাতীয় কবি ও বাঙ্গালীজাতির উজ্জ্বল রত্ন নবীনচন্দ্রের স্বর্গীয় আত্মাকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। সমাগত স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বক্তা তাঁহারা নিজ নিজ বক্তব্য শেষ করিয়া বেশ অসঙ্কোচে সভার অন্যান্য কার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া গেলেন। এক আধজন লোক কখনও কখনও সভা ছাড়িয়া যাইতে পারেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-সভার ন্যায় সভায় এই প্রকারের ব্যবহারের দ্বারা কেবল এই টুকুই প্রতিপন্ন হয় যে আমরা এখনও এমন সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি যাহার মধ্যে হৃদয়ের কোনরূপ স্পন্দন নাই—কেবলমাত্র এই সমস্ত অনুষ্ঠানের আবরণটাই লইতে শিখিয়াছি, এখনও ইহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সভার আলোচনাও মোটেই ভাল হয় নাই। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিলেন, নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে বৎসর বৎসর সভা হইলে আর কি নূতন কথা বলা যাইতে পারে? নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বক্তৃগণ এই উপলক্ষে বলিবার জন্য যে কোনরূপ প্রস্তুত হইয়া আসিয়া-

---

* এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ Rhys Davidsএর Buddism. এবং Dr Fleet লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

ছিলেন তাহাও মনে হয় না। যে সভায় আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে আমাদের সাহিত্যে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আলোচনা হইয়াছে সে সভার দ্বারা নবীনচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার বা দেশবাসীগণের নিকট নবীন চন্দ্রকে প্রচার কতটুকু সম্ভাবনা, তাহা সহজেই বিবেচ্য। ইহা ছাড়া এই সভা সম্বন্ধে আরও একটু ভাবিবার বিষয় আছে। নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্র লইয়া একটু আলোচনা ও কথাকাটাকাটি হইয়াছিল। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে নবীনচন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন নবীনচন্দ্র মাটির মানুষ ছিলেন অহঙ্কার কাহাকে বলে জানিতেন না। আর একজন (যদিও তাঁহার বক্তৃতা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি সভা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তথাপি কেবলমাত্র কথাটার প্রতিবাদের জন্য) বলিলেন নবীনচন্দ্র অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। নবীনচন্দ্র যাহা ছিলেন তাহাও আলোচনার যোগ্য, কিন্তু স্মৃতি-সভায় তাহা লইয়া তর্ক সৃষ্টি করা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র সভাপতি মহাশয় সভার তর্ক ও মতভেদের এক সুন্দর সমন্বয় করিয়া সভার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই সভা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক আহূত হয় নাই। চট্টগ্রামে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাঁহারা যদ্যপি কলিকাতায় ও বঙ্গের অন্যান্য জেলায় নবীনচন্দ্র সম্বন্ধীয় আলোচনা সজীব রাখিবার জন্য একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। বঙ্গের সাহিত্যান্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে কলিকাতার উপর রাখিলে ইহা অপেক্ষা অধিক কাজ হইবে না।

২। কবিসম্বর্দ্ধনা।

গত ১২ই মাঘ কলিকাতা টাউনহলে কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ এই কার্য্যের উদ্যোগী ছিলেন্। এই সম্বর্দ্ধনা বেশ সমা· রোহ ও আন্তরিকতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান খুব উচ্চ, এখন বঙ্গসাহিত্যে যে যুগ চলিতেছে তাহা "রবীন্দ্রনাথের যুগ" এই আখ্যা পাইবার উপযুক্ত। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতেছে, বাঙ্গালী নিজের সাহিত্যের মধ্যে ক্রমশঃ নিজেদের সত্তার শ্রেষ্ঠ গৌরব, উচ্চতম সার্থকতা অনুভব করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃ· ক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনায় বাঙ্গালী জাতি সপ্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা তাহাদের সাহিত্যিক ও কবিকে সম্মান করিতে শিখি-

য়াছে। সাহিত্য ব্যতীত জাতির উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা মোটেই লাভজনক নহে, তাহার ফলে সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে যাঁহাদের শক্তি প্রথম শ্রেণীর, তাঁহাদের মধ্যে কচিৎ দুএকজন সাহিত্য ক্ষেত্রের গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাধারণতঃ অন্যক্ষেত্রে কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা বিহীন গৌরবলিপ্সু অনেক লোক সাহিত্যক্ষেত্রে সমবেত। সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য ইহা একটা অনুকূল অবস্থা নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য জীবনের প্রথম হইতেই কেহ কোনরূপ বিশেষ সাধনা করেন না। রবীন্দ্র নাথ ভাগ্যবান ও প্রতিভাশালী, বঙ্গসাহিত্যের তিনি একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্য ক্ষেত্রের অভিমুখেই তাঁহার জীবন স্বভাবের প্রেরণায় অতি শৈশবেই অগ্রসর হইয়াছে, সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত গীতি কবিতা, সমালোচনা, নাটক,কাব্য, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় সর্ব্বতো-মুখী ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া বঙ্গবাণীর চরণে যে বিপুল অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাড়নায়, নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাদি আলোচনার মধ্যদিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ চিত্ত স্বাধীন রুচির পরিতৃপ্তির মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না। বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথকে এই বাধ্যতায় নিষ্পেষিত হইতে হয় নাই। ফলে নিজস্ব বলিয়া একটা জিনিষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অতি সুন্দর রূপে বিকশিত হইয়াছে—বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে যাঁহারা তাঁহার বিরোধী তাঁহাদেরও চিন্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।

সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই নির্দ্দেশ করেন যে রবীন্দ্রনাথের সহিত অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে, মতভেদ খুবই আছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে জীবিতকালে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া বাঙ্গালী জাতি নিজের মাতৃভাষার প্রতিই অনুরাগ দেখাইতেছেন। কথাটা সম্পূর্ণরূপে সত্য। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব প্রচার করিতেছেন, অথবা কাগজ ছাপাইয়া রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্য-সম্রাট করিয়া দেশে একটা বিরোধের সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অতি ভীষণ শত্রু। তাঁহাদের ভক্তি ও অনুরাগ প্রশংসার কথা, কিন্তু এ ভক্তি হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। কবি-সম্বর্দ্ধনার পর বঙ্গ-সাহিত্যে একটা নূতন যুগ আরম্ভ হওয়াই উচিত। সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, দেশবাসীগণের স্নেহলাভই বাঙ্গালার সাহি[illegible]

সেবকগণের ইহ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ—এই কথা আমরা যতই বুঝিব ততই শুভ।

৩। স্বর্গীয় কবি মনোমোহন বসু।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ও কবি মনোমোহন বসু মহাশয় গত ২১শে মাঘ রবিবার অপরাহ্নকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চুরাশি বৎসর হইয়াছিল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু বঙ্কিম প্রভৃতি সুলেখকগণের ন্যায় মনোমোহন বসু মহাশয়ও মাতৃভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু, বঙ্গসাহিত্যে বসু মহাশয়ের বিশেষ একটা স্থান আছে। বসু মহাশয় দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন! রামাভিষেক, প্রণয়পরীক্ষা, সতী নাটক, হরিশ্চন্দ্র, রাসলীলা প্রভৃতি মনোমোহন বসুর রচিত নাটক বেশ সুপরিচিত। এখন বঙ্গ-সাহিত্যে অনেক নূতন নূতন নাটকের প্রচার নিবন্ধন এই সমস্ত নাটক সাধারণ্যে বিশেষভাবে আলোচিত না হইলেও একদিন এই সমস্ত নাটকের খুব আদর ছিল এবং এই সমস্ত নাটকের মধ্যে এমন একটা নিপুণতা, মৌলিকতা ও হৃদয়বত্তা পরিদৃষ্ট হয় যে চিরকালই বাঙ্গালী জাতি, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু এই সমস্ত নাটক পাঠ করিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হইবে। দুলিন, মনোমোহন বাবুর একখানি উপন্যাস। মনোমোহন বাবুর কবিতা-গ্রন্থ 'পদ্যমালা' সম্বন্ধে স্বর্গীয় ভূদেব বাবু কবিকে বলিয়াছিলেন— "এখনকার বাজারে অনেকেই কবিতা লেখেন বটে, কিন্তু বালক বালিকার মনোমুগ্ধকারী নিত্যদৃষ্ট বস্তু ও প্রাণী সকল হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া এমন সহজ সুবোধ্য ও সুললিত কবিতা কেহই এপর্য্যন্ত লিখিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ আমি, আপনার কৃত "ঈশ্বর" কবিতা প্রত্যহ আমার পৌত্র-পৌত্রীগণের সঙ্গে আবৃত্তি করি। ধন্য আপনার কলম।" * মনোমোহন বাবু বেশ বাগ্মী ছিলেন "হিন্দুর আচার ব্যবহার" ও "বক্তৃতামালা" গ্রন্থে তাঁহার বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনোমোহন বাবুর রচিত সঙ্গীতগুলি অনেকেরই পরিচিত। "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন" প্রভৃতি সঙ্গীত অনেকেই অবগত আছেন। মনোমোহন বাবু 'মধ্যস্থ' নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন—এই পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনের" সমসাময়িক। ১২৭৯ সালে ইহা প্রথম প্রচারিত হয়। এই পত্র পরে পাক্ষিক ও মাসিক পত্রে

* বসুমতী ২৭শে মাঘ ১৩১৮।

পরিণত হইয়াছিল। গুরুতর পরিশ্রমে মনোমোহন বাবুর শিরঃপীড়া হওয়ায় এই পত্র বন্ধ হইয়া যায়।

বসু মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালী কবি, তিনি তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্তের বিশেষত্ব যতখানি রক্ষা করিয়াছিলেন, গুপ্ত কবির অন্যান্য শিষ্যগণ ততটা পারেন নাই। মনোমোহন বাবু হাস্যরসিকতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। লোককে হাসাইতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি চিরজীবন দেশহিতব্রতী ও স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মনোমোহন বাবু প্রাচীন যুগের একটি নিদর্শন-স্বরূপ ছিলেন। তিনি হাফ-আখড়াইয়ের একজন বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৫২ সালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে মনোমোহনের জন্ম হয়। পরে তিনি কলিকাতায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকের দোকান "মনোমোহন লাইব্রেরী" নামে খ্যাত। দেশ বিখ্যাত "বোসের সার্কাস" এর প্রফেসর বসু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র।

৪। দুঃস্থ কবি গোবিন্দদাস।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের নাম সকলের পরিচিত না হইলেও যাঁহারা বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী তাঁহারা নিশ্চয় তাঁহার মৌলিক কাব্য গ্রন্থগুলি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছেন। 'চন্দন', 'কস্তুরী' প্রভৃতি যে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হইবে তাহা কাব্যরসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তিনি আজ প্রায় তিরিশ বৎসর কাল বঙ্গবাণীর সেবা করিতেছেন। তাঁহার সরল নির্ম্মল কবিতাগুলি বৈদেশিকতার গন্ধবিহীন, ও বঙ্গপল্লীর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস। বড়ই দুঃখের কথা যে আজ এই প্রতিভাশালী প্রবীণ কবি অতি ভীষণ দারিদ্রদশাগ্রস্ত হইয়াছেন। রোগ শোক ও বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘকাল সাহিত্য সেবার পর হতভাগ্য কবি আজ অন্নাভাবে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছেন। 'যেজন সেবিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে' দেবী ভারতীর প্রতি কবির এই মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ উক্তি সার্থক হইলেও, একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক, ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাহিত্য গৌরবে যে জাতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সেই তাঁহার স্বজাতির মধ্যে একমুষ্টি অন্নের অভাবে মারা যাইবেন এ কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য এ দেশে কি কেহ নাই?

পূর্ব্বে বঙ্গের এক নিভৃত পল্লী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের বাস স্থান। সেখানে ফুটিয়া তাঁহার হৃদয়-কুসুম যে সৌরভ দান করিয়াছে তাহা উপভোগ করিবার অবসর সকলের এখন না হইতে পারে—জীবিত কালে আদর লাভ কবিগণের

একমাত্র সৌভাগ্য, তাহা হইতেও ইনি বঞ্চিত ; কিন্তু যখন এদেশের এই যুগের কাব্যসাহিত্যে কালের নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার প্রকৃত আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে, যখন ভবিষ্যৎবংশীয়েরা শুনিবে এই আদরনীয় কবি দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া তাঁহার দেশবাসীগণের নিকটে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার মত এক মুষ্টি অন্নসাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই, তখন তাহাদের পিতৃগণের নামে এ অপবাদ কি তাহাদিগকে বাজিবে না।

এক সময়ে এই কবি নানারূপে অযথা উৎপীড়িত হইয়া দেশবাসীগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন এই অভাব-লাঞ্ছিত রোগ-পীড়িত দরিদ্র কবির মর্ম্মভেদী আবেদন সফল হয় নাই। কবি সম্বর্দ্ধনার পর বাঙ্গালীজাতির চিত্তে একটা নূতন কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদ্রেক যথার্থই হইয়াছে কিনা তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন সাহিত্য সমাজে গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গোবিন্দ প্রতি দেশের যে একটা কর্ত্তব্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করা যায় আমরা তাহা সাধ্যমত পালন করিতে সক্ষম হইব।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক।

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা,
চৈত্র ১৩১৮।

যোগ-ভঙ্গ।*

রক্ত শীমূলে ব্যক্ত বিলাস কার এ ?
শুষ্ক শাখায়, নিম্নে উচ্চে,
সধূম-বহ্নি পুষ্পগুচ্ছে
জ্বলিছে কাহার আকুল, তপ্ত,
অসম্বম কামনা রে !
শিশির-শীর্ণ রিক্ত তরুতে,
কিবা এ দৃশ্য মলয়-মরুতে,
অস্থি বিদারি শোণিত-উৎস
দীপ্ত লালসা-সারে !
তুমি কি, বৃক্ষ, সমাধি-মগ্ন
পঞ্জর-শেষ তাপস নগ্ন,
বাসব-অপ্সরা-কেন্দ্র হয়েছ
সংহরি বাসনা রে ?

---

* The Ascetic's Revel :
Or the *Simul* in flower.
[After Walt Whitman]

What incarnadines the crimsoned *Simul* ?
On withered boughs, above, below,
In smoke-chaliced fire of clustered flowers,—
Whose passion burns, hot, impetuous, devoid of shame ?
On yonder winter-bared and leafless tree
What magic hath been wrought by touch of spring :

মদিরা-অধীর, ঘন-রঞ্জিত,
চুম্বন-তরে মণ্ডলীকৃত
কাহার মত্ত অধর-ওষ্ঠ
মথিছে, কুসুমাকারে ?
বসন্ত-দেহা উর্ব্বশী কি এ,
শান্তি-বিনাশি পরশে ঘিরিয়ে,
দহিতে সমাধি জেলেছে শতেক
দাবানল-নিভ যারে ?

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

Through merest bones gush sprays of scarlet flood,
fiery with quintescent desire!

Art thou, O tree, a tranced ascetic,
Naked, with obtrusive ribs,
For killing the flesh, the chosen mark of envious
Indra's ire?

Wine-frenzied, deep-dyed,
And circled to make a pouting kiss,—
Whose lips, flower-guised, smother thee with their
eager multitudinous contact?

No fragrance, but color merely:
No love hallows this rapture red:
To what cruel mockery of blandishment art thou per-
force a victim!

Has *Urvasi* come, bodied in spring,
And round thee thrown her hot embraces,
Setting a hundred carnal flames to thy long-nursed
trance?

B. C. MITRA.

আহ্বান।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা জীবন্ত যোগ সূত্র না থাকিলে কোনও জাতি গৌরবময় কীর্ত্তি-শিখরে আপনার ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। একটা নূতন ভাবের প্রেরণা আসিয়াছে, নূতন প্রকারের আকাঙ্ক্ষা আসিয়া আমাদের চিত্তগুলিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আজ বড় আশায় আমরা একটা ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করিতেছি, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সেই ভবিষ্যতের নির্ম্মাণ ব্যাপারে নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু পথ পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের অতীত এখনও অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, বৈদেশিকগণের উপদেশ অনুসারে অথবা বৌদকগণের উপদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে আমরা আমাদের অতীতের যে চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া মানসনেত্রের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছি, মনে হইতেছে সে চিত্রখানি বিকৃত ও অকৃত্রিম। পরের কথার কুহকে ভুলিয়া আমরা আমাদের অতীতের মধ্যে কেবল দুর্ব্বলতা, অনৈক্য, ভ্রান্তি ও অবসাদ দেখিতেছি, অতীত আমাদের চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অনুকূল নহে, এই প্রকারের হৃদয়-ভাব লইয়া, এই মিথ্যার উপাসনা করিয়া আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না।

এখন নূতন নূতন সাধক চাই, তাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সেই অতীতের যথার্থ রূপ আমাদের সম্মুখে ধরুন। আমাদের অতীত আমাদের মধ্যে অতি অল্পই আছে, আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, আমাদের জীবনের আদর্শ ও আমাদের ধর্ম্মভাব হইতে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও বেশভূষা পর্য্যন্ত সমস্তই সে অতীতের সহিত সম্বন্ধ হারাইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে দেখিয়া, আমাদের জ্ঞান ও রুচির সাহায্যে, সে অতীতের সন্ধান করিলে আমরা একবারে বিফল-মনোরথ হইব। অতীত ভারতবর্ষ এখন নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে সুদূরবর্ত্তী ও দুরধিগম্য পবিত্র তীর্থস্থানে, নব্য সভ্যতার সংস্পর্শবিহীন সুদূর পল্লীর দরিদ্র ও অজ্ঞাত অধিবাসীগণের মধ্যে, প্রাচীন ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে, বিচিত্র অনুষ্ঠানে ও সংস্কারে, রুচি ও বিশ্বাসে, বেশভূষায়, ব্যায়ামে ও ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও মৌনভাবে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। সাধকের প্রয়োজন, ভক্তিবিনম্রভাবে ও ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত তাঁহারা পরিশ্রম করুন, অতীত তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ সাধনার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন।

অতীতের সহিত একবার হৃদয়গত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হইলেই এদেশ ও এ জাতি ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

যে সমাজের উচ্চশ্রেণী বৈদেশিক শিক্ষায় বিকৃতরুচি হইয়া নিম্নশ্রেণীকে বুঝিতে পারে না, তাহাদের জীবনে কেবল বর্ব্বরতা, দীনতা ও কুসংস্কার মাত্রই দেখিতে পায়, আবার নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের নিকট প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে পারে না, যে সমাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমভাবে স্পন্দনপ্রবাহ এই প্রকারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে সমাজ মৃত্যুর পথে দাঁড়াইয়াছে। যে সমস্ত চিকিৎসক আসিয়া এই বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে পারিবেন আবার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত একটা ভাবের জীবন্ত প্রবাহ অবাধে বহাইয়া দিতে পারিবেন, এখন সেই সমস্ত চিকিৎসকের প্রয়োজন।

দেশ সাহিত্য চাহিতেছে, জাতীয় সাহিত্যের জন্য একটা আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আমরাও দেশের এক প্রান্তে বসিয়া বঙ্গবাণীর অর্ঘ্য শালায় দুই একটি বনকুসুম অর্পণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের এই সাহিত্যসাধনার কৃতকার্য্যতা কি প্রকারে সম্ভব? কাহারা আমাদের এই সাধনা সফল করিতে সক্ষম? যে শ্রেণীর সাধক ও চিকিৎসকের কথা বলিলাম কেবলমাত্র তাঁহাদের দ্বারাই আমরা সফলকাম হইতে পারিব।

আমরা নূতন রকমের দাম্ভিকতা শিখিয়া কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠার অন্বেষণ করিতেছি, আমরা দল বাঁধিয়া টাকা খরচ করিয়া নিজের পূজা চালাইবার জন্য দিন রাত্রি ব্যস্ত, সত্য কি আমাদের নিকট আসিতে পারেন? আমরা যে নিজেদের সত্য অপেক্ষা বড় বলিয়া বুঝিতেছি। আমরা ভারতের অগণিত জনশ্রেণীর অনুষ্ঠানে ও আচারে, ধর্ম্মসাধনায় ও ভক্তির ঐকান্তিকতায় কেবল কুসংস্কার ও বর্ব্বরতা আবিষ্কার পূর্ব্বক, উপহাসের বিষদিগ্ধ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আপনাপন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রশংসার হাততালি পাইবার জন্য সতৃষ্ণভাবে চাতক পক্ষীর মত বসিয়া আছি, আত্মম্ভরী ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব আমি, আমার কথায় কি দেশের হৃদয়ে নবভাবের স্থায়ী স্পন্দন জাগিবে? বৃথা আশা, বৃথা আস্ফালন! যাহারা সম্প্রদায়কে বা সাম্প্রদায়িক খণ্ড সত্যকে চাহিতেছে তাহারা দেশকে, অখণ্ড সত্যকে পাইবে কেন? যাহারা অর্থ ও সম্মান চায় তাহারা অর্থ ও সম্মান পাইবে, সাহিত্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন না। তাহাদের শক্তি

থাকিতে পারে, কিন্তু শক্তিই সফলতার উপায় নহে, সিদ্ধির মন্ত্র নহে, সরলতাই সে উপায়, সরলতাই সে মন্ত্র।

এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেমিক ও সরলচিত্ত সাধকের প্রয়োজন, সাধনাতেই যাঁহাদের আনন্দ, সিদ্ধির সিংহাসনে আপনাকে বসাইবার জন্ত যাঁহাদের লোভ নাই, অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াও যাঁহারা বিশ্বদেবের অমৃতময় অভয় বাণী শুনিয়া নব বলে বলীয়ান হইতে সক্ষম, তাঁহাদেরই প্রয়োজন। যাঁহারা সর্ব্ববিধ সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দেশের প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারিবেন, তাঁহারাই রত্ন উদ্ধার করিয়া মাতৃভাষার শোভা বিধান করিতে পারিবেন। সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাদের জন্ত পড়িয়া রহিয়াছে, এ আহ্বান কি এক জনের কর্ণেও প্রবেশ করিবে না?

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু। (২)

রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় যে কয়েকখানি নাটক, রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকগুলি সংস্কৃতের অনুবাদমাত্র। এ সকল স্থলেও যদিও তিনি সর্ব্বত্র মূলানুযায়ী নহেন, এবং অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি এগুলি সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাঁহার মৌলিকরচনা-সমূহের মধ্যে "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" "নবনাটক" ও "রুক্মিণী হরণ," এই তিনটির উপরই তাঁহার যশ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে "রুক্মিণীহরণ" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখিনা, কারণ এই নাটকটি মৌলিক হইলেও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত, এবং এক তোতলা ধনদাস ভিন্ন ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র আর কিছুই নাই।

তাঁহার তিনখানি প্রধান নাটক।

"রুক্মিণী-হরণ।"

"কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" সংস্কৃতনাটকের রীত্যনুসারে রচিত। কিন্তু ইহার নান্দী প্রস্তাবনা প্রভৃতির মধ্যে "শকুন্তলার" প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হইলেও, চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। গ্রন্থকার নাটকের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"এই নাটক ছয়ভাগে বিভক্ত; প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তাগণের বিবাহানুষ্ঠান; ২য়ে ঘটকের কপটব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব; ৩য়ে কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার; ৪র্থে শুক্র বিক্র-

"কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব।" (১৮৫৪)
ও
"নব-নাটক।" (১৮৫৭)

রীর দোষোদ্‌ঘোষণ ; ৫মে নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন ; ৬ষ্ঠে বিবাহ নির্ব্বাহ।” কিন্তু এই ছয়টি বিভিন্ন অংশ কেহই পরস্পরাপেক্ষী নহে, বরং পঞ্চমটি অপ্রাসঙ্গিক। সমস্ত নাটকটির মধ্যে একটা বাঁধুনীর অভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে ; অসংলগ্নতা বা অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যের সমাবেশ ইহার প্রধান দোষ। তৃতীয় অঙ্কে দেবল ও রসিকার প্রসঙ্গ অথবা চতুর্থ অঙ্কে মহিলামাধবীর কথোপকথন যে কেবল সুরুচিবিগর্হিত তাহা নহে, এ গুলি বাদ দিলেও নাটকের কিছু মাত্র অঙ্গহানি হয় না। তেমনি সুমতি ও উদরপরায়ণের রহস্য উপাদেয় হইলেও, নাটকের আখ্যানবস্তুর সহিত সম্পর্কবিহীন। মোট কথা, নাটকটি একটি সামান্য কৃত্রিম মূলসূত্রের উপর গ্রথিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র। কৌলীন্যপ্রথায় দেশের দুরবস্থাই এই মূল সূত্র।

আখ্যানবস্তুর বৈচিত্র্যহীনতা ও নির্ম্মাণচাতুর্য্যের অভাব।

কৌলীন্য-প্রথার দোষোদ্‌ঘাটনের জন্য রঙ্গপুরের জমিদার শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত পারিতোষিক উপলক্ষ্য করিয়া এই নাটক প্রথম রচিত হইয়াছিল। নাটকের এই উৎপত্তিটি আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত, কারণ ইহা হইতেই এই গ্রন্থের সমস্ত দোষ ও গুণ। এই জন্য এই নাটকটা প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক, কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বা চরিত্রাঙ্কণ ইহার বিশেষ লক্ষ্য নহে। বহুবিবাহ-বিষয়ক “নবনাটকে”ও এইরূপ একটা উদ্দেশ্য দৃষ্ট হইবে। সেই জন্য এই উভয় গ্রন্থ কাব্যাংশে তত উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই। “নীলদর্পণ” ও এইরূপ একটী উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু “নীলদর্পণের” অসাধারণ শিল্প-চাতুর্য্য ও অকৃত্রিম করুণরসবাহুল্য নাটকের চিত্রপটখানি কাব্যের উপযোগী করিয়া চিত্রিত করিয়াছে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব। কিন্তু এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এইরূপ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া, “কুলীনকুলসর্ব্বস্ব” ও “নবনাটক” এই উভয় গ্রন্থের নিছক কাব্য-সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। কুলীনকন্যাগণের চরিত্র ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা তাহাদের দুর্দ্দশার বিবৃতির ভাগটা বেশী। যে সব অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যের সমাবেশের জন্য গ্রন্থটি তত উপাদেয় হয় নাই, তাহাও অনেকটা এই উদ্দেশ্যের খাতিরে আনা হইয়াছে। তারপর কৌলীন্যপ্রথার উপর লম্বা লম্বা বক্তৃতাগুলি আধুনিক পাঠকের নিকট যে কেবল

নাটকদ্বয়ের এই বিশেষ উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য-মূলক নাটক ও কাব্য-সৌন্দর্য্য।

বিশেষত্বহীন তাহা নহে, অনেকস্থলে বড়ই অতিরিক্ত ও অপ্রীতিকর হইয়াছে।
এই উদ্দেশ্যপরবশতার জন্য আর একটি গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে, তাহাতে তর্করত্নের নাট্যকলার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কোন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে advocacy বা পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া তর্করত্ন স্থলে স্থলে তাঁহার চরিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। একদিকটা গাঢ় করিয়া আঁকিতে গিয়া অন্য দিকটা কিছুই আঁকেন নাই। সেই জন্য তাঁহার চরিত্রগুলি সর্ব্বত্র সুন্দররূপে ফুটিতে পারে নাই।

স্বভাব-অঙ্কণ, চরিত্র-সৃষ্টি ও পরিহাস-শক্তি।

সুতরাং আখ্যানবস্তুর বৈচিত্র্য বা নির্ম্মাণচাতুর্য্য বা কাব্যসৌন্দর্য্য এই নাটকের বিশেষ গুণ নহে, পরন্তু গ্রন্থকারের সজীব চিত্রাঙ্কণ-ক্ষমতা, চরিত্র সৃষ্টি ও পরিহাস-শক্তি, এই তিনটী বিষয় এই নাটকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য। অনৃতাচার্য্য, শুভাচার্য্য, ও সুধীর, এই তিন ঘটকের চরিত্র-বিশ্লেষণ, অধর্ম্মরুচি ও বিবাহবণিকের রহস্য, কুলীন কন্যাগণের দুর্দ্দশার সজীব মর্ম্মস্পর্শী চিত্র, উদরপরায়ণ ও অভব্যচন্দ্রের কৌতুক প্রভৃতির মধ্যে এই সমস্ত ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। "নব নাটকে" আখ্যান-বস্তু-গ্রন্থনে অধিকতর মনোযোগ দেখা যাইলেও ইহার হাস্য ও করুণরসের সংমিশ্রণ ও জীবন্ত আলেখ্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও প্রতিভার পরিচায়ক। চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোয়ালিনী প্রভৃতির চরিত্রে যে কৌতুকপ্রিয়তা ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অসাধারণ না হইলেও, প্রতিভার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তর্করত্ন ও দীনবন্ধু—তুলনায় সমালোচনা।

তথাপি যে তিন গুণের জন্য "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" ও "নবনাটক" এত উপভোগ্য সেই তিনটী গুণের উপর নির্ভর করিয়াও তর্করত্নকে দীনবন্ধুর উপরে স্থান কোন মতেই দেওয়া যাইতে পারে না। চরিত্রাঙ্কণে নৈপুণ্য থাকিলেও, আলো ও ছায়ার সরস রেখাপাত, অথবা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অথবা ঘটনাবলীর দক্ষ সমাবেশের দ্বারা চরিত্রের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি তর্করত্নে দেখা যায় না। দীনবন্ধুর ন্যায় মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা, তর্করত্নের কথা ত দূরে থাকুক, বঙ্গ-সাহিত্যে অতি অল্প লেখকেরই আছে। এসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহার উপর আর কিছুই বলা যায় না। পরিহাস-শক্তি সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিলেও চলে; সে বিষয়ে দীনবন্ধুর নাটকগুলি আজও অদ্বিতীয় হইয়া রহিয়াছে। তার

পর সজীব-অঙ্কন-ক্ষমতা,—দীনবন্ধুর ন্যায় এ শক্তি তর্করত্নের প্রচুর পরিমাণে ছিল না। সৃষ্টিকৌশলে তর্করত্ন দীনবন্ধুর সমকক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি বাহুল্যে ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে দীনবন্ধুর ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর ছিল। তাঁহার নিমে দত্ত, আদুরী, তোরাব, রাজীবলোচন, মালতী, মল্লিকা, জলধর প্রভৃতি অসংখ্য কৌতুকোজ্জ্বল চিত্রের নিকট কি অভবাচন্দ্র, অনৃতাচার্য্য, চিত্তঘোষ, দাঁড়াইতে পারে!

দীনবন্ধুর ন্যায় তর্করত্নের নাটকেও, পরিহাসের সহিত করুণ রসের বিলক্ষণ প্রসর আছে। "নবনাটক"এর সমালোচনায় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই সকল করুণরসাত্মক স্থানগুলি পাঠ করিয়া "কেহই অনর্গল অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে না।" কিন্তু অশ্রুপাতই সর্ব্বত্র করুণ রসের কষ্টি পাথর এমন নহে, এবং সর্ব্বত্র অশ্রুপাত হউক বা না হউক, তর্করত্নের যে হাস্যোদ্রেকের ন্যায় করুণরসোদ্রেকেও বিশেষ ক্ষমতা ছিল তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, দীনবন্ধুর অসাধারণ শক্তির সহিত তুলনা করিতে যাওয়া অত্যন্ত সাহসের কার্য্য। "নীলদর্পণের" সৌন্দর্য্য ও হৃদয়দ্রাবী করুণরসের কণা মাত্র "নবনাটকে" নাই; "সধবার একাদশী'র উচ্ছলিত নিরবচ্ছিন্ন হাস্য রসের ফোয়ারা "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব"-রচয়িতার স্বপ্নাতীত। *

বাস্তবিক নিতান্ত পক্ষপাতী সমালোচক ভিন্ন আর কেহই সে সময়ের এই সমস্ত অপরিণত রচনাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উচ্চশ্রেণীর নাটক বলিবেন না। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় বহুদর্শী সমালোচক যে এই রূপ ভ্রমে পতিত হইবেন তাহা বিস্ময়কর বটে কিন্তু বোধ হয় সমসাময়িক লেখকের সমালোচনায় এরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। প্রথম শ্রেণীর লেখকের ন্যায় ক্ষমতা থাকিলেও তর্করত্নের চিত্রগুলি প্রথম শ্রেণীর নহে। বোধ হয় অনুবাদে তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন,

রাজনারায়ণ বাবুর মত খণ্ডন।

---

* তর্করত্নের নাটকে নানা দোষ থাকিলেও, তিনি আধুনিক নাটক রচনার পথপ্রদর্শক। এ জন্য তাঁহার সমস্ত দোষ মার্জ্জনীয় না হইলেও, এত নিখুঁত ভাবে আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত নহে। তর্করত্নের ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার "নব নাটক" যে বৎসর (১৮৫৭) রচিত হইয়াছিল সেই বৎসর "প্রবোধচন্দ্রোদয়" অবলম্বনে ঈশ্বরগুপ্তের "বোধেন্দুবিকাশ"ও রচিত হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই দুইটী নাটক মিলাইয়া দেখিতে পাইবেন যে তর্করত্নের নাটকীয় প্রতিভা সে যুগের কত অগ্রগামী, এবং এক মাইকেল ভিন্ন তৎসময়ের কাহারো প্রতিভার সহিত তুলনীয় নহে।

তাহা যদি তিনি মৌলিক রচনায় নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট আরও উৎকৃষ্টতর রচনা পাওয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন নাট্যসাহিত্যের নিতান্ত অপরিণত অবস্থা, Experimental stage বলিলেও চলে। তখনও নাট্যশাস্ত্র "সাহিত্য-শিল্পাগারে শিক্ষার্থী"। *

তর্করত্ন সম্বন্ধে এখানে যে কথাগুলি বলা হইল তাহা অল্প বিস্তর মাইকেল সম্বন্ধেও খাটে। বাহুল্য ভয়ে এখানে আমরা বিস্তৃত সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম, তথাপি মাইকেলের লেখাও যে এই Experimental stage ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। "কৃষ্ণকুমারী" (১৮৬০—৬১) ও তাঁহার দুই খানি প্রহসন ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার নাটকগুলির মূল্য খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু মাইকেল ও তর্করত্নের মধ্যে এইটুক প্রভেদ যে, মাইকেল ইংরাজী পদ্ধতির অধিকতর অনুকূল এবং মাইকেলের নাটক গুলির বেশ একটা নিরবচ্ছিন্ন সমষ্টি বা compact wholeএর ভাব আছে। মাইকেল সমস্ত জিনিষটাকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন কিন্তু রামনারায়ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর (Situation) জীবন্ত সমাবেশে বিশেষ দক্ষ। মাইকেলের নাটকের বাঁধুনি, গাঁথুনি তর্করত্নে নাই। চরিত্র-চিত্রাঙ্কণে মাইকেলের ক্ষমতা তর্করত্নের অপেক্ষা অধিক এ কথা বলা যায় না, তবে চরিত্রের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি অথবা তদ্গত সুকুমার ভাবটুকু ফুটাইয়া তোলা মাইকেলের একটি বিশেষ ক্ষমতা। এই জন্য স্ত্রীচরিত্র-চিত্রণেই মাইকেলের অত্যন্ত দক্ষতা দেখা যায়। বৈচিত্র্য না থাকিলেও তাঁহার চরিত্রগুলি আলো ও ছায়ার সুনিপুণ রেখাপাতে বড়ই রমণীয়। নিত্যদৃষ্ট পরিচিত চিত্রগুলিই তর্করত্ন বেশ সুন্দর আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার রসিকা, দেবল, ভোলা, শিশু, প্রভৃতি চিত্র ক্ষুদ্র হইলেও অতুলনীয়। কিন্তু একটী সুকুমার ভাবমণ্ডিত চিন্ময় সৌন্দর্য্যাভিষিক্ত মানসী প্রতিমার সৃষ্টি তাঁহার ক্ষমতার অতীত ছিল বলিয়া বোধ হয়। মাইকেলের কবি হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল ও ভাবপ্রবণ ছিল। নিত্যদৃষ্ট পরিচিত জিনিষ গুলিও তাঁহার কবি প্রতিভায় সমুজ্জল হইয়া উঠিত। এই idealism, বা ভাবপ্রবণতা এই Romance বা কল্পনা-বৈচিত্র্যটুকু তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব, করুণ-রসোদ্রেকে মাইকেলের যে ক্ষমতা এবং "কৃষ্ণকুমারীর" যাহা বিশেষত্ব তাহাও

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩)

বাঙ্গালা Romantic dramaর সৃষ্টি।

* যোগীন্দ্রবাবু এই কথা মাইকেলের নাট্যকলা সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই কবিত্বশক্তি প্রসূত। বাঙ্গালার Romantic dramaর সূত্রপাত মাইকেল হইতে।

মাইকেল একদিকে যেমন এই কবিত্ব শক্তি বা মানসিক সৃষ্টির ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার দুইটী প্রহসনে তিনি তাঁহার স্বভাবাঙ্কণক্ষমতা ও ব্যঙ্গশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার প্রতিভা তর্করত্ন অথবা দীনবন্ধু হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। কথিত আছে, দীনবন্ধু "একেই কি বলে সভ্যতার" আদর্শে তাঁহার "সধবার একাদশী" লিখিয়াছিলেন। এ স্থলে আদর্শ ও তৎপ্রতিকৃতি উভয়েরই একটা এমন নিজস্ব গৌরব আছে, যাহা তাহাদের পরস্পরের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধ সত্ত্বেও ক্ষুন্ন হইবার নহে। কিন্তু মাইকেলের এই রচনাদুইটী প্রহসন মাত্র (farce), এবং আমরা তাহাদিগকে প্রহসন হিসাবেই দেখিব। "সধবার একাদশী" এই প্রহসনের শ্রেণী ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; তাহাকে আমরা হাস্যরসাত্মক নাটক বা comic drama বলিব।* তর্করত্ন ও মাইকেলে যে হাস্যরসাত্মক নাটকের সূচনা, দীনবন্ধুতে তাহার বিশিষ্ট পরিণতি।

মাইকেলের প্রহসনদ্বয় (১৮৫৯-৬০)

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতির কালবিভাগ হিসাবে ধরিলে, মাইকেল-তর্করত্নের সময়কে (১৮৫৫-৬০) আমরা সাধনার যুগ বা Experimental Stage বলিতে পারি। সাহিত্যের এই পুনর্গঠনের যুগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের অপূর্ণতা দেখিয়া আমাদের ক্ষুণ্ণ হইবার কিছুই নাই, কারণ তখন সঞ্চয় ও সংগ্রহই সাহিত্যের শ্রেয়ঃপথ। ইহা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের সময়নহে; নাট্যসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ রচনার কাল তখনও আসে নাই; মাইকেল স্বয়ং দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন "Alas for the drama! But this is not the age for the drama to flourish." বঙ্গভাষার এই তপস্যার কাল। এই যুগে প্রথম শ্রেণীর কিছুই রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমি অলক্ষ্যে নীরবে গড়িয়া উঠিতেছিল। জমী তৈয়ারী হইতেছিল, ফসলের আর বিলম্ব নাই।

বঙ্গভাষার তপস্যার কাল।

এই পরিবর্তনযুগের প্রায় প্রান্তসীমায় দীনবন্ধুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বগামী স্বনামধন্য লেখকদিগের ন্যায় তাঁহারও রচনায় অনেক অপক্কতা বা অপূর্ণতা দোষ আছে; দুয়েকটী গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহার কোন রচনাকে আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে

দীনবন্ধুর আবির্ভাব।

* যোগীন্দ্র বাবু ইহাকে ব্যঙ্গাত্মক নাটক বা Satirical drama বলিয়াছেন।

পারি না, তথাপি আসন্ন পূর্ণতর যুগের অগ্রদূতের ন্যায় তাঁহার রচনা এক অপূর্ব্ব প্রতিভাকিরণে মণ্ডিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দে।

বসন্তের চিঠি।

বসন্তের প্রথম প্রভাতে
বসে আছি মন্দির-দুয়ারে,
চেয়ে দেখি, নীলিম আকাশ
ভরে' গেছে আলোক-জুয়ারে!
মুঞ্জরিত চূতশাখাগুলি
হেলিয়াছে পুলক-রভসে,
ফুলবনে মধুপের মেলা,
—মিলিয়াছে গুঞ্জন-হরষে!
অশোকের রাঙা ফুলবাস
রচিয়াছে বিবাহ-বাসর,
মুকুলিত নব মল্লিকারে
মনে হয় বধূর বেসর।

মনে হ'ল কত কাল তা'র
পাই নাই প্রেমের পরশ,
জানাইতে ভুলে গেল সখা
বসন্তের নবীন হরষ!
ভরি' উঠে হৃদি-পুষ্প-পুটে
ফাগুনের আকুল সৌরভ,
খুলিব না মাধবী কলিকা—
বরষের কিসের গৌরব?
কতক্ষণে চেয়ে চারিদিকে
বুঝিলাম, মিছা এ বেদনা,
বসন্তের বর্ণে গন্ধে গানে
প্রভু মোর করিছে চেতনা।

পাঠায়েছে প্রেমলিপি তা'র
প্রতি ছত্র ফুলের গাঁথন,
পৃষ্ঠা তার খোলা চারিদিক
কোন' খানে পড়েনি বাঁধন।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

ভগ্নপোত।

কাল ৩১শে ডিসেম্বর গিয়াছে।

আমি আমার বাল্য বন্ধু জর্জ্জেস্ গেরিনের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছি এমন সময়ে তাহার ভৃত্য এক খানা শীল-করা চিঠি আনিয়া দিল, তাহাতে পোষ্ট-চিহ্ন ও বিদেশীয় ডাক-টিকিট রহিয়াছে।

জর্জ্জেস্ বলিল, 'তোমার আপত্তি নাই ?'

'কিছু না'

সে তখন ইংরাজীতে, মোটামোটা অক্ষরে, বাঁকালাইনে লেখা, আটপৃষ্ঠা-ব্যাপী পত্রখানি পড়িয়া যাইতে লাগিল। যেরূপ ধীরে ধীরে অতিশয় মনোযোগ করিয়া পড়িতেছিল, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, পত্রে তাহার অতি প্রিয় সমাচার আছে।

শেষ হইলে পত্র খানি মাণ্টেল্‌পীসের উপর রাখিয়া আমাকে বলিল,

"ও একটা ভারী মজার ব্যাপার, তোমাকে এত দিন বলি নাই,—একটা নভেলি কাণ্ড,—সে একবার হয়েছিল। ওঃ সেবারকার নববর্ষের দিনটা কি অপূর্ব্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল! সে আজ বিশ বৎসরের কথা,—আমার বয়স তখন ত্রিশ, আর এখন পঞ্চাশ।

আমি তখন জাহাজ-বীমা-অফিসের ইন্‌স্পেক্টার, এখন যেখানকার চেয়ারম্যান হয়েছি।

১লা জানুয়ারী দিনটা সাধারণ পর্ব্বদিন বলিয়া প্যারীতে যাপন করিব স্থির করিলাম, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে আমাকে তৎক্ষণাৎ আইল-দে-রে নামক স্থানে যাইতে হইবে, সেখানে আমাদের আফিসে বীমা-করা এক খানি জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। তখন বেলা আটটা,

আমি দশটার সময় কোম্পানীর আফিসে গিয়া পরামর্শ লইলাম, এবং সেই দিনই অপরাহ্নের ট্রেণে উঠিয়া পরদিন 'লা রোশেলে' নামিয়া পড়িলাম। সে দিন ৩১শে ডিসেম্বর।

প্রায় দুই ঘণ্টা 'লা রোশেলের' প্রাচীন রাজপথে ঘুরিয়া আসিয়া যথা সময়ে একখানি কালো ষ্টীমারে 'আইল-দে-রে' অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দিনটা নিরানন্দ, অতিশয় অবসাদকর ছিল; এমন দিনে চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়, অন্তর পীড়িত হয়—যেন সমুদয় শক্তি ও উদ্যম লুপ্ত হইয়া যায়। অতি শীতল ধূসরালোক দিবা, ঘন কুয়াসা বৃষ্টিপাতের মত চারিদিক ভিজিয়া দিতেছে।

এই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বহুদূরবিস্তৃত বালুকিনারায়, অগভীর এবং হরিদ্রাভ সমুদ্রজলে, তরঙ্গের লেশ ছিল না—একটুও কম্পন, জীবনের চিহ্ন মাত্র ছিল না। ষ্টীমার খানি স্বভাববশে একটু দুলিয়া যাইতেছিল, পশ্চাতের আন্দোলিত জলরাশি শীঘ্র শান্ত হইতেছিল।

আমি কাপ্তেনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলাম, লোকটি খর্ব্বাকৃতি, পদযুগল হ্রস্ব; দেহ জাহাজ খানির মতই গোলাকার এবং সর্ব্বদাই দুলিতেছে। আমি যে দৈববিপাকের অনুসন্ধানে যাইতেছিলাম, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য। 'সেণ্ট্‌নাগেয়ার' নামক স্থান হইতে 'মারী জোসেফ্' নামক এক খানি বড় জাহাজ 'আইল-দে-রে'র সন্নিকটে বালুচরে প্রবেশ করিয়াছে।

যে ব্যক্তির সম্পত্তি, তিনি লিখিয়াছেন, যে ঝড়ে জাহাজ খানি এত উপরে উঠিয়া পড়িয়াছিল, যে তাহাকে সে অবস্থায় বাহির করিয়া আনা অসম্ভব, এবং সময়ও এত অল্প ছিল, যে মালপত্র বা জাহাজের খুলিয়া লইবার মত সাজসজ্জা বাঁচাইবার উপায় ছিল না। সে জন্য জাহাজ খানির প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, তাহা^র^ মূল্য কত হইতে পারে, এবং তাহাকে সেখানে ফেলিয়া আসিবার পূর্ব্বে ভাসাইবার কোনও চেষ্টার ত্রুটি হইয়াছিল কি না, এই সকল অনুসন্ধানের ভার আমার উপরে ছিল। আমি কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলাম, যদি ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় তবে তাহাদের পক্ষে আমাকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আমার রিপোর্ট পাইলে পর কোম্পানীর পরিচালকগণ আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যাহা কিছু করিবার করিবেন।

কাপ্তেন ঘটনাটা খুব ভাল রূপই জানিত, কারণ জাহাজ ও মালপত্র রক্ষা করিবার জন্য সেও ষ্টীমার লইয়া যোগ দিয়াছিল। সে অতি সংক্ষেপে আসল

কথাটা এইরূপ বিবৃত করিল—'মারী জোসেফ্' ভীষণ-বাত্যা-বিতাড়িত হইয়া রাত্রি কালে পথ হারাইয়া ফেলে; সমুদ্র তখন ফেনময়,—কাপ্তেন বলিল, 'দুধের মত শাদা', সে তাহারই উপর অন্ধ হইয়া চলিতে চলিতে এখানকার এক বালুচরে বাধিয়া গিয়াছে। এইরূপ অল্পজলমগ্ন বালুচর ভাঁটার সময় এদিক্‌কার উপকূলে বহুদূরবিস্তৃত সাহারা-মরুভূমির মূর্ত্তি ধারণ করে।

গল্প করিতে করিতে আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। দূরে সমুদ্রের উপর আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; ঠিক মাঝ খানে, অনেক দুর চক্ষু চলিতে পারে, এমন একটি স্থলভাগ দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ঐ কি 'আইল-দে-রে' দেখা যাইতেছে?"

"হাঁ, মহাশয়"

হঠাৎ সম্মুখের দিকে দক্ষিণ হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া, আমাকে দূরে, কূল এবং দিগন্তরেখার প্রায় মধ্যস্থলে, একটা অতি অস্পষ্ট পদার্থ দেখাইয়া বলিল

"ঐ দেখুন আপনার জাহাজ!"

"মারী জোসেফ্?"

"হাঁ"

আমি বিস্মিত হইলাম। এই প্রায় অদৃশ্য কৃষ্ণবিন্দুটি কূল হইতে অন্ততঃ তিন মাইল দূর হইবে। আমি আপত্তি করিলাম, বলিলাম,

"কিন্তু কাপ্তেন, তুমি যে স্থানটি দেখাইতেছ, ওখানে জল দুই শত হাত গভীর হইবে।"

সে হাসিতে লাগিল।

"দু'শো হাত! কি বলেন, মশায়! দু' হাতও হবে না, বলে দিচ্ছি।"

লোকটার 'বোর্ডো'য় বাড়ী। পুনরায় বলিল

"এই এখন সাড়ে ন'টা, জোয়ার এসেছে। আড়াইটার সময় হোটেলে আহারাদির পর হাত দুটি পকেটে রেখে এই বালির উপর দিয়ে চলে যাবেন ভাঙ্গা জাহাজে পৌছিতে জুতায় একটুও জল লাগ্‌বে না। কিন্তু সাত কোয়াটার বা দু' ঘণ্টার বেশী যেন ওখানে থাকবেন না, তা হলে জোয়ারের মুখে পড়বেন। এখানকার চড়াও ঠিক আরশোকার পিঠের মতন সমান-করা। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিটের সময় ফিরবেন, দেখবেন যেন দেরী হয় না—তা' হলে সাড়ে সাতটার সময়ে ষ্টিমারে নির্ব্বিঘ্নে পৌছিবেন, আর আজই সন্ধের সময় 'লা রোসেল' এর জেটিতে নেমে পড়তে পারবেন।"

আমি কাপ্তেনকে ধন্যবাদ দিয়া একটু অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র সেণ্ট্-মার্টিন সহর দেখিতে লাগিলাম—তখন অনেক নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি একটা ক্ষুদ্র অন্তরীপ-মুখে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; তারপর সমুদ্র যখন দ্রুত নামিয়া যাইতে লাগিল, আমিও বিস্তৃত বালুকারাশি পার হইয়া দূরে, অতিদূরে জলের উপর যে একটা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরস্তূপের মত দেখা যাইতেছিল, তাহার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমি অতি দ্রুত পদে এই হরিদ্রাবর্ণ বালুভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম, বোধ হইল যেন একটা কোমল মাংসপিণ্ডের উপর দিয়া চলিয়াছি, পদতলে যেন স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এইখানে সমুদ্র ছিল, এখন কত দূরে চলিয়া যাইতেছে; এখনই সমুদ্র ও বালুভূমির সীমান্তরেখা আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যেন কোনও ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমি এই অদ্ভূত ও প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখিতে পাইতেছিলাম। আটলাণ্টিক মহাসাগর এই একটু পূর্ব্বে আমার সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল, আর এখন এই বালুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে; যেন রঙ্গমঞ্চের অন্তর্দ্বার দিয়া এই মহাদৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে, আর আমি এখন এক মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করিতেছি। কেবলমাত্র একটা সৌরভ, লবণাক্ত সমুদ্রজলের মৃদুগন্ধ তখনও চারিদিক ভরিয়া উঠিতেছিল। আমি সামুদ্রিক উদ্ভিদের গন্ধ, সফেন তরঙ্গের গন্ধ, ও সমুদ্র তীরের উগ্র হইলেও স্বাস্থ্যকর, গন্ধ সেবন করিতে লাগিলাম। আরও দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম, আর শীত বোধ হইল না। দূরে অচল ভগ্নাবশেষ জাহাজখানা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, এক্ষণে তাহাকে একটা তিমি মাছের মৃত দেহের মত দেখা যাইতেছিল।

বোধ হইল সেটা যেন মাটীর ভিতর হইতে বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই অসীম, সমতল, হরিদ্রাবর্ণ ভূমির উপরে তাহার আয়তন বিস্ময়কর দেখাইতে লাগিল একঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়া জাহাজে পৌঁছিলাম।

জাহাজখানি এখনি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে মৃত জন্তুর পঞ্জরাস্থির মত, আল্‌কাতরা-মাখানো বড় বড় পেরেক-মারা কাষ্ঠপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র-বালুকা তাহার ভিতরে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ভগ্নদেহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে কায়দা করিয়াছে, দখল করিয়াছে, আর ছাড়িবে না। সে যেন সেই বালুকার মধ্যে শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার সম্মুখভাগ সেই কোমল বালুস্তরে বসিয়া গিয়াছে, এবং

পশ্চাৎভাগ আকাশে উৎক্ষিপ্ত; তাহার কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ-ফলকে শাদা অক্ষরে 'মারী জোসেফ' এই ছুটি কথা লেখা রহিয়াছে—সে যেন ঊর্দ্ধ আকাশে প্রেরিত একটি আকুল অস্তিম প্রার্থনা।

আমি এই মৃত জাহাজখানির উপর তাহার সর্ব্বনিম্ন পার্শ্ব দিয়া আরোহণ করিলাম, তাহার পাটাতনের উপর পৌঁছিয়া জাহাজের নিম্নতলে নামিয়া গেলাম। পার্শ্বস্থ ছিদ্রপথে দিনের আলোক প্রবেশ করিয়াছে; একটা দীর্ঘ অন্ধকার কক্ষের মত স্থান সেই আলোকে আরও ম্লান দেখাইতেছে। কক্ষতল বালুকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

জাহাজ খানির অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিয়া লইবার জন্য আমি একটা শূন্য সিন্দুকের পার্শ্বে বসিলাম। একটা বড় ছিদ্রপথে আলোক আসিতেছিল, তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের অনন্ত জলবিস্তার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে আমার দেহে শীত ও নির্জ্জনতাজনিত কি একটা কম্প হইতেছিল। আমি লেখা বন্ধ করিয়া ভগ্ন জাহাজের মধ্যে কত প্রকার অস্ফুট শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলাম। কাঁকড়া গুলা দংষ্ট্রার মত নখরে ভর করিয়া কাষ্ঠের উপর বিচরণ করিতেছে, সহস্র সহস্র অতি ক্ষুদ্র জন্তু আর এক প্রকার শব্দ করিতেছে আবার কাষ্ঠ-ধ্বংসি 'টিরীডো'-কীটও তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা এক প্রকার মিষ্ট তানলয়যুক্ত শব্দ করিয়া অনবরত গর্ত্ত কাটিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করিতেছে।

সহসা আমার ঠিক পাশেই যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। প্রেতের আবির্ভাবে লোক যেমন চমকিয়া উঠে, আমি ও তেমনি চমকিয়া উঠিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য আমার সত্য সত্যই মনে হইয়াছিল, যেন সেই সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে দুইটা জলমগ্ন মূর্ত্তি আমাকে তাহাদের মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে বলিবার জন্য উত্থিত হইয়াছে। সত্যই আমি পাটাতনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেই গলুইএর নীচে একটি দীর্ঘকার পুরুষ ও তিনটি যুবতী—আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে—একজন ইংরাজ ও তিনটি 'মিস্'কে দেখিতে পাইলাম। অবশ্য, হঠাৎ এই জনশূন্য ভগ্নপোতের উপর একটা মনুষ্য-মূর্ত্তির আবির্ভাবে তাঁহারা আমা অপেক্ষা অধিকতর ভয় পাইয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ বালিকাটি পলাইতেছিল, এবং অপর দুইটি তাহাদের পিতাকে বিষম আশঙ্কায় ধরিয়া রহিল, তিনি শুদ্ধ হাঁ করিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থার পরিচয় দিলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পরে কথা কহিলেন,

"ওঃ! মহাশয়ই তবে এই জাহাজের অধিকারী?"

"আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়"

"জাহাজ খানি কি আমরা দেখিতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে"

তিনি একটি দীর্ঘ ইংরাজী বচন বলিলেন, তাহার মধ্যে আমি 'সৌজন্য' এই কথাটি কয়েকবার প্রয়োগ করিতে শুনিলাম।

তিনি কোন্ দিক দিয়া কোন্ স্থানে উঠিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি আমার প্রসারিত হস্ত অবলম্বন করিয়া আগে উঠিলেন, পরে আমরা দুইজনে মিলিয়া বালিকা তিন টিকে সাহায্য করিলাম; তখন তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। তাহারা তিন জনেই অতি সুন্দরী, বিশেষতঃ বড়টি—তাহার বয়স আঠারো হইবে। অতি সুন্দর কেশ গুচ্ছ, দেহটি ঠিক ফুলের মত সদা বিকশিত—এত সুন্দর! বাস্তবিক, সুশ্রী ইংরাজ বালিকা যেন অতি পেলব সাগরসম্ভব সামগ্রী। এই বালিকাটিকে দেখিলে তোমার মনে হইত, সে যেন সমুদ্রবালুকা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, বালুকার বর্ণটি তাহার স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছে রহিয়া গিয়াছে। কি অম্লান সৌকুমার্য্য! বর্ণটি কি কমনীয়! দেখিলে ঈষৎ-রক্তিম ঝিনুক ও শুক্তি-জাত মুক্তার কথা মনে পড়ে—যাহা দুষ্প্রাপ্য ও বিস্ময়কর, এবং অতল সমুদ্রগর্ভে উন্মীলিত হয়।

এই মেয়েটি তাহার পিতা অপেক্ষা ভাল ফ্রেঞ্চ কহিতে পারিত, এজন্য আমাদের কথাবার্ত্তায় সেই দোভাষীর কাজ করিতে লাগিল। আমাকে জাহাজ খানি কিরূপে ধ্বংস হইয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হইল—অনেকটা কল্পনার সাহায্যও লইতে হইল; আমি যেন সেই সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত ছিলাম! অবশেষে সকলেই জাহাজের মধ্যে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা সেই স্বল্পালোক প্রায়ান্ধকার সুদীর্ঘ কক্ষ দর্শনে বিস্ময় ও প্রশংসাসূচক অস্ফুট ধ্বনি করিলেন এবং পিতা পুত্রী সকলে তৎক্ষণাৎ আপনাপন আঁকিবার খাতা বাহির করিয়া সেই বিচিত্র ও বিষাদগম্ভীর স্থানটির একসঙ্গে চারিখানি পেন্সিল-চিত্র আঁকিতে বসিলেন।

আমি জাহাজখানির পরীক্ষা কার্য্যে পুনরায় ব্যাপৃত হইলাম। বড় মেয়েটি আপনার কাজ করিতে করিতেই আমার সহিত গল্প করিতে লাগিল।

আমি তাহার নিকটে শুনিলাম যে তাহারা শীতকালটা 'বিয়ারিজে'

কাটাইতেছে এবং সেইখান হইতেই এই বালুলগ্ন জাহাজখানি দেখিতে 'আইল-দে-রে'তে আসিয়াছে। ইংরাজসুলভ রুক্ষ স্বভাব এই সৎপরিবারটির আদৌ ছিল না। ইংলণ্ড হইতে পৃথিবীময় যে এক শ্রেণী নির্ব্বিরোধী ও একটু বাতিক-গ্রস্ত পর্য্যাটকের দল বাহির হয়, ইহারা তাহাই।

তাহার সবই আমোদজনক। এমনি ফ্রেঞ্চ বলিবে, গল্প করিবে, হাসিবে, তোমার কথা বুঝিবে আবার বুঝিবে না, জিজ্ঞাসার ভাবে চোখ দুটি তুলিয়া এমন চাহিবে!—সেই সুনীল চক্ষু-তারকা, অতলস্পর্শ সমুদ্রের মত নীল! সময়ে সময়ে ছবি আঁকা বন্ধ করিয়া তোমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে, আবার তখনি আপনার কাজে মন দিবে—এসব আমার এত ভাল লাগিতেছিল যে, আমি যতক্ষণই হউক না কেন, সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতাম ও তাহার কাজকর্ম্ম দেখিতাম।

সহসা সে মৃদুস্বরে বলিল,

"জাহাজে যেন কি শব্দ হইতেছে"

আমি কাণপাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম, আমারও মনে হইল, একটা কি শব্দ হইতেছে—যেন একটা অস্ফুট ও অবিশ্রান্ত শব্দ। কিসের শব্দ? আমি একটু উপরে উঠিয়া একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিলাম, দেখিয়া চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমুদ্র ফিরিয়া আসিয়াছে, জাহাজের তলায় চারিদিকে জোয়ার বহিতেছে। আমি ছুটিয়া পাটাতনের উপর উঠি-লাম। তখন আর সময় নাই। সমুদ্র আমাদিগকে বেড়িয়া ফেলিয়াছে ও প্রচণ্ডবেগে কূলাভিমুখে ছুটিতেছে—না, ঠিক ছুটিতেছে না, অতি নিঃশব্দে চুপে চুপে চলিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড ভিজা দাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ি-য়াছে। বালুকার উপর দুই ইঞ্চির বেশী জল দাঁড়ায় নাই। কিন্তু উহারই মধ্যে এই গোপনসঞ্চার জলস্রোতের অগ্রসীমা আর দেখা যাইতেছিল না।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপ্রস্থানের অভিপ্রায় করিলেন, আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। পলায়ন অসম্ভব, কারণ মাঝে মাঝে যে সব গভীর খাত আছে তাহা এখন জলমগ্ন হওয়ায় আর দেখা যাইবে না, যে অনায়াসে ঘুরিয়া যাওয়া চলিবে। এখন যাইতে গেলেই ডুবিয়া মরিতে হইবে।

মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের প্রাণে ভীষণ উদ্বেগের সঞ্চার হইল। সেই সময়ে বড় বালিকাটি একটু হাসিয়া বলিল,

"আমরাই তবে ভগ্ন জাহাজের যাত্রী"

আমিও হাসিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার প্রাণে সেই জোয়ারের মতই অলক্ষিতে একটা কাপুরুষোচিত ভয়ের উদ্রেক হইল। উপস্থিত অবস্থার ভীষণতা আমি একেবারে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কে শুনিবে ?

ছোট বালিকা দুইটি তাহাদের পিতার অতি নিকটে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল—তিনি অবাক হইয়া সমুদ্র আমাদিগকে কিরূপ বেষ্টন করিয়াছে, তাহাই দেখিতেছিলেন।

সমুদ্রের জোয়ারের মত রাত্রিও অতি শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অন্ধকার টা যেন ভারী, সাঁৎসেতে ও বরফের মত ঠাণ্ডা।

আমি বলিলাম,

"আমরা আর কি করিব ? এইখানে সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে"

ইংরাজ ভদ্রলোকটি বলিলেন

'হাঁ, তা' বই কি।"

বালিকাদের মধ্যে একজনের বড় শীত করিতে লাগিল, তখন আমার জাহাজের নীচে নামিবার কথা মনে হইল—এই অতি শীতল বাতাস আমাদের মুখে যেন বিঁধিতেছিল। আমি পাটাতনের ফাঁক দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম। জাহাজের ভিতরেও জল ঢুকিয়াছে। তখন পাটাতনের উপরেই পশ্চাদ্দিকে, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া শুইয়া পড়া ছাড়া আর উপায় রহিল না। সেখানে দুইদিক একটু উচুঁ করিয়া ঘেরা ছিল—বাতাস তত লাগিবে না।

আমরা একত্র হইয়া শুইয়া রহিলাম। চারিদিকে জল ও রজনীর গাঢ় অন্ধকার। আমার স্কন্ধে ইংরাজ বালিকার স্কন্ধ স্পর্শ অনুভব করিলাম। সে কাঁপিতেছিল, মাঝে মাঝে তাহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার শরীরে তাহার অঙ্গের মৃদু উত্তাপ প্রবেশ করিতেছিল এবং সেই অন্তর্বাহিত উত্তাপ আমার চুম্বনের ন্যায় মিষ্ট লাগিতেছিল।

আমরা কথা কহিতেছিলাম না, অতি স্থির ও নিস্তব্ধ হইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিলাম, যেন ঝড়ের সময় কতকগুলা জানোয়ার একটা বেড়ার আড়ালে কোনও মতে জায়গা করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এই রাত্রিকালে ও এই ভীষণ সঙ্কটে আমার প্রাণে একটা সুখ জাগিতেছিল। এই সুন্দরী কোমলাঙ্গী মনোহারিণী বালিকার এত কাছে

থাকিতে পাইয়া আমার এই দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, এই উদ্বেগ-যাতনা ও এই ভগ্ন কাষ্ঠশয্যাও আনন্দময় হইয়া উঠিল।

আমি আপনি আপনাকে প্রশ্ন করিলাম, এই মনোহরণ কোথা হইতে আসে? এই আনন্দ, এই সুখ কেন?

কেন? কে বলিতে পারে? সে সেখানে ছিল বলিয়া? একটি অপরিচিতা ইংরাজ বালিকা! আমি তাহাকে ভালবাসি নাই, আমি তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবু আমার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, আমাকে সে জয় করিয়াছে। আমার তাঁহাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা হইল, তাহার জন্য প্রাণ দিতে চাহিলাম, এবং তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার মূর্খতাচরণ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলাম।

আশ্চর্য্য! রমণীর সাহচর্য্য মাত্রেই আমাদের এমন চিত্তবিকার ঘটে কেন? তাহার অঙ্গ হইতে যে কান্তি নির্গত হয়, তাহাই কি প্রবল মন্ত্রশক্তির মত আমাদিগকে আচ্ছন্ন অরিয়া ফেলে? না যৌবন ও সৌন্দর্য্যের মোহ সুরার মত আমাদিগকে মাতাল করিয়া দেয়?

বরং ইহাকে অলক্ষিত প্রেমস্পর্শ বলিয়াই মনে হয় না?—দুর্জ্জেয় রহস্যময় প্রেম, যাহা চিরদিন মানবজগতে মিলন ঘটাইবার জন্য ফিরিতেছে। একটী নর ও একটী নারীকে মুখামুখী পাইলেই তাহার শক্তি পরীক্ষা করে, তাহাদের অন্তরের মধ্যে একটা নব চেতনা প্রবাহ, একটা অস্পষ্ট, গভীর, মধুর ভাব সঞ্চার করে; যেমন প্রাবৃটের মৃদু ধারাস্পর্শে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে।

কিন্তু মাথার উপরকার নিঃশব্দ অন্ধকার ভীষণতর হইতেছিল। সমস্ত আকাশ নীরব। আমাদের চারিপাশে জলের একটা অবিরাম, অস্পষ্ট, কলশব্দ হইতেছিল—অতি মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনির সহিত সমুদ্রজল বাড়িতেছে আর জাহাজের পার্শ্বদেশে ক্রমাগত একই শব্দ করিয়া স্রোতোজল আঘাত করিতেছে।

হঠাৎ শুনিলাম কে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে; সে সর্ব্বকনিষ্ঠা বালিকাটি, তাহার পিতা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজের ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান করিলাম, পিতা বলিতেছেন, ভয় নাই, কন্যা শান্ত হইতেছেনা।

আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে বলিলাম,

"তোমার বড় শীত করিতেছে বোধহয়?"

"হাঁ, খুব করিতেছে"।

আমি তাহাকে আমার বহির্বাস দিতে চাহিলাম, সে লইবে না। কিন্তু

আমি তখন খুলিয়া ফেলিয়াছি, তাই তাহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলাম। আপত্তিকালে আমার হস্ত তাহার হস্ত একবার স্পর্শ করিয়াছিল, সে সময়ে আমার সর্ব্ব শরীরে একটা পুলক-রোমাঞ্চ হইয়াছিল।

কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বাতাস বাড়িয়া উঠিয়াছে। জলের শব্দ ও তখন ক্রমে বেশি বোধ হইতেছিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, মুখে ঝাপটা লাগিতে লাগিল। বাতাস আরও বাড়িয়া উঠিল।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি ও ইহা লক্ষ্য করিলেন। কেবল বলিলেন

"বড় ভাল নয়..........."

ভাল ত' নয়ই—সমুদ্র আর একটু বাড়িয়া উঠিয়া এই ভগ্ন জীর্ণ আশ্রয় খানিকে আঘাত করিতে থাকিলেই, তাহা প্রথম ঝড়ের মুখেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে—মৃত্যু অবধারিত।

প্রতি মুহূর্ত্তে ঝড় ও বাড়িতে লাগিল, আমাদের উৎকণ্ঠা ও বাড়িতে লাগিল। এখন সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকারে শুভ্র রেখা সকল উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, দেখিলাম, সেগুলা ফেনচিহ্ন। এখন 'মারী জোসেফ' এর উপর প্রত্যেক তরঙ্গাঘাত আমাদের প্রাণের মধ্যেও যেন আঘাতের মত বাজিতে লাগিল। তরুণী ইংরাজবালার বড় ভয় হইতেছিল, সে আমার পার্শ্বে কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে আমার বাহুপাশে বেষ্টন করিবার উন্মত্ত বাসনা হইল।

দূরে—আমাদের সন্মুখে, বামে দক্ষিণে ও পশ্চাতে, সমুদ্রের কূলে কূলে, বাতিঘরের শ্বেত, পীত, ও লোহিত আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে গুলা বৃহদাকার চক্ষুর মত—যেন দৈত্যের চক্ষু, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মিট্ মিট্ করিতেছিল; যেন আমাদের অন্তর্দ্ধানের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া চাহিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটা আমাকে আরও বিরক্ত করিতেছিল; সেটা ত্রিশ সেকেণ্ড্ অন্তর নিবিয়া আবার তখনই জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সেটা ঠিক চক্ষুর-মত, তাহার দীপ্ত দৃষ্টিতে যেন মাঝে মাঝে পলক পড়িতেছিল!

ইংরাজ ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিতেছিলেন, আবার নীরবে পকেটে রাখিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ কন্যাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়া গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিলেন

"মহাশয়, আপনার নববর্ষ সুখময় হউক!"

তখন দ্বিপ্রহর রজনী। আমি আমার হাত খানি বাড়াইয়া দিলাম, তিনি

চাপিয়া ধরিলেন। তারপর ইংরাজিতে কি বলিলেন, আর হঠাৎ তিনি ও তাঁহার তিন কন্যা সমস্বরে ইংরাজের বিখ্যাত বিজয়গীতি ' রুল ব্রিটানিয়া ' গাহিয়া উঠিলেন। সেই সুগম্ভীর স্বরলহরী নিকষকৃষ্ণ অন্ধকার ও স্তব্ধ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধ-আকাশে উঠিয়া গেল। প্রথমে আমার হাসি পাইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভূত ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

সমুদ্রে পরিত্যক্ত অভিশপ্তদিগের কণ্ঠে এই গান যেমন ভীষণ, তেমনই মহিমাব্যঞ্জক। যেন স্তোত্রের মত, অথচ স্তোত্র অপেক্ষাও মহান্—সেই ল্যাটিন গীতের মত—" হে সীজার ! মরিবার সময়েও তোমাকে প্রণাম করি"—বধ্যভূমিতে দ্বৈরথযুদ্ধে হত হইবার পূর্ব্বে হতভাগ্যেরা যাহা বলিয়া সম্মুখে সিংহাসনাসীন রোমসম্রাটকে অভিবাদন করিত।

তাহারা যখন থামিল, আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে একটি গান গাহিতে বলিলাম—একটি গাথা বা একটি ভাবপূর্ণ সংগীত, যাহা তাহার ভাল লাগে, এবং যাহাতে আমাদের কষ্টের একটু লাঘব হয়। সে সম্মত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিষ্কার তরুণ কণ্ঠস্বর লঘু ভঙ্গীতে নিশীথ-আকাশে উঠিতে লাগিল। গানের বিষয়টি নিশ্চয়ই করুণ হইবে, কারণ তাহার দীর্ঘোচ্চারিত বিলম্বিত পদগুলি অতি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আহত পক্ষীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে তরঙ্গের উপর লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

জল আরও বাড়িয়া উঠিয়া খোলা জাহাজের বুকের উপর গড়াইয়া গেল।

আর আমি ? আমি সেই গানই ভাবিতেছিলাম। আমার হোমার-বর্ণিত সাগরকূলবাসিনী মোহিনী রাক্ষসীর কথাও মনে হইতেছিল। যদি সে সময়ে কোনও তরণী আমাদের নিকট দিয়া বাহিয়া যাইত, তবে তাহার দাঁড়ীরা কি মনে করিত ! আমার যাতনাবিদ্ধ মন তখন একটী স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মোহিনী রাক্ষসী ! এই সাগরকন্যা ইংরাজকুমারীও ত' সেইরূপ কুহকিনী ! সে-ই ত' এই ভগ্নপোতে আমার বিলম্ব ঘটাইয়াছে, আর এখনি ত' সে আমাকে সঙ্গে লইয়া এই অকূল বারিধি বক্ষে ডুবিয়া যাইবে !

হঠাৎ আমরা পাঁচজনেই পাটাতনের অপরদিকে উল্টাইয়া গেলাম, 'মারী জোসেফ' দক্ষিণদিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। ইংরাজ বালিকা একেবারে আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে আমার বাহুপাশে চাপিয়া ধরিলাম এবং অন্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া, জ্ঞানশূন্য হইয়া, উন্মত্তের

ন্যায় তাহার গণ্ডদ্বয়ে, কপালে ও কেশে অজস্র চুম্বন করিলাম। ইহার পর জাহাজ আর নড়িল না, আমরা কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পিতার কণ্ঠে শব্দ হইল—'কেট্!' আমি যাহাকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম সে উত্তর করিল, 'এই যে,' এবং আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। আমার ইচ্ছা হইল, জাহাজ খানা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাক, আর আমি তাহাকে লইয়া সমুদ্রগর্ভে নামিয়া যাই।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি আবার কথা কহিলেন

"একটু একপেশে হইয়াছে মাত্র, আমার কন্যা তিনটি এখনো আছে।"

জ্যেষ্ঠা কন্যাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, সে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ সমুদ্রের উপর আমাদের খুব নিকটে একটা আলোক দেখিতে পাইলাম। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, উত্তর আসিল। সে একখানা নৌকা, আমাদের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। হোটেলওয়ালা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অসাবধানতা অনুমান করিয়াছিল।

তবে আমরা রক্ষা পাইলাম! আমার বড় দুঃখ হইল। তাহারা আমাদিগকে সেই ভগ্নপোত হইতে 'সেণ্ট্ মার্টিনে' লইয়া গেল।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি আপনার হস্ত আমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন,

"খুব ভাল আহার চাই, খুব ভাল আহার!"

আমরা সত্যই নৈশভোজনে বসিলাম। আমার আদৌ ফূর্ত্তি ছিল না, 'মারী জোসেফ্' এর জন্য দুঃখ হইতেছিল।

পরদিনই বিদায় লইতে হইল। আমরা অনেক আলিঙ্গন করিলাম, এবং পরস্পরকে পত্র লিখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

ওঃ, সেবার কি ধরাই পড়িয়াছিলাম! আর একটু হইলেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিতাম। এক সপ্তাহ এক সঙ্গে থাকিলে নিশ্চয় বিবাহ হইত। মানুষ সময়ে সময়ে কি দুর্ব্বলতা ও অসারতারই পরিচয় দেয়!

দুই বৎসর তাহাদের কোনও সংবাদ পাই নাই। তার পর নিউইয়র্ক্ সহর হইতে একখানা পত্র পাইলাম। তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহাই আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছে। তখন হইতে আমরা প্রতি বৎসর, ১লা জানুয়ারি, পরস্পর পত্রসম্ভাষণ করিয়া আসিতেছি। সে আমাকে তাহার নিজ জীবনের কথা, তাহার পুত্র কন্যাদের কথা, তাহার ভগিনীদের কথা,—সবই লেখে, কিন্তু

স্বামীর কথা লেখে না। কেন? কেন লেখে না? ......আর আমি?—কেবল সেই "মারী জোসেফ্" এর কথাই লিখি। আমি বোধ হয় জীবনে সেই একবার মাত্র একজন রমণীকে ভাল বাসিয়াছিলাম—না ঠিক তা' নয়—আমার ভালবাসা উচিত ছিল—ওই ত!—কে জানে? ঘটনাস্রোতে মানুষ ভাসিয়া যায়, তার পর সব শেষ। সে এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে দেখিলে বোধ হয় আর চিনিতেও পারি না।—হায়! সেই অতীত কালের সে!—সেই ভগ্নপোতে—সে কি চমৎকার!—স্বর্গীয়! সে লিখিয়াছে, তাহার কেশ শুক্ল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আমি বড়ই বিচলিত হইয়াছি। সেই তার কেশ—এমন সোনার মত! নাঃ, সেই যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে আর নাই,—এ সব মনে করিতেও কষ্ট হয়। *

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

---

* মোপাসাঁ-রচিত এই বিখ্যাত গল্পটির একটি বিকৃত অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অধিকাংশ স্থল পরিত্যক্ত হইয়াছে, এজন্য অতিশয় সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছে; গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলিও মূলের সমান ফুটিয়া উঠে নাই। ইহা সামান্য ত্রুটি নহে। আমাদিগের সাহিত্যে যে নানা ব্যভিচার প্রবেশ করিতেছে, ইহা তাহারই অন্যতম। একে অনুবাদের অনুবাদ, তার উপর একজন বিখ্যাত লেখকের উপর কলম চালাইয়া তাঁহার রচনার যথেচ্ছা অঙ্গহানি করিয়া, তাহাই আবার মূলের অনুবাদ বলিয়া প্রকাশিত করা কি ব্যভিচার নহে? ইহাতে যে শুধুই অনুবাদকের শিল্পসৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাব ধরা পড়ে তাহা নহে, ইহা মিথ্যাচার এবং সাহিত্যের অবমাননা। আমাদের মনে হয়, যে এরূপ অনুবাদ করা অপেক্ষা বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক মহাজনগণের পন্থা, অর্থাৎ একটু উল্টাইয়া নিজ নিজ নামে প্রকাশ করাই শ্রেয়স্কর; তাহা হইলে আর আসলে ও নকলে গোল বাধিবে না। ক্ষুদ্র গল্পের সংক্ষিপ্তসার হইতে পারে না, তাহার আখ্যানবস্তুর মনোহারিত্ব অপেক্ষা লিপিকুশলতাই অধিক, বিশেষ মোপাসাঁর। 'কপালকুণ্ডলার' উপসংহার যিনি লিখিয়াছেন, তিনি 'কপাল কুণ্ডলা' যেমন বুঝিয়াছিলেন, মোপাসাঁর গল্পের যিনি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়াছেন তিনিও মোপাসাঁর গল্প সেইরূপ বুঝিয়াছেন। বীরভূমি-সম্পাদক।

কবি গোবিন্দ দাস।

আজ ১৬ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩০৩ সনের ৭ই আষাঢ়, বাংলাদেশের একজন কবি 'দেশছাড়া' ও 'স্বজনহারা' হইয়া আট কোটী বঙ্গবাসীর নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছিল।

"তোমরা বিচার কর ভাই!
কেন আমি দেশছাড়া, আত্মীয় স্বজন হারা
কেন সে জনম ভূমি দেখিতে না পাই"

* * * * * *

করিলি ডাকাতি চুরি, মারিলি ত বুকে ছুরি,
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই।
শুধু তার হিতকামী, তারে ভালবাসি আমি,
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই।
কোন পাপে বল তবে, এ শাস্তি আমার হবে
জগতে ইহার নাকি সুবিচার নাই!

* * * * *

নির্ব্বাসিত কবি তাঁর জন্মভূমির উদ্দেশে গাহিতেছেন—

"শত স্বর্গ, শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অইযে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুন্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মনিকর্ণিকার।

* * * *

নির্ব্বাসিত কবি শুধু নিজের জন্য বিচার প্রার্থনা করিতেছেন না। সমগ্র দরিদ্র ভাওয়ালবাসীর হইয়া তিনি প্রতীকার ভিক্ষা করিতেছেন।

দরিদ্র ভাওয়ালবাসী, কাতরে কাঁদিছে আসি
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে।
সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান, কে আছ বীরের প্রাণ
বাড়াও সবল হস্ত পাপের সংহারে।
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে।

কিসের বিচার? কিসের প্রতীকার? কবি বজ্র-নির্ঘোষে গাইতেছেন শুন বাংলার নর-নারী—

"যে জাতি যেথানে থাক, সতীর সতীত্ব রাখ,
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার"!

যে পৈশাচিক অত্যাচারের কথা কবি অসহায় ভাওয়াল বাসীর মুখপাত্র হইয়া একদিন তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে 'আপনার মা বোনেরে স্মরণ করিয়া' ভাওয়ালে সতীর সতীত্ব রাখিবার জন্য, বাংলার নরনারীর মধ্যে সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান কয়জন বীরের প্রাণ, পাপের সংহারে সবল হস্ত বাড়াইয়াছিলেন, তাহা কি আজ আমরা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিব না?

কবি কতইনা কাতরে গাহিয়াছিলেন—

"সংসারে আমার ভাই, যদি ও কেহই নাই
তবুত তোমরা আছ দেশবাসিগণ?"

দেশবাসিগণের উপর কবির এই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের মর্যাদা বাঙ্গালী জাতি কিঞ্চিন্মাত্র ও রক্ষা করিয়াছিল কিনা, আজ আমাদের তাহাও বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া জানিবার দিন। কেন না ভাওয়ালের এই চিরদরিদ্র কবির আহ্বানে, এমন একটি অমানুষিক, পৈশাচিক অত্যাচার প্রতীকার ভিক্ষা করিয়াছিল, যে যদি বাঙ্গালি জাতি সে দিন কবির এই আহ্বানের যথোপযুক্ত উত্তর না দিয়া থাকে তবে গত ৩০ বৎসরের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস লেখক, পৌরুষ ও মনুষ্যত্বহীন বাঙ্গালীর এই জাতীয় জীবনের কলঙ্ককে কি করিয়া মুছিয়া ফেলিবেন তাহা ভাবিয়া পাইনা।

বাঙ্গলা দেশে ভাওয়ালের মত কত শত পল্লী বিদ্যমান। ভাওয়ালে যে অত্যাচারের কথা বাংলার কাব্যসাহিত্যকে আজ চির দিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়াছে,—কে জানে হয়ত সেই অত্যাচার, দূরদিগন্তে অজ্ঞাত অখ্যাত কত শত পল্লীর সামাজিক জীবনকে আজ ও প্রপীড়িত করিতেছে। বাংলার দূর পল্লীর সামাজিক জীবনের ইহা এক অতি বীভৎস চিত্র। কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস বাঙ্গালীর এই সামাজিক জীবনের অতি দক্ষ ও ভুক্তভোগী কবি।

পল্লীবাসীর সামাজিক জীবনকে এই ব্যাধি, এই পৈশাচিক অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের কবিতায় যে উষ্ণ গৈরিক স্রাব অনর্গল নির্গত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্যের শুধু একটা

বিশেষত্ব সৃষ্টি করে নাই, পরন্তু তাহার সামাজিক জীবনের এক অংশের একটি নিছক প্রতিকৃতিকে চিরদিনের জন্য বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দান করিয়াছে।

সামাজিক জীবনে অত্যাচার, দুর্নীতি, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই কখনো না কখন দেখা যায়। কত কবি সেই অত্যাচার প্রপীড়িত, দুর্নীতি-পরায়ণ সমাজে জন্মলাভ করিয়াও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া যান, সমাজ ছাড়িয়া প্রকৃতিতেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। তাহারা হয়ত মনে করেন যে পৃথিবীর বা স্বদেশের মনুষ্যসমাজের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বড় অল্প, নাই বলিলেই হয়। চাঁদের জ্যোৎস্না, তারার হাসি, মলয়হিল্লোল, ফুলের সৌরভ ইত্যাদি এইসব জিনিসের সহিতই তাহাদের নিকটতম সম্বন্ধ। কবি-হৃদয়ের এইরূপ একটি স্বভাবসিদ্ধ ভাবের মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে আমরা স্বীকার করি। Byron এর মত কত কবি মনুষ্যসমাজকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ই অধিকতর ভালবাসিয়া গিয়াছেন ও সে কথা পুনঃ পুনঃ কাব্যে ব্যক্ত ও করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার কারণ কি তাহাও আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি।

প্রকৃতি ও মানবসমাজ, কবি এই দুইয়ের মধ্যে কাহার নিকট অধিক-তর ঋণী, কাহাকে তিনি অধিকতর ভালবাসেন। তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কেননা ভিন্ন প্রকৃতির কবির ভিন্ন রুচি হওয়া সম্ভব। আবার যখন কবি ভাবিতেছেন যে সমাজ অপেক্ষা প্রকৃতিকেই আমি বেশী ভাল বাসিতেছি প্রকৃতিই আমাকে "যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী" গড়িয়া তুলিতেছে তখন হয়ত প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ, বিশেষতঃ তাঁহার স্বজাতীয় সমাজ, তাঁহার পূর্ব্বের কবি ও জ্ঞানীদের চিন্তা, তাঁহার সমসাময়িকদের সমালোচনা, তাঁহার জাতীয় জীবনের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ, এই সমস্তই কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার কবিতার প্রস্রবন যোগাইতেছে।

তা'ছাড়া প্রকৃতি ও সমাজ দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে, একের সহিত অন্য অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ। সে হিসাবেও কবি প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সমাজ বা সমাজকে ছাড়িয়া শুধু প্রকৃতিকে লইয়া বাঁচিতে পারেন না।

একথাটা এস্থানে এত বেশী করিয়া বলার কারণ এই যে কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের কবিতায় সমাজ ও প্রকৃতি পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। এমনকি অনেক সময় মনে হয় যে সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করিয়াই কবি প্রকৃতির দিকে তাঁহার কাতর ও করুণ অথচ মুগ্ধ দৃষ্টি খানিকে অবারিত করিয়া দিয়াছেন।

যেখানে সমাজের উপর অত্যাচার হইতেছে, সেখানে তিনি যেন নিজে ব্যক্তিগত ভাবে সে অত্যাচার সহ্য করিতেছেন; আবার নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দুঃখ বা অত্যাচারকেও সমস্ত জনসমাজের দুঃখের সহিত বিস্তৃত করিয়া কবির উন্মুক্ত অবারিত বক্ষে সে দুঃখ বিপদকে বরণ করিয়া লইতেছেন। সামাজিক জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ যেখানে এত নিবিড়, সেখানে সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেবল প্রকৃতি একক ও স্বাধীন ভাবে কবিহৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; অন্ততঃ কবি গোবিন্দ দাসের প্রতিভার উপর পারে নাই, ইহাই আমাদের ধারণা। ভাওয়ালের চিলাই নদী, বেলাই বিল, মৃত স্ত্রীর শ্মশানঘাট, পুর্ণিমার জ্যোৎস্না এ সমস্তকেই কবি তাঁহার দুঃখপূর্ণ জীবনের একটি বিষাদক্লিষ্ট কৃষ্ণছায়ায় আবৃত করিয়া তবে দেখিয়াছেন। প্রকৃতিত চিরকালই কবি-হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এখানেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। তবে কবির জীবনই তাঁহার চারিদিকের প্রকৃতির উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত কবির জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। কবি গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে ইহাই আমাদের ধারণা।

পল্লীর সামাজিক জীবনকে একটা বাস্তব অত্যাচারের হাত হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য কবি গোবিন্দদাসের মত বাংলা সাহিত্যে আর কোন কবি উদ্যম করিয়াছেন কি না বলা কঠিন।

ইংলণ্ডে ১৮দশ শতাব্দীর শেষ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কবি Crabbe এর সহিত আমাদের গোবিন্দ দাসের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পল্লীর সামাজিক জীবনের নিছকচিত্র (realistic side) Crabbe যেমন আঁকিয়াছেন, এবং Goldsmithএর মত শুধু পল্লীজীবনের ভাল দিক না দেখাইয়া বিশেষ ভাবে মন্দ দিক দেখাইয়া যেমন পল্লীর সামাজিক জীবনকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসও অনেকটা সেইরূপ করিয়াছেন। অবশ্য দুই জনের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট আছে।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব না থাকিয়া যায় না। ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গোবিন্দদাসের কবিতায় এই বিদেশীয় প্রভাব অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয়ের অভাবই হয়ত ইহার একটি কারণ। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এই ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবের অভাবই তাঁহার কবিতার দোষ ও গুণ এই উভয়ের জন্য

দায়ী। ইহাই তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব। Art বা কলানৈপুণ্যের দিক দিয়া নাকি এজন্ত তাঁহার কবিতা অনেক দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন ব্যাপারেও নাকি কবি এজন্ত খুব সংকীর্ণতার আশ্রয় লইয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ সে কথার অনুমোদন করি না। অধুনাতন কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যের art দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণতা দান অনেকেই করিতেছেন। ইহা সাহিত্যের একটি আশাপ্রদ চিহ্ন, স্বীকার করি। ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর খ্যাতনামা শিষ্যেরা এ বিষয়ে কেহই পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু বাংলার প্রাচীন সামাজিক জীবন বা সাহিত্য য়ুরোপের সংঘাতে আসিয়া আজ আহত ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়াছে বলিয়াই যে বাংলার মাটীতে আর খাঁটি ফসল ফলিবে না, সত্য হইলে, ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে art তাহার অনুসরণ ব্যতীত বা তাহার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া ব্যতীত বাংলা সাহিত্য যদি এযুগে মোটেই দাঁড়াইতে না পারে তবে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তাহা খুব গৌরবের কথা নহে। কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস ইংরাজী সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া যদি কোন অংশে দরিদ্র হইয়া থাকেন, তবে ইহাও সত্য যে অগুকার বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র কবি যিনি বিদেশীয় প্রভাব অস্বীকার করিয়াও মাতৃভাষাকে তাঁহার স্বপ্রকৃতিস্থ তাঁহার নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই স্বদেশী আত্ম নির্ভরতার দিনে বাঙ্গালী ইহাকে উপেক্ষা করিবে কি করিয়া ?

কবি যখন মাতৃভাষার চরণে কুঙ্কুম উপহার দেন তখন তিনি নিজেই এজন্ত একটু আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কে আর তোমারে ভাল বাসিবে কুঙ্কুম ?
লেভেণ্ডার ম্যাকেসার, সুইট ব্রায়ার ওয়াটার
পাউডার এসেন্সের মহা মরসুম।
সর্ব্বথা বিলাতী গন্ধ   ভারত করেছে অন্ধ,
কে আর তোমারে ভাল বাসিবে কুঙ্কুম ?

কিন্তু ইহা জাতীয় জীবনে 'স্বদেশী' আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বের আক্ষেপ। সমগ্র দেশব্যাপি এই 'স্বদেশীর' পর কবি গোবিন্দ দাসের "কুঙ্কুম" 'কস্তুরী' "চন্দন" যদি আদৃত না হয়, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে 'স্বদেশী' বাঙ্গালীর মুখের কথা, অন্তরের নহে।

কবি গোবিন্দ দাসের মধ্যে যাহা সঙ্কীর্ণতা বলিয়া অনেকে ভ্রম করেন, অন্ত

দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা তাঁহার কবিপ্রতিভার একনিষ্ঠ স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র। সাহিত্যেক্ষেত্রে বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যে আজ একটি প্রবল স্রোত বহিয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা এই স্রোতের মূল প্রস্রবন। এই স্রোতে বাংলার উদীয়মান নব্য কবিরা একসঙ্গে সকলেই গা ঢালিয়া দিয়াছেন। স্রোতের বিরুদ্ধে ত দূরের কথা, এই স্রোত হইতে স্বাতন্ত্র্য বা আত্মরক্ষা করিবার কোন প্রয়াস একেবারেই দেখা যাইতেছে না। অবশ্য ইহার ভাল মন্দ ভবিষ্যের সাহিত্যিক আলোচনা করিবেন। এ বিষয়ে এখন কিছু বলা অসমীচীন ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে এই বিশাল স্রোতের মধ্যে যে ৩।৪টি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্রোত লক্ষ্য করা যাইতেছে, কবি গোবিন্দ দাসই তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। অবশ্য য়ুরোপীয় সাহিত্য কলার ধারা ভাবান্বিত হইলেও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও অক্ষয়কুমার বড়ালের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত ৩০ বৎসর ধরিয়া কবি গোবিন্দ দাস বাংলা সাহিত্যে কবিতা লিখিতেছেন। 'চিলাই' নদী,'বেলাই' বিল, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের উভয়তীর ও শ্মশান ঘাট প্রতিধ্বনিত করিয়া এই কলকণ্ঠ পিক বাংলার কাব্য নিকুঞ্জে আজো কত সুরে গান গাইতেছেন।

তাঁহার সমগ্র কবিতার সমালোচনা, ভবিষ্যের কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের এক প্রকাণ্ড অধ্যায় পূর্ণ করিবে, আশা করা যায়।

গোবিন্দ দাস দুঃখের কবি। Macaulay ইংলণ্ডের ছোকরা-কবিদের দুঃখের কবিতায় যে তীব্র অথচ ব্যঙ্গসমালোচনা করিয়াছেন, গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে সেরূপ করিলে চলিবে না। গোবিন্দ দাসের দুঃখ কল্পিত নয়, বাস্তব পদার্থ। দারিদ্র্যের দুঃখ, স্ত্রী কন্যার অসময়ে মৃত্যুর দুঃখ, স্বীয় পরিবারের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের দুঃখ, দুঃখ অনেক। আজ পর্য্যন্ত তাহার শেষ হয় নাই, এ জীবনে হইবে কি না কে জানে ; সেই জন্য এই দুঃখের কবির সব কবিতাতেই একটা বিপদের, একটা নৈরাশ্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

গোবিন্দ দাস অনেক বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন,স্বদেশ প্রেম,সমাজ সংস্কার। ভালবাসা, স্ত্রী জাতির প্রকৃতি, অত্যাচারের প্রতিকার, মানবের সুখ দুঃখ, দাম্পত্য জীবন, জন্ম মৃত্যু, ব্যঙ্গ, রহস্য প্রভৃতি সব বিষয়েই কবি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সব কবিতাতেই তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে দুঃখের কবি, তাঁর ভাষা যে দুঃখীর ভাষা, তা সব সময়েই বুঝা যায়।

গোবিন্দ দাস কখনো বলিতে পারেন নাই

"যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয় ;
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।"

জীবনের পথে প্রতি পদে এই কবির চরণ কণ্টকে বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবু সেই পথের কাঁটা কবি "রক্তমাথা চরণ তলে, একলাই দলিয়া গিয়াছেন।" তাঁর বুকের পাঁজর বজ্রানলে একলাই জ্বালাইয়া লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। কবির পক্ষে ইহা যাহাই হউক, যে জাতির মধ্যে নিঃসহায় কবিকে এরূপভাবে পথ চলিতে হইয়াছে, সে জাতির কবির প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আজ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কেন না, বাঙ্গালী জাতি মাইকেল বা হেমচন্দ্রের সময় যেরূপই হউক, আজ যে তাহার কবিপ্রতিভার প্রতি সম্পূর্ণ নয় তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। কবি গোবিন্দ দাসের প্রেমের কবিতায় অনেকে উদাসীন sensuality বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার দোষারোপ করেন। আমরা স্বীকার করি যে এই কথাটা আমরা ভাল করিয়া বুঝি না। গত আশ্বিনের বীরভূমি পত্রিকায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। জগতে সৌন্দর্য্যের নানা দিক্ আছে, তাহার যে কোন দিক্‌কে ভাব দিয়া ভাষার মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই কবির কাজ। তবে 'চন্দন' কাব্যের 'দেখিলে তারে,' 'কস্তুরী'র 'কে বেশী সুন্দর,' 'ফুল ও রেণু'র, প্রথম চারিটি কবিতায় সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিতে সংযমের কিছু অভাব লক্ষিত হইতেছে, এমন অনেকে বলিতে পারেন।

কিন্তু গোবিন্দ দাসের প্রেমের কবিতার মেরুদণ্ডে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা স্থান লাভ করিয়াছে ইহা আমরা স্বীকার করি না। বিরহের কবি, অত্যাচার জর্জ্জরিত কবি, দারিদ্র্যে নিপীড়িত কবি, স্বদেশের ও স্বজাতির উপেক্ষিত, অথচ 'কুঙ্কুম,' 'চন্দন', 'কস্তুরী'র কবি প্রেমের কবিতায় একটা বিরাট নৈরাশ্যের হাহাকার ধ্বনিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"প্রাণের এ হাহাকার, কেহ না শুনিল আর,
আর না শুনাতে চাই, আর না শুনাতে চাই,
ফিরে যাই, ফিরে যাই।"

প্রেমের কবিতায় 'শত সাহারার তপ্ত বালুতে' কবির হৃদয় এমন ভরিয়া

উঠে, কত মেঘদূতের বিরহী যক্ষের অশ্রুতে তাঁহার নয়ন এত অধিক সমাকীর্ণ হয়, দুঃখিনী প্রিয়াকে কোন দিন সুখী করিতে পারিলেন না বলিয়া সেই মর্ম্ম স্পর্শী আক্ষেপোক্তি বাংলার কাব্য সাহিত্যের শ্রীঅঙ্গে এমন এক ব্যথার সঙ্গীত জড়াইয়া দেয়, যে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হইলে, গোবিন্দ দাসের কবিতায় ঐ দোষ সম্যক বিচার না করিয়া আরোপ করা কি করিয়া সম্ভব, বুঝিতে পারি না।

অধুনাতন বাংলা সাহিত্যের প্রেমের কবিতার সহিত তুলনা করিতে গেলে, গোবিন্দ দাসের প্রেমের কবিতার আরো একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে দাম্পত্য প্রেম অধিক স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইলেও তাহার একটা পরমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভাব ভক্তগণ বাহির করেন, যদ্বারা সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ঐরূপ দুর্নীতিপরায়ণ আদর্শ দ্বারা কলুষিত হয় না, অন্ততঃ হইবার সম্ভাবনা কম থাকিয়া যায়; কিন্তু প্রেম বিষয়ের কবিতায় বাংলার উদীয়মান নব্য কবিদের মধ্যে এই পরকীয়া ভাব এবং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এমন একটা অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যাইতেছে যে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে এই সমস্ত প্রেম আমাদের সামাজিক জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিহীন, অনেকস্থলে সামাজিক জীবনের বিরোধী। সামাজিক জীবনের বিরোধী বা সামাজিক জীবনের স্মৃতি সম্পর্ক বিহীন প্রেমকে আজ যাঁহারা ভাবপ্রাণ বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে ও বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে, ফলে পুষ্পে মুকুলিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন, তাহাদের এই উদ্যমের পরিণাম, ভবিষ্যৎ বিচার করিবেন। কিন্তু অনেক বিজ্ঞ সমালোচক আশঙ্কা করেন যে বাংলা সাহিত্যে, ইহা অবনতিশীল ইউরোপীয় আর্টএর একটা অন্ধ অনুকরণমাত্র। এত কথা এ প্রসঙ্গে এখানে বলিবার প্রয়োজন এই যে আমাদের কবি গোবিন্দ দাস এই অন্ধ অনুকরণের ছায়া বা ত্রিসীমায় গিয়াও কখন দাঁড়ান নাই। তাঁহার প্রেম বাংলার সামাজিক জীবনের বিরোধী বা সামাজিক জীবনের সহিত সম্পর্কহীন প্রেম নয়। একদিন বাংলাসাহিত্যে ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ইহার গুরুত্ব বিচার করিবার দিন আসিতে পারে, আশা করা যায়।

কিন্তু এই বলিয়া আমাদের এই কবির জীবনে যে কোনরূপ Romance একেবারেই স্থান পায় নাই,—তাহা বলা যায় না। কবি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, অনুতাপ করিয়াছেন যে, একদিন প্রথম বয়সে "ভুল

হয়েছিল এক ফুল পানে চেয়ে।" জীবনে, বিশেষতঃ কবিদের জীবনে হয়ত ওরূপ ভুল দু একটা হইয়া পড়ে'—হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেটা যে 'ভুল' তাহার সম্যক্ উপলব্ধিই এখানে গোবিন্দদাসের কবিত্বকে মনুষ্যত্বের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবিকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। 'কস্তুরী' কাব্যের 'পরনারী' কবিতায় কবি স্পষ্ট বলিতেছেন—

"আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি, সে যে পরনারী"

ইহা শুধু কবিত্ব নয় মনুষ্যত্ব। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে এই মনুষ্যত্বের আদর্শ, যে কবি তুমি আজ এই চপলতা, এই বিলাসিতা, এই অন্ধ অনুকরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে বজ্রমুষ্টিতে তুলিয়া ধরিতেছ, আজ নয় কাল নয়, কিন্তু একদিন আসিবে, যেদিন বাঙ্গালী জাতি তাহার জাতীয় জীবনের লাভ ও ক্ষতির হিসাব করিয়া তোমার উদ্দেশ্যে একখানি জয়মাল্য লইয়া ছুটিবে—কিন্তু হায় কবি! সেদিন তুমি কোথায় থাকিবে!

নারীচরিত্র সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা যাহা কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা খুব ব্যাপক না হইলেও গভীর। 'কস্তুরীর' "এই এক নূতন খেলা" কবিতা অনেকে রুচি-বিগর্হিত বলিতে পারেন কিন্তু বালিকাহৃদয়ের একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেম, লজ্জা ও বাধার যে স্বাভাবিক চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নারীচরিত্রের আদ্যন্ত সম্বন্ধে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতায় দুটি বালকবালিকার হৃদয়চিত্র যেরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের শকুন্তলা কাব্যের সমালোচনা পড়িয়া কে না মনে করিবে যে, মহাকবির দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ছায়ায় এই ক্ষুদ্র বাংলা কবিতাটি কেমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্মন্তের প্রেমকাতর আহ্বানে শকুন্তলা নারীসুলভ চপলতায় যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন,—যেরূপ স্পষ্টভাবে সম্মতিও দিতে পারিতেছিলেন না, এখানেও সেইরূপ মুগ্ধ বালক যখন বালিকার খেলার সঙ্গ যাচ্ঞা করিতেছিল তখন বালিকা বারণ করিতেও পারিতেছিল না, আবার সম্মতও হইতেছিল না। বালিকা বলিতেছিল—

"তোমার সনে খেলে ভাই, সকাল আস্‌তে ভুলে যাই
ভয়ে মরি একলা যেতে, সবুজ সন্ধ্যা বেলা"
"তুমি কেবল বনে যেয়ে, মুখের পানে থাক চেয়ে
লজ্জা করে! আর যাব না নিত্যি সন্ধ্যা বেলা।"

কবি নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সংসারের নিছক চিত্রই আঁকিয়াছেন। শুধু কল্পনা

করেন নাই। ভালমন্দ দুইদিকেই তিনি সমান দৃষ্টি করিয়াছেন। কখনো বা নারীর প্রেমকে বড় ক্ষণ-ভঙ্গুর বলিয়া গালাগালি দিয়াছেন। নীল জলদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চঞ্চলা চপলা যেমন ছুটিয়া পালায়, পরে সেই মথিত নভো-অঙ্গনে কত হাহাকার কত অশনি পতন হয়, রমণীর প্রেমও তেমনি চঞ্চল, হতাশ প্রেমিকের হৃদয়েও তেমনি অশনি পতনও হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করে। আবার কখনো বা কবি এই নারীপ্রেমকে জীবনের শ্রেষ্ঠ মোক্ষ বলিয়া পূজা করিয়াছেন। 'ফুল ও রেণু' কাব্যের 'আমার ঈশ্বর', ও 'কার শক্তি' কবিতায় নারীপ্রেমে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া ধন্য হইতেছেন। কবি কখন বলিতেছেন—

রমণী জানে না কভু গুণের আদর
রমণী জ্বলিয়া মরে রূপের তৃষ্ণায়
রমণী পুড়িয়া মরে তপ্ত আকাঙ্খায়।

নারীর ভালবাসায় নাকি দৃঢ়তা বা একনিষ্ঠ ভাব নাই, যে যখন সম্মুখে থাকে তারি ছায়া নাকি তার প্রাণে ভাসে।

তারি ছায়া ভাসে প্রাণে যে থাকে সম্মুখে
একটু সরিলে দূরে নাহি কাঁদে মন
আরেক নূতন ছায়া পড়ে তার বুকে।

তারপর কবি বলেন—

কি তীক্ষ্ণ নারীর ঠোঁট, কি শোষণ তার
চুম্বনে চুম্বনে যেন শুষে খায় হাড়।
শকুনি খাইলে পরে তখনি ফুরায়
রমণী জীবিত রেখে দিনে দিনে খায়।

নারীর প্রেম নাকি—

পর্ব্বতে আছাড়ি প্রাণ করে খান খান

বিরক্ত নারীর প্রেম নাকি আরও ভয়ানক। কবি বলেন,—

তার চেয়ে শত ভাল সহস্র নরক।

নারী নাকি কখন শূন্যবক্ষে তিষ্ঠিতে পারে না।

"শূন্যবক্ষে নারী যেন পারেনা তিষ্ঠিতে
রমণী রাক্ষসী যেন ক্ষিপ্ত আলিঙ্গন"
"মমতা জানে না নারী শুধু মৃত্যু জানে
গর্ব্বিতা গৃধিনী মত্ত ক্রোধে অভিমানে"

তারপর—

"রমণী জীবনে ধর্ম্ম নাহি এক কণা
পাপিষ্ঠা নারীর প্রেম মহাপ্রতারণা।"

এই গেল একদিক্।

তারপর আর একদিন কবি বলিতেছেন যে, যাহা গিরিহিমালয় দেখাইতে পারে নাই, অশনি গর্জ্জিয়া বুঝাইতে পারে নাই, বৃথায় গ্রহ সমুদয় জ্যোতি ঢালিয়াছে—কিন্তু হে রমণী যেদিন তোমারে ভালবাসিয়াছি,

"সেই দিন হইতে এই বিশ্ব-চরাচরে
কি যেন অনন্ত শক্তি মহান্ নবীন"

জাগিয়া উঠিয়াছে।

"তুইসে অনন্ত শক্তি পূর্ণ পরাৎপর ব্যাপিয়া বিশাল বিশ্ব, আমার ঈশ্বর।" তারপর নারীর রূপে গুণে কবি এত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন যে তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে এই শক্তি নারীর কি ঈশ্বরের।

"রূপে গুণে এত মুগ্ধ করিয়াছ নারি,
একি ঈশ্বরের শক্তি অথবা তোমারি।"

এখানে আমাদের বড়াল কবির "প্রদীপ" কাব্যের "অভেদে প্রভেদ" কবিতাটি মনে পড়ে।

কবি এখানে খাঁটি স্বদেশী। আমাদের জাতির উচ্চতম চিন্তায় একদিন নারী আদ্যাশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। নারীর শক্তি সৃজন পালন ও রমণের শক্তি; আবার আবশ্যক হইলে নারীর শক্তিই ধ্বংসের শক্তি। নারীর প্রেমের মধ্য দিয়া এই ধ্বংস ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে কবি গোবিন্দ দাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের এক অতি গুরুতম কথা। নারী খেলার পুতুল নয়, ঘর সাজাইবার জিনিষ নয়। এই নারীর শক্তিতেই সমাজ দেহের হৃদ-যন্ত্রে রক্ত চলাচল করিতেছে। যেখানেই নারী চরিত্রে পরিবর্ত্তন ঘটে সেইখানেই সমাজ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়।

নারীকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে ও ভয় করিবে, কিন্তু কখনই উপেক্ষা করিবে না। নারী উপেক্ষার জিনিষ নয়, কেননা নারী এ সংসারশক্তির প্রতিমূর্ত্তি।

এই অনাদি সংসার-প্রবাহের মূল প্রস্রবণে নারীর শক্তি কার্য্য করিতেছে। আমাদের ঋষি কবি ও দার্শনিকেরা একদিন এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। পুরুষকে

সাক্ষী রাখিয়া এই প্রকৃতির বিবর্ত্তন, শিবকে আশ্রয় করিয়া এই শক্তির প্রকট লীলা,—ইহা নারী চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় চিন্তার একটি বিশেষত্ব। তাই নারীভক্ত কবি গোবিন্দ দাস যখন মুগ্ধ বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া ভাবিতে-ছেন যে

"একি ঈশ্বরের শক্তি অথবা তোমারি"

তখন নারী চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় চিন্তার বিশেষত্বকেই কবি তাঁহার কাব্যের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল ও প্রস্ফুট করিতেছেন। গোবিন্দ দাস শুধু ভাষা বা ভঙ্গীতে নয়, ভাবেও জাতীয় কবি এবিষয়েও কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সহিত গোবিন্দচন্দ্র দাসের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বড়াল কবিও নারীকে খেলার পুতুল বলিয়া বন্দনা করেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন

নারি—

তুমি স্বস্তি-শান্তি দাত্রী অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী
সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী ভবদুখহরা
আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা
মুগুধা, আশ্লেষ-রূপা, বিশ্লেষকাতরা।

গোবিন্দ দাসের চিত্রিত নারী চরিত্রের মধ্যে সর্ব্বদাই এমন একটা তেজের একটা শক্তির প্রাখর্য্য অনুভূত হয় যাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নারী চরিত্রে প্রায়ই লক্ষিত হয় না। ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। তবে একটি বোধ হয় এই যে আমাদের নবীন সাহিত্যিকেরা য়ুরোপীয় আর্টএর অন্ধ অনুকরণ করিতে যাইয়া নারী চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশ হইতে এমন একটা আদর্শ ধার করিয়া আনিতেছেন যে আদর্শের পশ্চাতে আমাদের এই জাতির অতীত কালের একটা ইতিহাস নাই। হইতে পারে বিদেশের এই নারীচরিত্রের নবীন আদর্শের সাম্য বা স্বাধীনতার ভাব আমাদের অনুকরণীয়। কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজ জীবন বা আর্টএর অনুপ্রাণিত নব্য বাংলা সাহিত্যের এই নূতন নারীচরিত্রগুলি অনেক সময় ফুলের সৌরভ, চাঁদের কিরণ, বা মলয়হিল্লোলের মত মনোরম হইলেও বড় 'হাল্কা' বোধ হয়। আশঙ্কা হয় সাহিত্যে এরূপ হাল্কা নারী চরিত্রের আদর্শ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক বা বিধিনির্দ্দিষ্ট গতিকে ক্ষুব্ধ করিবে। কেননা সাহিত্যের উপর অযথা আঘাত সব সময়েই জাতীয় জীবনে শক্তির উদ্বোধন করেনা, ক্ষয় সাধনও করে। এখানে এত কথা বলিবার কারণ এই যে কবি গোবিন্দ দাস, নারী চরিত্র লইয়া ভাল মন্দ উভয়

চিত্রই আঁকিয়াছেন, কেননা সংসারে ভাল মন্দ দুইই আছে আর গোবিন্দ দাস সংসার বা সামাজিক জীবনেরই কবি। কিন্তু তাঁহার কাব্যে নারী চরিত্র হাল্কা নয়, সর্ব্বদাই শক্তির মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত। তাই তিনি দেখাইয়াছেন যে ভাঙ্গিতেও নারী আবার গড়িতেও নারী বড়াল কবিও বলেন "উপচয়ে দশহস্তা অপচয়ে ছিন্নমস্তা।" ইহাই নারী চরিত্র বিশ্লেষণ সম্বন্ধে গোবিন্দ দাসের আরো একটি বিশেষত্ব।

তিনি নারী প্রভৃতিকে তাঁহার সমুদয় মানবীয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার এক বর্ণগন্ধহীন স্বরূপ দেখাইতে প্রয়াস পান নাই। এরূপ শ্রেণীর কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" উল্লেখ যোগ্য। বলা বাহুল্য 'উর্ব্বশী' বাংলার কাব্য সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন।

অনেকে বলেন গোবিন্দ দাসের কবিতায় চিন্তাশীলতা বা দার্শনিক রকমের ভাবুকতা নাই। এ কথার মূল্য অতি কম। তাঁহার দু'একটি কবিতা হইতেই এ কথার অসারতা আমরা প্রতিপন্ন করিব। 'চন্দন' কাব্যে তাঁহার 'প্রতিহিংসা' কবিতাটিতে সমাজের একটি চিরন্তন ব্যাধির বিষয়ে এমন এক তীক্ষ্ণ এবং চিন্তা ও সহানুভূতিপূর্ণ অপক্ষপাত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় যে এরূপ বিষয়ে এরূপ চিন্তাশীলতা আমরা সচরাচর কোন কবির নিকট আশাই করি না।

সমাজ পরিত্যক্তা নারীগণ,—কেহ 'বিধবা মেয়ে' কেহ 'পতিপুত্র ভ্রাতাহীনা' কেহ "কুলের কন্যা।" কিরূপে পাপের পিচ্ছিলপথে সমাজ কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া পরে প্রতারিত হয়, কিরূপে প্রলুব্ধকারী সমাজের নিকট নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া যায়, আবার কিরূপেই বা অসহায়া পতিতা নারীগণ সমাজ পরিত্যক্তা হয়;—তাহার চিত্র বড় মর্ম্মস্পর্শী। এই সব পতিতা রমণীদের সামাজিক জীবনের উপর প্রতিহিংসাও কি ভীষণ!

কুঙ্কুম কাব্যের 'পাপ পুণ্য' কবিতায় শুধু ভাবুকতা নয়—কবি যেরূপ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের উপর সমাজধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন চিন্তাশীল দার্শনিকের মনে স্বতঃই উদয় হয়, উচ্চ নীচ, পাপ পুণ্যভেদকে যেরূপ কাল্পনিক মনে হয়, এবং তাহার ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় সমাজ ধর্ম্ম ও নীতি যেরূপ আক্রান্ত হয়, কবি সে সমস্তই দেখাইয়াছেন। এখানে কবি পাপ পুণ্যে ভেদ করিতেছেন না। জগতের অনন্ত উন্নতি সম্বন্ধে, নিত্যমুক্ত আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন।

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কিসে বা উন্নত হই, কিসে অবনত রই,
আত্মার উন্নতি তবে লোকে কারে কয় ?

আবার বলিতেছেন—

"জড় উপাদান তার, আগেত ছিলনা আর,"

কাজেই

"যাহাতে রচিত বিশ্ব সেকি বিশ্ব নয়"

ইংরেজীতে সৃষ্টি বা ব্রহ্মতত্ত্বের এই ভাবকে Pantheism বলা হয়।

আবার বলিতেছেন—

আত্মার আত্মায় তবে, পূর্ণ আত্মীয়তা সবে
কিসে থাকে পুত্র কন্যা ভেদ সমুদয়
সে আমি অভেদ যদি একই উভয় ?

এই সমস্ত হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে কবি গোবিন্দ দাস শুধু চিন্তাশীল কবিই নন। তাঁহার চিন্তাশীলতা ও সন্দেহ অনেক সময় কত গভীর। জীবনের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের 'শ্মশানে নিশান' কবিতাতে যে ভাবুকতা,—সে দার্শনিকতা, সমস্ত সংসারের এক ভয়াবহ বিরাট পরিণামের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে, তাহা বাংলা কবিতায় আমরা খুব বেশী পাই না। এই কবিতাটির ভাষা ও ভাব কি গভীর!

শ্রাবণের শেষ দিন মেঘে অন্ধকার
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার।
উলঙ্গ এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার!
নয়নে কালাগ্নি ঢালি উন্মত্তা শ্মশানকালী,
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কার!
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা
ভৈরবীর কাল কণ্ঠে মহা শঙ্খ মালা।

তারপর শ্মশানের কি আশ্চর্য্য বর্ণনা—

হেন ঘোর অন্ধকার, এ হেন সময়,
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান!

অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লণ্ডভণ্ড,
এখানে ওখানে পড়ে শয্যা উপাধান।
দু'চারিটি কাণাকড়ি কোথাও কলসী দড়ী
কোথাও বা ছাই ভস্ম অঙ্গার নির্ব্বাণ।
কোথাও মাথার খুল, ছেঁড়া নখ ছেঁড়া চুল
কোথাওবা অস্থিখণ্ড রয়েছে বিতান।
ঘোর স্তব্ধতার শিরে, সে নিস্তব্ধ নদীতীরে,
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান
উড়িতেছে 'পত্ পত্' শ্মশানে নিশান।

তারপর কবি দেখিলেন যে অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায় সেই চিতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—অমল ধবল সৌম্যমূর্ত্তি বিশ্বম্ভর, ধবল অস্থির মালা গলে দিয়া, ধবল বৃক্ষের উপর বিরাজিত,—

ধ্যানগত আত্মা তার, নাহি দেখে ত্রিসংসার
জ্ঞানময় মহামূর্ত্তি স্থির অবিচল।

বিশ্ব বিনাশের জন্ত বিবেকী বৃষকেতু আপনিই স্বহস্তে সেই শ্মশানের নিশান সমুজ্জল করিয়া ধরিয়াছেন। শ্মশানের জয়ভেরী বাজাইয়া ত্রিপুরারী মৃত্যুর ভৈরব গীত গাহিতেছেন—

"গাও মরণের জয়, গাও শ্মশানের জয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান।
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথায় কথা বোঝেনা অজ্ঞান।
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা গর্ব্ব করে তার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান।
লওহে সকলে তুলি, মড়ার মাথার খুলি,
বাজাও বিকট বাদ্য কাঁপাও বিমান।
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথাহ'তে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত-বিজ্ঞান।
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব, বৃথা অভিমান,
গাওহে ভৈরব কণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান।"

কবি রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' এই আখ্যার কবিতাটি আমাদের মনে পড়ে। কবি মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন

অত চুপি চুপি কেন কথা কও—
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরণ।

কবি মৃত্যুর মিলনকেও 'প্রণয়েরি একটা ধরণ' কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কহ মিলনের একি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ?

তারপর রবীন্দ্রনাথও শ্মশানবাসী মহাদেবের কথা এই মৃত্যু প্রসঙ্গে তুলিয়াছেন। এখানে ত্রিলোচন বিবাহে চলিয়াছেন,—সেই বর যাত্রীর "কত মত ছিল আয়োজন"

তাঁর লট পট করে বাঘ ছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটা জাল
ভুজঙ্গ দল তরজে
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান,
ওগো, মরণ হে মোর মরণ!

এও অতি সুন্দর কল্পনা, সুন্দর বর্ণনা।

কিন্তু কবি গোবিন্দ দাস এই মৃত্যু দেবতা শিবের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহাও দেখুন।

"কিবা সেই সৌম্য মূর্ত্তি অমল ধবল,
ধবল বৃষভপর, বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
ধবল অস্থির মালা গলে দলমল।
ধ্যানগত আত্মা তাঁর নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহামূর্ত্তি স্থির অবিচল।
বিশ্ব বিনাশের হেতু বিবেকী সে বৃষকেতু,
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল।

শ্মশানের জয় ভেরী, বাজাইয়া ত্রিপুরারী
ভৈরবে গাহিছে গীত মরণ মঙ্গল।
আতঙ্কে অবনী যেন করে টলমল।"

গোবিন্দ দাসের মৃত্যু-দেবতা শিব, বিবাহের বরযাত্রী নন, কেন না গোবিন্দ দাস মৃত্যুর মিলনকে প্রণয়েরি একটা ধরণ কিনা কখনো জিজ্ঞাসা করেন নাই, বোধ হয় এরূপ সন্দেহও তাহার মনে আসে নাই।

কবি শ্মশানে আসিয়াছেন। শ্মশানে শিব, তাহার সম্মুখে বিবাহ বা প্রণয়ের কোন কথা তাঁহার মনে নাই। তিনি শ্মশানে আসিয়া, দেখিলেন সম্মুখেই "মড়ার মাথার খুলি"। কবি গোবিন্দ দাস বাস্তবকে ছাড়িয়া কল্পনায় উড়িয়া যান না। ইহা তাঁহার কবি-প্রতিভার একটি বিশেষত্ব। তিনি বলিলেন, বেশ্‌ত মড়ার মাথার খুলি গুলিকেও তুলিয়া লও

লওহে সকলে তুলি মড়ার মাথার খুলি,
বাজাও বিকট বাদ্য কাঁপাও বিমান!
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হ'তে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত-বিজ্ঞান।

কবি দেখিলেন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে। সেই 'ভূত-বিজ্ঞান' কবি শ্মশানে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এখানে কবি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাধক। শুধু কি তাই

"তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই
কেন করে বৃথা গর্ব্ব, বৃথা অভিমান।
দেখুক এ শ্মশানের বিজয় নিশান।"

কবি এখানে সংসারের ক্ষণ ভঙ্গুরতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া মোহান্ধ, বৃথা গর্ব্বিত সংসারী জীবকে বলিতেছেন; "শান্ত হও, সংযত হও, ঐ দেখ তোমার গর্ব্বের, তোমার রূপ যৌবন ঐশর্য্য, তোমার বল ও বিদ্যা, ঐ দেখ তার শেষ পরিণাম।"

অনেক দিন আগে "বঙ্গ দর্শনে" কোন সমালোচক কবি রবীন্দ্রনাথের এই 'মরণ' কবিতাটির সহিত স্বামী বিবেকানন্দের "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতাটি তুলনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সংসারে মাধুর্য্যের কবি। যাহা কিছু সুন্দর ও মনোরম ও সুশোভন, রবীন্দ্রনাথ তারি চিত্র আঁকিতেই সিদ্ধহস্ত। কোন ভীষণ বা বিরাটের ধারণা যে তাঁর নাই তাহা নহে,

তবে তাঁহার অনন্ত সাধারণ কবি প্রতিভার স্বাভাবিক গতি সে দিকে নয়। ভীষণকেও তিনি মধুর করিয়া দেখেন। ইহা হয় ত অনেকটা সত্য। কেন না আর এক স্থানে তাঁহার "প্রতীক্ষা" কবিতায় মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়ন-প্রান্তে
এসো বর বেশে,
আমার পরাণ-বধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

স্বামী বিবেকানন্দত সন্ন্যাসী। তাঁহার পক্ষে শ্মশান, শিব, কালী ইহার ধারণা ও অভিব্যক্তি স্বাভাবিক। তিনি হৃদয়কে শ্মশান করিয়া অনায়াসেই বলিতে পারেন যে "তাহাতে নাচুক শ্যামা।" কিন্তু আমাদের কবি গোবিন্দ দাসও ভীষণের কবি, ভাবুকতার কবি। শুধু সৌন্দর্য্যের কবি নহেন। তিনি ভীষণকে ভীষণ ভাবেই দেখিতে পারেন। মৃত্যুকে প্রণয়-দেবতা কল্পনা না করিয়াও শুধু 'মড়ার মাথার খুলি' লইয়াই তাঁহার কবি-প্রতিভা বিকাশ লাভ করিতে পারে। কবি গোবিন্দ দাস ভীষণের ভাব মাধুর্য্যে আরোপ করেন নাই, মাধুর্য্যের ভাবও ভীষণে আরোপ করেন নাই। তিনি যে শ্রেণীর কবি তাহাদের ইহা রীতি নয়। ইহা গোবিন্দ দাসের, রবীন্দ্রনাথ হইতে একটা বিশেষত্ব মাত্র প্রমাণ করিতেছে। ভাল মন্দ ইহার কোন কথাই হইতেছে না।

যাহা হউক আমরা কবি গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার কাব্যের সমস্ত দিক ফুটাইয়া তুলা অসম্ভব। তবে আমার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা আজ এই কবিপ্রতিভার সম্যক্ আলোচনার দিনেও, গোবিন্দদাসের নাম করিলে,—তিনি কি? বাড়ী কোথায়? বয়স কত? কি কি কাব্য লিখিয়াছেন? এখনও কি বাঁচিয়া আছেন কিংবা মরিয়াছেন, ইত্যাদি প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলেন,—তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া বাংলার কাব্য-সাহিত্যে গোবিন্দদাসের কাব্যগুলি একটু আলোচনা করিয়া দেখেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থ হইবে না।

আমরা আজ অতি সামান্ত আলোচনাতেই দেখিতে পাইলাম, যে গোবিন্দ দাস পল্লীর সামাজিক জীবনে যে পৈশাচিক অত্যাচার হয়, তাহার কবি। Crabbe এর মত পল্লী জীবনের নিছকচিত্র আঁকিবার কবি। শুধু পল্লীর সামাজিক জীবনের কবি নহেন, পল্লীবাসিনী সেই শ্যাম কোমলাঙ্গী প্রকৃতিরও কবি। তিনি অন্তকার বাংলা কাব্য-সাহিত্যের স্রোতে গা ভাসান নাই,—য়ুরোপীয় অবনতিশীল আর্টের অযথা অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। প্রেমের কবিতায়, দাম্পত্য প্রেমই তাঁহার কবিতার প্রাণ। অন্তকার কবিদের প্রেমের কবিতায় যেরূপ সত্য কথা প্যাঁচ দিয়া বলার ধরণ হইয়াছে, যেরূপ অস্পষ্ট হা হুতাশের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছে, গোবিন্দদাসে তাহা নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতায় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা কথা মাত্র নাই। গোবিন্দদাস দুঃখের কবি, ভাবুকতার কবি, নারী চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণকারী কবি। তিনি মধুর ও ভীষণ উভয় ভাবের কবি।

তাঁহার স্বদেশ প্রেমও খাঁটি স্বদেশী। কেন না বাংলা সাহিত্যে—বিদেশী স্বদেশ প্রেমের অসার তর্জ্জমা, হৃদয়হীন মেয়েলি কাঁদুনী ও কথার আবর্জ্জনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাও গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব। চুঁচুড়া গত সাহিত্য সম্মিলনে বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র যাহার জন্ম আক্ষেপ করিয়াছেন, সেই 'সত্য কথা পেঁচ দিয়া বলা'র বাহাদুরী বা দোষ গোবিন্দ দাসে আরোপ কর যায় না।

কবির জীবনের সহিত কাব্যের সম্পর্ক, অনেকে বলেন, খুব ঘনিষ্ঠ, আবার অনেকে বলেন, বিশেষ কিছুই নয়। কবি রবীন্দ্র নাথ বলেন, - যে টেনিসনের কাব্য পড়িয়া টেনিসনকে যত বড় মনে হইয়াছিল, তাহার জীবনী পড়িয়া তাহা মনে হয় নাই। পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কালে বাংলা দেশের কাব্য ও অন্তকার অনেক খ্যাতনামা কবির জীবনী পড়িয়াও আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি, আশঙ্কা হয়। কেন না গত চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনীতে বঙ্কিম-দীনবন্ধু-যুগের প্রবীন সাহিত্যরথি অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের গতির যে প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহা বড়ই আশঙ্কা মূলক। আশাপ্রদ ত কিছুতেই নয়।

অক্ষয়চন্দ্র বলেন—"যে আমি বলিতে বাধা বোধ করিতেছি না যে আমরা ক্রমেই অধিকতর ভণ্ড হইতেছি। ধর্ম্মে বা সমাজে ভণ্ডামি বহুদিন প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এখন আমরা রাজনীতিতে ভণ্ড, সাহিত্যে ভণ্ড, ভাষায়

ভণ্ড, লেখার ভণ্ড। সত্য কথা পেঁচ দিয়া না বলিলে আমাদের বাহাদুরিই হয় না।"—তারপর তিনি দেখাইয়াছেন যে এই বাংলা ভাষার উপর বাঙ্গালীর অত্যাচার ১০।১৫ বৎসর কিছু বেশী হইয়াছে—এবং পরিশেষে প্রবীণ সাহিত্যিক এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে—"পল্লীবাসী সাহিত্য-সেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা ভিন্ন"—আমাদের সাহিত্য বা তাহার ঐ সারকুলার রোডের পরিষৎ দেশের কোনই প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারিবে না। অক্ষয়চন্দ্র বলেন ইহা না হইলে বড়বাড়ী, গাড়ী জুড়ি, লাইব্রেরী, চিত্র-সজ্জিত সুপ্রশস্ত দেওয়াল, ও পিছনে রাজা মহারাজা বড় বড় লোক থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভার মত উক্ত পরিষদেরও অধঃপতন হইবে। জানি না এই বৃদ্ধ জ্ঞানী অথবা জ্ঞান-বৃদ্ধ সাহিত্যিকের ইঙ্গিত সাহিত্য-পরিষৎ কি ভাবে লইবেন।

সহরে আমরা এখন কবি-প্রতিভার সম্মান করিতে শিখিয়াছি। জাতীয় জীবনে ইহার স্থায়ী ফল ভবিষ্যত বিচার করিবে। কিন্তু আজ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার প্রাক্কালে যে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীবাসী ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাস অনাহারে রোগে, শোকে, অত্যাচারে ও উপেক্ষায় মৃত্যু-শয্যা শায়ী হইয়া লিখিতেছেন—

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোস্ করি, না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি, ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্—
* * * ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মর্লে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

বাঙাল দেশের কাঙাল কবির এই যে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপোক্তি—ইহার উত্তর, আজ কবি-প্রতিভার বহু সমারোহপূর্ণ সম্বর্দ্ধনার দিনে, এই বঙ্গভঙ্গ রহিত জনিত মহা আনন্দের দিনে,—বাঙালী জাতি বা সাহিত্য পরিষৎ কি ভাবে দিবেন, তাহাই ভাবিবার জন্য, বন্ধুগণ! আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। কবির কাব্য সমালোচনা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। *

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

* এই প্রবন্ধটি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পঠিত হইয়াছিল। গত ১লা চৈত্র উক্ত ভবনে, গোবিন্দ দাসের কাব্য সমালোচনা ও তাঁহার বর্ত্তমান অভাব লাঞ্ছিত দুর্দ্দশা-পীড়িত অবস্থার সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ।*

[জন্ম—১৭ই চৈত্র, ১৭৬২ শক।

দেহত্যাগ ১৮ই ফাল্গুন ১৮৩৩ শক]

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ লোকান্তরিত হইয়াছেন—তাঁহার মর্ত্ত্য-জীবনের অবসান হইয়াছে—জগতে যাহা নশ্বর, তাহা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—আমরা তাহা চিরদিনের জন্য হারাইয়াছি!

কিন্তু তাঁহার সমুন্নত আধ্যাত্ম-জীবন—অক্লান্ত একনিষ্ঠ সকল সাধনা—জগতে যাহা অবিনশ্বর, তাহা এখনও কল্যাণপ্রদ ধ্রুবজ্যোতিঃর ন্যায় আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে—উত্তর কালে আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উত্তর পুরুষগণের নিমিত্ত বিদ্যমান রহিবে। আজ আমরা তাহারই তর্পণ করিবার জন্য এ স্থলে সমবেত হইয়াছি।

এই যে বহির্বিচ্ছেদের দারুণ বেদনা—এই যে অন্তর্মিলনের নিবিড় আনন্দ, একাধারে অশ্রু ও হাসি, দুঃখ ও সুখ, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যুগপৎ উচ্ছ্বসিত উঠুক্! আজ আমরা, আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি অমর-শ্রী উপাধ্যায়ের উদ্দেশে সর্ব্ব মূলাধার বিশ্বদেবতার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

দীপালী উৎসবের সময় দেখিতে পাই, সেই হৈমন্তিক অমারজনীর কৃষ্ণ-বসনা সন্ধ্যায় স্তরে স্তরে সুসজ্জিত মৃন্ময় দীপাবলী গৃহ-মাতৃগণের মঙ্গল কর প্রভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে—তাঁহাদিগের হস্তস্থিত এক একটি জ্যোতিষ্মাণ দীপ শিখা শত শত হীনপ্রভ দীপপুঞ্জকে প্রদীপ্ত প্রভান্বিত করিয়া তুলে—একের সংস্পর্শে শতের মধ্যে চেতনা সঞ্চার হয়।

তদ্রূপ আমরা জগতের আবহমান কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে লক্ষ্য করি, পৃথিবীতে যখনই কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার অন্তরের স্বভাবসিদ্ধ পুণ্য বিভা কতকগুলি সুপ্ত হৃদয়কে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আপনার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবনায় ও তৎকর্ত্তৃত্বে একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা দরিদ্র কবিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাপতি মহোদয়ের নামে পাঠাইতে পারেন। বীভূ, সং।

* চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের স্মৃতিসভায় পঠিত।

অন্যান্য দিক ছাড়িয়া কেবল মাত্র ধর্ম্ম-রাজ্যের ঐতিহাসিক যুগের পরিচয় লইলেও দেখিতে পাই, মহাত্মা বুদ্ধ দেব, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মোহাম্মদ, কিংবা আমাদের বাঙ্গালার শ্রীশ্রীচৈতন্য বিশ্ব-নাট্য-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহাদিগের ঐশীশক্তিসম্পন্ন অপূর্ব্ব হৃদয়ালোকে অপর কয়েকটী বিশেষ হৃদয়কে আলোকিত অনুপ্রাণিত ও স্বভাবাপন্ন করিয়া আপনাদের অন্তরঙ্গ সাথী রূপে জগতে মহাজন পদবীতে উন্নীত করিয়া দিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সকল বিরাট কায়া পুণ্য তোয়া মন্দাকিনী ধারায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া মহাসিন্ধু সঙ্গমের সুদুর্লভ সৌভাগ্য গৌরব লাভ করিবার জন্য পরমানন্দে ছুটিয়াছিল।

যুগে যুগে জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার নিমিত্ত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। করুণাময়ী জগজ্জননী তাঁহার এই সমুদয় সুচিহ্নিত প্রিয় সন্তানের দ্বারা জগজ্জননীর শ্রীকর ধৃত এই এক একটী প্রোজ্জল স্বর্ণ প্রদীপ দ্বারা যেন অপর কয়েকটী সুসজ্জিত দীপাবলী প্রজ্জলিত করিয়া দিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন "আমি তোমাদের প্রতিষ্ঠা করিলাম; তোমরা এক্ষণে স্বপ্রতিষ্ঠ হও দিব্যালোকে বিকীর্ণ করিয়া দশদিক উদ্ভাসিত কর।"

আমাদের উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বিশ্ব-মাতা কর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠ এমনই হিরন্ময় দীপ। মহাত্মাগণ যদি পরিষদ নক্ষত্র মণ্ডলী পরিবেষ্টিত সুধাস্থলী সুধাকর হয়েন, তবে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ ইহার অন্যতর উজ্জলতম নক্ষত্র। আমরা যদি মহাপুরুষগণকে অন্তহীন সহস্রাংশু কল্পনা করি, তবে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যকান্ত মণি;—ভাস্বর ভাস্করের প্রখর রশ্মিমালা অন্তরে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাতে ছিল।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে বিধান-বার্ত্তা যে সমন্বয় কাহিনী ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণের আহ্বান বাণী যে সকল বিশিষ্ট প্রাণে সাড়া পাইয়াছিল. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাঁহাদেরই একজন। জগতের চারিটী মহাধর্ম্ম—হিন্দু. বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইস্লামধর্ম্ম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পবিত্র হৃদয় সরোজে যুগপৎ আসন পাতিয়াছিল—এই চারিটি মহাধর্ম্মের মহান্ উদার সত্য সমূহ তাঁহার প্রস্ফুটিত চিত্ত-কমলে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল; সেই অমূর্ত্ত মূর্ত্তিগুলির অর্চ্চনা করিবার করিবার জন্য তিনি একদল ঋত্বিক বরণ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র শুধু এই ঋত্বিক বরণ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—তিনি আপন বিভূতিগুণে তাঁহাদিগকে সুযোগ্য পুজারির উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া

তুলিয়াছিলেন—জননীর দীপ ধরণীর দীপকে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের প্রতি হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্র-মন্থন করিয়া অমৃত সঙ্কলনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এই গুরুতর কার্য্য আমরণ কি ভাবে সসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জগদ্ব্যাপী খ্যাতি তাহার সুষ্ঠু পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার প্রকৃত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অপর তিনটী মহাধর্ম্ম অনুশীলন সূত্রে যে তিনটী মহাপ্রাণ আমাদিগকে দান করিয়াছিলেন—তিনি যাঁহাদিগকে আপন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া অপর মহাধর্ম্মত্রয়ের বিজয়-বৈজয়ন্ত বহনের ভার দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আজ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের সহিত অজ্ঞেয় পুরের অধিবাসী। ইহারা সকলে ইহলোকে অচ্ছেদ্য প্রেম-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, পরলোকেও তাঁহাদের সেই পবিত্র অধ্যাত্ম বন্ধন সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমি এ স্থলে শ্রমণ সাধু অঘোরনাথ, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র এবং মৌলবী গিরীশচন্দ্র মহোদয়গণকে নির্দ্দেশ করিতেছি। ইহারা যথাক্রমে বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্রে যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। ইঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আমাদিগের মাতৃভাষায় মহার্হ অর্ঘ্য আহরণ করিয়া তাহার গৌরবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এজন্য এ শুভ সুযোগে, মাতৃভাষার পক্ষ হইতে—"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" পক্ষ হইতে, মাতৃভাষার অযোগ্য সেবক আমি, তাঁহাদের সকলকে এবং যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি, বিশেষভাবে সেই উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দকে ভক্তি নম্র হৃদয়ে অভিনন্দন করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে একস্থলে লিখিয়াছি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রাণের আহ্বান গৌরগোবিন্দের প্রাণে পশিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, মায়াপাশবদ্ধ কুরঙ্গ শিশুকে সেই সুমধুর স্বর্গীয়-বংশীধ্বনি বিমুক্ত স্বাধীন করিয়া দিয়াছিল। গৌরগোবিন্দ পুলিশের কর্ম্মচারী ছিলেন—যে পুলিশের নাম করিতে আজ আটকোটী বাঙ্গালীর চিত্তে অতর্কিতে বীভৎসরসের সঞ্চার হয়, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ প্রথম জীবনে কিছুকাল সেই পুলিশের কর্ম্মচারী

ছিলেন; ভক্ত কেশব তাঁহাকে তাঁহাকে বিশ্বজননীর ভক্ত পূজারি সাজাইয়াছিলেন।

গুরু শিষ্যের সম্পর্ক যেখানে প্রভু ভৃত্যের ন্যায়—যেখানে গুরু তাঁহার উচ্চ সিংহাসন হইতে নামিয়া শিষ্যকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন না করেন, সেখানে দুর্ভাগা শিষ্যের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে বটে; কিন্তু তাহার প্রকৃত প্রেমলাভের ভরসা সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়ায়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র গৌরগোবিন্দের দীক্ষা ও শিক্ষা দাতা হইয়াও তাঁহাকে প্রিয়তম সুহৃদ্রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মধ্যে আচার্য্যের ভক্তি প্রীতি প্রেম বৈরাগ্য যোগ ধ্যান প্রভৃতি মহৎ গুণরাশি বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি এ স্বর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করেন নাই এবং আমাদিগকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ঘনিষ্টতররূপে প্রাপ্ত হইয়া আরও ঘনিষ্টতররূপে তাঁহাকে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বিরাটগ্রন্থ "আচার্য্য জীবন।" এই পুস্তকের প্রতি অধ্যায়ে তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন চরিত ব্যতীত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের রচিত শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" "গীতা সমন্বয় ভাষ্য" "বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য" "গীতা প্রপূর্ত্তি" 'বক্তৃতা" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বহুমূল্যবান পুস্তক আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুকুট-মণি-সদৃশ মহামনস্বীসমাজে তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থ একবাক্যে অতি উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। তিনি শুধু সুলেখক নহেন, প্রখ্যাত নামা সুবক্তাও ছিলেন;—তাঁহার "বক্তৃতা" নামক পুস্তকখানি তাহারই আভাষ দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি উচ্চ শ্রেণীর পাক্ষিক পত্র প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই "ধর্ম্মতত্ত্ব"খানি ধর্ম্মপিপাসুগণের নিকটে কত মধুর প্রিয়সামগ্রী ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখককে অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমি শুনিয়াছি আমার পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব যখন স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি "ধর্ম্মতত্ত্বের" গ্রাহক হয়েন—আজ পর্য্যন্ত সমভাবে তাহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন। যে সাময়িক পত্রখানি এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে সমভাবে সমাদৃত হইতে

পারে,—যে সাময়িক পত্রখানি একজন অপরিণত বয়স্ক বালককে ধীরে ধীরে পরিণত বয়সের সীমায় আনয়নে সাহায্য করিতে পারে, তাহার অন্তর্গঠনী কার্য্যকারিতা শক্তি কত গভীর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তম গৌরগোবিন্দকে "উপাধ্যায়" অভিধায় ভূষিত করিয়াছিলেন। গৌরগোবিন্দের অগ্রগামী আচার্য্য-দত্ত এই "উপাধ্যায়" সংজ্ঞা তাঁহার ধর্ম্মে কর্ম্মে বাক্যে চিন্তায় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল, একথা এক্ষণে আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের সমগ্র গ্রন্থাবলী আলোচনা করিবার মত অবসর ও ক্ষমতা আমার নাই এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রও তাহার উপযোগী নহে। সুতরাং সে ভার সুযোগ্যতম সতীর্থগণের হস্তে সমর্পণ করিতেছি—আশা আছে, তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে সে আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

কিন্তু উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের প্রণীত যে পুস্তক খানি সর্ব্ব প্রথমে পাঠ করিয়া আমি বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম—একখানি নিষ্কলঙ্ক দেব চরিত্রের সন্ধান পাইয়া গভীর তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিলে আমার অদ্যকার কর্ত্তব্য যেন কতকটা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। সত্য বলিতে কি এই গ্রন্থখানিই শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের প্রতি সর্ব্ব প্রথমে আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

কোন সমাজের বা জাতির যখন শোচনীয় অধঃপতন ঘটে, তখন সে তাহার আরাধ্য দেবতা বা দেবকুলকেও অধঃপাতিত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। তাহার দূষিত মানস মহীয়ান শুদ্ধসত্বার বিরাট ধারণা অনুধাবন করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ হইয়া পড়ে—সে খর্ব্বাকায় বামনত্ব লাভ করিয়া আর ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ-বিহারী শশাঙ্ককে স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা রাখিতে পারে না—তাই সে তাহাকে নিম্নে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া নিজের হাতে নিজের মনের মত গড়িয়া লইয়া বৃথা আস্ফালন করিবার প্রয়াস পায়। এক কথায়, সে উপাস্য দেব-চরিত্রে আপন-চরিত্র প্রতিফলিত করে!

আমরা অবগত আছি আমাদের পূজ্যতম পিতৃ পুরুষগণ—স্বভাব-সরল বৈদিক আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতির উপাসক ছিলেন—তাঁহারা বিশ্ব-প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে ও নিরুপম মাধুর্য্যে মুগ্ধ আত্মহারা হইয়া তাহারই বন্দনা-গানে—যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন-তৃষ্ণা মিটাইতেন। প্রকৃতির সেই প্রিয় সন্তানেরা জগতের সর্ব্ব আদিম শাস্ত্র-গ্রন্থ ঋগ্বেদে" পলকহীন দেব-নেত্র সদৃশ

সহস্র নক্ষত্র পরিশোভিত যে 'দ্যৌঃ" বা আকাশকে "সহস্রাক্ষ ইন্দ্র" বলিয়া বিস্ময়-বিহ্বল অন্তরে ভক্তির প্রসূনাঞ্জলি প্রদান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, সেই আর্য্যগণ পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র নয়ন লাভের পরবর্ত্তী কাহিনীর নৈতিকতা আমাদের পক্ষে একেবারেই অবোধ্য।

সুমহৎ চরিত্রের বা আদর্শের নিকটে পৌঁছাইতে না পারিয়া—তাহার অলৌকিক গৌরব অনুভব করিবার সামর্থ্য হারাইয়া দুর্ব্বল মানব যখন সে শক্তি পুনর্লাভের জন্য সাধনা বা তপস্যা না করিয়া, তাহার মহত্ব আপনার মনোমত খর্ব্ব ও কলঙ্কিত করে, তখন সে মনুষ্যত্ব হইতে স্খলিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন তীর্থ-যাত্রায় অসমর্থ হইয়া আমাদের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট সমাজ সে পরিচয় পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করিয়াছেন।

ভারতে বা জগতে যিনি নবযুগের প্রবর্ত্তক, বেদ উপনিষদ্ সাংখ্য দর্শন পুরাণ প্রভৃতি আর্য্য শাস্ত্র সমূহের নিগূঢ় রহস্য সকল যাঁহার উদার অন্তরে নির্য্যাসিত ও সমঞ্জসীভূত, যিনি ত্রিলোক বিজয়ী মহাবীর অর্জ্জুনের অভিন্ন হৃদয় সখা ও আচার্য্য, যিনি সুহৃদ-ভ্রান্তি-অপনোদন ছলে বিশাল বিশ্বজগতের অশেষ কল্যাণপ্রদ সর্ব্ব ধর্ম্ম-সার নিষ্কামকর্ম্মের—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা, সেই ভুবনাদর্শ মহা মহীয়ান পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া অসংযতচেতা ব্যক্তিগণ কি প্রকার মরীচিকা-লীলার ঘৃণিত অভিনয় করিয়াছেন, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। এই অকথ্য অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফল এখনও হিন্দুসমাজ মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করিতেছে। এ কঠোর পাপের কঠোরতম প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হইবে, কে জানে?

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ যুগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এই সমুদায় গুরুতর অপপ্রবাদ বা অপবাদ আশ্চর্য্য যুক্তি-তর্ক সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরাকরণ করিয়া নীরদাবৃত কৃষ্ণ-তপনের নিবিড় ঘনাবগুণ্ঠন সরাইয়া "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" শীর্ষক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এই মূল্যবান গ্রন্থখানিই পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের উপস্থিত অবকাশ না থাকায়—শুধু স্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়া লিখিতে হইতেছে, আমার যতদূর স্মরণ হয়, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" পুস্তকখানি অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র" কিংবা "নবীন ভারত-স্রষ্টা" অমর কবি নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী-মহাকাব্য "রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের" পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলির

মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, সে বিচারে এ ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে—শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে নহে, বিশ্ব-সাহিত্যে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের গ্রন্থাবলীই কৃষ্ণ-কলঙ্ক-ভঞ্জনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। আমাদের শুধু এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের প্রতিভা, মৌলিক গবেষণা ও বিশ্লেষণী শক্তি তাঁহাকে বরণীয় সমাজে বরণীয় করিবার পক্ষে কিছুমাত্র অপ্রচুর ছিল না।

"গীতার" মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের এববিধ অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহাকে উত্তরকালে "গীতা সমন্বয় ভাষ্য" এবং "গীতাপ্রপূর্ত্তি" রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিয়া লইতে পারি। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচিত তাঁহার "গীতা সমন্বয় ভাষ্য" খানি বিশ্ব-বিখ্যাত, আমি বহুজন সম্পাদিত গীতা সন্দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এক শ্রীমদ্ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর "গীতার্থ-সন্দিপনী" নাম্নী ব্যাখ্যা যুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যতীত এমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুসম্পাদিত গীতা এ পর্য্যন্ত আর পাঠ করি নাই।*

কেশব-নিষ্ঠ গৌরগোবিন্দ যে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের নির্ম্মল গৌরব অনুভব করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মূলেই যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রাণদা-শক্তি বিদ্যমান, তিনি যে শুধু উপলক্ষ মাত্র, গুরুভক্ত বিনয়ী গৌর-গোবিন্দ এই আত্মম্ভরিতা:—এই আত্ম সর্ব্বস্বতার যুগেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে তিল মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই! তিনি "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" পুস্তকের "অবতরণিকায়" এক স্থানে লিখিয়াছেন:—

"বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবন যে আলোকে পঠিত হইয়াছে, সে আলোক একটি জীবন হইতে সমুত্থিত। যদি সে জীবন সম্মুখে প্রকাশ না পাইত, জীবনলেখকের সাধ্য ছিল না যে, এরূপে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত সামঞ্জস্যের ব্যাপার জন সমাজকে কখন জ্ঞাপন করেন। * * * এই শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন যখন শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের নির্দ্দোষিতার কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর হয়। আশ্চর্য্য এই, তাহার বলিবার পূর্ব্বে লেখক এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে এ সকল প্রমাণ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই।"

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ এই কেশব নিষ্ঠামূলক ভূমিকায় যে কারণটী চিন্তা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা অদ্য প্রবন্ধারম্ভেই বুঝিবার

* স্বর্গীয় দামোদর বাবুর গীতার কথা উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। বীর, সং

চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি—লিখিয়াছি, "জননীর দীপ ধরণীর দীপকে প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছিল।" এতক্ষণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইল, এ কথা বৃথা কবি কল্পনা নহে—ইহার অন্তরে ধ্রুব সত্য নিহিত রহিয়াছে।

উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দের ব্যক্তিগত চরিত্রে কেশব নিষ্ঠার আর একটী জলন্ত নিদর্শন আমরা লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পবিত্র দেহাবসানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "শ্রীদরবারে" যখন প্রবল শোকোচ্ছ্বাসের ভিতরেও আত্ম-প্রতিষ্ঠা বা আত্ম-প্রাধান্ত স্থাপনকল্পে দুর্জ্জয় রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, তখন শোকাহত গৌর-গোবিন্দ তাঁহার প্রিয় আচার্য্যদেবের সহিত অধ্যাত্ম-যোগযুক্ত হইয়া বিশেষ ব্রতাবলম্বনে ব্রহ্মানন্দের "কমল-কুটীর" সুদীর্ঘ বৎসরেক-কাল শান্তি-সমাহিত-চিত্তে বসবাস করিয়াছিলেন। বাহিরের তাণ্ডব-কলরব তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই—প্রাণাধিক সন্তানের উৎকট রোগ-যন্ত্রণাও তাঁহাকে দিনেকের জন্য বারেকের নিমিত্ত তাহার শয্যাপার্শ্বে আনিতে সক্ষম হয় নাই! নিষ্ঠুর সংসারের সর্ব্বপ্রকার কোলাহল হইতে দূরে—অতি দূরে কেশব-জননী কেশব-ভক্তকে সেই ভক্ত-সঙ্গ-পবিত্র "যোগ-গুহায়" কি অপূর্ব্ব ধ্যানামৃত-আনন্দ-মগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, মায়া-মুগ্ধ সংসারীজীব তাহার কি বুঝিবে?

যিনি একাধারে এমন জ্ঞানী, ভক্ত, বিশ্বাসী, দার্শনিক, প্রেমিক ও উদাসী, তাঁহার নিকটে ক্ষুদ্রও যে উপেক্ষিত হইত না, একবার আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার নিরুপম স্নেহশীলতার নিদর্শন স্বরূপও তাহা এ স্থলে উল্লেখিত হইতে পারে।

আমার বাল্যকালে রচিত "অঞ্জলি" নামক একখানা গীতিকাব্য তাঁহাকে পাঠাইলে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"মাধুর্য্য ও সুকুমার গুণে "অঞ্জলি" আদৃত হইবার যোগ্য। "সুকুমার তরৈ বৈতদা রোহতি সতা সুধম্।" দণ্ডীর এ বাক্য "অঞ্জলি" সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহার যে অংশে ভগবদ্ভক্তি গীত হইয়াছে, উহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক। হাফেজের প্রেমোন্মাদের অনুসরণ করিতে পারিলে "অঞ্জলি" প্রণেতা ভগবৎ কৃপায় অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এ আশা কিছু দুরাশা নহে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা,
আশ্বিন ১৩১৯।

উদ্বোধন।

আবার শারদী প্রভাতের নির্মেঘ আকাশ পীতরৌদ্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের উৎসব বসিয়া গিয়াছে, শিশিরমাখা শেফালি ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, আবার আনন্দময়ীর প্রতীক্ষায় নিখিলবিশ্ব ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আবার শ্যামল-শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্রে, কাসপুষ্পধবলিত প্রান্তরে বিশ্বমানবের মানসদুহিতা কল্যাণময়ীর প্রতীক্ষায় মৌন মহাযোগী মর্ত্ত্যহিমাচল ধ্যান-সমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন; বিহগের কূজনরোলে তটিনীর কলোচ্ছ্বাসে, বাত্যান্দোলিত পত্র-মর্ম্মরে মেনকার মাতৃ-হৃদয় ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব মনের একটি চিরন্তন আত্মীয়তা আছে। এই আত্মীয়তার সূত্রটুকু যাহাতে ছিন্ন হইয়া না যায়, সেজন্য সকল দেশে ও সকল সমাজে কতকগুলি করিয়া ব্যবস্থা আছে, শারদীয় উৎসব এই প্রকারের একটি ব্যবস্থা। ইহার সহিত কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, আজ দম্ভ আসিয়া আমাদিগকে এই উৎসবের মর্ম্ম হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে যেন অক্ষম করিয়া না ফেলে। শরতের বাহ্যপ্রকৃতি মানব মনে স্বভাবতঃ যে ভাব-গুলি জাগাইয়া দেয়, আজ হৃদয় মধ্যে সেই ভাবগুলির বিশেষভাবে উদ্বোধন করিতে হইবে।

বিশ্বব্যাপারের মধ্যে যাহারা আপনাদিগেরই কর্তৃত্ব ও বিজয় দর্শন করিয়াছে, তাহারা এই মহাপূজার তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। পূর্ব্বে দেবতাদিগের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবতারাই জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিজয়

কাহার, তাহা দেবতারা সকলে বুঝিতে পারেন নাই। তাই অগ্নি ভাবিলেন, আমি অগ্নি, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই আমি দগ্ধ করিতে পারি, সুতরাং এই বিজয়ের গৌরব আমারই প্রাপ্য। বায়ু ভাবিলেন, আমি বায়ু, আমি সমস্তই উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি, সুতরাং এই বিজয়ের গৌরব আমারই প্রাপ্য। এই প্রকারে যখন অহঙ্কারে মূঢ় হইলেন. তখন অগ্নিদেব একটি সামান্য তৃণখণ্ডকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না, পবনদেব একটি সামান্য তৃণখণ্ডকে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হওয়ায় অগ্নি ও বায়ু যাঁহার সাহায্যে দেবতারা জয়লাভ করিয়াছিলেন সেই বরণীয় পুরুষকে চিনিতে পারেন নাই। তখন দেবতারা তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র সেই আকাশেই স্ত্রীরূপা অতিশয় সৌন্দর্যশালিনী হৈমবতী উমাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ পূজনীয় পুরুষটি কে?"

ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী উমাদেবী দেবতাদের এই বিজয় লাভের যাহা রহস্য তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ইন্দ্রের নিকট সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইল বলিয়াই ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা হইলেন। দেবশক্তির বিজয় লাভের রহস্য নির্ণয় করিতে যাইয়াই এই হৈমবতী উমার প্রথম উদ্বোধন হইয়াছিল। তাহার পর কতবার প্রয়োজন হইয়াছে, কতবার এই মহাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছে। এই প্রাচীন জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই পবিত্র বিবরণ অমর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আজ আবার সেই আগমনীর মহাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে। আবার তাঁহার উদ্বোধন!

কিন্তু আজ আমাদের ইন্দ্র কৈ? কে আজ হৈমবতীর পরিচয় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিবে? আজ দেখিতেছি, চারিদিকে অগ্নি ও বায়ু আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। নিজ নিজ যশোগীতি দেশ দেশান্তরে গান করাইবার কি তীব্র প্রতিযোগীতা, কি দারুণ পরিশ্রম! আজ কোথায় সে দিব্য পুরুষ, যিনি আসিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন যে এই সমস্ত অগ্নি ও বায়ু একটি সামান্য তৃণখণ্ডকেও পরিবর্ত্তিত করিতে অক্ষম!

ইহাই এই উদ্বোধনের মূলভাব। এই মূলভাব হইতে যদি এই প্রাচীন জাতি বিচ্যুত হয় তাহা হইলে বৎসর বৎসর শূন্য আড়ম্বরের ঢক্কা নিনাদে কর্ণ বধির করিয়া লাভ কি? এই মহাশক্তির উদ্বোধনে ও এই মহাপূজায় প্রেম ও ত্যাগমন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে। এই মন্ত্রেই এই জাতির বিজয়লাভের বীজ নিহিত আছে। আজ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে

হইবে যে মানুষ ঘটনার দাস নহে, ইন্দ্রিয়-সেবার মধ্যে বসিয়া অহঙ্কারের দুঃস্বপ্ন দর্শন করাই মানবজীবনের চরম তত্ত্ব নহে, জীবনের এই কয়েক দিনের জন্য কোনও প্রকারে স্বচ্ছন্দতা অর্জ্জন করাই জীবনের লক্ষ্য নহে। মানব অমৃ-তের পুত্র,—আনন্দময়ীর সন্তান, এই জীবন বৃহৎ জীবনের একটা দিন মাত্র, পূর্ব্বে কত দিবা, কত রজনী চলিয়া গিয়াছে, এখনও পুরোদেশে কত দিবা, কত রজনী বর্ত্তমান। মানব সমগ্র বিশ্বের একটি সচেতন অঙ্গ, এই ভাবে আজ জীবনকে অনুভব করিতে হইবে, এই অনুভূতির মধ্যেই দেবীর প্রথম উদ্বোধন!

এই বিশ্ব যখন কারণ সমুদ্রে মগ্ন ছিল তখন ব্রহ্মা এই ভাবের দ্বারাই মহা-মায়ার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। প্রজাপতিগণের তপস্যা এই ভাবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। আবার সেই উদ্বোধনের প্রয়োজন—সেই বিরাট ও বিশ্বজনীন ভাবের দ্বারা আজ আবার মহাকালীরূপা বিশ্বেশ্বরীর উদ্বোধন করিতে হইবে।

আজ মিলন প্রয়োজন। প্রফুল্ল শেফালি-পুষ্প উষাকালেই বৃক্ষশাখার উচ্চ-বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ধরিত্রীর অঙ্কে আসিয়া ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইতেছে, আমাদিগকেও আজ নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের উচ্চাসন হইতে নিম্নে অব-তরণ করিয়া প্রেম ও আনন্দের সহিত সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। নির্ম্মল জলাশয়ের বক্ষে আজ নীল গগনের কোমল কান্তি প্রতিবিম্বিত, কাস-পুষ্পের শুভ্রহাসিতে প্রান্তর ভরিয়া গিয়াছে, আজ আমাদেরও হৃদয় সঙ্কোচহীন সরল হাসিতে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক, প্রতি হৃদয়ের সুখ দুঃখ প্রতি হৃদয়ে প্রতি-বিম্বিত হউক। আজ সকলেই আপনার হউক, আজ শরতের স্বর্ণবর্ণ বালার্ক-কিরণের রথে আরোহণ করিয়া মহামিলনের বার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তে ঘোষিত হউক। আজ ধনীর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হউক, আজ আমাদের সম্বৎসরের সঞ্চয় দেশমাতৃ-কার পূজার জন্য ব্যয়িত হউক। প্রবাসী বৎসরের পর নব নব দেশের কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন, গৃহে গৃহে আত্মীয় সম্মিলনী, বাঙ্গালার 'ভাইবোন' আজ আনন্দ উৎসবে মিলিত, আজ স্বার্থনিষ্ঠ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলি দিয়া, আমাদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিকে একত্রে মিলিত করিতে হইবে।

পূর্ব্ব কল্পে এই প্রকারেই দেবশক্তির মিলন হইয়াছিল—তাহাতেই অশুভ-নাশিনী মঙ্গলময়ী মহালক্ষ্মী স্বরূপিনী মহাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল। সে দিনের সেই পুণ্যকথা আজ পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে পঠিত হইতেছে—সে কথা কি আজ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা সজীব ভাবের প্রবল তরঙ্গ জাগাইবে না? যদি তাহা না জাগায় তবে আমাদের সমস্ত উদ্যোগই বিফল হইবে।

সমস্ত দেবগণের দেহজাত অতুলনীয় তেজ একত্র মিলিত হইয়া রমণীমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল, নারীমূর্ত্তি সমাজের স্থিতি শক্তি ও মঙ্গল শক্তি, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ ধন দিয়া এই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। আজ আবার সেই দেবীর পূজা! আজ আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ ধন উপহার দিয়া দেবীর পূজা করিতে হইবে। পূজায় কৃপণতা নাই, পূজার অধিকারী সকলেই, যাঁহার যাহা আছে, তাহাই দিয়া এই মহামায়ার পূজা করিতে হইবে। জ্ঞানীর জ্ঞান দেশমাতৃকার চরণাভিমুখে ধাবিত হউক,—দেশের অজ্ঞান ও অশিক্ষিত জনশ্রেণী জ্ঞানালোকে ধন্য ও কৃতার্থ হউক। ধনীর ধন ভাণ্ডার দেশমাতৃকার চরণাভিমুখে ধাবিত হউক, দেশের অনশনক্লিষ্ট, পিপাসার্ত্ত ও গৃহহীন নরনারী-কুলের উদরান্নের ও পানীয় জলের ব্যবস্থা হউক, প্রেমিকের প্রেম জাহ্নবীর মত সহস্র ধারায় দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হউক, আমাদের দুঃখগ্লানি ও সন্তাপ তাহাতে ধৌত হইয়া ভাসিয়া যাউক, এই ত তাঁহার পূজা। এই প্রকারে যদি আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠধন দিতে পারি, তবেই পূজা হইবে, নতুবা শূন্য আড়ম্বরে অহঙ্কার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই।

'মোহান্ধকারময়' 'মমত্বগর্ত্ত' হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নিখিল বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সকল জগতের পাপনাশের জন্য এই যে আমাদের বাৎসরিক উৎসব ইহা সফল হউক,

> "প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তি হারিণি
> ত্রৈলোক্যবাসীনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"

আজ এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আমরা সকলে সমবেত ভাবে যদি আহ্বান করিতে পারি তাহা হইলে তিনি আসিবেন। শান্তিরূপে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। চারিদিকে দারুণ অশান্তি দাবানলের মত জ্বলিতেছে, দুঃস্থ নরনারীকুল শশব্যস্তভাবে দিগদিগন্তে ভ্রাম্যমান, গৃহে অশান্তি, সমাজে অশান্তি, পরস্পরের ব্যবহারে অশান্তি ইহা দূরীভূত হইবে; ঐ শরতের প্রস্ফুটিত শতদলের মত গৃহে গৃহে প্রতি নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। তিনি শ্রদ্ধারূপে আসিবেন, এই উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত যুগ, ভক্তি ও সম্ভ্রমহীন—এ যুগের অবসান হইবে, আবার পিতাপুত্রের ব্যবহারে, গুরু শিষ্য, স্বামী স্ত্রী ও ভ্রাতা ভগ্নির ব্যবহারে সেই শ্রদ্ধার সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, গুরুতে শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া আসিবে, আবার আমরা ধন্য হইব।

এই বিস্মৃতির যুগে আমরা সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি, পরের কথায় মুগ্ধ হইয়া

আমাদের অতীত সাধনার সহিত একেবারে সম্বন্ধহীন হইয়াছি—তাই আমরা এত দুর্ব্বল ও এত অসহায়, তাই পদে পদে পদস্খলন হইতেছে। তিনি স্মৃতি-রূপে আসিলে আমাদের সেই গৌরবময় অতীত আবার জাগিয়া উঠিবে, আবার বশিষ্ঠের নিষ্ঠা, বিশ্বামিত্রের তপোবল, জনকের নিষ্কাম কর্ম্ম, বেদব্যাসের প্রতিভা, বুদ্ধের ত্যাগ, চৈতন্যের প্রেম, সমস্তই আমাদের নিজস্ব হইবে,—স্মৃতি-রূপে তিনি আসিবেন। ইহাই পুজার ভাব, এই ভাব আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

"আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥"

ভাগবত ধর্ম্ম।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মমতের বিশেষত্ব কি তাহা সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতধর্ম্মের প্রধান কথা এই যে এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন তাঁহারা ঐহিক সুখ সুবিধা, বা মৃত্যুর পরে স্বর্গাদির প্রত্যাশী নহেন। এমন কি মোক্ষের আকাঙ্খাও তাঁহাদের নাই। ঈশ্বরের আরাধনা করাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও একমাত্র সফলতা। কেহ কেহ রাজ্যের জন্য, ঐশ্বর্য্যের জন্য, স্বর্গের জন্য, বা মোক্ষের জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এই সমস্ত সাধকের নিকট ঈশ্বর লক্ষ্য নহেন উপলক্ষ্য মাত্র, উদ্দেশ্য নহেন উপায় মাত্র। ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য বা উপায় বিবেচনায় যে আরাধনা তাহা ভাগবত ধর্ম্ম নহে।

যাঁহারা ঈশ্বরকে উপায় বা উপলক্ষ্য বলিয়া তাঁহার আরাধনা করেন তাঁহারা প্রধানতঃ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাবের বা বহিরঙ্গ ভাবের সহিতই পরিচিত। কিন্তু ইহা ছাড়া ঈশ্বরের আর একটি ভাব আছে, তাহার নাম মাধুর্য্য। ঈশ্বর কেবল যে অনন্ত বিশ্বের আশ্রয় রূপে, প্রকাশক রূপে আছেন মাত্র তাহা নহে, তিনি যে কেবলমাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন লয় নিজের অনির্ব্ব-চনীয় শক্তিতে প্রতিমুহূর্ত্ত সাধন করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার মধ্যে এক অনির্ব্বাচ্য চিন্ময় আনন্দ আছে। তিনি রসস্বরূপ, তিনি অতীব মধুর। বেদ বলিয়াছেন তিনি নিখিল বিশ্বের মধু, আরও বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা সর্ব্বানন্দী ভবতি।" তিনি রসস্বরূপ, জগতে এই যে আনন্দের

মেলা ও প্রেমের খেলা বসিয়াছে, এ কেবল তাঁহারই সেই চিন্ময় আনন্দের সাহায্যে। ঈশ্বরের এই আনন্দময় ভাবের উপলব্ধিই ভাগবতের বৃন্দাবন, তিনি রসস্বরূপ, এই শ্রুতিমন্ত্রই সাধন-বারিসিঞ্চনে রাসলীলারূপ বিচিত্র বৃক্ষে পরিণত। ঈশ্বরের আনন্দ ও রস অনুভব করিবার প্রয়াসই ভাগবতধর্ম্মের সাধনা। এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যতত্ত্ব একটি সাধারণ উদাহরণের দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

রাজা হাতিতে চড়িয়া খুব সমারোহ পূর্ব্বক রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে রথ, অশ্ব, পদাতিক সারি সারি চলিয়াছে। দৌবারিকগণ আগে আগে লোক সরাইতে সরাইতে চলিয়াছে, নানাপ্রকারের বাদ্য বাজিতেছে। পথের পার্শ্বে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে, তাহারা দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিতেছে। ক্রমে রাজা নগরপরিদর্শন করিয়া রাজসভায় রত্নসিংহাসনে আসিয়া বসিলেন, অর্থী প্রত্যর্থীর ভিড় পড়িয়া গেল, মন্ত্রী সেনাপতি সভাসদ যোড়হস্তে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ আসিয়া মহারাজের স্তব করিয়া বলিতেছেন, মহারাজ অমুক আমার অনিষ্ট করিয়াছে সুবিচার করুন, কেহ আসিয়া বলিতেছে মহারাজ আমাকে কিছু ভূমি দান করুন, কেহ কবিতা লিখিয়া আনিয়াছে কিছু অর্থের প্রয়াসী, রাজা সকলের প্রার্থনা শুনিলেন যাহাকে যাহা দিবার দিলেন। ক্রমে বেলা হইল, সভা ভাঙ্গিল, রাজা এইবার আহার ও বিশ্রামাদির জন্য অন্তঃপুরে চলিলেন। পথিমধ্যেই মাথার মুকুট খুলিলেন, বুকের তরবারি নামাইলেন, রাজবেশ সমস্ত ছাড়িয়া রাজা এখন মানুষ হইলেন, মানুষ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এখানে আর সে সম্ভ্রমের ব্যস্ততা নাই, অভিবাদনের ত্রুটি হইলে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনের শঙ্কা নাই। রাজা ও যেন নিয়মের বন্ধন হইতে প্রেম ও অনুরাগের সহজ ও সরল রাজ্যে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এখানে রাজার রাণী আছেন, ছেলে আছে, মেয়ে আছে। ইহারা রাজার কাছে কিছুই চায়না, কেবল রাজাকেই চায়। ছেলেটি ধূলা মাখিয়া খেলা করিতেছিল সে নাচিতে নাচিতে আসিয়া রাজার কোলে বসিল, মেয়েটি রাজার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল, রাণী আসিয়া একটু অভিমানের সহিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা রাজ কাজ যা'হোক্, এত বেলা হয়েচে, তা খাওয়া দাওয়ার কথা বুঝি মনে নাই ?"

রাজা যখন নগরের পথে ছিলেন, রাজা যখন সভায় রত্নসিংহাসনে বসিয়া

ছিলেন তখন রাজার ঐশ্বর্য্য ভাব, আর অন্তঃপুরে মাধুর্য্য। এই অন্তঃপুরের লোক যাঁহারা তাঁহারাই রাজার অন্তরঙ্গ, তাঁহারাই রাজার স্বগণ। মনে করুন রাজার রাজ্য গেল। মেবারের মহারাণা প্রতাপসিংহ বনে বনে ঘাসের রুটি খাইয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা মহারাণার নিকট কোন কিছুর প্রার্থী ছিলেন, তখন তাঁহারা সঙ্গে ছিলেন না, যাঁহারা মহারাণার মাধুর্য্যের উপাসক, যাঁহারা কেবল মহারাণাকেই চাহেন তাঁহারা মহারাণাকে ছাড়েন নাই।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান যতদিন অপূর্ণ, ততদিন সে ঈশ্বরের সহিত নিজের সম্পর্ক ঠিক বুঝিতে পারেনা। একটি বহিঃস্থিত শক্তি রূপে তাঁহাকে ধারণা করে। ঈশ্বরতত্ত্ব যে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বের সমন্বয়, সফলতা ও পরিপূর্ণতা তাহা উপলব্ধি করিতে পারেনা। তাই ঈশ্বর ছাড়িয়া অন্য বস্তুর কামনা করে। ঈশ্বরতত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধির উপরেই ভাগবত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বিশেষভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ভাগবত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরদেবতার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক আলোচনা ও ধারণা করা উচিত। প্রথম শ্লোকটি এই

জন্মাদস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

এই শ্লোকের অর্থ নিরূপণের প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, এই শ্লোকে দুই প্রকারের লক্ষণের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বকে লক্ষণান্বিত করা হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করিতে হইলে এবং ভাগবত ধর্ম্মের মর্ম্মোপলব্ধি করিতে হইলে এই উভয় প্রকারেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই দুইটি লক্ষণের নাম স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ। আমরা সাধারণতঃ জানি যে স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণের দ্বারা সগুণ ব্রহ্ম লক্ষণান্বিত হয়েন, সুতরাং ভাগবতের প্রথম শ্লোকে এই উভয় প্রকার লক্ষণেরই একত্র সমাবেশ দেখিয়া এইরূপ মনে করাই অতীব স্বাভাবিক যে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় প্রকার ব্রহ্মবাদ ও উপাসনা-পদ্ধতিকে এক উদার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আনয়ন করা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম অভিপ্রায়। কোন বস্তুকে অপর বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে বর্ণনা করার

প্রণালীর নাম স্বরূপ লক্ষণ—As the thing is in itself. ভাগবতের প্রতি-পাদ্য যে ঈশ্বর তত্ত্ব তাহার স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হইল "সত্যং পরং ধীমহি" তিনি পরম বা পরমার্থ সত্য তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। এখানে 'ধীমহি' ক্রিয়াটি কেন বহুবচন হইল এবং সে সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কি মত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন ভাবিতে হইবে তিনি পরমার্থ সত্য। শঙ্করাচার্য্যের মতে "একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ।" যে বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা একরূপেই অবস্থিত, তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ, যাহার কোন কালে কোন অবস্থায় বাধ হয় না, তাহাই পরমার্থ। একত্বই পারমার্থিক, নানাত্ব ব্যবহারিক। সুতরাং ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই পরমার্থ সত্য নহে।

এখন এই পরমার্থ সত্যের ধারণা কিপ্রকারে করা যায়? ভাগবত বলি-তুই প্রকারে ধারণা হইবে। প্রথমতঃ "তেজোবারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা" * প্রকৃতির তমো, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিগুণের সৃষ্টি, ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা, প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা। কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা মিথ্যা? যাহার বাধ নাই তাহাই সত্য। একটি জিনিস এখানে আছে কিন্তু দশহাত দূরে অথবা তুই ক্রোশ দূরে নাই, সুতরাং তাহা সত্য নহে। একটি জিনিস আজ আছে, কিন্তু তুই বৎসর পরে থাকিবেনা বা একশত বৎসর পূর্ব্বে ছিল না, সুতরাং ইহাও সত্য নহে। ইহা ছাড়া মানব চৈতন্যের চারিটি অবস্থা আছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। যখন জাগিয়া থাকি তখন যাহা অনুভব করি, যখন স্বপ্ন দেখি তখন আর তাহা থাকেনা, আবার সুষুপ্তিকালে জাগ্রত ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থার অনুভূতিই থাকে না। ইহা ছাড়া তুরীয় বলিয়া একটি অবস্থা আছে, তাহা যোগাধিগম্য! অদ্বৈতবাদীরা বলেন, যে বস্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারি অবস্থাতেই নির্ব্বাধ, কখন ও যাহার বাধ হয় না,—তাহাই সত্য, তাহাই পরমার্থ, অদ্বৈতবাদীদের এই যুক্তির যাহা সার কথা ভাগবত তাহা অন্যস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রথম শ্লোকে ভাগ-বতের বিচারপদ্ধতি একটু অন্যরূপ। অদ্বৈতবাদীগণ সত্য বা তত্ত্ব নির্ণয়ে কেবলমাত্র জ্ঞাতার অনুভূতি লইয়াই আলোচনা করিলেন কিন্তু জ্ঞেয় জগৎ, যাহা এই অনুভূতি জাগাইতেছে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। ভাগবত প্রথমেই সে কথা উত্থাপন করিলেন, জগৎ একেবারে নাই বলিয়া উড়াইয়া

* এই অংশটুকুর অর্থ পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে।

দিলেন না। বলিলেন জগৎ-ব্যাপার আমরা যে ভাবে অনুভব করি তাহা সত্য হইতে না পারে, কিন্তু যাহা কিছুই না, যাহা শূন্য বা মিথ্যা, তাহা আমাদের মধ্যে অনুভূতি জাগাইবে কি করিয়া? এই জন্য ভাগবত বলিলেন যে জল দেখিয়া কাচ বলিয়া ভুল হয়, জ্যোতি দেখিয়া কাচ বা জল বলিয়া ভুল হয়, আমি জিনিষটাকে যাহা বলিয়া বিবেচনা করি জিনিসটা অবশ্য তাহা নহে কিন্তু আমার অনুভূতি মিথ্যা হইলেও, যাহারা অনুভূতি জাগাইতেছে তাহাদের অধিষ্ঠান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ভূমি এই যে সত্য ইহাই পরমার্থ সত্য, এই সত্যই আমাদিগকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু কি প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে? 'ধীমহি' ক্রিয়াটি' বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে কেন, তাহার উত্তরে টীকাকার বৈষ্ণবাচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন।

"দেশকালপরম্পরাপ্রাপ্তান্ সর্ব্বানেব জীবান্ স্বান্তরঙ্গীকৃত্য" দেশ ও কালের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে হইবে না, ব্যক্তিগত রুচি, অরুচি বা তৃপ্তি অতৃপ্তির মধ্যদিয়া দেখিলে ও হইবে না। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে Absolute standpoint বা standpoint of the Infinite বলে সেইখান হইতে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে কি দেখা যাইবে, এ শ্লোকে তাহা বলা হয় নাই সত্য, কিন্তু আমরা এক কথায় তাহা বলিতে পারি। তাহা হইলে বিশ্ব বৃন্দাবন হইয়া যাইবে এবং দ্রষ্টা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথায় "গোপীভর্ত্তুর্পদ কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" হইয়া যাইবে। ইহাই ভাগবত ধর্ম্মসাধনার আদর্শ।

পরমার্থ সত্যের ভাগবত বর্ণিত এই যে প্রথম প্রকারের ধারণার কথা বলা হইল, ভাগবতধর্ম্মের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সে সম্বন্ধে আরও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। বিশ্বব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্নেহ, প্রেম, আনন্দ, শোক, তাপ দুঃখ, ভয় প্রভৃতি কত প্রকারেরই না অনুভূতি (sensations and perceptions) প্রাপ্ত হইতেছি। একটু স্থির হইয়া চিন্তা করা যাউক এ সমস্তের অর্থ কি? ভাগবত ও স্থির হইয়াই চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কারণ পরমার্থ সত্যের দ্বিতীয় প্রকার ধারণার কথায় ভাগবত বলিয়াছেন—

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং"

স্বীয় তেজপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে। এই উভয়ভাবে পরমার্থ সত্যের চিন্তা করিতে হইলে নিজেই সাধ্যমত মায়িক উপাধির ঊর্দ্ধে উঠিয়া জগৎব্যাপার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তাহা

হইলে আমরা যে সমস্ত অনুভূতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইব, তাহা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা। শেষে আমরা এই উপলব্ধিতে আরোহণ করিব যে এই অনন্ত বিশ্বের মধ্য দিয়া আনন্দময় ভগবানের অনন্তবৈচিত্র্যময় সত্ত্বার স্পন্দনগুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসিয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে স্পর্শ করিতেছে। তিনি নিশ্চল নিশ্চেষ্ট সত্ত্বামাত্র নহেন। তাঁহার মধ্যে আনন্দ ও মাধুর্য্য যেন ধরিতেছেনা, তিনি নিজের সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরস যেন বিলাইয়া দিবার জন্য নিয়ত উদ্‌গ্রীব ও ব্যাকুল, বিশ্ব সেই মাধুরীময়ী আকুলতার মূর্ত্তিমাত্র। এই প্রকারে তিনি নিয়ত আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন ও জাগাইয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন, কি তাঁহার অপার করুণা, কি তাঁহার প্রেম! ভগবানের এই ভাবের নাম মাধুর্য্য। ভাগবতের সমস্ত লীলার মধ্যে এই মাধুর্য্যভাবই দেখান হইয়াছে কেবল যে দেখান হইয়াছে তাহা নহে এই মাধুর্য্যভাবে মানবের মনকে বসাইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৃন্দাবনে বাঁশি বাজাইয়া গোপীদের মন-চুরি, দুষ্ট বালক হইয়া ননি চুরি করিয়া বাৎসল্যরসাশ্রিতা গোপীদের তন্ময় করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় এই মাধুর্য্যভাবের মধ্য দিয়া অনুভব করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা উপকৃত হইব। ভাবুক ও রসিক হইয়া ভাগবত রস পান করিতে হইবে ইহার একটি অর্থ ইহাই। বৈষ্ণব কবি এইটুকু বুঝিয়াই বলিয়াছেন—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে।"

অবশ্য এস্থলে জ্ঞান বলিতে হৃদয়হীন শুষ্ক তর্ক বুঝিতে হইবে।

সমস্ত ভাগবত গ্রন্থখানি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ভগবান ভিখারী, তাঁহার সমস্ত থাকিয়াও যেন কিছু নাই। তিনি মানবের দ্বারে দ্বারে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, জলে রসরূপে, চন্দ্র সূর্য্যে জ্যোতিরূপে, আকাশে শব্দরূপে, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধরূপে সকল স্থান হইতে সর্ব্বদা মানবের অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। মানব তাহা গ্রাহ্য করে না, শুনিয়াও শোনে না, বুঝিয়াও বোঝে না, কর্ণে প্রবেশ করিলেও উপেক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবানও যেন ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাই তাঁহার নানা অবতার। ভাগবত কৃষ্ণের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় ভগবান মানুষকে তাঁহার নিজের করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু পাইবার আশায় মানব ষড়বর্গের আরাধনা করে, চিন্ময় সুন্দর

ভগবান তাহার সমস্ত গুলির চিন্ময় ভাব লইয়া বৃন্দাবনে অবতীর্ণ। তাই বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে আশ্চর্য্য প্রকারের প্রকাশ দেখা যায়, আমরা যদি তাহা হৃদয়ের দিক দিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা না করিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ করি, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব। অনেকে নিজ নিজ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শিক্ষার তুলাদণ্ড লইয়া কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিয়াছেন ও এই লীলার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ উপাসনা ও বৃন্দাবনে মধুর ভাবের সাধনা উপাসক সম্প্রদায়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। এসম্বন্ধে ভক্ত ও সাধকগণের লিখিত গ্রন্থেরও অভাব নাই। সর্ব্বপ্রথমে নিরূপণ করিতে হইবে এই সমস্ত ভক্ত ও সাধক কৃষ্ণলীলা কিরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন, কৃষ্ণ, রাধা, গোপী, বৃন্দাবন, রাসলীলা প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহাদের হৃদয়ে কি সমস্ত ভাবের উদ্দীপনা আনয়ন করিয়াছে। দুইজন মহাপুরুষের জীবনের সাধনার মধ্যে দিয়া কৃষ্ণলীলার তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে বুঝিতে পারা যায়, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সুতরাং কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই দুইজন মহাপুরুষের শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক গোস্বামী শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বৃন্দাবন তত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা ও ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ভগবানের এই মধুরভাবে প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥
আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে তাড়ন ভৎর্সন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহন।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদ স্তুতি হৈতে তাহে হরে মোর মন॥"

প্রাচীনতর কালের সাধন পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই অংশটুকুর অর্থ নিরূপণ করা যাউক। ভয় অথবা লোভ এই দুইটি বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া যে ঈশ্বরের উপাসনা তাহা ঈশ্বরের উপাসনাই নহে. তবে 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামার' মত মন্দের ভাল। তুমি যখন ঈশ্বরকে ভয় করিতেছ তখন ত তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব এখনও বুঝিয়াই উঠিতে পার নাই, তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে কোন কিছু খোসামোদ করিয়া আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ, তোমার অবস্থাও তদ্রূপ। এপ্রকারের উপাসনায় উপাসক মনে করেন যে ঈশ্বর জগতের ও মানব চৈতন্যের বহিঃস্থিত একটা কিছু, আকাশের ঊর্দ্ধে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক সিংহাসনের উপর পৃথিবীর রাজাদের মত বসিয়া রহিয়াছেন। জড়-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া দেশকাল ও অবস্থার দ্বারা খণ্ডিত করিয়া দেখাই যাহাদের অধিকারের সীমা, জ্ঞানময় ও ভাবময় রূপে অন্তরাত্মা ও অন্তর্য্যামীরূপে সেই পূর্ণ তত্ত্বের ধারণা করিতে যাঁহারা একেবারেই অক্ষম এ প্রকারের ধর্ম্ম তাঁহাদের জন্য যে প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই ধর্ম্মই মানবের শেষ ধর্ম্ম নহে।

ভগবানের মধুরভাব বা প্রেমভাব একটি উদাহরণের দ্বারা ধারণা করা যাউক। আপনার বাড়ীতে আপনার গৃহদেবতা আছেন, তিনি প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদাই পরিবারের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আপনার ঠাকুরেব পূজার জন্য একখানি ঘর আছে, সেই ঘরখানি বাড়ীর একপার্শ্বে অবস্থিত। তাহার অঙ্গণ বেশ পরিচ্ছন্ন, সর্ব্বদা তকৃতক্ করিতেছে। অশুচি অবস্থায় কেহ সেখানে যায় না। ছেলেরা জুতা পায়ে দিয়া সেদিকে যায়না, ঠাকুর ঘরের নিকটে বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়া অন্য দিন জোরে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। আপনি খুব সংযতভাবে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া দিবসে দুইবার সেখানে যান, আপনার গৃহিণী খুব শুদ্ধ ও সংযতভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রে করিয়া ঠাকুরঘরে ভোগ দিয়া আসেন। ছেলেরা খালি লোমবস্ত্র পরিধান করিয়া সকালে ফুল তুলিয়া আনে. সন্ধ্যায় আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজায়। আপনি দুইবেলা স্নান করেন, দিনে পূজা ও সন্ধ্যায় আরতি করিয়া থাকেন। অশৌচের সময় আর আপনাদের কাহারও দেবগৃহে যাইবার অধিকার থাকেনা, স্ত্রীলোকেরাও বিশেষ বিশেষ সময়ে দেবগৃহে যাইতে পারেন না, যেদিন কোনও কারণে স্নান করিতে না পারেন সেদিন আর আপনার দেব

পূজার অধিকার থাকেনা অন্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাইতে হয়। ইহারই নাম আনুষ্ঠানিক হিন্দু উপাসনায় বৈধ উপাসনা। যাঁহারা এই নিয়মবদ্ধ পারিবারিক দৈনন্দিন অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার বা পৌত্তলিকতা বলেন তাঁহারা হিন্দুপরিবার কখন দেখেন নাই, দেখিবার দরকারও অনুভব করেন নাই কারণ সাহেবেরা যখন বলিয়াছে ইহা পৌত্তলিকতা, সাহেবদের দেশে যখন ইহা নাই তখন ইহা যে খারাপ তাহা আর ভাবিয়া ঠিক করিতে হইবে কেন?

এই যে প্রণালীবদ্ধ দৈনন্দিন অনুষ্ঠান, ইহার মধ্য দিয়া মানব সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা, সেবাপরায়ণতা, আস্তিক্যবুদ্ধি প্রভৃতিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইতেছে। হিন্দুদর্শনের ভাষায় মানব যতক্ষণ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অভিমানী, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন (সূক্ষ্ম দেহ হইতে বুদ্ধিকে বাদ দেওয়া হইল, কারণ, বুদ্ধির অভিমানী হইলেই কারণ দেহের অভিমানী বা প্রাজ্ঞ হইয়া পড়া যায়। খৃষ্টান শাস্ত্রের ভাষায় Body ও Soul কে ছাড়াইয়া Spirit এর সহিত একাত্মতা বোধ জন্মে—ইহাই Baptism with fire) এই গুলির সহিত একাত্মতা অনুভব করে তখন এই বৈধ ধর্ম্মই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মসাধনার এই অংশকে ইংরাজী ভাষায় Religion of Law বলে, ইহার পরের অবস্থার ধর্ম্মের নাম Religion of Love অন্যনামে এই বিভাগ দুইটির বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় প্রথমটি Ethical Religion আর দ্বিতীয়টি Transcendental অথবা Mystic Religion।

এইবার মনে করুন আপনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দীর্ঘকাল ধরিয়া আরাধনা করিতেছেন। ভগবান আপনার ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া আপনার বাড়ীর সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন যে আপনি ভয়ে ভয়ে ঠাকুরঘরে আসিয়া পূজা সারিয়া ঠাকুরঘরে শিকল দিয়া চলিয়া যান, ঠাকুরঘরে যখন থাকেন তখন, কত ভয় কত সম্ভ্রম (পূজার আসনে বসিয়া আচমন করার পর বাংলা কথা কহিতে নাই, যদি বাংলা কথা মুখ দিয়া বাহির হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার বিষ্ণু স্মরণ করিয়া আচমন করিতে হয়) তাহার পর পূজা সারিয়া আপনি যখন পরিবারে আসেন তখন আপনার কত আনন্দ, কত স্ফূর্ত্তি, স্বাধীনভাবে অশেষপ্রকার আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ঠাকুরের জন্ত আতপতণ্ডুল আর পাকা কলা আর গুড়ের বাতাসার নৈবেদ্য, আর এক তরকারী নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া আপনি পরিবারে স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগ্নি প্রভৃতিকে লইয়া মাছের ঝোল, মাংসের কাবাব প্রস্তুত করিয়া খাইতেছেন, কথায় বার্ত্তায় গানে

আনন্দে পরিবার মধ্যে মুহুর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব প্রেমরস তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে কিন্তু ঠাকুর ঘরখানি এ প্রেম তরঙ্গের সীমানার বাহিরে। ঠাকুর অনেকদিন বসিয়া বসিয়া দেখিলেন, দেখিয়া দেখিয়া ঠাকুর আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যেখানে প্রেম নাই, আছে কেবল ভয় ও সম্ভ্রম মিশ্রিত ভক্তি সেখানে কি থাকিতে পারা যায়? "ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত।" এখন ঠাকুর ভাবিলেন এমন করিয়া ঠাকুরঘরে আলাদা হইয়া থাকা যায় না„ পরিবারের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া পড়া যাউক. মানবের সমস্ত প্রেম ব্যতীত ভিক্ষুক আমি আমার অন্তর পিপাসা মিটিবার নহে। বেদে আছে "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ. প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাং যদন্তরতমং তদয়মাত্মা॥" তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, আপনার ব'লতে মানবের যাহা কিছু আছে সকলের হইতে প্রিয়তর তিনি অন্তরতম। আবার বেদে এমন কথাও আছে যে মানুষ জগতে যে সমস্ত বস্তুকে ভালবাসে, সেই সমস্ত বস্তুর জন্য তাহাদিগকে ভাল বাসে না, সেই আত্মা বা পরমাত্মার জন্যই ভালবাসে এই যখন রহস্য, তখন ভগবান ভাবিলেন আমি পৃথক হইয়া থাকি কেন? এই যে ভগবানের বিশেষ করুণা এই করুণার নাম যোগমায়া। তাহা মায়া ও বন্ধন তাহাতে মমত্বের আবর্ত্তও আছে কিন্তু এই মায়া আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া দেয় মাত্র। পূর্ব্বে মানুষ শুনিয়াছিল ভালবাসার রস হৃদয় হইতে শুকাইয়া ফেল, তবে ভগবানকে পাইবে, এখন মানুষ শুনিল এই রস বাড়াইতে আরম্ভ কর, বেশী করিয়া ভালবাস, এই ভালবাসার মধ্যদিয়াই তাঁহাকে পাইবে, তিনি পরম প্রেমাস্পদ। কিন্তু সে ভালবাসায় আর এ ভালবাসার প্রভেদ আছে। বৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। আসল কথা Liberty is for the Spiritual man not for the natural man এই খানেই কাম আর প্রেমের প্রভেদ।

এই জন্য দেখিতেছি ভাগবতধর্ম্ম স্বাধীনতার ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম। কিন্তু এই ধর্ম্মের অধিকার পাইতে হইলে "নিরস্ত কুহক" হইতে হইবে। আমি যে আত্মা ইহাই বুঝিতে হইবে। Man is a Spirit এই জ্ঞান হইলেই স্বাধীনতা, তাহার পূর্ব্বে বিধি। বিধি বলিতে ব্রহ্মাকে বুঝায়। বিধির রাজ্যই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত মনোময় চক্র। এই চক্রের অপর নাম ব্রহ্মাণ্ড। এই ডিম্ব ভেদ করিয়া বাহির হওয়াই প্রেমের ধর্ম্মেদীক্ষা লাভ ও ব্রজের পথে পদার্পণ।

প্রথম শ্লোকে যে স্বরূপ লক্ষণের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ মোটামুটি

বলা হইল। এইবার তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণে বলিতেছেন "জন্মাদস্যযতঃ" যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে। ঈশ্বর হইতে এই জগতের জন্ম স্থিতি লয় হইতেছে বুঝিলাম, কিন্তু কি প্রকারে হইতেছে তাহাও ভাবা দরকার। একটা প্রাচীন মত আছে "ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" যেমন ঘট দেখিলেই মনে হয় কুম্ভকার এই ঘট প্রস্তুত করিয়াছে, তেমনি পৃথিবী প্রভৃতি দেখিলেও মনে হয় এই বিশ্বের একজন শিল্পী আছেন। ইংরাজী দর্শনে এই প্রমাণের নাম The Teleolegical proof. এই প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের বিশ্বাতীতত্ব (Transcendence) প্রতিপন্ন হয়। ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর এক সময়ে জগৎ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি নিয়মের দ্বারা তাহার শাসনের ব্যবস্থা করিয়া নিজে উদাসীন হইয়া বসিয়া আছেন, মানব এই নিয়মের অনু-বর্ত্তন করিয়া চলিবে ইহাই তাহার ধর্ম্ম, ইহাতেই তাহার মঙ্গল হইবে। ঈশ্বরের সহিত বিশ্বের যদ্যপি এই সম্বন্ধই হয় তাহা হইলে কর্ম্মের শাসন অলঙ্ঘ্যনীয় হইয়া দাঁড়ায়, মানবের স্বাধীনতা, বা ঈশ্বরের করুণার স্থান থাকেনা। তাহা হইলে বলিতে হয় :—

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম শুভাশুভম্॥"

ভোগ ব্যতীত শতকোটিকল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভাগবত কর্ম্মবাদ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন। আর জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদই হিন্দুসাধনার বিশেষত্ব। কিন্তু ভাগবত কর্ম্মবাদ সাধারণতঃ সত্য হইলেও বিশেষ অবস্থায় ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় এইরূপ কথা বলেন। সেইজন্য যাহা হইতে জগতের জন্মাদি হইয়াছে এই কথা বলার পর এই জন্মাদি কি প্রকারে হইল তাহা ভাল করিয়া বলার জন্য ভাগবত বলিলেন "অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ।" ঈশ্বর জগৎছাড়া নহেন, তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান। তিনি সদ্রূপে বিদ্যমান বলিয়াই জগৎ আছে। যাহা অবস্তু অর্থাৎ যাহা নাই তাহাতে তিনি নাই। ইহারই নাম অন্বয় ও ব্যতিরেক। অন্বয় শব্দের অর্থ, অনু শব্দে পশ্চাৎ. আর অয় ধাতুর অর্থ যাওয়া বা থাকা। ইংরাজী ভাষায় তিনি জগতের Substance. Sub=under, Stare=to stand. তাহা হইলে তিনি যখন জগতে রহিয়াছেন তখন করুণার উৎস নিত্য উৎসারিত, সুতরাং কর্ম্মের হস্তেও অব্যাহতি আছে। এই জন্য ভাগবত উপনিষদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।"

নিজের মধ্যে ঈশ্বর রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই মানবের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কারের বাঁধন কাটিয়া যায়, সকল সংশয় দূরে যায়, এবং তাহার সমস্ত কর্ম্ম (সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ) ক্ষয় হইয়া যায়। একটা গান আছে, "ছেড়ে দিলে অহঙ্কার পাবি শ্যাম কলঙ্ক অলঙ্কার" To see Him, is to love Him, and to love Him is to be free. তাঁহাকে দেখিলেই ভালবাসিতে হইবে। তাঁহাকে ভালবাসিলেই মানুষ স্বাধীন। বৈষ্ণব সাধনায় দুটি অতি সুন্দর ভাব দেখা যাইবে, একটির নাম তদীয়তা-ময় আর একটির নাম মদীয়তা-ময়। "আমি তোমার" এইটুকু বলিতে পারি, 'তুমি আমার" এ কথা বলিবার আমার সামর্থ্য নাই। এইভাবই রাধা-ভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে অন্যান্য বাক্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে প্রধান বা প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারেন না। কারণ যিনি জগৎকর্ত্তা তিনি 'অভিজ্ঞ' পূর্ণজ্ঞান, শ্রুতিতে তাহার প্রমাণ আছে। প্রধানে জ্ঞান (self-consciousness) নাই। মানুষে জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা স্বতঃসিদ্ধ (Absolute) নহে। এই জন্য বলিলেন স্বরাট্। তবে কি ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ? ইহার উত্তরে বলিলেন না তিনি ব্রহ্মাকে বেদ দিয়াছেন। এই প্রকারে প্রাচীন ধারণাগুলির সমালোচনা করিয়া ভাগবত শ্রীধর স্বামীর ভাষায় এই মীমাংসায় আসিলেন যে—

"স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণঃ"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অর্থও যাহা গায়ত্রীর অর্থও তাহাই। ইহা পরে আলোচনা করা যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আর একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত।

ঈশ্বরের সহিত মানবের যে সমস্ত সম্বন্ধ প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের গুরুভাব একটি অতি প্রধান কথা। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে "স পূর্ব্বেষামপিগুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" তিনি আদি গুরু, জগতের গুরুপ্রণালী পারম্পর্য্য শৃঙ্খলায় তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া অব্যাহত ভাবেই চলিতেছে। ঈশ্বরের এই ভাবটি মধুর বা করুণভাব। তিনি গুরুরূপে মানবকে তুলিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই ভাবটুকু প্রকাশ করার জন্যই বলা হইল "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ" যে বেদে দেবগণও মোহিত

সেই বেদ তিনি আদি কবির হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। এই উক্তির দ্বারা আর একটি কথা বলা হইল। অজ্ঞানতার ভূমিতে ভয় বা বিস্ময়ের বীজ পতিত হইয়া কুসংস্কাররূপ বারিসিঞ্চনে এই ধর্ম্মরূপ মহামহীরুহের উদ্ভব হয় নাই। যাঁহার স্বরূপ অনন্তজ্ঞান ও অনন্ত প্রেম তিনি মানবকে ধর্ম্ম দিয়াছেন। মানবের ধর্ম্মপিপাসা তাঁহারই প্রেরণা।

পূর্ণিমায়।

(১)

চাঁদের গাঙে বাণ ডেকেছে আজ।
সুধার ঢেউ উথলে ধরা মাঝ!
ঘরের কোণে আর
ঠাঁই আছে কি কার?—
ভুলিতে হ'ল সকল কিছু কাজ!
চাঁদের গাঙে বাণ ডেকেছে আজ!

(২)

ওই আকাশ ওই বাতাস ভরি'
হীরার কণা পড়িছে ঝরি' ঝরি'!
ও অভাগা, আয়রে!
সময় বয়ে যায় রে!—
লুটিতে হবে আকুল সুখে মরি!
হীরার কণা পড়িছে ঝরি' ঝরি'!

(৩)

কুসুম ভরা তরু লতার দলে
সোনার মায়া স্বপন হেন ঝলে
কোকিল পাপিয়ায়
মনের ভুলে গায়!—
শৈলজা তাই হাসিছে কত ছলে!
সোণার মায়া স্বপন হেন ঝলে!

(৪)

সারাটী বুকে মিলন-কথা 'তার'
এমন দিনে জাগায় হাহাকার!
অকূল-তীরে-তীরে
মোরে সে খুঁজে ফিরে
হিয়ায় বহি প্রেমের পারাবার!
সারাটী বুকে মিলন-কথা 'তার'

(৫)

সাধের তরী অলস কেন তবে?
ভাসিতে আজ ডুবিতে আজ হবে!
চাঁদের মহারাণী
পেতেছে ফাঁদ খানি!—
ডাকিছে ওই বুঝি অধীর রবে!
ভাসিতে আজি ডুবিতে আজি হবে!

"সাধনা কুঞ্জ"
চট্টগ্রাম। } শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দের প্রাগুক্ত "আশা" আমার পক্ষে যতই দুরাশা হউক না কেন, আমি তাহা যোগমুক্ত মহাপ্রাণের অতুল স্নেহাশীর্ব্বাদরূপে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহার সেই ক্ষুদ্র পত্রখানি "অঞ্জলির" অভিমত হিসাবে নয়, হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিমান সাধকের, নীরব কর্ম্মবীরের করালেখা অভিজ্ঞান জ্ঞানে পবিত্র নির্ম্মাল্যের ন্যায় আজিও সযত্নে রক্ষা করিতেছি।

মানবমাত্রের অন্তিম-বাণী তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপিনী ঐকান্তিকী চিন্তা ও সাধনার সমুজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি, জন্মান্তরবাদী আর্য্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সে সময়ের ব্যক্ত বা অব্যক্ত মনোভাব তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম গঠনে নিয়ন্ত্রিত পর্য্যন্ত করে। সুতরাং তাহা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়নের শেষ কথা স্মরণ হইতেছে—"ফ্রান্স—ফ্রান্সের সৈন্য দল—সৈন্য দলের নেতা—জোসেফাইন।" তাঁহার এ বাক্যগুলি পরস্পর যতই অসংলগ্ন হউক, তথাপি ইহার ভিতরে সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আজন্ম-প্রসারিণী সাধনা-কামনার কি গভীর নিদর্শন জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে! সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মাতৃভূমির প্রতি সেই সম্পদ বিপদের চিরসহচর সৈন্য সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি, সেই নারীকুল লক্ষ্মী প্রাণপ্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর প্রতি তাঁহার যে অকপট ভালবাসা, তাহা তাঁহার অন্তিম বাণীর অক্ষরে অক্ষরে কি অপার্থিব সুধা-ক্ষরণ করিয়াছে!!

বিশ্রুত নামা মহাকবি নবীনচন্দ্র আমাদিগকে শেষ কথা শুনাইয়া গিয়াছেন—"আজ আমার বিজয়া!" সুদীর্ঘ জীবনকাল ধরিয়া কবিবর বরাভয়া প্রতিভাসুন্দরীর অর্চ্চনায় একাগ্র প্রাণে নিরত ছিলেন, সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতা দেবীর অনুকম্পায় আজ পরম সাফল্যে মহা বিজয়গৌরবের মধ্যে অবলম্বিত মহান্ ব্রতের শুভ উদ্‌যাপন হইতেছে—অমর কবির আকৈশোরঝঙ্কৃত হৃদয় বীণা সুপবিত্র ভারতাকাশে অক্ষয় সুস্বর লহরী জাগাইয়া দিয়া আজ চিরকালের জন্য সসম্মানে বিদায় লইতেছে, তাই মর্ত্ত্যবাসীর প্রতি তাঁহার বিপুল করুণ মধুর আনন্দ সম্ভাষণ!

"বিধান"-সেবক "সমন্বয়"-সাধক উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের বিশ্বাসী হৃদয় বিশ্বে শেষ ভাষা প্রকাশ করিয়াছে—"দেখিলাম নববিধানে মহা সমন্বয় হইয়া গেল, আর কোনও বিভিন্নতা রহিল না, হিন্দু মোসলমান সব একাকার হইয়া গেল!"

তাঁহার এই অন্তিম-বাণী অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে এতদিন তাঁহার জীবনধারা কোন্ দিকে—কোন্ মহান্ লক্ষ্যে প্রবাহিত হইত, তিনি কোন্ সাধুসঙ্কল্পে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ অনুক্ষণ শয়নে স্বপনে জাগরণে যে সাম্য ও মৈত্রীর মঙ্গলরূপ মনন করিতেন, তাহাই তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তে তাঁহার দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে বিচিত্র ধ্যান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-হারা উপাসকের সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নখানি যেন নবজাগ্রত ভারতের সফল ভবিষ্যদ্বাণী রূপে ব্রাহ্মসমাজের আশা-আশ্বাসের গুপ্ত রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক স্বর্ণ রশ্মিপাত করিয়া দিয়াছে!!

কতকাল ধরিয়া যে সুন্দর শ্লোকটী "ধর্ম্মতত্ত্বের" বক্ষে কৌস্তুভ মণির মত শোভা পাইতেছে, তাহা যে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের রচিত কিছুদিন পূর্ব্বে আমি জানিতাম না; ভাবিতাম আর্য্যশাস্ত্র রত্নাকরের কোনও সুনিভৃত গুহাতল হইতে কোনও সুযোগ্য ডুবরী ইহাকে লোক লোচন-সকাশে আনয়ন করিয়াছেন। আমার এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কেন না ইহার ভাবের গভীরতা ও উদারতা যে কোন ঋষিশ্লোকের সহিত উপমিত হইতে পারে। যাহা হউক, সম্প্রতি আমার সে ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে, আমি ভক্তিপ্লুত চিত্তে সে শ্লোকটী আবার পড়িয়া দেখিয়াছি। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ লিখিয়াছেন—

"সুবিশালমিদং বিশ্বংপবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলঃ হি প্রীতি পরম সাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

সুবিশাল পবিত্র বিশ্ব-ব্রহ্ম-মন্দিরের অধিবাসী, সুনির্ম্মল চিত্ত-তীর্থবান্, অবিনশ্বর সত্য শাস্ত্রবিদ্, বিশ্বাসী ধার্ম্মিক, পরম সাধনা প্রীতির উপাসক, স্বার্থত্যাগী বৈরাগ্যশীল, প্রকৃত ব্রাহ্ম না হইলে কেহ কেবল পাণ্ডিত্যবলে চারিটী চরণ বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র শ্লোকটীর ভিতরে এমন ভাবে "বিধানের"—কেশবের—নিজের জীবনের মূলমন্ত্র সন্নিবেশিত করিতে পারেন না। এই সুললিত শ্লোকটী যে বিশ্ব-জনীন দেব-মূর্ত্তি প্রকটন করিতেছেন, তাঁহাকে আমাদের নমস্কার!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

[সন ১৩১৬ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে অর্থাৎ রমেশচন্দ্রের তিরোভাবের ঠিক দশদিন পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি শোকসভার অধিবেশন হয়। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় (Dr. P. C. Ray) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সভায় বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির যে যে স্থল কেবলমাত্র তৎকালোচিত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রিত হইল। বীরভূমি সম্পাদক]

ইংরাজী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতার একটী সম্ভ্রান্তসম্পন্ন শিক্ষিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ খৃঃ ৬১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকে কোনও বিশেষরূপ অংশে বা স্তরে বিভক্ত করা কঠিন। কেন না তিনি জীবনের কোন বিশেষ

অংশ কেবলমাত্র কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য পৃথকভাবে ব্যয় করেন নাই। যাহা তাঁহার জীবনের প্রিয়কার্য্য তাহা তিনি অন্যান্য শত কার্য্যের মধ্যেও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে তরুণ যুবক রমেশচন্দ্র স্বীয় পরিবারের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে ইহা একটা অতি বড় দুঃসাহসিকতার কার্য্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যত জীবনে যিনি কত বড় বড় দুঃসাহসিকতার কার্য্যে অগ্রণী হইয়া জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা আর বিশেষ আশ্চর্য্য কি? য়ুরোপের জ্ঞান গরিমায় বিভূষিত হইয়া আশায় উল্লাসে সিদ্ধকাম দৃপ্ত যুবক রমেশচন্দ্র ১৮৭১ সনে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করেন, এবং ২৬ বৎসর একক্রমে গৌরবের সহিত তাঁহার কর্ম্ম জীবনের সিংহাসন নিষ্কলঙ্ক যশোরাশিতে অলঙ্কৃত করিয়া ১৮৯৭ সনে রাজকর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই ত্যাগের মধ্যেও তাঁহার একটী মহত্ব রহিয়াছে; দেশবাসীর জন্য স্থায়ী কোন অমূল্য সম্পদ আহরণ করিবেন এই সংকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ২৬ বৎসর কি তিনি শুধু রাজকার্য্যই করিয়াছেন? ইহার মধ্যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় চারিখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন, সমগ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অতীত সভ্যতার, চারিখণ্ডে সমাপ্ত একটী ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন। সাহিত্যের দিক ছাড়িয়া রাজকার্য্যেও তাঁহার স্বদেশ হিতৈষণা ও দৃঢ়তার পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। বস্তুতঃ শাসন বিভাগে তিনিই একমাত্র রাজকর্ম্মচারী যিনি একই সময়ে দেশের ও গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। ইলবার্ট বিলের দিনে দেশে যে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল তাহাতে তিনি অটল ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ডফ্‌রিন্ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা আমরা দেখিয়াছি; উড়িষ্যার কমিশনার রূপ করদরাজ্যের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য তাঁহার আগ্রহ আমরা দেখিয়াছি। বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার যুক্তি ও দৃঢ়তাপূর্ণ অনুরোধ আমরা শুনিয়াছি। বাঙ্গালার জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত,

লর্ড রিপণের এর স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী, দেশীয় জুরির বিচার, পথকরের ব্যয় প্রণালী ইহার প্রত্যেকটির পশ্চাতেই রমেশচন্দ্রের হস্ত আমরা দেখিতে পাইয়াছি। শুধু হস্ত নয় এই সমস্তের পশ্চাতে আমরা তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন হোমানল শিখা দেখিতে পাইয়াছি কেন না জন্মভূমির উন্নতির জন্য যে আকাঙ্খা তাহা হোমানল শিখার মতই পবিত্র, তেজোদৃপ্ত ও সাধনার ধন। দেশহিতৈষণাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, এবং শরীর পাত হইবার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি এই মন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৯ সনে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি রূপে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বিংশতি কোটী ভারতবাসী কৃষকের দুরবস্থা ও ন্যায্য অধিকারের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে একটী পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন। তৎপর মহাভারত ও রামায়ণের সমগ্র অনুবাদ করিয়া ম্যাক্‌স্‌মুলর কেও চমকিত করিয়াছেন। লর্ডকার্জ্জনকে বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে ও রাজস্ববিভাগের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে যে একটী দীর্ঘ পত্র লেখেন তাহার উত্তরে লর্ডকর্জ্জনকেও রাজ্য শাসনের অনেক গুপ্ত রহস্য লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইয়াছে। লর্ডকার্জ্জনকে তাঁহার ভারতশাসন নীতির ভুল বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং সভ্যজগতের নিকট এই শাসননীতির পেষণে ভারতের নৈতিক ও আর্থিক অবশ্যম্ভাবী ক্ষতির জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত প্রকট করিবার জন্য রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও (Economic History of British India in the Victoria age) ভারতে দুর্ভিক্ষ (Famine in India) প্রণয়ন করেন। তাহার:পর বরোদারাজ্যে ১৯০৪ হইতে ১৯০৭ এই তিনবৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া তথায় অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। শাসনপদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণ ব্যাপারে (Decentralization কমিশনে) তিনি যথেষ্ট খাটিয়াছেন। দ্বিতীয়বার তিনি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান রূপে নিযুক্ত হইয়া সেইখানেই তাঁহার গৌরবময় দীর্ঘ জীবনলীলা সমাপন করিয়াছেন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের দৃষ্টান্ত হইতে উচ্চপদস্থ দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ শিক্ষা লাভ করিবেন; ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজে শিক্ষালাভ করিবেন, স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মারা শিক্ষা লাভ করিবেন এবং সর্ব্বোপরি ভারতের ছাত্রবৃন্দ এই মহাপুরুষের জীবনের আলোকে জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবেন। তিনি শাসনদণ্ড পরিচালনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি

রাজনীতি ও অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক ছিলেন; তিনি অধ্যাপক ও আইনজ্ঞ ছিলেন, তিনি চিন্তাশীল ও বাগ্মী ছিলেন। তথাপি তাঁহার জীবনকে বিশ্লেষণ দ্বারা এইরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখিলেই শুধু সে দেখা সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি যাহাই থাকুন না কেন তাঁহার জীবনের এই বহুমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা যেন আমরা না হারাইয়া ফেলি। তাঁহার জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া আংশিক ভাবে দেখিয়াছি, এখন সেই অংশের সমষ্টি ও সামঞ্জস্যকে পূর্ণভাবে দেখিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিব।

এই বিপুল কর্ম্মী এতকাজ একেলা কি করিয়া করিলেন, এত শক্তি তাঁহাকে যোগাইল কে? উত্তরে বলাযায় যে তিনি প্রেরণা পাইয়াছেন শক্তির একটি মূলে প্রস্রবণ হইতে। সেই প্রস্রবণ তাঁহার জীবন-ব্যাপী একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা—এই আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্যে ও মহত্ত্বে তাঁহার হৃদয় নিশিদিন পরিপূর্ণ ছিল। তাই তাঁহার কার্য্যে অবসাদ আসে নাই, অবস্থার অনিবার্য্য প্রতিকূলতা কেবলি বিভীষিকা দেখাইয়া নৈরাশ্যের অন্ধকারে আত্মহত্যা করিবার জন্য টানিয়া লয় নাই; আরাম বা বিলাসসম্ভোগ গন্তব্য পথ হইতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্খলিত করে নাই। তিনি যে এত বিভিন্ন রকমের বিচিত্র কার্য্য সকল করিয়াছেন, গভীরভাবে যদি দেখি, তবে দেখিতে পাইব, এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই তাঁহারা প্রাণের একটা গভীর সুর সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইতেছে, একটি বিরাট আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতী হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

একদিন অচেতন জাতিকে লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়া, একজীবনেই যে তাঁহাকে অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় পৌছাইয়া দিয়া বিদায় লাভ করিতে পারিয়াছেন, এজন্য তাঁহার জীবনব্যাপী উদ্যম যেন অনেকটা সফল হইয়াছে ভাবিয়া মৃত্যু শয্যায় তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছেন। তাঁহার ৭ই অক্টোবরের প্রকাশিত চিঠিতে তিনি বলিতেছেন,—

"What a wonderful revolution we have seen within the life time of a generation. What progress in the thoughts and ideas of a nation!"

যদি এই কর্ম্মীর জীবনকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হয়, তবে তাঁহার জীবনের কোন বিশেষ দিক্ হইতে নয়, পরন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনের মূল প্রস্রবণ হইতে আমরা বল লাভ করিব। তাঁহার অন্তর্নিহিত মূল আকাঙ্ক্ষার সহিত আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইব। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদি হইতে

শিখিবার যথেষ্টই আছে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের যে উদার ভূমিতে দাঁড়াইয়া, তিনি একই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, এত কার্য্য ও বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই উদার ভূমিতে আমরাও আমাদের চিত্তকে প্রেরণ করিব। সেই খানে না পৌঁছিতে পারিলে, তাঁহার জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না। তিনি জীবনদ্বারা একটি অলিখিত আদর্শ আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা তিনি কোন বিশেষ গ্রন্থে লিখিয়া যান নাই। সুতরাং রমেশচন্দ্র দত্তকে যেন আমরা তাঁহার গ্রন্থ ও কার্য্য লইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার অবকাশ ও সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। তাঁহার আদর্শ দ্বারা যেন জীবনে পরিচালিত হইতে পারি। আমাদিগকে এ কথা অকুতোভয়ে স্বীকার করিতেই হইবে, যে সকল কার্য্যে, সকল চিন্তায় জন্মভূমি তাঁর সন্মুখে ছিল। এই স্বদেশের অতীত গৌরবের ধ্যানে মগ্ন হইয়া তিনি কি আশায় উৎফুল্ল, কি আনন্দে অধীর, কি ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন, তাহা তাঁহার—বৈদিক যুগ বর্ণনার প্রতি ছত্রে ছত্রে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। এক কথায় তিনি এই দেশের প্রাচীন সভ্যতার একজন উপাসক ছিলেন। তথাপি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার এক সুন্দর সম্মিলন তাঁহার জীবনে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। একের জন্য অন্যকে হারাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; সেরূপ করিলে মানুষ দরিদ্র থাকিয়া যাইবে; তিনি দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের অনেক মনীষীর জীবন হইতেই আমরা এই সামঞ্জস্যের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। এবং এই শিক্ষা জাতির জীবনে সচেতন ভাবে কার্য্য না করিলে আমাদের প্রকৃত মুক্তির দিন দূরে।

মাননীয় গোখেলে, মৃত মহাত্মা রাণাডের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"To him (Ranade) India's past was a matter of great, of legitimate pride, but even more than the past, his thoughts were with the present and the future, and this was at the root of his matchless and astonishing activity in different fields of reform" * * * Mr. Rande was content to live und work for his country only, and though he was a careful student of the history and institutions other people, he studied them mainly to derive lessons from them for the guidance of his countrymen."

সত্যের কিছু মাত্র অপলাপ না করিয়া, ইহার প্রত্যেকটি কথাই কি আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে পারি না? তিনিও বিভিন্ন জাতির

ইতিহাস ও শাসন তন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন ; কিন্তু শুধু জ্ঞানান্বেষণের জন্য নয় ; সেই জ্ঞান দ্বারা দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে। তিনিও দেশের অতীতদ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া নয়, ভবিষ্যতের উপর আস্থাহীন হইয়া নয়। ভবিষ্যৎকে সাহায্য করিতে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি "Victoriaর যুগ" পর্য্যন্ত, সম-ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া গিয়াছেন। এমন দিব্যদৃষ্টি লইয়া ভারতে কয়জন জন্মিয়াছেন ? ভারতবর্ষকে এমন সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়জন ব্যাকুল হইয়াছেন. চেষ্টা করিয়াছেন এবং সক্ষম হইয়াছেন ? এই বেদ ও ঋষির প্রসূতি পুণ্যভূমি, এই বুদ্ধ ও শঙ্করের জননী দেবভূমি, এই অশোক ও কনিষ্কের শাসিত অতুল সমৃদ্ধিশালী সোণার ভূমি, আবার অদৃষ্ট চক্রের কি নিয়মে, এই দুর্ভিক্ষ ব্যাধি বিমর্দ্দিত অন্ধকার রিক্ত কঙ্কালসার—দুর্ভাগা দেশ : ইহাকেই সম্মুখে রাখিয়া—রমেশচন্দ্র দত্ত উপন্যাস লিখিয়াছেন, অর্থনীতির কূট তর্কে, রাজনীতির গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হইয়াছেন, বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন। এবং এই আশা উদীয়মান জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য, তাহার পূর্ব্ব গৌরবের উপর, পুঞ্জীভূত অন্ধকার রাশি বিদীর্ণ করিয়া, এমন তীব্র আলোকের রশ্মিপাত করিয়া গিয়াছেন, যে সমস্ত সভ্য জগৎ সে স্ফুরিত আলোকছটায় কত বহু শতাব্দীর অতীতে, আদি মানব সভ্যতার সেই এক অতি বিরাট বিশাল মহামৌন উজ্জ্বল মহিমার দিকে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। ধন্য রমেশচন্দ্র, ভারতে তোমার জন্ম সার্থক ! দেশের এমন সুসন্তান সকল যুগে, সকল দেশে ধন্য !

আহা, এত তিনি কেন করিয়াছেন ? কেন ? তিনি যে দেশকে ভাল-বাসিতেন, সেত শুধু মুখে নয়, শুধু হুজুগে নয়। বস্তুতঃ দেশকে হৃদয় দিয়া ভাল না বাসিলে, শত ক্ষমতা ও যোগ্যতা সত্বেও, দেশের কোন প্রকৃত মঙ্গল করা যায় না। বুকের পাঁজরের তলায় এই দুর্ভিক্ষ ও অত্যাচার পীড়িত দেশের সম্মিলিত তপ্তশ্বাস আসিয়া নিয়ত দগ্ধ করিত বলিয়াই, দীন-নয়নে অসহায়, নিরুপায় কোটী দেশবাসী প্রতীকার ভিক্ষা করিত বলিয়াই তিনি ধ্রুবতারার মত একটি লক্ষ্যের প্রতি নিশিদিন নিজকে জাগ্রত রাখিয়াছিলেন।

বন্ধুগণ, রমেশচন্দ্র দত্ত ত ভারতবর্ষকে ইতিহাস দিয়াছেন,—সে শুধু মারামারি বা কাটাকাটির ইতিহাস নয় ; ভারতবর্ষ, তাঁর যজ্ঞশালায়, তপোবনে,

মঠে, সিংহাসনে, ধর্ম্মে, সমাজে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে যে বৃহৎ জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, ইহা সেই জীবনের ইতিহাস। য়ুরোপ Giibbon, Buckle ও Leckyকে যেরূপ সম্মান করিবে, ভারতবর্ষ রমেশচন্দ্র দত্তকে সেইরূপ কেন, তদপেক্ষাও অধিকতর সম্মান করিবে। তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞ নিরক্ষর দেশবাসী আজ তাহা বুঝিতে পারিবে না। আজ পারিবে না, কাল পারিবে না, কিন্তু একদিন পারিবে, সেই আশা লইয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। শুধু আমাদের ভবিষ্যের উদীয়মান জাতীয়তাই তাঁহাকে পূজার অর্ঘ্য দান করিবেন, বিস্মৃত প্রাচীন যুগের ঋষিরাও অমর লোক হইতে তাঁহাকে অশীর্ব্বাদ করিবেন ; কেননা তিনি তাঁহাদিগকে জীবন্ত ভাবে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এস বন্ধুগণ, ভারতের এই মহা মনীষীকে আমরা আমাদের নবোত্থিত জাতীয় জীবনের অত্যুঙ্গ শিখরে স্থাপন করিয়া করযোড়ে ভক্তি বিনম্র হৃদয়ে প্রণাম করি। এস, ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য তিনি যে বৃহৎ আশা রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই মহৎ আশার মধ্যে, তাঁহার স্মৃতির সম্মানের জন্য মিলিত হই। সে মিলনে জগতে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করিবে, এক নূতন প্রভাব আনিবে। তিনি দেখাইয়াছেন আমাদের অতীত বৃহৎ ছিল, এই জন্য, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ এই অতীতের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতির সম্মানের অধিকারী যিনি হৃদয়ের মধ্যে তাহার জীবনের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষাকে বরণ করিয়া লইবেন। তিনিই তাঁহার স্মৃতির সম্মানের অধিকারী, যিনি ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের জন্য নিশিদিন কর্ম্মরত ও বদ্ধপরিকর। নতুবা বচন রাশি রচনা করিয়া তাঁহার নিষ্ফল চাটুবাদে কোনই ফল নাই। আমাদের মধ্যে অন্ততঃ দশজনও মৃত মহাত্মার জীবন হইতে, —সে কি জীবন, যাহা সূর্য্যের মত ভাস্বর, সমুদ্রের মত :গম্ভীর, তপস্বীর মত বিনিদ্র এমন জীবন হইতে যদি প্রকৃত বল ও মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতে পারেন, তবে তাঁহার উদ্দেশে অদ্যকার এই শোকসভা ধন্য হইবে। মৃত্যুর পর পার হইতে তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও অভয় দান করিবেন।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

দেবালয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবা-লয়' সমিতির পঞ্চম বৎসরের প্রথম ষাণ্মাসিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে 'দেবালয়' সমিতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এবারে দেবালয়ের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। গত বৎসর ৮৮৯ জন সভ্যছিল, এবারে সভ্য সংখ্যা ১০৭০। হিসাবের বিবরণীতে আয় ও ব্যয় উভ-য়েরই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। গত ছয় মাসে ১৯২৭৵০ আয় ও ১৪৩৪।০ ব্যয় হইয়াছে, ব্যাঙ্কে ৫৭০৶০ জমা পড়িয়াছে। দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ফেব্রুয়ারী মাসে দেবালয় সমিতিকে তাঁহার ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ৫০০, টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদে দেবালয়ের বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

দেবালয় সমিতির যাহা উদ্দেশ্য ও যেরূপ ভাবে ঐ সমিতির কার্য্য পরিচালিত হয় তাহা দেশের অনেক লোকই অবগত আছেন, তথাপি সে সম্বন্ধে সর্ব্বত্র আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের যাহা প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক মফঃস্বল সহরে 'দেবা-লয়'এর একটি করিয়া শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। মানব সভ্যতার ইতি-হাসে একটি নূতন যুগের লক্ষণ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই নবযুগের যাহা মহত্তম সংবাদ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা 'দেবালয়'এ আমরা তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হই।

'দেবালয়' বর্ত্তমান আকারে এই পাঁচ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইলেও এইখানেই তাহার যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ নহে। ইংরাজী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বরাহনগর নিবাসী সর্ব্বজন পরিচিত সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরাহনগরে 'সাধারণ ধর্ম্মসভা' নামক একটি সভা স্থাপন করেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মানবগণের মধ্যে প্রকৃত হৃদয়গত একতা, প্রেম ও সহানু-ভূতির ভাব আনয়ন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এ প্রকারের আন্দোলন ইহার পূর্ব্বে আর কোথায়ও কখন হয় নাই।

পূর্ব্বে কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য একত্র করা যে হয় নাই তাহা নহে। ভারতবর্ষে বাদশাহ আকবর তাঁহার সভায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আচার্য্যগণকে ধর্ম্মালোচনার জন্য একত্রে নিমন্ত্রণ করি-তেন, আধুনিক যুগে আমেরিকার স্বাধীন ধর্ম্মসভা (Free Religious Asso-

sciation) অনেকটা এই প্রকারের ছিল। কিন্তু এই সমস্ত সভার সহিত সাধারণ ধর্ম্মসভার বা 'দেবালয়'এর একটু প্রভেদ আছে, তাহাই বিশেষরূপে ভাবিবার কথা। পূর্ব্বে যে সমস্ত সমিতির কথা বলা হইল সেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের আলোচনা বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না। যে সমস্ত কথা সকল ধর্ম্মেরই অনুমোদিত কেবলমাত্র তাহারই আলোচনা হইত। এ প্রকারের আলোচনার যে খুব মূল্য আছে তাহা নিশ্চয়। কিন্তু একালের পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে প্রত্যেক জাতির জীবনের, প্রত্যেক সভ্যতার ও প্রত্যেক ধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্বে কোন কোন পণ্ডিত বলিতেন যে এই বিশেষত্ব ধ্বংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একালের মত কিন্তু অন্যরূপ। এ কালের পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে এই সমস্ত বিশেষত্বের বিলোপ সাধন সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। তাহা হইলেই এ যুগের সমস্যাটি এই, প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনার বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিবে অথচ পূর্ণ মত সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা ও মৈত্রীর সহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও সাধনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া উন্নত ও একতাবদ্ধ হইবে।

সাধারণ ধর্ম্মসভা ঠিক এই আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, হিন্দু হিন্দু সাধনা ও শাস্ত্রের মধ্যদিয়া, মুসলমান, মুসলমান শাস্ত্র ও সাধনার মধ্য দিয়া খৃষ্টান, খৃষ্টীয় শাস্ত্র ও সাধনার মধ্য দিয়া আপনার বক্তব্য বিষয় প্রচার করিতেন। অথচ কেহ অপর কাহাকেও উপহাস বা বিদ্রূপ করিতে পারিতেন না।

মানবজাতির ইতিহাসে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত বিরোধ, কত সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্‌গণ যাহারা গ্রীক নহে, তাহাদিগকে বার্ব্বেরিয়ান্ বলিতেন—বার্ব্বেরিয়ান কথাটা ঘৃণা ও অবজ্ঞাবাচক, হিব্রুজাতি অন্য জাতীয়গণকে জেণ্টাইল বলিতেন, এ কথাটিও ঘৃণাব্যঞ্জক। প্রাচীন হিন্দুগণ বৈদেশিকমাত্রকেই ম্লেচ্ছ বলিতেন—একথাটিও ভাল নহে। সেই প্রাচীন কালে ও বাণিজ্য দিগ্বিজয় প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্নজাতির মধ্যে যে মিলন বা সংঘর্ষ হইত না তাহা নহে, অনেক স্থলে চিন্তার আদান প্রদান ও যথেষ্ট পরিমাণেই হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এ কথাটি খুবই সত্য, যে সে যুগে প্রত্যেক জাতি নিজেকে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত এখন বিজ্ঞানের উন্নতি নিবন্ধন সে গণ্ডীর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—প্রাচ্য জগৎ ও প্রতীচ্য জগৎ বিবিধ প্রকার আদান প্রদানের মধ্যদিয়া একত্র সম্মিলিত, কাজেই এ যুগে অনেক নূতন জটিল সমস্যা ও সুধীগণের মনে উদিত হইয়াছে।

বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে এসিয়ার নবজাগরণের দ্বারা প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায় যে নিজ নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিবে এ কথা প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর লণ্ডন সহরে যে অন্তর্জাতিক সম্মিলনী (Inter Racial Congress) হয় তাহাতে এ কথাটি পরিষ্কাররূপেই স্বীকৃত হইয়াছে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এ যুগের এই প্রধান সমস্যার মীমাংসার কথা এক জন বাঙ্গালীর মনে উদিত হইয়াছিল, কথাটা মনে উদিত হওয়ার পর তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না এই মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের যথার্থ হিত সাধন করে তিনি বিনিদ্রভাবে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে কার্য্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আজ আমরা আমাদের জাতির গৌরবে মহত্ত্ব অনুভব করিতে চাই, আমাদের জাতির যাহা কিছু গৌরব করিবার আছে নিবিষ্টভাবে তাহার আলোচনার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা এ যুগের একটি খুব বড় সুসংবাদ। তাহা হইলে আমাদের আজ এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে এ কালের যাহা সমস্যা তাহার মীমাংসার এমন এক উপায় একজন বাঙ্গালী নিরূপণ করিয়াছেন যে তাহা ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানবজাতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আজকাল দেখিতেছি থিয়জফিক্যাল সোসাইটি, কেশবচন্দ্রের নববিধান, সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতির ধর্ম্মান্দোলনে এই সমস্যাটি বেশ সুন্দররূপে গৃহীত হইয়াছে। সেদিনও কলিকাতা সহরে এই সমস্যার মীমাংসার জন্য "ব্রহ্মসংসদ" নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঠিক এই ভাবে কার্য্য করার জন্য জাপানে Association Concordia নামক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সমস্তই একটি মঙ্গল ভাবের শুভ সূচনা। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করিবেন তাঁহারা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবেন যে বরাহনগর ধর্ম্মসভা এই সমস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী।

সাধারণ ধর্ম্মসভার কার্য্যের জন্যই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগরে শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউট নামক এক গৃহ নির্ম্মিত হয়। এখন সেই গৃহ ও সেই গৃহে রক্ষিত পুস্তকাগার বরাহনগরবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই এই ভবনে ধর্ম্মালোচনা করিবার অধিকারী, কেবলমাত্র বিবাদ, বিরোধ বা তর্ক না করিলেই হইল। বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে হইবে, বিদ্বেষ বুদ্ধির সহিত ধর্ম্ম একত্রে থাকিতে পারে না ইহাই 'দেবালয়'এর মূল ভাব।'

সাধারণ ধর্ম্ম সভা বা 'দেবালয়' সমিতি যেন মানবগণকে ডাকিয়া বলিতে-ছেন—"আমাদের দ্বার সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাবলম্বী ও সকল জাতীয় লোকের নিকট তুল্যভাবে অবারিত। আমরা কেহই শিক্ষক বা উপদেষ্টা নহি—আমরা কাহাকেও ডাকিয়া বলি না—আমরা একটা নূতন সংবাদ আনিয়াছি, বা আমরা সকল ধর্ম্মের একটা মহা সমন্বয় করিয়াছি, তোমরা এ অভিনব সংবাদ শুনিয়া যাও। আমরা এখানে শ্রদ্ধা লইয়া বসিয়া আছি, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, জৈন, পারসি, শিখ, যিনি যেখানে আছেন তাঁহার ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিশেষ সাধনা লইয়া আসুন, অমরা করজোড়ে তাঁহাদের আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আসিয়া আমাদের দান করুন আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত।"

ইহা অপেক্ষা অধিকতর উদার বা মহৎ কথা মানব জাতির ইতিহাসে কখন শ্রুত হয় নাই। মফঃস্বলে অনেক লোকের ধারণা যে 'দেবালয়' একটি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত প্রস্তাবে দেবালয় হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই তুল্যরূপে আপনার। দেবালয়ের অর্পণ পত্রে (Trust Deed)এই কথা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে "সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তেরাই "দেবালয়"কে নির্ব্বিরোধে তাঁহা-দের নিজের নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন—কোনো একটি বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় কখনও এই 'দেবালয়'কে কেবল তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে বা অধিকার করিতে পারিবেন না। সকল সম্প্রদায় হইতেই 'দেবা-লয় সমিতির অধ্যক্ষ সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

অর্পণপত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথমে বলা হইল যে সকল সম্প্রদায়ই দেবালয়কে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি "দেবালয়"এ ধর্ম্মালোচনা করিবেন তখন তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া যাইবেন, অন্ত লোকের বাড়ীতে আসি-য়াছি বলিয়া কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। তবে অবশ্য অন্ত সম্প্রদায়কে উপহাস বা বিদ্রূপাদি করিবেন না। মুসলমান তাঁহার মস্‌জিদে, হিন্দু তাঁহার মন্দিরে, খৃষ্টান তাঁহার গির্জ্জায় যেমন অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করেন দেবালয়ে তেমনি সকলেই নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিবেন।

তাহার পর বলা হইল "কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় দেবালয়কে নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে বা অধিকার করিতে পারিবেন না। সকল সম্প্রদায় হইতে

গৃহীত সভ্য দ্বারা গঠিত অধ্যক্ষ সভা দেবালয় পরিচালনা করেন। ইহা দ্বারা 'দেবালয়'এর সার্ব্বজনীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বেশ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলোযোগের সম্ভাবনা নাই। সকল সম্প্রদায়ের লোক দেবালয়ে নিয়মিত ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া দেবালয় সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ কথা আছে। 'দেবালয়'এ যে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাই হয় তাহা নহে। এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। সুরাপান নিবারণী সভা, বঙ্গীয় পরাবিদ্যা সমিতি, বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা, চৈতন্যতত্ব প্রচারিণী সভা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আদি, সাধারণও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টান সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি সকলেই 'দেবালয়'এ নিয়মিত ভাবে কার্য্য করেন। ইহা ছাড়া দান, সাহায্য করা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা আছে। সাধারণ ধর্ম্মসভা ও 'দেবালয় এর প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দেবালয়' সমিতিকে চৌদ্দ হাজার টাকা মূল্যের স্বকীয় বাসভবন রেজেষ্টারি করিয়া দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্, এ, বি, এল, মহাশয় দেবালয় সমিতির সভাপতি। আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেবালয় সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে ও মফঃস্বলে প্রত্যেক সহরে যাহাতে 'দেবালয়'এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

'দেবালয়' সমিতির বিষয় চিন্তা করিবার সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় উদিত হওয়া সম্ভব। পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে দেশে যে সমস্ত মঙ্গলকর ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা করাই প্রধান। এই উদ্দেশ্যে দেশে নানারূপ চেষ্টা ও আন্দোলন চলিতেছে। অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন। ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠাই এ কালের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

ভারতবর্ষ বড়ই বিচিত্র দেশ, ইহাকে দেশ না বলিয়া মহাদেশ বলিলেই ঠিক হয়। এ পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সমস্ত ধর্ম্মেরই লোক এই ভারতবর্ষের অধিবাসী। পারস্যের প্রাচীন অধিবাসী জোরাস্তার ধর্ম্মাবলম্বীগণ বহুকাল হইল তাঁহাদের মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বদেশে তাঁহাদের ধর্ম্মের নামগন্ধও নাই, কিন্তু তাঁহারা এখনও ভারতবর্ষের অধিবাসী। এই যে ভারতবর্ষে সর্ব্বধর্ম্মের ও সকল জাতির

লোকের একত্র বসতি ইহার অন্তরালে বিধাতার কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

একদল লোক বলেন যে ভারতবর্ষে যখন এত বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের বাস তখন এখানে জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। কথাটা কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত। দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধে তিনি ভারতের জাতীয় একতার যাহা ভিত্তি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দেবালয়ের যাহা আদর্শ তাহাও এই প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। এই প্রবন্ধ হইতে দুএকটি সারগর্ভ কথা নিয়ে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে একতাই বল, এবং তদনুসারে ভারতবর্ষ একতার দিকে চলিয়াছে। চারিদিকেই জাগরণের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। উত্তর ভারতবর্ষে "ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় শাখা ও সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় "সনাতনধর্ম্মসভা" নামক এই প্রকারের এক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে রায় বাহাদুর রঘুনাথ রাও "হিন্দুসংস্কার সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে জাতীয়ভাবের প্রতিষ্ঠা করার অর্থ কেবলমাত্র হিন্দুদিগকেই একতাবদ্ধ করা নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলকেই জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে উপলব্ধি করিতে হইবে যে তাহাদের সকলেরই মঙ্গলের পথ অভিন্ন, এবং তাহারা সকলেই এক মাতৃভূমির সন্তান। জাতীয় উন্নতির এমন একটা স্তর আছে যে সেখানে উপস্থিত হইলে আর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ থাকে না, আমাদের দেশ ও এখন সেইস্তরে উপস্থিত হইয়াছে। রাজনীতিক একতা ধর্ম্মগত সখ্যের সহিত মিলিত হইলে দেশের উন্নতি বেশ ক্ষিপ্রগতিতে হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনে বলাধান করিবার জন্য ধর্ম্মগত ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। সকল ধর্ম্মেরই মূল শিক্ষা এক, দেশের চিন্তাশীল ও প্রধান লোকেরা যত্তপি চেষ্টা করেন তাহা হইলে এই ঐক্য খুব সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে।

ইংরাজী ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে যখন খুব প্লেগ আরম্ভ হইল, তখন সঙ্কীর্ত্তনের খুব ধুম পড়িয়া গেল। অন্য কোন উপায়ে যখন এই প্লেগ দৈত্যের হস্তে অব্যাহতি পাওয়া গেল না তখন লোকে স্বভাবতঃই ভগবানের নামকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিল। এই সমস্ত সঙ্কীর্ত্তনে সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু,

শিখ ও জৈন ব্যতীত মুসলমানকেও যোগ দিতে দেখা গিয়াছে। এই সময়কার এডুকেশন গেজেটে এই প্রকারের সঙ্কীর্ত্তনের এক সুন্দর বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা হইতে এই টুকু বুঝা যাইতেছে যে এক সাধারণ বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকে তাহাদের সামান্য সামান্য পার্থক্য ভুলিয়া যায় ও একতাবদ্ধ হইয়া প্রাণমন বাক্যের দ্বারা সেই বিশ্বদেব পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়।

বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্ম সমন্বয়ের যুগ। রাজা রামমোহন রায় ইহার পথপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেন জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মন্দিরে এই গ্রন্থ পঠিত হয় বটে কিন্তু সেখানেও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মসমন্বয়ের একটি বিশেষ ত্রুটি আছে। তাঁহার মন্দিরের বেদি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অপর কেহ ব্যবহার করিতে পান না। এই স্থানে আমরা সাম্প্রদায়িকতা দেখিতে পাই। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব আছে—এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য—যেমন খোসা ও শস্য। বহিরঙ্গ ভাব লইয়াই ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ : আত্মার পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ ভাবের প্রয়োজন। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বহিরঙ্গ ভাব লইয়া বিরোধ করেন না, ভিতরের সত্যটুকু গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায় এইরূপে ভিতরকার সত্যটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পর অনেক লোকই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের যাহা বহিরঙ্গভাব তাহাও অবশ্য উপেক্ষণীয় নহে। অন্তরঙ্গভাবকে ধারণ ও পোষণ করিবার জন্য তাহাদের বিশেষ উপযোগীতা আছে। তাহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে। কিন্তু সেই গুলিকেই মুখ্য মনে করিয়া কলহ করা উচিত নহে।

বৈচিত্র্য বিশ্বসৃষ্টির একটি বিশেষ ব্যবস্থা। বৈচিত্র্য ধ্বংশ হইবার নহে। সমস্ত গাছ একরূপ নহে, একই গাছের দুইটি ফুল বা দুইটি পাতা একরূপ নহে। পশু জীবনের বৈচিত্র্য দেখিয়া মানব স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানবের মধ্যেও বৈচিত্র্য। দেহে ও যেমন মনে ও তেমনি। দুটি দেহ একরূপ নহে। আকার একরূপ হইলে বর্ণে প্রভেদ। বর্ণ একরূপ হইলে আয়তনে প্রভেদ। মানুষের বাহির হইতে অন্তরে বৈচিত্র্য ও প্রভেদ আরও বেশী। আমাদের প্রত্যেকেরই চিন্তা বাসনাও উদ্দেশ্য বিভিন্ন। আমাদের এক বিষয়ে যদি মিল থাকে তাহা হইলে সহস্র বিষয়ে অমিল। এ বৈচিত্র্যের সমাধান নাই, ইহা ঈশ্বরের বিধান। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়েও আমরা বৈচিত্র্যও মতভেদ মানিয়া লইতে শিক্ষা করিব।

প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে এই আদর্শ অবলম্বনে বরাহনগরে সাধারণ ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উপসংহারে তিনি এই প্রকারের সভা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন "If there is anything that can put an end to the Hindu and the Christain's antipathy, if there is anything that can make impossible the oft-recurring feuds between Hindus and Muhammadans, it is such an organisation and the brotherly feeling that will ensue as its inevitable result."

অর্থাৎ হিন্দু ও খ্রীষ্টানের মধ্যে যে বিরোধের ভাব আছে তাহা দূর করিবার জন্য, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বদা যে সংঘর্ষ হয় তাহা নিবারণ করিবার জন্য এই প্রকারের সভার প্রয়োজন। তাহা হইলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে যথার্থ ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আদর্শ হইতেই 'দেবালয়' সমিতির উদ্ভব। 'দেবালয়' এর শ্রীবৃদ্ধির সহিত দেশের মঙ্গল অতীব ঘনিষ্ঠভাবে বদ্ধ। আমরা আশা করি প্রত্যেক শিক্ষিত ও স্বদেশহিতৈষী ভদ্রলোক দেবালয়ের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন। মফঃস্বলের প্রত্যেক সহরে ও বৃহৎ পল্লীগ্রামে 'দেবালয়' এর শাখা অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

রামায়ণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত।

ইউরোপীয় সাহিত্যে যাহাকে 'এপিক' কবিতা বলে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সেই প্রকারের যে সমস্ত গ্রন্থ আছে তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর নাম ইতিহাস, অখ্যান বা পুরাণ ; আর এক শ্রেণীর নাম কাব্য। মহাভারত প্রথমশ্রেণীর এবং রামায়ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

বর্ত্তমান রামায়ণ ২৪০০০ শ্লোক লইয়া গঠিত এবং সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা তিনটী বিভিন্ন শোধিত সংস্করণে রক্ষিত, পশ্চিম ভারতীয় (ক), বঙ্গদেশীয় (খ) এবং বোম্বাই প্রদেশীয় (গ), প্রত্যেক পাঠের এক তৃতীয়াংশ শ্লোক অন্য দুইটীর একটীরও মধ্যে স্থান পায় নাই। বোম্বাই প্রদেশীয় সংস্করণ অনেক স্থলেই প্রাচীনতম পাঠের আকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, কারণ অপর দুইটী সংস্করণ সংস্কৃত

সাহিত্যের ক্লাসিক যুগের কেন্দ্র স্থলে উত্থিত হইয়াছিল। ঐ সকল কেন্দ্রে যথাক্রমে গৌড় এবং বৈদর্ভ লিখন প্রণালীতে রচনার প্রাদুর্ভাব থাকায় মহাকাব্যাত্মক ভাষার বিশৃঙ্খলতা তাহাদিগের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। রামায়ণ এ স্থলে যথাবিহিত কাব্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারত প্রাচীন মর্য্যাদা হানির জন্য এবং উপদেশাত্মক গ্রন্থ বলিয়া ব্যবহৃত হওয়ার জন্য এ আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই। যাহাহউক পরবর্ত্তী দুইটী সংস্করণ বোম্বাই প্রদেশীয় পাঠের সংশোধন বলিয়া যেন ধরা না হয়, যখন তিনটী শোধিত সংস্করণ লিখিত আকারে প্রকাশ হওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে যথাযথ আকার ধারণ করিতেছিল তখন ব্যবসায়ী গায়কদিগের মৌখিক জনশ্রুতির অস্থিরতা প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে এইরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর হইতে এই সকল শোধিত সংস্করণের ভাগ্য অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় হইয়াছিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালের বলিয়া বোধ হয়, কারণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর গ্রন্থে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায় যে সম্ভবতঃ (গ) ও (ক) র অনুরূপ শোধিত সংস্করণ তখন বিদ্যমান ছিল, আরও মূল গ্রন্থের সুচারু সম্পূর্ণ অনুগমনকারী ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত 'রামায়ণ কথাসার মঞ্জরী' নামক কাব্য-সংক্ষেপ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে ইহার গ্রন্থকার একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (ক) ও (খ) পাঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন, 'রামায়ণ চম্পূ' নামক অপর একটী সংক্ষেপ গ্রন্থের রচয়িতা ভোজও ঐ শতাব্দীতে (গ) পাঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক জেকবি (Jacobi) যত্নের সহিত অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, যে রামায়ণ প্রথমে পাঁচখণ্ডে (২-৬) বিভক্ত ছিল, সপ্তম খণ্ডটী নিশ্চয়ই পরে সংযোজিত হইয়াছে কারণ ষষ্ঠ খণ্ডের উপসংহারই এক সময় সমগ্র কাব্যের শেষ বলিয়া ধরা হইত। আবার প্রথম খণ্ডের অনেক স্থল পরখণ্ডের অনেক স্থলের সহিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, আরও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট দুইটী সূচীপত্রের নির্ঘণ্ট পত্র (প্রথম ও তৃতীয় সর্গের মধ্যে) নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত কারণ তাহাদের মধ্যে একটী প্রথম ও শেষ খণ্ডের কোন সন্ধানই লয় না। এই দুইটী খণ্ড সন্নিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই তাহারা প্রণীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভাংশের পারম্পর্য্য হইতে মূল গ্রন্থের আরম্ভাংশ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সর্গের আরম্ভাংশ স্বরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আরও কতিপয় সর্গ যথার্থ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অধ্যাপক জেকবি (Jacobi)

দেখাইয়াছেন প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে এই প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলি এরূপ অসম্বদ্ধ যে সহজেই ইহা দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা হউক তাহারা প্রাচীন অংশের ভাবে অনুপ্রাণিত, ইহা হইতে এরূপ ধারণা করিবার কোন আবশ্যক নাই যে তাহারা যোদ্ধৃজাতিগণের জন্য রচিত এবং পরে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সংশোধিত। লৌকিক রুচ্যনুযায়ী ব্যবসায়ী গায়কদিগের ইচ্ছানুরূপ ইহাদের উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণেই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কবিতা, হয় ব্যবসায়ী গায়কদিগের দ্বারা মৌখিক গীত হইত নয় তারযন্ত্রের সহিত একতানে গীত হইত। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ ও লবের মৌখিক গীতোচ্চারণ হইতেই ইহার উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়। কুশ ও লব দুইটী নাম, কুশীলব, কবি অথবা নট bard or actor শব্দটী ব্যাখ্যা করিবার জন্য লৌকিক শব্দ সাধন বিদ্যার আবিষ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যে তিনটী শোধিত সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বেই নূতন অংশগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মূল কাব্যের রচনা এবং পরবর্ত্তী যোজনার সময়ে অনেক ব্যবধান রহিয়াছে, কারণ পূর্ব্বের কুলবীর, জনসাধারণের নৈতিক আদর্শ স্বরূপ এখনকার জাতীয়বীরে পরিণত হইয়াছেন, মুল পঞ্চখণ্ডের নরবীর (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়) প্রথম ও শেষ খণ্ডে দেবরূপী এবং ভগবান বিষ্ণুর সহিত এক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের নিকট সর্ব্বদাই তাঁহার দেবরূপ বর্ত্তমান ছিল, এস্থলে রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি ভূয়োদর্শী বলিয়া আগেই পরিচিত হইয়াছেন, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক সময়ের ব্যবধান আবশ্যক।

অযোধ্যায় ইক্ষাকুগণের দ্বারা শাসিত কোশল প্রদেশ যে রামায়ণের উৎপত্তি স্থান ইহা যুক্তিযুক্ত, কারণ আমরা সপ্তম খণ্ডে (৪৫ সর্গে) জানিতে পারিয়াছি যে বাল্মীকির তপোবন গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বর্ত্তমান ছিল; আর বলা যাইতে পারে যে অযোধ্যার রাজবংশের সহিত কবির কোন পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল কারণ নির্ব্বাসিতা সীতা তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই আশ্রমেই তাঁহার যমজ সন্তানের জন্ম হয়, সেই স্থানেই তাহারা লালিত পালিত হয় এবং বাল্মীকির মুখনিঃসৃত রামায়ণ শিক্ষা করে, এবং সর্ব্বশেষে প্রথমখণ্ডে (পঞ্চম সর্গে) বর্ণিত হইয়াছে যে রামায়ণ ইক্ষাকু বংশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব অযোধ্যার রাজসভার কবিগণের ইক্ষাকুবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী লইয়া কাব্যরসাত্মক অনেক গল্পের প্রচার থাকিবে, বাল্মীকি বোধ হয় এই সকল গল্পগুচ্ছের একত্র

সমাবেশ করিয়াছিলেন। এই কাব্য প্রাচীন এবং মহাকাব্যাত্মক হওয়ায় গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী ব্যক্তিদ্বারা 'আদিকাব্য' রূপ যথার্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তার পর এই গ্রন্থের ব্যবসায়ী পুরাণ পাঠকগণ (কুশীলব) ভ্রমণকালে এক দেশ হইতে অন্যদেশে আবৃত্তি করিতেন।

মহাভারতের সার আখ্যায়িকা টুকু বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই রামায়ণের প্রথম (মূল) অংশ শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়' কারণ মহাভারতের কোন নায়কেরই আমরা রামায়ণে উল্লেখ পাই না, কিন্তু বৃহৎ কাব্য রামায়ণের অনেক সময় উল্লেখ পাই, আবার মহাভারতের সপ্তম পর্ব্বে উদ্ধৃত দুই পংক্তিরই রামায়ণের ষষ্ঠ খণ্ডে সমাবেশ দেখিতে পাই। অতএব অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে বিরচিত এবং প্রাচীনতর; এমন কি মহাভারত তখন বিশিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। মহাভারতের তৃতীয় পর্ব্বের (২৭৭—২৯১ সর্গে) রামোপাখ্যান 'রামায়ণের উপর স্থাপিত,কারণ ইহাতে বাল্মীকির লেখনীর অনুরূপ অনেক কবিতা আছে, ইহার গ্রন্থকার ধরিয়া লইয়াছেন যে রামায়ণের বেম্বাই-প্রদেশীয় শোধিত সংস্করণ তাঁহার পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন।

আর একটী গুরুতর প্রশ্ন, বৌদ্ধ সাহিত্যের সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ হিসাব করিয়া রামায়ণের কাল নিরূপণ। পালিপুস্তক সকলের মধ্যে 'দশরথ জাতক' নামক পুস্তিকায় আমরা রামায়ণের গল্প কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে দেখিতেপাই, এই অনুবাদটী রামের সাহসিকতার প্রথম অংশ অর্থাৎ তাঁহার বনগমন লইয়া গঠিত; প্রথম দৃষ্টিতে ইহা দুইটীর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, যাহা হউক গল্পের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ লঙ্কাভিযান ও জাতক রচয়িতার অবিদিত ছিল না ইহারও পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ বাল্মীকির কাব্য রাম-সীতার পুনর্ম্মিলন লইয়া শেষ এবং 'জাতক', রাম-সীতার বিবাহ লইয়া শেষ। প্রাচীন কাব্যেও আমরা তাহাদিগের বিবাহের কথা শুনিতে পাই। আরও রামায়ণের মূল অংশের একটী শ্লোক পালি আকারে আমরা এই জাতকের মধ্যে পাই।

যেরূপ অধিকতর স্বাধীনতার সহিত ইহাঁরা শ্লোকের ছন্দের নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ লিপি সমূহ রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর, রামায়ণের শ্লোক ক্লাসিক্ ছাঁচে ঢালা, বাস্তবিক পক্ষে এই পালিগ্রন্থসমূহ মোটের উপর ক্লাসিক্ শ্লোকের নিয়মাবলী পরিরক্ষণ করিয়াছে পালি, আধুনিক পালি সাহিত্যে প্রয়োগ হেতু এবং গ্রন্থের

অযত্ন রক্ষণ হেতু তাহাদিগের ছন্দ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, পক্ষান্তরে বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রথমে আর্য্যা ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই আর্য্যা ছন্দের সংস্কৃত কাব্যের ক্ল্যাসিক্ যুগে খুব চলন ছিল এবং ইদানীং ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত একস্থলে আমরা বুদ্ধের উল্লেখ পাই। মূল রামায়ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই অনুকূল সাক্ষ্য পাই।

আমাদের কাব্য রচয়িতা গ্রীকদিগের পরিচিত ছিলেন কি না ইহা আনু-পৌর্ব্বিকতা নিরূপক কাব্য পাঠে আমরা যবন (Greeks) দিগের দুইবার মাত্র উল্লেখ পাই, একবার প্রথম এবং আর একবার চতুর্থ খণ্ডের এক সর্গে ; অধ্যাপক জেকবি এই দুই অংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে মূল গ্রন্থের পরবর্ত্তী যোজনা সমূহ খ্রীষ্টীয় পূঃ ৩০০ শতাব্দীতে হইয়াছে, অধ্যাপক ওয়েবারের রামায়ণ গ্রন্থে গ্রীক প্রভাব ভ্রমাত্মক এবং ভিত্তিহীন, কারণ সীতাহরণ, এবং সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কাভিযা-নের সহিত হেলেন হরণ, এবং ট্রয় যুদ্ধের কোন প্রকৃত সম্বন্ধ নাই, অথবা রামের সীতালাভের জন্য হরধনুভঙ্গের সহিত Ulyssesর সাহসিকতার কোন প্রমাণ-যোগ্য সাক্ষ্য নাই, গ্রীক্ ছাড়া অন্যান্য জাতির কবিতার মধ্যেও এরূপ শৌর্য্য পরিচায়ক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এসব গল্পের স্বাধীনভাবে উৎপত্তি হইবারও সম্ভাবনা আছে।

রামায়ণের প্রকাশিত পূর্ব্বভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃশ্য হইতে আমরা কাব্যযুগের সম্বন্ধে অনেকটা জানিতে পারি। প্রথমতঃ রাজা কালাশোকের (যাঁহার অধীনে বৈশালীতে ৩৮০ পূঃ খ্রীঃ দ্বিতীয় বৌদ্ধ সভা আহূত হইয়াছিল) স্থাপিত পাটলীপুত্র (Patna) নগরের কোন উল্লেখ পাই না। মেগাস্থিনিসের (৩০০ পূঃ খ্রীঃ) ভারতাগমন সময়ে পাটলীপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। অথচ রাম (প্রথমখণ্ড ৩৫ সর্গে) যে স্থানে নগরী বর্ত্তমান ছিল সেই স্থানই অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন এইরূপভাবে, বর্ণিত হইয়াছেন। কোশলের বহির্ভাগে রামায়ণের খ্যাতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য কবি পূর্ব্ব হিন্দুস্থানে স্থাপিত কৌশাম্বী, কান্যকুব্জ এবং কাম্পিল্য প্রভৃতি নগরীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সময় পাটলীপুত্র বর্ত্তমান থাকিলে নিশ্চয়ই উল্লিখিত হইত।

এটী বিশেষ স্মরণ রাখিবার জিনিষ যে মূল রামায়ণে কোশলের রাজধানী

'অযোধ্যা' বলিয়া অভিহিত হইত কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন, গ্রীক এবং পাতঞ্জলি সর্ব্বদাই ইহাকে 'সাকেত' আখ্যা দিয়াছেন। রামায়ণের শেষ খণ্ডে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব শ্রবস্তি নগরে শাসনভূমি নিরূপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা মূলগ্রন্থে এই নগরীর কোন উল্লেখই পাই না। বুদ্ধের আবির্ভাব কালে কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ শ্রবস্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহাও অবগত হওয়া যায়, এই সমস্ত বিবরণ হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে মূল রামায়ণ রচিত হইবার সময় প্রাচীন অযোধ্যা পরিত্যাগ করা হয় নাই, তখনও ইহা কোশলের প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সাকেত আখ্যায়অভিহিত হয় নাই এবং তখনও শ্রবস্তি নগরীতে শাসনভূমি স্থানান্তরিত হয় নাই।

আবার প্রথম খণ্ডের মূল অংশে মিথিলা ও বিশালা বিভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন সমরূপ নগরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাব কালে এই দুই নগরী একত্র হইয়া বিখ্যাত নগরী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এই দুই নগরী একত্র হইয়া বিখ্যাত বৈশালী নগরী নাম ধারণ করিয়াছিল এবং কতিপয় মাত্র শাসন- তন্ত্রের অধীন হইয়াছিল।

রামায়ণের বর্ণিত রাজনৈতিক অবস্থা হইতে অবগত হওয়া যায় যে গোষ্ঠী সম্বন্ধীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল অর্থাৎ প্রত্যেক গোষ্ঠীপতির অধীন এক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ ছিল, বিভিন্ন প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল না। আবার মহাভারতের কবিগণের উল্লিখিত রাজা জরাসন্ধের দ্বারা শাসিত (মগধ ছাড়া) রাজ্য সকল হইতে আমরা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থা জানিতে পারি, উপরি লিখিত যুক্তি হইতে আমরা এই সংযোজক সাক্ষ্য পাইতে পারি যে রামায়ণের সার আখ্যায়িকা টুক খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীর পূর্ব্বে নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছে, আধুনিক অংশগুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী কিম্বা তাহার পর সংযোজিত হইয়াছে।

রামায়ণের ভাষা হইতে কিন্তু প্রথমতঃ আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। কারণ মহাভারতের অনুরূপ বোম্বাই শোধিত সংস্করণের মহাকাব্যাত্মক ভাষা হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহা পাণিনীর পরবর্ত্তী যুগের ভাষা এবং বৈয়াকরণিক পাণিনীও ইহার কোন সন্ধানই লন নাই। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইহা পরবর্ত্তী যুগের নয়। কারণ পাণিনী ব্রাহ্মণগণের সাধু সংস্কৃত ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তজ্জন্ত ভ্রমণকারী গায়কদিগের ভাষাপেক্ষা অধিকতর

প্রাচীন ; ইহা হইতেই বুঝা যায় যে পাণিনী স্বভাবতঃ ইহার অবজ্ঞা করিয়াছেন। অশোক অনুশাসনের যুগে কিম্বা অর্দ্ধশতাব্দী পরের যুগে ভারতবর্ষের যে অংশে রামায়ণ প্রণীত হইয়াছিল সে অংশে জনসাধারণের মধ্যে 'প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে সম্ভবতঃ রামায়ণ পাণিনীর যুগে রচিত হয় নাই কারণ ইহা সর্ব্বসাধারণোপযোগী, পাণিনীর সময় জনসাধারণ শিষ্ট ভাষায় লিখিত সংস্কৃত কখনই বুঝিতে পারিত না, যদি কাব্য পাণিনীর পরবর্ত্তী যুগের হয় তাহা হইলে কাব্যের ভাষা কখনই পাণিনীর ব্যাকরণের একছত্র প্রভাব অতিক্রম করিত না। ইহাই অধিকতর সম্ভব যে কাব্যের লৌকিক সংস্কৃত বাল্মীকি প্রণীত কাব্যের দ্বারা অপেক্ষাকৃত অগ্রেই সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ক্ল্যাসিক্ কাব্যের মধ্যে আপেক্ষিক (উৎকর্ষ অপকর্ষ মূলক) অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে তাহারা ভাষা হিসাবে প্রাচীন কাব্যের সহিত অধিকতর নিকট সম্বন্ধে অন্বিত, সাধারণতঃ যাহা অনুমান করা যায় তাহা অপেক্ষা তাহারা পাণিনীর আদর্শ হইতে বিপথগামী।

লিখন প্রণালীতে রামায়ণ, সরল লোকপ্রিয় কাব্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। লোকপ্রিয় কাব্যের গল্পই প্রধান জিনিষ, আকার কিছুই নয়। বাল্মীকি উপমায় অদ্বিতীয়, সর্ব্বদাই তিনি উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন ; তিনি সর্ব্বদাই কৌশলের সহিত রূপক নামীয় সমান জাতীয় অলঙ্কারের (পাদ—পদ্ম) ব্যবহার করিয়াছেন। সময় সময় ক্ল্যাসিক্ কবিগণের দ্বারা ব্যবহৃত অলঙ্কারেরও প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বর্ণনায় তাহাদিগের সাধ্যমত অনুগমন করিয়াছেন। রামায়ণ পরবর্ত্তী কাব্যের প্রভাত স্থানীয় এই কাব্যকলা বাল্মীকির গ্রন্থের আবৃত্তিকারী গায়কগণ হইতে ক্রমশঃ উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ল্যাসিক্ কাব্যের রচয়িতাগণ এইরূপ বিশেষ সম্বন্ধই ধরিয়াছেন এবং তাঁহাকে 'আদিকবি' এই আখ্যা দিয়াছেন।

মূল রামায়ণ গ্রন্থে বর্ণিত গল্প দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। অযোধ্যার রাজা দশরথের রাজ সভার ঘটনাবলী লইয়া প্রথম অংশ সম্পূর্ণ। এই অংশে আমরা সন্তানের রাজ্য লাভের জন্ম রাজ্ঞীর ষড়যন্ত্রের নিখুঁত ও স্বাভাবিক চিত্র পাই। এ ঘটনা বিবৃতিতে পৌরাণিক কিম্বা কাল্পনিক কিছুই নাই। যদি বৃদ্ধ রাজা দশরথের মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত কাব্য শেষ হইত তাহা হইলে ইহা ঐতিহাসিক গল্প (Saga) এই আখ্যা লাভ করিত, কারণ এমন কি ঋক্ বেদেও আমরা ইক্ষাকু, দশরথ ও রাম প্রভৃতি

ক্ষমতাশালী বিখ্যাত রাজাগণের উল্লেখ পাই, যদিও তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ পাই না।

দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা পৌরাণিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং তজ্জন্য কাল্পনিক ও আশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ,। গল্পের অর্থ সম্বন্ধে প্রাচীন মতাবলম্বী, ল্যাসেন। (Lassen) তাঁহার মতে আর্য্যদিগের দক্ষিণ দেশ জয়লাভ করিতে চেষ্টা রূপকভাবে বর্ণনা করাই গল্পের উদ্দেশ্য; কিন্তু কাব্যে কোথাও রামের দাক্ষিণাত্যে আর্য্য রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা বা অভিযানের ইচ্ছা পাওয়া যায় না, ওয়েবার (Weber) পরে এই মত ভিন্ন আকারে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দক্ষিণদেশে এবং লঙ্কায় আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করাই রামায়ণের উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপকাত্মক মতের কাব্য হইতে কোনরূপ সমর্থনই পাওয়া যায় না; কারণ রামের অভিযান দক্ষিণদেশের কোনরূপ উন্নতিই সাধন করে নাই। কবি দাক্ষিণাত্যের কিছুই জানেন না। তথায় ব্রাহ্মণদিগের তপোবন আছে কেবল ইহাই জানেন,নচেৎ ইহা রাক্ষস এবং কল্পিত প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত এবং ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে ইহা কল্পনার রাজ্য।

জেকবির (Jacobi) মত খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মতে রামায়ণে আদৌ রূপক নাই, ইহা ভারতীয় পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় অংশ বেদের পৌরাণিক গল্প সাধারণ নিয়মে পার্থিব সাহসিক কার্য্যে পরিবর্ত্তিত আখ্যানের উপর স্থাপিত। ঋক্ বেদে সীতার উল্লেখ পাওয়া যায়, বেদে তিনি লাঙ্গল চিহ্নরূপী সাক্ষাৎ দেবীরূপে আহূতা। কতকগুলি গৃহ্যসূত্রে আবার তিনি, কর্ষিতক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আবির্ভূতা, অলোকসামান্যা সৌন্দর্য্যের জন্য প্রশংসিতা এবং ইন্দ্র বা পর্জ্জন্যের স্ত্রী স্বরূপ প্রতীয়মানা, কারণ সীতা রামায়ণে পৃথিবী সম্ভূতা; পিতা জনকের হলকর্ষণ হইতে উত্থিতা এবং অবশেষে পুনরায় মাতৃক্রোড়ে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, তাঁহার স্বামী রাম, ইন্দ্র ব্যতীত আর কেহ নন এবং দৈত্যরাজ রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ. ঋক্‌বেদের ইন্দ্রবৃত্র পৌরাণিক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। এই একীকরণ রাবণ সন্তান ইন্দ্রজিত অথবা ইন্দ্রশত্রু, (ঋক্‌বেদে বৃত্রের প্রকৃত আখ্যা নাম দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।) রাবণের সীতা হরণরূপ বিখ্যাত ব্যাপারের মূল, ইন্দ্রের দ্বারা মুক্ত গাভী হরণ। বানর রাজ এবং সীতার উদ্ধারের প্রধান সহায় হনুমান পবন সুত, পৈত্রিক মারুতি আখ্যা বিশিষ্ট এবং সীতান্বেষণে আকাশে শত যোজন ব্যাপী উড্ডীয়মান। তাঁহার চরিত্রে আমরা বৃত্রযুদ্ধে ইন্দ্রের মারুতগণের সহায়তার

চিহ্ন পাই। ইন্দ্রের দূত সরমা কুকুরের বাস অতিক্রম এবং গাভীর অনুসরণেরও উল্লেখ পাই। সীতার রাবণগৃহে অবরোধ সময়ে আবার সান্তনা দাতা সরমা নাম্নী রাক্ষস পত্নীর উল্লেখ পাইয়া থাকি, হনুমৎ নামটি খাঁটি সংস্কৃত, আদিম অধিবাসীগণের নিকট এ চরিত্র গ্রহণ করা হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে হনুমান ভারত বর্ষের সর্ব্বত্র গ্রাম্য দেবতা বলিয়া পূজিত হওয়ায় অধ্যাপক জেকবির (Jacobi) তাঁহার কৃষির সহিত সম্বন্ধ এবং মনমুন বায়ুর উপদেবতাখ্যা সম্ভবপর।*

শ্রীবনবিহারী দাস।

বিক্রম-সংবৎ।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ অব্দে প্রতিষ্ঠিত একটী অব্দ এখন বিক্রম সংবৎ নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। এই সকল বাদানুবাদের একটী সন্তোষজনক মীমাংসা করাই আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ডাক্তার কীলহর্ণ বলেন যে এই অব্দ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহার আদিনাম ছিল 'মালবাব্দ'। পরে উত্তর কালে কোন রাজা বিক্রমপ্রভাবে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই মালবাব্দের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে 'বিক্রমসংবৎ' নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কোনটীতেই তিনি 'বিক্রমাব্দ' এই নামের উল্লেখ দেখিতে পান নাই। সে পর্য্যন্ত সমস্ত লিপিতেই 'মালবাব্দ' নামক অব্দের উল্লেখ ছিল! তিনি যে সকল শিলালিপি অবলম্বন করিয়া স্বীয়মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে 'মালবাব্দ' নামের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে তৎকালে উক্ত অব্দের 'বিক্রমাব্দ' নাম একেবারেই ছিল না এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। অবশ্য এই অব্দ যে মালবদেশেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং কোন ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক কোন ঘটনাবিশেষকে স্মরণীয় করিবার জন্য যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে বিষয়েও সংশয়ের কোন কারণ নাই। ডাক্তার কীলহর্ণ যদিও বলিয়া গিয়াছেন যে ইহা মালবাব্দেরই পরিবর্ত্তিত নাম, এই

* Macdonell সাহেবের গ্রন্থ হইতে।

বিক্রমাদিত্যই এই পরিবর্ত্তনের মূল, তথাপি তিনি মালবাব্দের উৎপত্তি বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। মালবজাতি বুদ্ধদেবের সময় হইতেই মালবদেশে বাস করিতেছিল অথচ পূর্ব্বে কোন অব্দ প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাহারা ৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দেই বা কেন একটী অব্দ স্থাপন করিল তাহার কি কোনও কারণ নাই? নিশ্চয়ই ইহার উৎপত্তির সহিত কোনও স্মরণীয় ব্যক্তির ইতিহাস জড়িত আছে।

সেই ব্যক্তিকে এবং কেন তিনি এই অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা মীমাংসা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে আমরা বিচার করিতে চাই যে ডাক্তার কীলহর্ণের মত প্রমাণিক কি না। যদি তাঁহার মত সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিক্রমাদিত্য নামক কোন বিজয়ী নৃপতি স্বকীয় বিজয় সংবাদ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটী অব্দ প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন অব্দ স্থাপন না করিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত মালবাব্দেরই নাম নিজ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মত। কিন্তু এইরূপ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি অনায়াসে একটী নূতন অব্দ প্রচলিত করিতে পারিতেন এবং এইরূপ করিলেই তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিতে পারিত;—পুরাতন অব্দের নাম পরিবর্ত্তন অপেক্ষা এই উপায়েই তাঁহার উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইতে পারিত। নূতন অব্দ প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার রাজত্বকাল ও কীর্ত্তিনিচয়ের প্রকৃত কালনিরূপণ করা সহজ হইত। আমাদিগের পুরাণ প্রভৃতিতে লিখিত আছে যে পুরাকালে লোক প্রসিদ্ধ বিজয়ীগণ স্ব স্ব নামে এক একটী নূতন অব্দের প্রচলন করিতেন। পরবর্ত্তী কালেও বিক্রমাদিত্য, কনিষ্ক, শ্রীহর্ষ ও শিবাজী প্রভৃতি রাজা ও বীরগণ এক একটী অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজেতার অদম্য যশোলিপ্সা অন্তের প্রচলিত একটী অব্দে নিজ নাম সংযোজিত করিয়া দিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, নূতন অব্দ স্থাপন না করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। নূতন অব্দ প্রচলন ভিন্ন তাঁহার কীর্ত্তির প্রকৃতকাল নিরূপিত হওয়া অসম্ভব এবং তাহা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গিয়া সাধারণ ঘটনার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, ইহা তাঁহার ন্যায় একজন বিজয়ীর অবিদিত ছিল না। সুতরাং আমরা নাম পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত মতের যৌক্তিকতা দেখিতে পাইতেছি না।

কীলহর্ণের মতের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার হয়ের্ণলি ও ডাক্তার

ভাণ্ডারকর বিক্রমাদিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। হয়ের্ণলি বলেন যে মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া যশোধর্ম্মন্ বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই মালবাব্দের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিক্রমাব্দ নাম করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারকর বলেন যে গুপ্তবংশীয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তই সর্ব্বপ্রথমে বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই এই নাম পরিবর্ত্তনের মূল। পূর্ব্বেই আমরা কীলহর্ণের মতের অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল মতই যে অসঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি আমরা এই দুইটী মতের পৃথক্ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। চন্দ্রগুপ্তের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত অব্দ রহিত করিয়া মালবদেশে প্রচলিত একটি অব্দকে গ্রহণ করিবেন ও তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নিজনামে প্রচারিত করিবেন, এরূপ অনুমান করা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। আর যদি তাহাই সম্ভব হয়, তবে চন্দ্রগুপ্তের পরেও একশতাব্দী পর্য্যন্ত যশোধর্ম্মনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত শিলালিপি সমূহেও মালবাব্দ নামেরই উল্লেখ দেখা যায় কেন? যশোধর্ম্মন্ যে মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মালবাব্দের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকেই নিজ নামে প্রচারি করিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বলিখিত লিপি সমূহের মধ্যে কোনটীতেই উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে আমাদিগকে এই দুইটী মতও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে মালবদেশের যে অধিপতি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০ অব্দে এই অব্দ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সর্ব্বদা উল্লিখিত না হওয়ায় তাহা কালক্রমে বিস্মৃতির সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য নামধারী কোন রাজা বাস্তবিকই মালবদেশে রাজত্ব করিয়া নানা দেশ জয় করিয়াছিলেন কি না? তাঁহার নামীয় কোনও শিলালিপি বা মুদ্রা পাওয়া যায় নাই বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকেই তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের শতবাহন বংশীয় রাজা হল সপ্তশতী গাথা বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদিগের অবিশ্বাসের কোনও কারণ থকে না। ভিন্‌সেণ্টস্মিথের মতে রাজা হল ৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এপর্য্যন্ত কেহ এই মতের প্রতিবাদ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত এই গাথার পঞ্চম শতকের পঞ্চষষ্টিতম শ্লোকে রাজা

বিক্রমাদিত্যের দানশীলতার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে হল রাজার পূর্ব্বেই রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেই রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অতঃপর বিক্রমাদিত্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য অর্থাৎ শক পরাজয়ের যথার্থতা নিরূপণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আলবিরুনির ইতিহাসে লিখিত আছে যে বিক্রমাদিত্য করুরের যুদ্ধে শকজাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই বিক্রমাদিত্য যে হল লিখিত খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আলবিরুনির মতে যশোধর্ম্মনের বহু পূর্ব্বেই করুরের যুদ্ধে হইয়াছিল, এবং যশোধর্ম্মনের শিলালিপি সমূহেও এই যুদ্ধ বা মিহিরকুলের সহিত অন্য কোনও যুদ্ধের উল্লেখ মাত্র নাই। সুতরাং যশোধর্ম্মন ও এই বিক্রমাদিত্য যে এক লোক নহেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। শক জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করায় বিক্রমাদিত্য শব্দ ক্রমে ম্লেচ্ছ বিজেতৃগণের উপাধি স্বরূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালে যে কোনও রাজা ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন তিনিই বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কহ্লন প্রণীত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, উজ্জয়িনীর রাজা যশোধর্ম্মন্ বিক্রমাদিত্য উত্তর ভারতের সম্রাটছিলেন এবং তিনি মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের শূন্য সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কহ্লন শকারি বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার প্রতাপাদিত্য নামক জনৈক আত্মীয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার ষ্টীন্ সাহেবের মন্তব্য অনুসারে ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, একজন শকারি বিক্রমাদিত্য প্রতাপাদিত্য নামক তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে কাশ্মীরে রাজ্যস্থাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং আর একজন বিক্রমাদিত্য পরবর্ত্তীকালে মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের শূন্য সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম বিক্রমাদিত্যই হল বর্ণিত খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য।

মহাবীর আলেক্‌জান্দারের সময় হইতে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণকাল পর্য্যন্ত পঞ্চদশ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া ভারতবর্ষ অবিরত বিদেশীয়আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়াছিল এবং ক্রমাগত ভারতীয় আর্য্যদিগের সহিত যবনদিগের ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে আর্য্যগণ পুনঃপুনঃ যবনদিগকে বিতাড়িত

করিয়া অবশেষে হতবীর্য্য হইয়া কুতবউদ্দীনের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ আলেক্জান্দার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভারতআক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রমের সম্মুখে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার একশত বৎসর পরে ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীক্গণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনুমান ১৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পুষ্পমিত্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। অতঃপর তিব্বতীয় ইউচিগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতে প্রবেশ করে ও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ তক্ষশিলা ও মথুরায় এবং অন্য ভাগ কাটিওয়ারে বাস নির্দ্ধারণ করে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ বলেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব একশত অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলা ও মথুরার শত্রপ রাজগণের অধীনস্থ শকদিগের বিবরণ পাওয়া যায়; তৎপরে আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে হল বর্ণিত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য ৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ইহাকে পরাভূত করিয়া শকারি নাম প্রাপ্ত হন এবং এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি অব্দের প্রবর্ত্তন করেন; ইহাই "মালবাব্দ" বা "বিক্রমসংবৎ" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কাটিওয়ারের শকসম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়। অতঃপর ইউচি জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহাদের রাজা কনিষ্কের রাজত্ব বহুবিস্তৃত ছিল এবং স্মিথ্সাহেবের মতে কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বসুদেব প্রায় একশত বৎসর কাল রাজ্য করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ইহাদিগকে পরাজিত করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চাশশতাব্দীতে শ্বেতবর্ণ হুন জাতি ভারত আক্রমণ করে কিন্তু তাহাদিগের রাজা মিহিরকুল যশোধর্ম্মন্ কর্ত্তৃক ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিধ্বস্ত হন। পুনরায় সপ্তম শতাব্দীতে হূণজাতি ভারত আক্রমণ করিয়া কান্যকুব্জরাজ শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। ইহার পর তিনশতাব্দীব্যাপী শান্তির পর মহম্মদ গজনবী ও ঘোরীর আক্রমণ এবং মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে পৃথ্বিরাজের পরাজয়।

তক্ষশিলার ও মথুরার শকদিগের বিষয় যতদূর অবগত হওয়া গেল, তাহাতে জানাগেল যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নিশ্চয় ইহাদিগের পতন সংঘটিত হইয়াছিল। এই ঘটনার সহিত হলরাজের সপ্তশতী এবং আলবিরুণী ও কহ্লনের সংগৃহীত প্রবন্ধ সমূহের সামঞ্জস্য করিলে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথমশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া এই শকজাতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। গণ্ডকারেস্ বা গন্তক্যারেসের তকৃতিবাহী শিলালিপি দ্বারা আমাদিগের এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হয়। এই ফলকে ১০৩ অব্দের উল্লেখ আছে এবং এই সময়

পারসিয়ার রাজা গন্দক্যারেসের রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বর্ষ ছিল এই অব্দ সংবৎ কি শকাব্দা তাহা লিখিত নাই। কারণ পরম্পরার দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় ইহা 'সংবৎ', 'শকাব্দা' নহে। তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত "সেণ্ট্‌ টমাসের এক্ট্‌" নামক ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থে গণ্ডক্যারেসের উল্লেখ আছে। সেণ্ট্‌ টমাস্‌ যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনি গণ্ডক্যারেসের সভায় গিয়াছিলেন। ১০৩ শকাব্দে ধরিলে ১৮১ খ্রীষ্টাব্দ হয়, সে সময়ে সেণ্ট টমাসের ভারতবর্ষে আগমন অসম্ভব। ১০৩ সংবৎ ধরিলে ৪৬ খৃষ্টাব্দ হয়, এবং সেই সময়কে গণ্ডক্যারেসের রাজত্বের ষড়্‌বিংশ বর্ষ ধরিলে ২১ খৃষ্টাব্দ ও ৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেণ্ট টমাসের ভারতবর্ষ আগমনের কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে। ডাক্তার ফ্লীট্‌ এইমত সমর্থন করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে কনিষ্কই বিক্রম-সংবতের প্রতিষ্ঠাতা। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে কনিষ্কের রাজত্বকাল ১২৫ হইতে ১৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং এই উভয় মতের মধ্যে কনিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ১৮২ বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এবিষয়ের মীমাংসা করা আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। কিন্তু বিক্রম-সংবৎ মালব প্রদেশে প্রচলিত অব্দ, এবং কনিষ্কের সহিত মালব দেশের কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং কনিষ্ক যে বিক্রম-সংবতের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারেন না তাহা নিশ্চিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে একরাজা খ্রীষ্টের একশতাব্দী পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন এবং তিনিই তক্ষশিলা ও মথুরার শকদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল মত আছে তাহার কোনটিই সম্পূর্ণরূপে যুক্তিমূলক নহে। *

শ্রীভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘৃণিতের প্রত্যুত্তর।

অঙ্কুর কহিল হাসি আঁধারেরে ডাকি,
কি যন্ত্রণা পেয়েছিনু তোর মাঝে থাকি
এখন কেমন দিব্য আলোকে আসিয়া।
উদার আকাশে অঙ্গ দিয়াছি মেলিয়া,

---

* বীরভূম সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রথম মাসিক অধিবেশনে ১৩১৮।২৪শে বৈশাখ তারিখে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত। বী সং।

রে অবোধ—কহে ডাকি প্রশান্ত আঁধার
এখনো আমাতে মূল রয়েছে তোমার
যত কাল ধরণীর বুকে রবে তুমি,
আশ্রয় তোমার মাত্র অন্ধকার ভূমি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বসন্তের দাবী।

ভ্রমরায় মধু খায়
পাখী শাখে করে গান ;
কোথা হতে এল মধু ?
আমিই করেছি দান।
গাছে গাছে ফোটে ফুল
মালী যাহে গাথে তোড়া ;
কোথা হতে এল ফুল ?
আমারি ত হাতে গড়া।
কুহু কুহু রব কবি
কোকিল জুড়ায় প্রাণ,—
আমারি সম্পত্তি সে ত,
আমিই করেছি দান।
আকাশেতে মেঘ নাই
জোছনার এত শোভা,—
যাহা কিছু দেখিতেছ
আমারি রূপের আভা।
কুল কুল রব করি
তটিনী বহিয়ে যায়,
এ নব যৌবন কাল
আমিই দিয়েছি তায়।
ধীরি ধীরি বায়ু বয়
ফুল বাস মাখি গায়,
আমারি সুষমা রাশি
মাখান রয়েছে তায়।
বল দেখি কি সুন্দর
হেরিতে মুরতি তার,
এই সব শোভা অঙ্গে
মাখান রয়েছে যার ?

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে বীরভূমির বর্ষারম্ভ হইত। এখন বৈশাখ মাস হইতে বর্ষারম্ভ হইবে। পূর্ব্বে ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। নূতন হিসাবে আশ্বিনে ৬ষ্ঠ সংখ্যা বাহির হইল—কার্ত্তিক মাসে বর্ষশেষ না হইয়া চৈত্র মাসে ২য় বর্ষ বা দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইবে। গ্রাহকগণ চৈত্র সংখ্যার পরেই আশ্বিনের সংখ্যা বাঁধাইয়া লইতে পারিবেন।

সাধু বালক কৃষ্ণমূর্ত্তি

সাম্য-প্রেস, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা।

বীরভূমি, ২য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা।
কার্ত্তিক, ১৩১৯।

বিসর্জ্জন ও বিজয়া।

আজ দুঃখ করিবার দিন, কি আনন্দ করিবার দিন, মুগ্ধচিত্তে, তাহাই ভাবিতেছি। সন্ধ্যার প্রদীপ যখন জ্বলিয়া উঠিল তখন পূজামণ্ডপে চাহিয়া দেখিলাম মণ্ডপের আনন্দ প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। মণ্ডপ অন্ধকার করিয়া আনন্দময়ী চলিয়া গিয়াছেন। তখনও দূরে নদীতীরে বিজয়ার বিদায়বাদ্য শ্রান্তভাবে করুণ সুরে বাজিতেছে। প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা নানা সাজে সাজিয়া নদীতীরে সমবেত হইয়াছেন।

বিসর্জ্জন হইয়া গেল "সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ" এবারকার মত শারদীয় উৎসব ফুরাইয়া গেল। আবার একবৎসর পরে আনন্দময়ী আসিবেন পুরোহিত এই আশ্বাস দিয়া এবারকার উৎসব শেষ করিলেন। তিন দিনের জন্য যে মহা জাগরণ আসিয়াছিল, যে হাস্যকলরোলে সমস্ত বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহা ফুরাইল—আবার "যে তিমিরে সে তিমিরে" দেশবাসী ডুবিয়া গেল। অনেকের ভাগ্যে তিমির আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

এমনি করিয়া বহুদিন ধরিয়া বৎসর বৎসর একটা স্বপ্নের বন্যা দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের দীনতা, নগ্নতা, ব্যাধি ও বিদ্বেষ সেই বন্যার প্লাবনে তিন দিন ডুবিয়া যায়—প্রেমের তরণী সেই বন্যার স্রোতে চারিদিকে ছুটাছুটি করে। পরস্পর পরস্পরের তত্ত্ব করে,—এ এক "সোণার স্বপন।" এ সোণার স্বপন আসে আর ভাঙ্গিয়া যায়। ভাবিতেছি ব্যাপার কি? এতবড় একটা উৎসব ইহার ভিতরের অর্থটা কি? ইহার মধ্যে একটা ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে, একটি আদর্শের আভাস লুক্কায়িত আছে—একদিন বোধ হয় আমরা তাহা

বুঝিতে পারিব, এই আশাতেই বৎসর বৎসর আনন্দময়ীর উদ্বোধন, ষোড়শোপচারে মহাপূজার অনুষ্ঠান, আবার দশমীতে বিসর্জ্জন।

যাহা হউক আজ বিজয়া। বিসর্জ্জনের পর বিজয়া। ত্যাগের মধ্যে পরমানন্দ। বিরহের মধ্যে শান্তিঘটের প্রতিষ্ঠা। এও এক মহারহস্য! তাই ভাবিতেছি আজ আমাদের হাসিতে হইবে, না কাঁদিতে হইবে?

সুখ আর দুঃখ, হাসি আর কান্না ইহারা আজ একত্রে মিলিয়াছে—আজ বিসর্জ্জনের বিষাদের মধ্যেই নমস্কার ও প্রেম আলিঙ্গনের ঘটা, মিষ্টমুখে শিষ্ট আলাপন—বক্ষে বক্ষে সুখস্পর্শ—আজ বেশ মিলিয়াছে। ইহার মধ্যেও রহস্য আছে—আজ একটু গভীরভাবে ভাবিবার দিন।

সুখ আর দুঃখ, হর্ষ আর বিষাদ, জয় আর পরাজয়, লাভ আর অলাভ এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া জগৎ চলিতেছে—পৃথিবীর দুইটি দিক এই দ্বন্দ্বে চাপা হইয়া গিয়াছে, পৃথিবী অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে—কিসের টানে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে তাহা সে জানে না, দাঁড়াইবার স্থান নাই, মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত সবলে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর জীব আমরা, আমরাও ঘুরিতেছি—এই যে ঘূর্ণন, এই যে দ্বন্দ্বের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে ক্রীতদাসের মত পার্শ্বপরিবর্ত্তন, এই অবস্থার উর্দ্ধে যাইতে হইবে ইহাই এই প্রাচীন জাতির মহাশিক্ষা, আজ এই বিসর্জ্জনের পর বিজয়ার আলিঙ্গন এই মহাশিক্ষা দান করিতেছে।

"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

ভাগবতধর্ম্ম।

ভাগবত ধর্ম্মের উদারতা ও বিশ্বজনীনতার কথা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে একাদশ স্কন্ধের দুইটি শ্লোক সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত।

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥ ১১।৮।১০॥

"যেমন ভ্রমর নানাপুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ কুশল ব্যক্তি অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।" বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মতে সারগ্রাহিত্বই শিক্ষণীয় অর্থাৎ দেখিতে হইবে যেন অসার বর্জ্জন করিতে পারি। বৈষ্ণবদিগের সাধনশাস্ত্রে অনেক স্থলে বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিতে নিষেধ

করা হইয়াছে, অলস-প্রকৃতিসম্পন্ন লোকে এই উক্তিটি খুব জোরে প্রচার করিয়া থাকে। আসল কথা এই যে তমোস্বভাব নিম্নাধিকারীর জন্যই বহুশাস্ত্রের আলোচনা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যেখানে সদুপদেষ্টার অভাব, যেখানে শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা চিত্তবিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, এই উপদেশ সেই খানেই প্রযোজ্য। বহুশাস্ত্র আলোচনা করার নিষেধ আর এক স্থলে প্রযোজ্য। যে অবস্থার নাম প্রবর্ত্তসাধকের অবস্থা, মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করিয়া মনকে একাগ্র করিবার জন্য যে সময়ে কোনও রূপ বিশেষ অনুষ্ঠানের (Discipline) আশ্রয় লওয়া হয় সে সময়েও কখন কখন বহুশাস্ত্রের আলোচনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই উপদেশ একটি বিশেষ ব্যবস্থা, পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে যাহা কথিত হইল তাহাই সাধারণ ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের আর একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"নহ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।"১১।৯।৩১

"এক গুরুর নিকট হইতে জ্ঞানের ব্যবস্থা স্থির বা সুনির্ণীত হয়না, যে হেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা নানা প্রকারে তাঁহাকে নির্ণয় করিয়াছেন।" এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে ইঁহারা অর্থাৎ এই বহু গুরু পরমার্থোপদেশ গুরু নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইঁহারা শিক্ষাগুরু। জ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনের জন্যই বহু গুরুর প্রয়োজন। মহাভারতে একটি সর্ব্বজন পরিচিত শ্লোকে আছে "নাসৌ ঋষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া অনেকে অনুরূপ আলোচনার পথ না পাওয়ায় মনে করেন যে ধর্ম্ম বিষয়ে এই যে মতভেদ ইঁহাদের বুঝি আর সমন্বয় নাই। এই প্রকারের ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় পূজনীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাভারতের ঐ উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি এই উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে অবধূত ব্রাহ্মণ, যিনি কপোত, মীন, হরিণ, কুমারী, হস্তী, প্রভৃতিকে গুরু করিয়াছিলেন এবং যিনি যদুরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার ঐ সমস্ত গুরুদিগের বিবরণ বলার পর উপসংহারে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি বলেন, তিনি বলিতেছেন যে ঋষিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে বলিয়াই আমি এই সমস্ত ব্যবহারিক পদার্থকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম।

যাহা হউক ঋষিদিগের মধ্যে এই যে মতভেদ তাহার একটা সমন্বয় আছে

এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব এই সমন্বয়ের ভূমি আবিষ্কার করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভই হইবে না। যে উপদেষ্টা এই সমন্বয়ের ভূমি আবিস্কার করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেই নাই।

পূর্ব্বে একথাও বলা হইয়াছে যে 'অনঘ' হওয়াই ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করার সরল পথ এবং 'অনুকম্পা'ই ভাগবতধর্ম্মের সাধন। 'অনঘ' না হইলে 'অনু-কম্পা' অসম্ভব এবং এই 'অনুকম্পা' ব্যতীত ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করা অসম্ভব বলিয়াই পুনর্ব্বার এই বিষয়েরই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে এক প্রণালী অবলম্বনে আলোচনা করা গিয়াছিল, এবারে আর এক প্রণালী অবলম্বন করা যাইতেছে। বিষয়টি দুরূহ অথচ অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া নানা দিক হইতে আলোচনা করা যাইতেছে।

অধ্যাত্ম জগতের সত্যসমূহ অন্ধভাবে ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। এই সমস্ত সত্য, দর্শন করিবার বিষয়। আমরা সকলেই নিজ নিজ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যেমন বাহ্য জগতের সত্য সমূহ প্রত্যক্ষ করি ও তাহার পর তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তেমনি অধ্যাত্ম জগতের তত্ত্বগুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। যে ইন্দ্রিয় বা শক্তির সাহায্যে সেই সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইবে সেই শক্তি আমাদের অধিকাংশ লোকেরই এখনও অবিকশিত হইলেও সকলেরই মধ্যে সেই শক্তি আছে এবং শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা সেই শক্তি বিকাশ করাও যায়। এই জন্যই বলিতেছিলাম অধ্যাত্ম জগতের সত্য সমূহ বাহির হইতে পাই-বার বিষয় নহে, ভিতর হইতে উপার্জ্জন করিয়া অধিকার করিবার বিষয়। ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সমূহের বর্ণনা আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাচীনদিগের মতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ, শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সমস্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনাকে অধ্যাত্ম জগতের চিন্তাচিত্র (Thought picture) বলা চলে। এই সমস্ত অধ্যাত্ম সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যাঁহাদের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে এই সমস্ত চিন্তা-চিত্র গ্রহণ করিতে হইবে। মানবের সত্ত্বা জ্ঞানময়। মননও নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়াই সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাগবতধর্ম্মের সাধনার প্রথমে শ্রবণ ও কীর্ত্তন। ইহার দ্বারা এই সমস্ত চিন্তা-চিত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাহা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতেছি তাহা আমার ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে এমন কি তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধেই আমার দারুণ সন্দেহ হইতেছে, সুতরাং কেমন করিয়া আমি

কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্ধভাবে তাহা গ্রহণ করিব। ইহার উত্তর সাধন-শাস্ত্রে এইরূপ দেওয়া হয় যে এই সমস্ত চিন্তা চিত্রের মধ্যে একটা শক্তি নিহিত আছে, এই চিত্রে মনোনিবেশ করিলে সেই শক্তি মনোনিবেশ-কারীর চিন্তারাজ্যে ক্রিয়া করিতে থাকিবে। এই ক্রিয়ার ফলে তাঁহার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি নিদ্রিত তাহারা জাগ্রত হইয়া উঠিবে। সুতরাং সাধনরাজ্যে যাঁহারা সত্য সত্যই প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই লীলা-শাস্ত্রের শ্রবণ ও কীর্ত্তন অথবা এই সমস্ত পৌরাণিক চিন্তা-চিত্র গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের মধ্যে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে সেই সমস্ত শ্রবণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই প্রকার উপদেশ দেওয়ার কারণ কি? শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥" ১১।২।৩৭

"চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও লোক পরম্পরা প্রসিদ্ধ মঙ্গলজনক জন্ম কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া ও তদর্থক নাম সকল কীর্ত্তন করতঃ নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া বিচরণ করিবেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে অন্যত্র আছে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি।
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" ৩।২৫।২১

"সাধুজনের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক। তাহার শ্রবণ দ্বারা অপবর্গ বর্ত্ম স্বরূপ ভগবান হরিতে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই লীলা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

"কৃষ্ণলীলা মণ্ডল,　　　　শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর

সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি
আশা ঝুলি কান্ধের উপর।
চিন্তা কাঁথা উড়ি গায়, ধূলি বিভূতি মলিন কায়,
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে
ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস শুকাদি যোগী জন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তার যত লীলাগণ
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২৪শ প।

পৌরাণিক লীলাগুলি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা, * বা নৈতিক উপাখ্যানরূপে গ্রহণীয় নহে। তাহাদের ম ও গভীর, ধর্ম্ম সাধনায় অগ্রসর হইবার জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের জীবনের সহিত এই লীলা গ্রন্থের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। পৌরাণিক সাধনা সর্ব্বাপেক্ষা যে সুগম সাধনা কেবল তাহাই নহে, ইহা পূর্ণাঙ্গ সাধনা। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের যে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতেছে, পৌরাণিক সাধনায় তাহা সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত লীলাগুলি কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। একদিকে বৈদেশিকগণ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইহার অযথা নিন্দা করিতেছেন আর এক দিকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারীগণ কপোল কল্পিত ব্যাখ্যায় সুলভে প্রশংসা ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সুতরাং যাঁহারা পৌরাণিক সাধনার রহস্য বুঝিতে চাহেন তাঁহারা ধীরভাবে প্রাচীন কালের সাধক ও সুধীগণের সাহায্যে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আরও দু একটি উদাহরণ দিলে যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে পৌরাণিক লীলাগুলিকে যত সহজ বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিই, তাহা তত সহজ নহে। ইহার মর্ম্ম গভীর, ইহার ভিতর এমন অনেক

* বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগে আমরা সত্য বলিতে যাহা বুঝি তাহাকে পূর্ণাঙ্গ সত্য বলিয়া মনে করা এ যুগের একটি ভয়ানক কুসংস্কার। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সার অলিভার লজ তাঁহার Reason and Belief গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। পরিচ্ছেদটির নাম Aspects of Truth আমরা সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

রহস্য আছে যাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগম্য। একটা কথা বোধ হয় সকলেই জানেন যে পুরাণগুলিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যত আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারা তত আধুনিক নহে। অবশ্য এখন পুরাণ সমূহ যে আকারে পাওয়া যাইতেছে তাহাদের সেই আকার তত প্রাচীন না হইতে পারে, কিন্তু মূল পুরাণ বা পুরাণ বর্ণিত সত্য সমূহ বেদের সমসাময়িক। ইহার অনেক প্রমাণ আছে, এ স্থলে একটি মাত্র প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত। এই ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমারের নিকট স্বকীয় অধীত বিদ্যার পরিচয় প্রদান কালে পঞ্চম বেদ বলিয়া ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

পৌরাণিক সাধনার ইতিহাসে বৃন্দাবন তত্ত্বই এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক উচ্চতম তত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বৃন্দাবন লীলা সাধনার দ্বারা যখন ভক্ত কর্ত্তৃক অনুশীলিত হয় তখন ভক্ত কিরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়েন, তখন এই দৃশ্যমান বিশ্ব কি আকারে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয় তাহা আমরা চৈতন্যদেব ও অন্যান্য ভক্তদিগের জীবনীতে দেখিতে পাই।

"এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা॥

* * * * *

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥" *

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত—১৮ প।

চৈতন্য মহা প্রভুর মধ্যে এই যে ভাবের প্রকাশ ইহারই মধ্য দিয়া ভক্তগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। যথা—

* Lover Consciousness বলিয়া একটি জিনিস আছে। যাঁহারা তাহা কাল্পনিকমাত্র এইরূপ বিবেচনা না করেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন ইংরাজীতে যাহাকে mystic's rapture in the immanence of God বলে, ইংরাজ কবি শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর সাধনার নিকট যাহা যথাক্রমে প্রেম ও জ্ঞান রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, চৈতন্যদেবের এই দিব্যোন্মাদ সেই ভাবের চরম বিকাশ কিনা।

"পয়োরাশে স্তীরে স্ফুরদুপবনালী কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য স্মরণজনিত প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী ॥

"সাগরের উপকূলে উপবন সমুহ দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি উদিত হওয়ায় যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সময়ে সময়ে কৃষ্ণনামোচ্চারণে যাঁহার জিহ্বা চপল হইত, যিনি ভক্তিতত্ত্বের গূঢ়রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যদেব, কি পুনরায় মদীয় নেত্র পথের পথিক হইবেন।"

"শরজ্জ্যোৎস্না সিন্ধোরবকলনয়া জাত যমুনা
ভ্রমাদ্ধাবন, যোঽস্মিন্ হরিবিরহ তাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচী সূনুরিহ নঃ॥"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

"শরৎকালের জ্যোৎস্না কিরণোজ্জ্বল সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনাভ্রমে, যেন কৃষ্ণবিচ্ছেদ তাপ সাগরে মগ্ন হইয়াছি এইরূপ মনে করিয়া বেগে ধাবিত হইয়াছিলেন ও মূর্চ্ছিত দশায় সমুদ্রজলে মগ্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া ছিলেন, প্রভাতে স্বভক্তগণ কর্তৃক সেই অবস্থায় প্রাপ্ত শচীনন্দন অধুনা আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

নিত্যানন্দের বাল্যজীবন বর্ণনায় চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাস পৌরাণিক ভাব সাধনা বেশ সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

"শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।"

কৃষ্ণলীলা, বামনলীলা প্রভৃতি অনুকরণ করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে একদিন এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ও ঘটিয়াছিল। একদিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল হইতেছে।

"কোন শিশু বোলে 'মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ।"
এত বলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া॥

মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়ে ছাওয়াল সব তভো নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে
কান্দয়ে সকল শিশু হাথ দিয়া শিরে॥"

খেলা করিতে করিতে লক্ষ্মণের ভাবে তিনি সত্যই নিস্পন্দ ও মুর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

বালকেরা এই ব্যাপারে নিরতিশয় ভীত হইয়া গুরুজনকে সংবাদ দিল, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সমস্ত কথা শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গ্রাম বৃদ্ধদিগের মধ্যে একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁহার উপদেশ মত বালকদিগের ক্রীড়া চলিতে লাগিল। যে বালক হনুমান হইয়াছিল সে গন্ধমাদন আনিতে গেল। যথারীতি গন্ধমাদন পর্ব্বত আনীত হইলে সুষেণ বৈদ্যরূপধারী বালক নাসিকায় ঔষধ দিলেন, তখন নিত্যানন্দ জাগ্রত হইলেন। ইহার নামই অনুকম্পা সাধনা বা ভাব সাধনা। গোপীভাব আশ্রয় পূর্ব্বক যে সাধন পদ্ধতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাও এই 'অনুকম্পা' সাধনারই পরিণত অবস্থা। শ্রীনিবাস আচার্য্য সমাধিমগ্ন হইয়া যমুনায় শ্রীমতী রাধিকার কুণ্ডল অন্বেষণ করিতেছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী সমাধিমগ্ন হইয়া হোরি ক্রীড়া করিতেছিলেন এ সমস্ত কথা বৈষ্ণব গ্রন্থের পাঠকগণ অবগত আছেন।*

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় ব্রজগোপীদিগের মধ্যেই এই ভাবানুকরণ সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। গোপীগণ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, তাহার পর তাঁহাদের মনে সৌভাগ্যগর্ব্বের উদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রজাঙ্গনাগণ উন্মত্তবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণাত্মিকা হইলেন, তাহার পর তাঁহারা জ্ঞানশূন্যা হইয়া অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, অশোক নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষাদিকে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই ফল বৃক্ষ, পৃথিবী, হরিণী, প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কৃষ্ণের সন্ধান পাইলেন না। তখন

* আশা করি আমাদের কোন লেখক পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিবেন।

"ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥"

"এই প্রকারে উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণ কাতরা হইয়া কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পড়িলেন ও শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন।"

এই সময়ে কোন গোপী পুতনার মত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্য গোপী কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার স্তনপান করিতে লাগিলেন। অপর গোপী আপনাকে বালকবৎ করিয়া রোদন করিতে করিতে শকটাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অন্য গোপীকে পদাঘাত করিলেন। একজন গোপী তৃণাবর্ত্ত হইলেন, আর একজন গোপী কৃষ্ণ হইলেন, তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে লইয়া চলিয়া গেল। একজন বকাসুর হইলেন একজন কৃষ্ণ হইলেন এই প্রকারে বকাসুর বধ হইয়া গেল কৃষ্ণ যেমন করিয়া দূরগত গাভীসকলকে আহ্বান করিয়া বাঁশি বাজাইতেন, একজন গোপী সেইরূপ বাঁশি বাজাইতে লাগিলেন, আর অন্যান্য গোপীরা সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। একজন গোপী অন্য একজন গোপীর স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া কৃষ্ণগতচিত্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "ওহে গোপীগণ, আমি কৃষ্ণ আমার গতি দর্শন কর।" এই প্রকারে গোবর্দ্ধন ধারণ, কালিয় দমন, দাবানল পান, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন প্রভৃতি লীলার অনুকরণ চলিতে লাগিল। এই লীলানুকরণের পর তাঁহারা

"ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥"

সেই বনের এক প্রদেশে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।" *

কারণ কোন কোন লেখক বৈষ্ণব কবিতার সমালোচনা করিতে বসিয়া গোপীদিগের এই ভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন। গোপীদিগের এই কৃষ্ণাত্মিকা হওয়া প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। বৈষ্ণব সাধনায় এই লীলানুকরণের নাম "লীলাখ্য অনুভাব"

"মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥"

* যাঁহারা ভাগবত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া উপকৃত হইতে চাহেন তাঁহারা ব্রজগোপীদের এই অন্বেষণের সোপানগুলি (পাঠানুক্রমে) মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিব। পৌরাণিক ভাব সাধনার স্থান হিন্দু জাতির সাধনার কোন্ স্তরে অবস্থিত তাহা বুঝিতে পারিলে হিন্দু সভ্যতার অনেক তথ্যই বুঝিতে পারা যাইবে।

এই ভাব অদ্বৈতবাদী উপাসকগণের 'অহংগ্রহ' উপাসনার সহিত এক নহে। বাহির হইতে দেখিতে অনেকটা একরূপ হইলেও বিশেষ পার্থক্য আছে। অধিক কি অহংগ্রহ উপাসনার সহিত ইহাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিলে পৌরাণিক ভাবসাধনার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই স্থলে অদ্বৈতবাদীদিগের 'অহংগ্রহ' উপাসনা কি সে সম্বন্ধেও দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদীদিগের উপাসনা ত্রিবিধি,—অঙ্গাববদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। যজ্ঞের অঙ্গসমূহে ব্রহ্মভাবনা করার নাম অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা।

যাহা ব্রহ্ম নহে তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করার নাম প্রতীক উপাসনা। যেমন "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" মনকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে। "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদীদিগের মতে অহংগ্রহ উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন "সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই সমস্ত মহাবাক্যের বিশিষ্ট প্রকার চিন্তনই অহংগ্রহ উপাসনা।

বেদান্ত দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ে এই অহংগ্রহ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

"আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।" ১ পা ৩ অধি ৩ সূ

আত্মাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য ও প্রমাণ্য।

"ন প্রতীকে ন হি সঃ" ৪সূ

প্রতীকে আত্মদৃষ্টি হয় না।

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" ৫সূ

প্রতীকে ও ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে পারে তাহাতে ব্রহ্মেরই উৎকর্ষ।

"আদিত্যাদি মতয়শ্চাঙ্গে উপপত্তেঃ।" ৬সূ

অঙ্গে (কর্ম্মাঙ্গে বা যজ্ঞাঙ্গে) আদিত্যাদি প্রতীকমতি বিধেয়।

আত্মাকে পরমেশ্বর বলিয়া ভাবনা যখন অভ্যাসের বলে দৃঢ় ও নিশ্চলভাব ধারণ করে, তখন জীব ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতির ফলে জীবন্মুক্তির অধিকারী হয়। কারণ যে যাহাকে উপাসনা করে সে তাহাই হয়।

ইহাই অহংগ্রহ উপাসনা। ব্রজগোপীগণ যখন

"অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণ বিহার বিভ্রমাঃ॥

ভা ১০।৩০—৩।

"কৃষ্ণের ন্যায় ক্রীড়া ও বিলাস সম্পন্না হইয়া সেই কৃষ্ণই আমি পরস্পর এই-রূপ কহিতে লাগিলেন।"

তখন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় বলিতেছেন, "নতু অহং গ্রহোপাসনাবশাদেবেতি শ্রেয়ং" ইহা অহংগ্রহ উপাসনার বশে হয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদিগের পূর্ব্বে প্রহ্লাদের সাধন-বর্ণনায় এই অনুকম্পা সাধনার কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য কৃষ্ণাত্মিকা হওয়া ও লীলানুকরণ করার মধ্যে সামান্য প্রভেদ আছে। প্রহ্লাদের বাল্যাবস্থার সাধন বর্ণনায় ভাগবত বলিতেছেন।

"গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্ম্মাহাত্ম্যং তস্যসূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ॥
ন্যস্ত ক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশং॥
আসীনঃ পর্য্যটন্নশ্নন্ শয়ানঃ প্রপিবন্ ব্রুবন্।
নানুসন্ধত্ত এতানি গোবিন্দ পরিরম্ভিতঃ॥
ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠ চিন্তাশবল চেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্ত স্তন্ময়োঽনুচকার হ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণী মাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দ প্রণয়ানন্দ সলিলামীলিতেক্ষণঃ॥ ৭।৪।২৬—৩১॥

দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"ভগবান বাসুদেবে যাঁহার রতি স্বাভাবিক, কাহার সাধ্য তাঁহার গুণের সংখ্যা করে? তিনি (স্বাভাবিকী রতি নিবন্ধন) বাল্যকালেই ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে একচিত্ত হইয়াছিলেন, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানে একান্ত রত থাকায় জগৎ কীদৃশ তিনি তাহা কিছুই জানিতেন না। সর্ব্বদাই যেন ভগবানের ক্রোড়ে বসিয়া আছি এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হওয়ায় তিনি উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন ও বাক্য প্রয়োগ করিয়াও ঐ সকল উপবেশনাদি কর্ম্ম কদাচিৎ অনুসন্ধান করিতেন না। ভগবান্ বৈকুণ্ঠের চিন্তায় কখন কখন তাঁহার চেতনা ক্ষুভিত হইত। তাহাতে কদাচিৎ রোদন করিতেন। ভগবানের চিন্তা দ্বারা আনন্দ উৎপন্ন হওয়াতে কখন বা গান করিতেন। কখন মুক্তকণ্ঠ হইয়া শব্দ করিতেন, কখন

বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কখন ভগবদ্ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে তন্ময় হইয়া তদীয় চেষ্টাদির অর্থাৎ রামকৃষ্ণাদি অবতার লীলার অনুসরণ করিতেন। কখন ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি দ্বারা নির্বৃত ও পুলকিত হইয়া তুষ্ণীম্ভূত থাকিতেন, কদাচিৎ স্থিরতর প্রেমজন্য আনন্দ হেতু তাঁহার লোচন-দ্বয় সজল হইয়া ঈষৎ নিমীলিত হইত।" ইহার মধ্যে ২৮শ শ্লোকে 'পরিরম্ভিত' শব্দটির শ্রীধর স্বামী অর্থ করিয়াছেন "আত্মনা একীকৃতঃ" আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন "অতি-বৎসলেন পিত্রা মাত্রা বা একাঙ্কিকো বালো যথা প্রতিক্ষণমেব পরিরভ্য ক্রোড়স্থী ক্রিয়তে তথৈব" আমরা অনেকটা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে অনুবাদ করিয়াছি, কিন্তু প্রহ্লাদের এই অন্তর্জীবনের স্তরগুলি অনুধাবন করিয়া কোন্ অবস্থায় তিনি লীলানুকরণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া পৌরাণিক সাধনার রহস্য নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীধর স্বামীর অর্থটিও স্মরণ রাখিতে হইবে।

অনুকম্পা সাধনায় লীলানুকরণ কোন্ অবস্থায় হয় তাহা জানা প্রয়োজন। শ্রবণ ও কীর্ত্তনে সকলেই অধিকারী। শ্রবণের দ্বারা ভগবান যে প্রিয় এই জ্ঞান চিত্তে দৃঢ় হয়, যিনি প্রিয় তাঁহার প্রতি প্রীতি স্বাভাবিকী। ঈশ্বরে স্বাভাবিকী রতি জন্মিলে কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হয়। কতৃত্বাভিমান দূর হইলেই বিরজা পার হইয়া পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে। এই অবস্থার আর একটি নাম ব্রহ্মাণ্ড ভেদ। অণ্ডের মধ্যে যখন পক্ষী শাবক থাকে তখন সে বদ্ধ, আমরাও এখন তাই, অণ্ড হইতে বাহির হওয়ার পর পক্ষী শাবক যেমন পক্ষভরে উদার গগনের নীচে, অবাধ ও উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে স্বাধীনভাবে আত্মহারা হইয়া উড়িয়া বেড়ায়, নিখিল বিশ্বের সকল কানন, সকল কুঞ্জ, সকল উপত্যকা, সকল নদী-তীর যেমন তাহার আপনার হইয়া যায়, মানবেরও কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হইলে ঠিক সেই অবস্থা। পৌরাণিক অনুকম্পা সাধনা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিবার কেমন সুগম পথ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব।

অধ্যাত্ম সাধনায় বর্ত্তমানযুগে এই অনুকম্পা'র অনুবর্ত্তন অনেকেই করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেশবচন্দ্র সেনের নাম তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য লীলানুকরণ অনুকম্পা সাধনার একটি বিশেষ বা পরিপক্ক অবস্থা এবং সকল লীলাও কিছু অনুকরণীয় নহে। শ্রীযুত জীব গোস্বামী একস্থলে বলিয়াছেন।—

"বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবৎ নতু কৃষ্ণবৎ"॥

এ উক্তিটি ধীরভাবে স্মরণীয়।

কোল আঁধারি।

(গল্প)

(১)

আজ সপ্তমী পূজা। মুখুযো বাড়ীতে সন্ধ্যার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল।

পাড়ার একঅংশে নিধিরামের বাস; নিধিরাম জাতিতে মেথর। তাই সকলে তাকে নিধে মেথর বলিয়া ডাকে।

নিধিরামের ৭ বৎসরের ছেলে রামু বায়না ধরিল, "মা আমি ঠাকুর দেখ্‌তে যাব।"

নিধের স্ত্রীর নাম জগী। জগী তখন সেই সবে নিধিরামের সহিত ঝগড়া করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষান্ত হইয়াছে। ছেলের বায়না তার সহ্য হইল না। সে বলিল, "না যাওয়া হবে না।"

ওদিকে যতই ঢোল কাঁসির বাজনা, জোরে জোরে বাজিতে লাগিল ততই রামুর মন ঠাকুর দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বালক বলিল, "মা আমাকে ভাল কাপড় বের করে দে, আমি যাবই।"

বালকের কান্না নিধিরামের অসহ্য হইয়া উঠিল। সে বলিল, "দে—না কাপড় বের করে। সমস্ত দিন খাটুনির পর কান্নাকাটি আর ভাল লাগে না।"

রামুর মা তখন রাগে গর গর করিতে করিতে একখানা কোরাকাপড় পরিয়ে দিয়ে বলিল, "যা মরগে যা। একবারে যা।'

নিধে বলিল "আ মর্! বৎসরকার দিন গাল দিস কেন? দুটা নয় পাঁচটা নয় একটা ছেলে। আজকের দিন কেন গাল দিস।"

(২)

বালক রামু কোরাকাপড় খানি পরিয়া বরাবর মুখুয্যে বাড়ীর দরজা দিয়া একেবারে উঠানে গিয়া পড়িল। তখন আকাশে খুব মেঘ করিয়া আসিয়াছে।

সেই সময় স্বয়ং হরকুমার বাবু চেলির কাপড়ে আপনার বিপুল কায়াখানি আবৃত করিয়া আরতি দেখিতে আসিতে ছিলেন। বালক পূজাবাড়ীর ধুমধাম দেখিয়া দিশেহারা হইয়াছিল। সে জানিতে পারে নাই যে জমিদার বাবু আসিতেছেন।

মেথর পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া সকলে একসঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই নিধের পো, সরে যা সরে যা, এখুনি বাবু তোকে ছুঁয়ে ফেলবেন।

বালক এই হঠাৎ চিৎকারে চমকাইয়া গিয়া একবারে হরিবাবুর গায়ে গিয়া পড়িল। সকলেই একবাক্যে "অমঙ্গল অমঙ্গল অশুভ অশুভ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

জমিদার বাবু ত চটিয়া লাল। তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল "বেটাকে চাবুক লাগাও।"

একজন বলিষ্ঠ দ্বারবানকে চাবুক মারিবার আদেশ দেওয়া হইল। বালক ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। জমিদারের আজ্ঞায় ভোজপুরী সবলে চাবুক চালাইতে আরম্ভ করিল। এক—দুই—তিন—চার ঘা চাবুক পড়িতেই বালক অচেতন হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছিত বালকের উপর আরও পাঁচ ঘা চাবুক পড়িল। যখন প্রহার শেষ হইল তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখিল বালকের ক্ষুদ্রপ্রাণ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩

রামুকে বিদায় দিয়া জগীর প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল। কি যেন অজানিত আশঙ্কায় তার প্রাণটা হুহু করিতেছিল।

তারপর যখন ভীষণ রবে ঝড় উঠিল, তখন সে নিদ্রিত নিধেকে জাগাইয়া বলিল, "যা দেখি একবার বাবুদের বাড়ী। রামু এতঝড়ে কি করে বাড়ী ফিরবে? তুই গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। না শিগ্‌গির যা দেখিস দেরি করিস নে। আমার মাথা খাস্।"

সমস্ত দিনের খাটুনির পর আবার এতটা যাওয়া নিধিরামের পক্ষে কষ্টকর হইলেও সে বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল। কি জানি কেন তার প্রাণটা এক অজানিত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল।

অন্যদিন হইলে সে জগীকে মারিতে পর্য্যন্ত বাকী রাখিত না।

নিধিরামকে পাঠাইয়া জগী ভাবিতেছিল, "কেন বৎসরকার দিন বাছাকে গালি দিলাম। হে ঠাকুর আমার রামুকে ফিরিয়ে দাও। আর আমি তাকে গালি দেব না।" জগী অনেকরাত পর্য্যন্ত স্বামী পুত্রের প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিল। দশটা এগারটা বারটা বাজিয়া গেল। জগী আর থাকিতে পারিল না। সে বরাবর বাবুদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

জগী পথে যাইতে যাইতে আপনা আপনি বলিতেছিল, "কেন বৎসরকার দিন বাছাকে গাল দিলুম? কেন তাকে একলা পাঠালুম? নিজে কেন সঙ্গে গেলুম না?"

এমন সময় কে পরুষ কণ্ঠে ডাকিল, "জগী!" "কেরে তুই যে!" জগী দেখিল তার স্বামী একটা গাছ তলায় বসিয়া আছে। "কিরে তোকে এই খানে বসে থাকতে পাঠালুন বুঝি—রামু কোথায়

"এই মাটীর তলায়" বলিয়া নিশ্চল পাথরের মত নিধিরাম গাছের তলাকার মাটি দেখাইয়া দিল।

জগী বলিল, "তুই কি মদ খেয়েছিস্?"

"না মদ খাই নি—বিষ খেয়েছি।"

"কি সর্ব্বনাশ! কি হয়েছে বল?"

তখন নিধিরান দুই হাতে বুক চাপিয়া বলিল, "জমিদারের হুকুমে দারোয়ানেরা আমাদের রামুকে মেরে ফেলেছে; আর পাছে আমরা কেউ টের পাই তাই এইখানে পুতে রাখতে আসছিল সেই সময় আমার সঙ্গে তাদের পথে দেখা হল। আমি কিছুতেই পুত্‌তে দেব না—তারা জোর করে পুতে ফেল্‌লে।"

আর বলিতে পারিল না, নিধিরাম মাটিতে শুইয়া পড়িল। তখন পূজার বাড়ীতে সানাই ভৈরবী—রাগিনার আলাপ করিতেছিল। পুরোহিত ঠাকুর চণ্ডী পড়িতেছিলেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

হরি বাবু একাগ্রচিত্তে এই বন্দনা শুনিতেছিলেন।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

অনিমেষ আঁখি।

তরুণ অরুণ ওঠেনি তখন সুনীল গগন তলে
শুধু আধ আলো, আধ ছায়াটুকু সারাটি ভুবনে খেলে।
গাছে নাই গান প্রভাতের পাখী ওঠে নাই কলরব
জাগেনি মানব স্নিগ্ধ সময়ে, ঘুমে নিমগন সব।
কে আছ চাহিয়া জগতের'পরে অনিমেষ ও নয়নে
কে আছ বসিয়া নিকটে আমার স্থির আঁখি মুখ পানে।
আমার জননী, জগত-জননী তুমিই তুমিই সেই
কি স্নেহ মমতা খেলিছে নয়নে জাগিয়া দেখিগো তাই।

প্রভাতের আলো দেখিতে দেখিতে ভুবন উঠিল ভ'রে।
সব কলরব উঠিল যখন নগরে প্রান্তরে ধীরে
দিবসের কাজ মনে আসে শুধু শিশুদের আলাপন
নূতন দিবসে নূতন জীবনে যখন মাতিল মন।
কে তুমি চাহিয়া অনিমেষ আঁখি সচঞ্চল সে ভুবনে
মোর কর্ম্ম পানে গমনে মননে ব্যস্ততার প্রতিক্ষণে
আমার জননী জগতজননী তুমিই তুমিই সেই
কি দৃষ্টি তোমার কি জ্যোতি তাহার, (যেন) ভুলিনা ভুলিনা তাই।
শীতল বাতাস উত্তপ্ত করিয়া মধ্যাহ্নের দীপ্ত বেলা
উদিল যখন মাথার উপর রবির কিরণ মালা
মগন মানব কর্ম্ম পারাবারে ছুটিছে যে যার পথে
শুষ্কতায় যেন জড়িত ভুবন রবির কিরণ পাতে
কে তুমি তখনো স্নিগ্ধ নয়নে চাহিয়া সবার পরে
শ্রান্তি আনিয়া দিতেছ ঢালিয়া, কে আছে চোখের দূরে
আমার জননী জগত জননী তুমিই তুমিই সেই
সজনে বিজনে নিভৃতে নির্জ্জনে যেন নিকটে দেখিতে পাই।
সাঁঝের আঁধার নেমে আসে যবে শান্ত জগৎ ঘিরে
অনিমেষ ওই কাহার নয়ন আকুল হইয়া ফিরে
উড়ে যায় পাখী আপন কুলায় শ্রান্ত ধেনু ফিরে ঘরে
বিরাম লভিতে সবাই ব্যস্ত ও আঁখি সবার পরে
তোমার নয়নে নয়নপাত সবার দেখিতে চাও
ভুবন হইতে তোমাপানে মোরে কে তুমি ফিরায়ে দাও
আমার জননী জগত জননী তুমিই তুমিই সেই।
যেন তোমাপানে চেয়ে তব নাম গেয়ে শ্রান্তি লভিতে পাই।
নীরব রজনী আঁধারে মগন জগত ঘুমায় সুখে
কে আছে চাহিয়া অনিমেষ আঁখি ক্লান্তি নাই কি চোখে ?
কেন চেয়ে থাক নীরবেই জাগ কি বুঝিব তব লীলা
দিয়ে স্বাধীনতা; চেয়ে দেখ শুধু জগতের ছেলে খেলা।
যে দেখেছে ওই অনিমেষ আঁখি সেই শুধু নিরাপদ
রবি শশী তারা যাঁর পানে চেয়ে ঘুরিছে আপন পথ।

থাক থাক চেয়ে করুণা নয়নে মা আমার এই মত
খেলুক জগত তোমার সমুখে তোমার মনের মত।

স্নেহদেবী মুখোপাধ্যায়।

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু। (৩)

দীনবন্ধু বঙ্গসাহিত্যে প্রধানতঃ হাস্যরসের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু হাস্যরসের স্ফূর্ত্তি সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ শক্তিশালী লেখকের রচনায় অল্প-বিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রদায় বিশেষের মনোরঞ্জিকা না হইলেও অবিরত মিষ্টান্ন (বা তিক্তরস) সেবনে ক্লান্ত জিহ্বা মাঝে মাঝে "আদার কুচি" বা চাটনির প্রত্যাশা স্বভাবতঃ রাখিয়া থাকে। শিবের বিবাহের ন্যায় গম্ভীর বিষয়েরও অবতারণার সময়, প্রাচীন কবিগণ বিষয়ের গুরুত্বটুকু হাস্য-রসের অমৃতধারায় সিঞ্চিত করিয়া লইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার সুন্দর কবি-কল্পিত আলেখ্যগুলি একটু মধুরোজ্জ্বল কৌতুকরসে অভিষিক্ত করিতে ভুলি-তেন না। এমন কি মাইকেলের ন্যায় উচ্চাঙ্গ কবিপ্রতিভাও হাস্যরসের রচনায় বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু নিছক হাস্যরসের রচনা এই সকল লেখকদের উদ্দেশ্য নহে; তাঁহাদের উচ্চভাবাক্রান্ত রচনাগুলিকে হাল্‌কা ও রসাল করিবার জন্যই তাঁহাদের গ্রন্থে কৌতুকরসের সমাবেশ। অনন্যসেবা হাস্যরসের রচয়িতা সাহিত্যে দুর্লভ, কাচিৎ কখনও দেখা যায়। এরূপ লেখকের মনের গঠন বা প্রতিভা এত বিচিত্র, তিনি যাহা বলেন বা চিন্তা করেন তাহা এত অদ্ভুত বা অসাধারণ, এবং জীবনের বৈচিত্র্য বা অসামঞ্জস্যটুকু তাঁহার চক্ষুতে এত শীঘ্র ধরা পড়ে, যে তাঁহার মতামত শুনিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না। অনেকে বলেন, দীনবন্ধুও এইরূপ একজন স্বতঃসিদ্ধ হাস্যরসিক বা born humourist।

দীনবন্ধুর প্রতিভার বৈচিত্র্য।

কথাটি কতদূর সত্য পরে বিবেচ্য, কিন্তু সত্য হইলেও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তাঁহার 'হাস্যাবতার' এই গৌরবাস্পদ আখ্যা নিষ্ফল হয় নাই, তথাপি তাঁহার প্রতিভার গতি যাহাই হউক না কেন, দীনবন্ধুও একজন নিছক হাস্যরসের রচয়িতা নহেন। হাস্যরসের ন্যায় করুণ প্রভৃতি অন্যান্য "রসে"ও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা দেখা যায়, এবং তাঁহার লেখার স্থলে স্থলে এরূপ গাম্ভীর্য্যের উপলব্ধি হয় যে তাহাতে তাঁহাকে কেবলমাত্র হাস্যরসের

রচয়িতা বলিয়া ধারণা করা যায় না। এমন কি দীনবন্ধুর সর্ব্বপ্রথম রচনা হাস্যোদ্রেকের জন্ম রচিত হয় নাই; নীলদর্পণের ন্যায় করুণরসবহুল রচনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

১৮৫৫ খ্রীঃ অঃ দীনবন্ধু অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কালেজ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু স্বয়ং একজন ইঙ্গবঙ্গ হইলেও, ইঙ্গবঙ্গের চিত্র আঁকিবার অভিলাষ তখনও বোধহয় তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরে, দীনবন্ধু চাকুরী উপলক্ষে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সময় ঢাকায় অবস্থিতিকালে নীল বিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। নীলকর-প্রপীড়িত দুঃস্থ প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল; তাহার ফল নীলদর্পণ। বুঝি নিঃসহায় দরিদ্রের ও পীড়িতের মর্ম্মবেদনা সাহিত্যে আর কোথাও এত সুন্দর ফুটিয়া উঠে নাই। মানবের মর্ম্মন্তুদ যাতনা সাহিত্যে অনেক অঙ্কিত হইয়াছে সত্য, মহাভারত ও রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবজীবনের সুখ দুঃখই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, তথাপি শুদ্ধ অত্যাচার ও পীড়নের এত জীবন্ত ছবি, একদিকে বলদৃপ্ত পরস্বলোলুপ পাষণ্ডের নির্দ্দয় পাশবিক ব্যবহার, অন্যদিকে ভাগ্যচক্রে নিরীহ অসহায় দরিদ্রের এরূপ নির্ম্মম নিষ্পেষণ, আর কোথাও দেখা যায় না। নীলদর্পণের সহিত যে শ্রীমতী ষ্টো বা ডিকেন্সের উপন্যাস সমূহের তুলনা করা হইয়াছে তাহা নিরর্থক নহে।

নীলদর্পণ (১৮৬০)

নীলদর্পণের ও নীলকরদিগের কলঙ্কিত ইতিহাস বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। * এ সময়ে নীলদর্পণ প্রণয়ন বা প্রচার নিতান্ত সাহসিকতার কার্য্য। যদিও প্রণেতার নাম ব্যতিরেকে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার নাম ব্যক্ত হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। কারণ ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ অধিকাংশই নীলকরদিগের সুহৃৎ ছিলেন, এবং নীলদর্পণের ভূমিকায় উল্লিখিত দৈনিক সংবাদ পত্রদ্বয়—ইংলিসম্যান ও হরকরা—নীলকরদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণ লড়িতেছিলেন। এরূপ স্থলে, রাজকর্ম্মচারী

নীলদর্পণ প্রচারে বিপৎ সম্ভাবনা।

* বিশেষ দর্শনেচ্ছু পাঠকগণ দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র মহাশয়ের প্রণীত *History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full report of the Nildarpana case* পাঠ করিবেন। বলা বাহুল্য নিম্নোদ্ধৃত চিহ্নিত স্থানগুলি তাহার অমূল্য গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

হইয়া ইহাদের শত্রুতা করা দীনবন্ধুর পক্ষে নিরাপদ ছিল না। কিন্তু এ বিপৎসত্ত্বেও, দরিদ্রের বন্ধু দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রচারে পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এই দুরূহ কার্য্যে দীনবন্ধুর প্রতি সমস্ত দেশের ও দেশীয় সংবাদপত্রের সহানুভূতি ছিল। যখন ইংলিসম্যানের সম্পাদক ও নীলকরগণ, নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রচারের জন্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা লং সাহেবের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ আনিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ এক সভার অধিবেশন করিয়া লং সাহেবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সেই অভিনন্দনপত্রে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"That the *Nildarpana* is a genuine expression of native feeling on the subject of Indigo planting we can with confidence certify" * মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ যে লং সাহেবের জরিমানার ১,০০০৲ জজ সাহেবের রায় শুনিবার মাত্র তৎক্ষণাৎ কোর্টে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। শুধু তাহাই নহে, লং সাহেবের কারাদণ্ডের পর প্রায় ৩০,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক অভিনন্দন পত্র তাঁহাকে কারাগারে দেওয়া হইয়াছিল, এবং ওয়েল্‌স সাহেবের এই অসঙ্গত বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার জন্য, রাজা প্রতাপ সিংহ, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এক মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তখনকার কবি ধীরাজ দুঃখ করিয়া গাহিয়াছিলেন—"ওয়েল্‌স অবিচার করে, নির্দ্দোষী লংকে ধরে, একটি মাস মেয়াদ দিয়েচে"—। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে এই কার্য্যে তাঁহার প্রতি দেশের সহানুভূতি কত প্রবল ছিল। ইহার উপরে, ইংলিসম্যান ও হরকরা ভিন্ন, দেশের অন্যান্ত দেশী ও ইংরাজী সংবাদপত্র লংসাহেবের কারাগারে ও অর্থদণ্ডে-ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছিল। † কিন্তু অন্তদিকে ক্ষিপ্ত নীলকরগণ যে শুধু লংসাহেবকে কারারুদ্ধ ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, নীলকর কমিশনের সভাপতি ও তদানীন্তন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সীটনকার মহোদয়কে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ

দীনবন্ধুর পরদুঃখ কাতরতা ও নির্ভীকতা।

দেশের ও জন সাধারণের সহানুভূতি।

---

* L. C. Mitra. *Indigo Disturbance* (1906) P. 97.

† See extract from the *Phœnix, quoted in L. C. Mitra's Indigo disturbance* P. 108.

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, যদিও যে যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় এই যে স্বয়ং নীলদর্পণ প্রণেতাকে কোনও বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয় নাই।

দেশের ও দরিদ্রের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত নীলদর্পণ ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ ঢাকায় প্রথম মুদ্রিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ইহা দীনবন্ধুর সর্ব্বপ্রথম রচনা হইলেও ইহাতেই উন্মেষোন্মুখ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বঙ্গ সাহিত্যে ইহা যে একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ তাহা বলা বাহুল্য। না জানি, তখন ইহা সকলের নিকট কত বিস্ময় ও আদরের বস্তু হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে, বঙ্গসাহিত্যে এই জাতীয় ও এই দরের নাটক কেহ দেখে নাই। রামনারায়ণের অসম্পূর্ণতা ও মাইকেলের কৃত্রিমতার স্থলে কি অদ্ভুত চিত্রণশক্তি, কি স্বাভাবিক করুণরস-রঞ্জিত রচনা! রামনারায়ণ প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা এত জীবন্ত ও প্রস্ফুট নহে; এবং মাইকেলের নাটকে দেব দেবী বা মহৎ চরিত্রের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া, নীলদর্পণে দীনদুঃখীর প্রাত্যহিক জীবনের করুণ ছবি সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব্ব নবীনতা ও বৈচিত্র্য আনিয়াছিল। রামনারায়ণ ও মাইকেল যে একটু নূতন ভাব আনিতেছিলেন, দীনবন্ধু সেই স্রোত আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। বর্ণনার বৈচিত্র্য, বিষয়ের নবীনতা, অঙ্কণের নৈপুণ্য, সমাজিক অভিজ্ঞতা, অপরিসীম কল্পনা ও সহানুভূতি—সকল বিষয়েই নীলদর্পণে যে ক্ষমতার পরিচয় দেখা গেল, তাহা ইহার অগ্রে আর কেহ দেখে নাই।

নীলদর্পণের নূতনত্ব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক শ্রেণীর সমালোচক প্রথম হইতেই এই গ্রন্থের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। "কলিকাতা রিভিউ"এর বিখ্যাত সমালোচনার বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। 'রিভিউ'এর বিজ্ঞ সমালোচক * বলেন যে নীলদর্পণের এত সুখ্যাতি বা "কুখ্যাতি" হইয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ ইহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য নহে, পরন্তু লংসাহেব কর্ত্তৃক ইহার প্রচার ও তাঁহার কারাদণ্ড এবং তজ্জনিত বিরাট সামাজিক হুলস্থুল। The *Nildarpana* has become a rather notorious drama in consequence of its translation into English under the auspices of the Rev. Mr. Long and of his

* বোধহয়, পাদ্রী লালবিহারী দে।

subsequent imprisonment." * দীনবন্ধুর নাটকগুলি নাকি তাহাদের প্রাপ্য প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা পাইয়াছে—"overpraised dramatic compositions." পুনশ্চ—"We shouid give it (*Nildarpana*) a very low place as a work of art. The importance is political, not literary" † রিভিউয়ের যাহাই মত হউক না কেন, দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ও তাঁহার "বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা" নামক পুস্তিকায় এইরূপ মতে সায় দিয়া গিয়াছেন।

নীলদর্পনের সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি।

যাহা হউক, নীলকর বিষয়ক গোলযোগে পড়িয়া নীলদর্পণের সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি উভয়ই হইয়াছিল। একদিকে যেমন দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতা ইহার সহিত পরিচিত হইবার ও ইহার গুণের প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইলেন, তেমনি অন্য দিকে এক দল সমালোচক, এই হুজুগে পড়িবার দরুনই এই পুস্তককে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অবশ্য শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ইহার উদ্দেশ্যের নিন্দা করিতে পারিলেন না তবে বলিলেন যে এই বিশেষ উদ্দেশ্য থাকার জন্যই ইহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। এবং কখনও কখনও এই কথাটা একটু বাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যে নীলদর্পণের সাহিত্যিক গৌরব কিছুই নাই, সামাজিক হুলস্থুলই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই ইহার এত নাম।

রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য ও কাব্য সৌন্দর্য্য।

অবশ্য যে সকল চরমপন্থী সমালোচক নীলদর্পণ মাহাত্ম্যের এইরূপ অসাধারণ কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে যাঁহারা একটু নরম করিয়া বলেন, যে এই সামাজিক উদ্দেশ্যই ইহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে, তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য নহে, একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অন্য সমালোচকের কথা দূরে থাকুক, নীলদর্পণ প্রসঙ্গে এমন কি বঙ্কিম বাবুও, স্বদেশবৎসল দীনবন্ধুর পরদুঃখ কাতরতা ও তাঁহার নিকট "বঙ্গীয় প্রজাগণের অপরিশোধনীয় ঋণের" কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এই অসাধারণ দৃশ্যকাব্য খানির কি মূল্য, তাহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই। পরন্তু বলিয়াছেন "বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নভেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত

উদ্দেশ্যমূলক রচনা।

* *Calcutta Review* 1872 Vol. 54. † *Cal. Rev.* 1871, Vol. 51.

হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সে গুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়।" নীলদর্পণকে তিনি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কারণে শুধু এইটুকু নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।" ইহা গ্রন্থের প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে ইহার সাহিত্যিক গৌরব কিছুই বুঝা গেল না।

তৎসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর মতামত।

যে সকল লেখক বা সমালোচক নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বলেন, তাঁহাদের নিকট অন্যবিধ উদ্দেশ্যমূলক নাটক একেবারেই অগ্রাহ্য কিন্তু কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে বসিলেই যে শিল্প সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে ইহার কিছু কারণ নাই। কাব্যের সৌন্দর্য্য অনেকটা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সুন্দর হয়, তবে গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য কতটা এই উদ্দেশ্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। অর্থাৎ গ্রন্থকার কতটা এই উদ্দেশ্যর ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিবেচ্য। সমস্ত উদ্দেশ্যই কিছু মন্দ নহে, পরন্তু জগতের সাহিত্য ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উদ্দেশ্য বিহীন খেয়ালের উপর কখনও সাহিত্য গঠিত হয় নাই, কিছু না কিছু উদ্দেশ্য চিরকাল সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত। প্লেটো বলেন যে সাহিত্যের মূল্য ইহার উপকারিতার উপরও নির্ভর করে; লোক শিক্ষক কবিগণ চিরকাল উন্নত আদর্শের সৃষ্টি করিয়া মানব সমাজ পরিচালিত করিতেছেন; ইহা যদি না করেন, তবে তাঁহারা সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবার যোগ্য। একথা যদি সত্য হয় তবে উদ্দেশ্য ভিন্ন সাহিত্য নাই এবং কাব্যের সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্যের উপরও নির্ভর করে। দান্তেই বল, মিলটনই বল, সকলেরই একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে এই সকল মহৎ লোকের রচনায় যাহা কিছু দোষ দেখা যায়, তাহা এই উদ্দেশ্যের পশ্চাদ্-দ্বার দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহাও স্বীকার্য্য যে ইঁহাদের রচনায় যাহা কিছু গুণ তাহাও এই পথ দিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, যদি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচনা করা ভুল হয়, তবে এই ভুল অনেক বড় বড় লেখকেরও হইয়াছে।

উদ্দেশ্যের ব্যবহার ও অপব্যবহার।

নাটক রচনায় ও যে সকল রচনায় মনুষ্য চরিত্র লইয়াই কারবার, সে সকল স্থলে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতে যাইলে, কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে; তাহা না হইলে কবিত্ব নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা। ইহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান নিয়মটি এই যে এই বিশেষ উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া লেখক যেন অঙ্কিত চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া না যান। এ বিষয়ে নাট্যকার বা উপন্যাস লেখককে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে। সেক্সপিয়ার যে এত বড় নাট্যকার, তাহার বিশেষ কারণ এই যে অঙ্কিত চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; নিজের মতামতের প্রভাব যাহাতে এই চিত্রণ শক্তির গতি কোনওরূপে বিঘ্নিত করিতে না পারে তাহাতে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। দক্ষ বাজীকরের ন্যায়, তিনি স্বয়ং পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের চক্ষুর সন্মুখে তাঁহার পুতুলগুলি নাচাইয়া যান, কিন্তু এই পুতুলনাচের পশ্চাতে যে কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহা কে বলিবে? তবে এই উদ্দেশ্যটি আখ্যানবস্তু ও চরিত্রচিত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা কেবল চরিত্রসমূহের ঘাত প্রতিঘাত হইতে ও নাটকের গতি হইতে এই উদ্দেশ্যটি ধীরে ধীরে অনুভব করি—গ্রন্থকার বাহির হইতে জোর করিয়া এই উদ্দেশ্যটি আমাদের বুঝাইয়া দেন না। কিন্তু সেক্সপিয়ারের ন্যায় সকল লেখক সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন, এই জন্যই উদ্দেশ্যমূলক নাটকের এত নিন্দা। আজকাল কাব্যের চরিত্রগুলি উদ্দেশ্যসৃষ্টি না করিয়া, উদ্দেশ্যই চরিত্রসৃষ্টি করিয়া থাকে; সেই জন্যই এই সকল লেখা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট। সৃষ্ট চরিত্রগুলিও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। এই জন্য দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ গ্রাম্য জমীদরের অত্যাচার বা সহুরে বয়াটে মাতালের মাতলামীর চূড়ান্ত দেখাইতে গিয়া, অনেক গ্রন্থকার মূর্ত্তিমান শয়তানের মত এক অতি অস্বাভাবিক জমিদার বা মাতাল আঁকিয়া বসেন—মানুষ আঁকেন না। কারণ এস্থলে তাঁহার এই বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেই চরিত্রসৃষ্টি;—চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া উদ্দেশ্যটি ফুটাইয়া তোলা তাঁহার লক্ষ্য নহে। রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক নাটকসমূহে এই দোষ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অন্য লেখকের কথা দূরে থাকুক এমন কি ডিকেন্স (Deckens) সার্লোট ব্রণ্টে (charlotte Bronte)র ন্যায় প্রতিভাশালী লেখকও বিশিষ্ট উদ্দেশ্য পরবশ হইয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

উদ্দেশ্য ও চরিত্র সৃষ্টি।

নাট্যকারের নির্লিপ্ততা

উদ্দেশ্য পরবশতা ও নাট্যকলার হানি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিলে, কোনও নাটক বা উপন্যাস কাব্যাংশে নিকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকিলেই যে এইরূপ হইবে তাহা বুঝায় না। রচনার সৌন্দর্য্য বা নিকৃষ্টতা লেখকের ক্ষমতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে, উদ্দেশ্যের উপর নহে। কাব্যকৌশলের অভাব, অথবা উদ্দেশ্যের খাতিরে কাব্যকৌশলের বিসর্জ্জন—ইহা হইতে গ্রন্থের অপকৃষ্টতা সম্ভব হয়। "কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি"—গেটের অনুকরণে বঙ্কিমবাবু যে এ কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা ভুল করিয়া বুঝিলে চলিবে না। যদি উদ্দেশ্য সুন্দর ও লোকহিতকর হয়, তবে একমাত্র শিল্পচাতুর্য্যের অভাব না থাকিলে যে সে উদ্দেশ্য সুন্দর করিয়া কেন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যাইবে না অথবা তদ্দারা কেন যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সম্ভব নহে, তাহা বুঝিতে পারি না। সৌন্দর্য্যের মুলতত্ত্ব কি তাহা দার্শনিকগণ বিচার করুন, তবে এইটুকু বুঝা যায় যে যাহা মানবের হিতকর ও কল্যাণপ্রদ তাহা আমাদের চক্ষুতে সুন্দর। সমাজ সংস্করণ যখন এইরূপ জাতির কল্যাণ কামনায় উৎসৃষ্ট, তখন তাহা কেন সুন্দর হইবে না বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অন্তরায় হইবে, তাহা বুঝা যায় না। কোনও উদ্দেশ্য না থাকিলে সৃষ্টি সম্ভব নহে; শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইযা সেক্সপিয়ার তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী রচনা করিতে পারিতেন না। শুধু ইচ্ছামত প্রকৃতির যে কোনও চিত্র কাব্যপটে অঙ্কিত করা কিছু বাহাদুরী নহে; তাহাতে কাব্য বা নাটক রচনা করিতে পারা যায় না। আমরা শুধু খেয়ালী কাব্যও চাহি না, কিন্তু শিল্পসৌন্দর্য্যহীন উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তিও চাহি না,—এই উভয়ের সংমিশ্রণই সাহিত্যের উপাদেয় বস্তু। উদ্দেশ্য বর্জ্জিত কাব্য প্রাণহীন, কাব্যবর্জ্জিত উদ্দেশ্য শুষ্ক ও নীরস।

উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যের জন্য দীনবন্ধুর নাটকের যে কোনও ক্ষতি হয় নাই, এ কথা বলা যায় না; তথাপি দীনবন্ধু যে তাঁহার নাটকে কাব্যকৌশল দেখান নাই বা স্বভাবসঙ্গত চরিত্রাঙ্কণে অক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অথবা উদ্দেশ্যের খাতিরে শিল্পচাতুর্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এ কথাও কোন মতে বলা যায় না। অবশ্য উদ্দেশ্য ও বিষয়ানুরোধে, নাটকের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণায়তন হইয়াছে, তথাপি দীনবন্ধুর অঙ্কিত আলেখ্য যে সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গত ও সুন্দর হইয়াছে, একদিকে নীলকরদিগের অত্যাচার কাহিনী অন্যদিকে তোরাপ, রাইচরণ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতির চিত্র যে সম্পূর্ণ

নীলদর্পণে উদ্দেশ্য ও শিল্পচাতুর্য্য।

নিপুণ ও জীবন্ত হইয়াছে, এ কথা বঙ্কিমবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে পল্লীচিত্র ও পল্লীজীবনের সহিত এরূপ সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতা যে বঙ্গসাহিত্যে সত্যই অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এইজন্যই "নীলদর্পণ দীনবন্ধুর প্রণীত সকল নাটক অপেক্ষা শক্তিশালী।" কিন্তু এরূপ স্বভাব সঙ্গত ও শক্তিশালী হইয়াও কি তাঁহার চিত্রগুলি কাব্যের উপযোগী নহে? এইরূপ প্রকৃতির ছবি সুন্দর ও নিপুণ করিয়া আঁকা কি শিল্পকৌশলের পরিচায়ক নহে? বঙ্কিমবাবু আরও বলিয়াছেন, (ও আমরা তাহা পরে বিশেষ রূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব) যে দীনবন্ধুর এই চিত্রণশক্তি শুধু realistic বা স্বভাবাঙ্কণে পর্যাবসিত নহে, তাঁহার চিত্রগুলি idealise বা মানসিক সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও বিলক্ষণ ছিল, এবং এই idealismএর মূলে তাঁহার

সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও করুণরস।

শ্রেষ্ঠ কবিসুলভ কল্পনা ও সহানুভূতি প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ইহার পরেই বঙ্কিমবাবু আবার বলিয়াছেন—"যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত, সে সকলে দীনবন্ধুর তাদৃশ অধিকার ছিল না। তাঁহার সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয় নহে।" অবশ্য বঙ্কিমবাবুর সৌন্দর্য্যরসজ্ঞতা বঙ্গসাহিত্যে আর কে স্পর্দ্ধা করিতে পারে, তথাপি তাঁহার উপরোক্ত দুইটি নিষ্পত্তি পরস্পর বিরোধী

বঙ্কিমবাবুর অভিমত।

কিনা তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। নীলদর্পণে যেরূপ করুণরস ও idealise করিবার ক্ষমতা দেখা যায় বোধ হয় দীনবন্ধুর আর কোনও নাটকে তত দেখা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর শেষোক্ত মত যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে দীনবন্ধুর করুণরসোদ্রেকে ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল। যুক্তিদ্বারা এ কথার মীমাংসা হয় না; পাঠকগণ স্বয়ং অনুভব করিয়া যাহা ঠিক করিবেন তাহাই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। গোলকবসু ও সাধুচরণ, এই দুইটি পরিবারের দুঃখের কাহিনীর মধ্যে কি কিছুই "সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত" নাই? নিরক্ষর তোরাপের প্রভুভক্তি, নিরীহ ক্ষেত্রমণির সতীত্বমাহাত্ম্য, গ্রাম্য রাইচরণ ও সাধুচরণের সাধুতা ও সহিষ্ণুতা, সরলতার নীরব সারল্য, সাবিত্রী ও সৈরিন্ধ্রীর স্নেহ ও আত্মত্যাগ—এ সমস্ত স্পষ্ট কথায় ও জীবন্ত চিত্রে ব্যক্ত হইলেও তাহা কি কোমল মধুর করুণ ও অকৃত্রিম নহে? চাষার কাহিনী সরল ও আড়ম্বরহীন হইলেও, তাহাতে করুণ ও সূক্ষ্ম শিল্পের চাতুর্য্য যে একেবারে নাই এ কথা কিরূপে বলা যায়, তাহা কল্পনা করিতে পারি না। তবে best art is concealed art.

কিন্তু একটি বিষয়ে শিল্পসূক্ষ্মতার অভাব নিরপেক্ষ পাঠক দীনবন্ধুর নীলদর্পণে অনুভব করিবেন। বোধ হয় বঙ্কিম বাবু এ কথাই তাঁহার সমালোচনায় বলিয়া থাকিবেন। এই নাটকে যে অসাধারণ করুণ রসের উদ্রেক করা হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দীপনা কোথায়? মানবের ক্ষুদ্র শক্তির সহিত নিয়তির ভীষণ সংগ্রাম—ইহাই এই গ্রন্থের করুণরসের প্রাণস্বরূপ। এই বিষয়ে দীনবন্ধুর এই নাটকের সহিত প্রাচীন গ্রীক নাটকের মূলগত ভাবের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। আধুনিক রোমান্টিক নাট্যকারদিগের ন্যায় চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত বা অন্তর্জগতের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সংগ্রাম এই সকল উপায়ে প্রাচীন গ্রীকগণ করুণরসের সৃষ্টি করিতেন না; মানবের ক্ষুদ্রতা ও নিয়তির বিশালতা, ইহার মধ্যেই তাঁহারা মানবজীবনের সমস্ত বিয়োগান্ত নাটকের আভাস দেখিতে পাইতেন। * অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে প্রাচীন কালের সামাজিক জীবনে এত জটিলতা ও অন্তর্মুখী ভাব আসে নাই; এই জন্য তাঁহাদের নাটকের মূলগত ভাবটি এত সরল ও সঙ্কীর্ণ। ঘৃণা, প্রতিহিংসা, অত্যাচার প্রভৃতি কয়েকটি স্থূল বিষয় লইয়াই তাঁহাদের নাটকের সমাপ্তি। Æschylis এর Prommetheus বা Euripides এর Medea একদিকে, অন্যদিকে Shakespear এর Lear, Browning এর Luria বা Materlink এর Aglaraine et Selysette—এই উভয়ের তুলনা করিলে, উপরোক্ত কথার তাৎপর্য্য বেশ বুঝা যাইবে। এই বর্দ্ধনশীল Subjectivity বা অন্তর্মুখী ভাব আধুনিক নাটকের সূক্ষ্মতার উপাদান স্বরূপ। এই হিসাবে গ্রীক নাটকে আধুনিক নাটক সমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাদি দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এই হিসাবে দীনবন্ধুর নাটকেও সূক্ষ্ম শিল্পের অভাব আছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্কিমের বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে চরিত্র বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, দীনবন্ধুতে তাহা নাই। অবশ্য এক্ষেত্রে নীলদর্পণ রচনায় নাটকীয় আখ্যান বস্তুর ও সঙ্কীর্ণতা ছিল, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক romantic নাটকের বাহ্যপদ্ধতি অনুসারে রচিত হইলেও, নীলদর্পণের কেন্দ্রগত মূল ভাবটি প্রাচীন গ্রীক বা classical নাটকের অনুযায়ী।

নীলদর্পণে করুণরসের বিশেষত্ব।

চরিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে, চরিত্রের বিকাশ যে একেবারে দেখান হয় নাই তাহা

* See Schlegel's Art & Literature. Vaughan's Types of the Tragic Drama etc. Also See Victor Hugo's Preface de Cromwell.

নহে, তবে ঘাত প্রতিঘাতের সাহায্যে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ বিকাশ অপেক্ষা, ঈপ্সিত চরিত্রের স্থূল বিশেষত্বগুলি ধরিয়া লইয়া, কতকগুলি situation বা বাহ্য ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়া সেই বিশেষত্বগুলি ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর আখ্যানবস্তুর মধ্যে একটা ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্নতা বা সমষ্টির ভাবের অভাব নাই সত্য, তথাপি এসম্বন্ধে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক প্রসঙ্গে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা এস্থলেও অল্পবিস্তর খাটে। এই জন্য এই নাটকে মানবহৃদয়ের সে সকল সুকুমার ভাব বা অন্তর্জগতের যে সমস্ত সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার প্রসর বিস্তীর্ণ নহে ; কর্ম্মক্ষেত্রের আয়তনও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, আখ্যানবস্তু সরল ও সামান্য, এবং চরিত্রসমূহে বৈচিত্র্যের অভাবও ঈষৎ লক্ষিত হইবে। গ্রীক নাটকে যেমন দাম্পত্য বা অন্যবিধ প্রেমের কোনও স্থান ছিল না, এ নাটকেও সেইরূপ। অবশ্য ইহা হইতে বুঝাইবে না যে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা সঙ্কীর্ণপ্রসর ছিল ; আমরা শুধু বলিতে চাই যে এই নাটকে তাঁহার রচনা প্রণালী (এবং তাঁহার আখ্যান বস্তুর আয়তনও) অতি সঙ্কীর্ণ,—সেই জন্য তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা এ নাটকে দেখিতে পাই না। নাটকে তাঁহার প্রকৃত শক্তি কোথায় এবং কোন্ রচনাপ্রণালী তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ তাহা দীনবন্ধু বোধহয়, এখনও অনুভব করিতে পারেন নাই।

রচনাপ্রণালীর ও আখ্যান বস্তুর সঙ্কীর্ণতা।

মানব জীবনের কোন সূক্ষ্ম সমস্যার সমালোচনা নাই, মানবহৃদয়ের বিচিত্র অতীন্দ্রিয় ভাবসমূহের রেখাস্পর্শে মোহনীয় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি নাই, অথবা গ্রীক নাটকের প্রতিপাদ্য বৃহৎ চরিত্র বা বৃহৎ জীবনের বিকাশ নাই—শুধু সুখদুঃখপরিপূর্ণ পাপপুণ্যময় অনাড়ম্বর প্রাত্যহিক পল্লীজীবনের করুণ কাহিনী, এই নাটকের মুলবস্তু। ইউরোপীয় সাহিত্যে এরূপ নাটককে tragedie bourgeoise বা পারিবারিক নাটক বলিবে। * ইহাতে Othelloর "the pity of it, O Jago, the pity of it" বা Hamletএর "To be or not to be" অথবা Antonyর "Let Rome in Tiber melt" প্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি অতি নিপুণ কারুণ্যরসসিক্ত তুলিকার স্পর্শে দর্শকের চিত্তে একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেওয়া এবং ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়মন যুগপৎ লজ্জা ঘৃণা ভয় ও কারুণ্যরসে আপ্লুত করিয়া দেওয়া,

ও বিশেষত্ব।

* এখানে Ibsen বা Ibsenite দের কথা বলিতেছি না। ইংলণ্ডের Haywood বা ফ্রান্সের Sedaine বা Nivelle de la chauseeএর কথা বলিতেছি।

ইহাও কম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেয় না। Heywoodএর 'O Nan, Nan' * যদি এত মর্ম্মস্পর্শী হয় তবে ক্ষেত্রমণির "ওপরের দেবতাত জানতি পারবে, দেবতার চকি ধুলা দিতে পারবো না" অথবা রেবতীর "মুই সোণার নক্ষি ভেসিয়ে দিতি পারবো না" প্রভৃতি আরও কত মর্ম্মস্পর্শী। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি ও করুণরসোদ্রেকে ক্ষমতা বঙ্গ সাহিত্যে আর কয়জন লেখকের আছে? একদিকে হিন্দুপেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় রাইয়তদিগের চিরবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষা, অপরদিকে নীলদর্পণে বিম্বিত দানবন্ধুর করুণ উপাখ্যান—সে সময় বঙ্গ-সমাজে এক অভাবনীয় আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই করুণরসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন কোন বিশিষ্ট সমালোচক সন্দেহ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মত আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মরসজ্ঞতা আমরা কোথায় পাইব, তথাপি যখন বঙ্কিমবাবু বলেন যে "সৈরিন্ধ্রী সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ অদরণীয় নহে" তখন আমা-দের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে অনুমান হয় যে তিনি এই কথায় আলোচ্য চরিত্রের অস্থিমজ্জা-গত করুণভাবটির প্রতি লক্ষ্য করেন নাই (কারণ এ বিষয়ে করুণরসের অভাব কোনও মতে স্বীকৃত হইতে পারে না) পরন্তু এই করুণ ভাবটি যেরূপ বিসদৃশ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কারণ অনেকে বলেন যে দীনবন্ধু নীলদর্পণে তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, পদী, আহুরী, কৃষক, আমীন, লাঠিয়াল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর চিত্রগুলি যেরূপ স্বভাবসুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন,

নীলদর্পণে করুণরসের স্থায়িত্ব ও তৎসম্বন্ধে মতভেদ।

নবীন, মাধব, বিন্দু, সরলতা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর চিত্র সেরূপ উৎকৃষ্ট হয় নাই, এবং ইহার প্রধান কারণ কবির স্বভাবা-ঙ্কণ ক্ষমতার অভাব নহে, কবির বিচিত্র ভাষাবিন্যাস কোন সমসাময়িক সমালোচক (১৮৭২) বলেন—"যেখানে যেখানে নবীনমাধব বিন্দু-মাধব, সরলতা প্রভৃতির মুখে বেশী সাধুভাষা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ভাব উত্তম থাকিলেও শব্দগত 'অতি' দোষাদি ঘটিয়া রসের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটাই-য়াছে। ঐ সকল বক্তার মুখে অস্বাভাবিক গুরুভাবের গুরুতর শব্দাড়ম্বর কর্ণে যে অপ্রিয় ধ্বনির কাজ করিয়াছে।…নাটকের ১ম অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্কে গোলক-বসু নবীনমাধবকে নীলকুঠির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবা, কি করে এলে?" নবীনমাধব উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে

(১) ভাষাগত 'অতি' দোষ

* A woman killed with kindness'

কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশনে সঙ্কুচিত হয়?" ইত্যাদি। ....সীতা দময়ন্তী শকুন্তলার মুখে আর্য্যপুত্র, প্রাণবল্লভ, হৃদয়নাথ, শোভা পায়। গোলক বসুর পুত্রবধূর মুখে সেরূপ সম্বোধন দুই এক বিশেষস্থল ব্যতীত অর্থাৎ সচরাচর ব্যক্ত হওয়া অস্বাভাবিক। ....৩য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে নবীনমাধব ও সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তার কারামুক্তি, অর্থাভাব ও মোকদ্দমা প্রভৃতি দারুণ দুরবস্থার যে সব কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তন্মধ্যে 'প্রাণনাথ, হে নাথ, অকিঞ্চিৎকর, আভরণ, হৃদয়বল্লভ, জীবনকান্ত' ইত্যাদি শব্দ কি সৈরিন্ধ্রীর মুখে সাজিতে পারে? আবার —'ও অগ্নিবাণ, তার আর সন্দেহ কি? আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে।" এরূপ কথা কি স্বাভাবিক? কোমল ও লঘুবাক্যবিন্যাস কি ইহার অপেক্ষা করুণ-বাচক হয় না? নবীনমাধবের উক্তিতে ঐরূপ অর্থাৎ 'প্রেয়সী, আহা বিধুমুখী, প্রণয়িণি' প্রভৃতি সম্বোধন ও অন্যান্য পদাবলী আমাদের ভাল লাগে নাই। নবীনমাধবের মৃতবৎ শরীর দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী রোদন করিয়া বলিতেছেন— 'আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনা হইয়া আছেন ইত্যাদি।' এইরূপ সংস্কৃত ভাষা স্ত্রীলোকের মুখে পতির মৃত্যুকালে নিনাদিত হইলে রঙ্গভূমিতে শোকোদ্রেকের যতদূর সম্ভাবনা, তাহা সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী ধ্যান করিয়া দেখুন। এরূপ ভাষা এক আধস্থলে হইলে উল্লেখমাত্র করিতাম না, বহুস্থলে এই প্রকার গুরুশব্দ অর্থাৎ অবস্থার অনুপযুক্ত সাধুভাষা ব্যবহৃত হইয়া করুণরসের প্রতিবন্ধকতা করা হইয়াছে।

তাহার কারণ।

উক্ত সমালোচনার উত্তরে আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"কবি ইচ্ছা করিয়াই কাব্যের অর্থগৌরব বর্দ্ধনের জন্য, রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যসুলভ গাম্ভীর্য্য প্রদানের জন্য, ঐরূপ ভাষা দিয়াছেন।" এরূপ অনুমান হেতুস্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এই যে "নীলদর্পণের ৫ বৎসর পরে প্রকাশিত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তেও গৌরমণি ও রামমণির কথোপকথন মধ্যে বিধবার আকাঙ্ক্ষা আক্ষেপ, এবং বিধবা-বিবাহের যুক্তিযুক্ততা বর্ণনাস্থলে ঠিক ঐরূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু 'সধবার একাদশী নীলদর্পণের ৬ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। তাহাতে এরূপ ভাষা কোথাও নাই। অবশ্য অর্থগৌরব বর্দ্ধনের জন্য দীনবন্ধু স্বেচ্ছায় কতকাংশে এরূপ দীর্ঘায়ত সমাস বহুল বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকিবেন, কিন্তু যদি

কেহ সমসাময়িক নাটক সমূহের আলোচনা করিয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ লম্বা লম্বা স্বগতোক্তি বা বাক্যাড়ম্বর তখনকার নাটকে কিছুই আশ্চর্য্যজনক বস্তু ছিল না। কতকটা তখনকার প্রচলিত সংস্কৃত নাটক (বা তাহার অনুবাদ) অথবা যাত্রার ভাষার অনুকরণে কতকটা "সাধুভাষা" প্রয়োগেচ্ছা প্রনোদিত হইয়া অধিকাংশ কৃতবিদ্য লেখক এই সংস্কৃত বহুল গুরু গম্ভীর (কিন্তু আধুনিক কালে হাস্যাস্পদ) ভাষা ব্যবহার করিতেন। এরূপ ভাষা যে হাস্যজনক হইতে পারে এটুকু জ্ঞান যে রসিক দীনবন্ধুর ছিল না তাহা বলা যায় না, তবে তখনও ভাষা সম্বন্ধে কিছুই একটা স্থিরতা হয় নাই। দীনবন্ধুর দীক্ষা গুরু ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য প্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অলঙ্কার কণ্টকিত অনুপ্রাসবহুল এবং অনুস্বার বিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা, ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। * অবশ্য তখন ভাষার বাল্যাবস্থা। কিন্তু দীনবন্ধু যখন নীলদর্পণ লেখেন, তখনও এই ভাষা সমস্যার চরম নিষ্পত্তি হয় নাই। গদ্যে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে মাইকেল, নাটকে দীনবন্ধু, গদ্যে একদিকে সংস্কৃত কালেজী দল অন্য দিকে আলালী নক্সা—এই রূপ চারিদিকেই একটা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। ইহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

তৎকালী ভাষা সমস্যা।

নাটকে, মাইকেল দীনবন্ধুর পূর্ব্বগামী হইলেও, তাঁহার গম্ভীর প্রবন্ধ অনেকটা সরল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও যে সংস্কৃতানুযায়ী, কৃত্রিম ও নাটকের অনুপযোগী, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'কুলীনকুল সর্ব্বস্বে'র বিরহীপঞ্চাননের "জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজতাপসমূহ সমর্পিত করিয়া কি স্বয়ং সুশীতল হইল ? অহহ ! বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সঙ্কোচ নাই।" প্রভৃতির মধ্যেও কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। ফলতঃ তখনও নাটকের উপযুক্ত ভাষার সৃষ্টি হয় নাই; ভাষা তখনও "সাহিত্য শিল্পাগারে শিক্ষার্থী।" একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্য দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত এই দুই মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল বটে; তথাপি উভয়েই সংস্কৃতাভিজ্ঞ ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন বলিয়া ভাষা

* নমুনা যথা—"কেন না এইকালে নব নব নয়নবল্লভ পল্লব মঞ্জরী মণ্ডিত নব নব সুচারু সুন্দর সুরভি ফুল্ল ফুলদল সুশোভিত মৃদু মৃদু মলয়ানিল সেবিত মধুপান মত্ত মধুকর নিকর-গুঞ্জিত কোকিল কুলকল কূজিত কমনীয় কুঞ্জকাননে কুটিল কুন্তলা কুরঙ্গ পক্ষী কুলকামিনীকুল করসঞ্চালন পুরঃসর বিহার সুখে সুখী হইতে ইচ্ছা হয়।"

প্রাঞ্জল হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী হইয়া উঠিল।* বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষার লালিত্য, দৃঢ়তা বা ওজস্বিতা থাকিলেও, তাহা সংস্কৃত ভাব, অলঙ্কার ও অর্থ-গৌরবে এত গম্ভীর যে তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কোনও মতে নাটকের বা (যদি কেহ দ্বিতীয় 'রাসেলাস' লিখিতে না চাহেন তবে) উপন্যাসের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অবশ্য এই সময়ের টেকচাঁদের আলালী ভাষা অধিকতর জীবন্ত ছিল, কিন্তু তাহা এত হাল্‌কা যে তাহা মার্জ্জিত করিয়া না লইলে, কোনও উচ্চশ্রেণীর রচনায় চলিতে পারে না। † অবশ্য ইহার উত্তরে বেশ বলা যাইতে পারে যে নীলদর্পণ বাহির হইবার পূর্ব্বেও, মাইকেলের শার্ম্মিষ্ঠায় বা কৃষ্ণকুমারীতে ও তর্করত্নের রত্নাবলী প্রভৃতির বহুস্থলে সহজ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহা হইতে দীনবন্ধুর ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন লোক স্বীয় ভাষা গড়িয়া লইতে পারিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন টেকচাঁদী ভাষা স্বীয় ভাষার আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালা গদ্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন, দীনবন্ধুও কি তাহা পারিতেন না? নীলমণি বসাকের 'নবনারী' প্রভৃতি দুএকখানি গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে আলালের ন্যায় সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।* সুতরাং দীনবন্ধুর সম্মুখে আদর্শ ছিল না এ কথাও বলা যায় না। আদর্শ থাকুক বা না থাকুক, অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায়, এ বিষয়েও তিনি স্বয়ং আদর্শের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। নাট্যকারের ভাষার আবার আদর্শ কি? তিনি ইচ্ছা করিলে প্রচলিত কৃত্রিম ভাষার সাহায্য না লইয়া, প্রবৃত্তি বা স্বভাবানুযায়ী বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিতেন। সেক্‌সপিয়ারের সমসাময়িক গদ্যের সহিত তাঁহার গদ্যের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে ভাষার জন্য নাট্যকারের বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই—জীবনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। † ফলতঃ দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সে সময় দীনবন্ধু চাকুরী উপলক্ষে দেশে দেশে পথে পথে ঘুরিতেন, এরূপ ইচ্ছা বা চেষ্টার অবসরও তাঁহার ছিল না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে নীলদর্পণ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম

আদর্শের অভাব।

* গুপ্তকবি সংবাদ প্রভাকরের 'জিগীষা জিজীবিষা প্রভৃতির বিদ্রূপে 'ঢিডটামিষা' প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেও, তিনি স্বয়ং যে গদ্য রচনা করিতেন। ইচ্ছা করিলে তাহারও যথেষ্ট বিদ্রূপ করা যায়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

† 'দীনবন্ধু ও হাস্যরসের রচনা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* অনেকে বলেন যে এই পুস্তকখানি আলালের পূর্ব্বে লিখিত।

† অবশ্য সেক্সপিয়ারের ভাষায়ও Eupheasএর প্রভাব দৃষ্ট হইবে।

রচনা, এবং সুচিন্তিত হইলেও সাময়িক উত্তেজনার ফল। কিন্তু তথাপি এই স্থলেই বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সহিত দীনবন্ধুর প্রতিভার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এ কথা বলিয়া দীনবন্ধুর শক্তির খর্ব্বতা প্রতিপন্ন করিতে চাহি না; যেমন বঙ্কিম অনেক বিষয়ে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর তেমনি তিনিও অনেক বিষয়ে বঙ্কিম হইতে অধিকতর শক্তিশালী। তথাপি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে যদিও উভয়ের আদর্শ ও সুযোগ একই ছিল, তবুও দীনবন্ধুর ভাষা বঙ্কিমের ভাষার ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী বা সর্ব্ব শ্রীসম্পন্না নহে। ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ব্ব বিষয়ের ও সর্ব্ব সাধারণের ভাষা—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রধান সৃষ্টি।*

দীনবন্ধু ও বঙ্কিম উভয়ের ভাষা।

এই ভাষাগত বৈষম্য ভিন্ন আর একটি কারণে নীলদর্পণের করুণরসরঞ্জিত চিত্রগুলি স্থলে স্থলে একটু অস্বাভাবিক বা বিকৃত হইয়াছে। সেটি ভাবপ্রকাশে বা চিত্রাঙ্কনে সংযমের অভাব। অবশ্য এই দোষ অতি বিরল তথাপি বোধ হয় এই কারণেও সূক্ষ্মরসাস্বাদী বঙ্কিমচন্দ্র নীলদর্পণের করুণরসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। এই নাটকে, 'অতি দোষ' যে শুধু ভাষায় তাহা নহে, ভাব সম্বন্ধেও এই 'অতি দোষ' স্থানে স্থানে বর্ত্তিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক হইতে ৪র্থ গর্ভাঙ্ক পর্য্যন্ত, বোধ হয়, এই নাটকের করুণরসের চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। কিন্তু পাঠক যদি ২য় গর্ভাঙ্কে সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ ও ৪র্থ গর্ভাঙ্কে বিন্দুমাধবের শোকোচ্ছ্বাস এই উভয়ের আড়ম্বরটা অনুধাবন করেন, তাহা হইলে আমরা যে কথার উল্লেখ করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভাবের অত্যুক্তি দোষে চিত্র অতিরঞ্জিত করিলে যে করুণরসের ব্যাঘাত হয় তাহা বোধ হয় সাহিত্যজ্ঞ

(২) ভাবগত 'অতি' দোষ সংযমের অভাব।

* দীনবন্ধু নীলদর্পণে পদ্য অপেক্ষা গদ্যই প্রধানতঃ ব্যবহার করিয়াছেন। কেবলমাত্র দুইস্থলে পদ্য দেখা যায়—(১) সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ, (২) বিন্দুমাধবের বিলাপ। (৫ম অং ২য় ও ৪র্থ গঃ) বলা বাহুল্য, গদ্য ছাড়িয়া এই দুই স্থলে পদ্য ব্যবহারে কোনও উন্নতি দেখা যায় না। কবিতা রচনায়, বিশেষতঃ নাটকোপযোগী কবিতায়, দীনবন্ধুর তাদৃশ শক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং নীলদর্পণে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, অতি অল্পস্থলেই পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে। লীলাবতীতে হেমচন্দ্র পয়ারকে গয়ার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"লীলাবতী, সারদাসুন্দরী ও ললিত প্রভৃতির মুখে যে সকল দীর্ঘ দীর্ঘ মাইকেলা ছন্দ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কি পয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে?" অতদূর না গিয়াও, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কবিত্ব থাকুক বা না থাকুক, এই সমুদয় দীর্ঘ কবিতাবলী অভিনয়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও নাটকের স্বাভাবিক গতির ব্যাঘাত জন্মায়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। হৃদয়ের গভীর আবেগ কখনও বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলে না বা লম্বা লম্বা বক্তৃতার ধার ধারে না। কর্ডেলিয়ার মৃত্যু দৃশ্যটি এত সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী, তাহার কারণ সমস্ত চিত্রটি স্বাভাবিক অল্প কথায় ও অত সহজ উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে উত্তর রামচরিতের নায়ক সীতার আসন্ননির্ব্বাসনদুঃখে 'হা বিদেহ দুহিতা!' করিয়া যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধীরোদাত্ত নায়কত্বে আমাদের সন্দেহ আসে। কিন্তু রামায়ণ বা কালিদাসের রামের চিত্র এ স্থলে অধিকতর করুণ ও সুন্দর।

যাহা হউক, দীনবন্ধুর এই বাহুল্য দোষ স্থলে স্থলে দেখা যাইলেও ব্যাপক নহে। বিয়োগান্ত দৃশ্য বর্ণনায় বা করুণরসে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহার সন্দেহমাত্র নাই। নীলদর্পণের পঞ্চম অঙ্কের অন্যান্য স্থলে (বিশেষতঃ ক্ষেত্রমণির মৃত্যু ও পতি পুত্র শোকাকুলা সাবিত্রীর উন্মাদ) এই 'অতি' দোষের চিহ্নমাত্র নাই। ক্ষেত্রমণি, তোরাপ বা রাইচরণের চিত্র কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত হয় নাই। সকল স্থল যে প্রথম শ্রেণীর লেখকের উপযুক্ত তাহা সাহিত্যজ্ঞ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বন্ধুর নাটক সমালোচনে পাছে পক্ষপাত দোষ ঘটে, এই সতর্কতায় বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সামান্য ত্রুটিগুলিও যেরূপ বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে এই অকারণ সাবধানতাই তাঁহাকে দীনবন্ধুর করুণরসাধিকার সম্বন্ধে অযথা সন্দিহান করিয়াছিল। দীনবন্ধুর প্রতিভা যে করুণরসাত্মক রচনায় ফুটিত, তাহা শুধু নীলদর্পণ হইতে দেখা যায় এমন নহে, তাঁহার অন্যান্য নাটকের বহুস্থলেও ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। সাবিত্রীর উন্মাদ অপেক্ষা, গান্ধারীর করুণ চিত্র আরও ফুটিয়াছে। কমলে কামিনীর ৪র্থ অঙ্কে ৫ম গর্ভাঙ্ক পড়িলেই বুঝা যাইবে যে যাঁহারা বলেন দীনবন্ধু হাস্যরসেই অতুল ছিলেন, high tragic seriousness ছিল না, তাঁহাদের মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। তবে এইটুকু স্বীকার্য্য যে এরূপ অসাধারণ ক্ষমতাসত্ত্বেও, তাঁহার ক্ষমতার যেটুকু পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহা যথেষ্ট নহে। নীলদর্পণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; নীলদর্পণে করুণরস ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে নিবদ্ধ—ইহার প্রতিপাদ্য বস্তু মানব শক্তির সহিত জীবনের নির্দ্দয় সংগ্রাম; অন্তর্জগতের বৈচিত্র্য বা ঘাত-প্রতিঘাত অঙ্কিত করিতে তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু নীলদর্পণের অসামান্য শক্তিশালী লেখকের নিকট এত সামান্য দানে আমরা সন্তুষ্ট নহি। যে শক্তির

করুণরসে দীনবন্ধুর প্রতিভা।

তাহার বিকাশ ও অভিব্যক্তি।

পরিচয় তিনি নীলদর্পণে প্রথম দিয়াছিলেন, তাহার যে আর বিকাশ বা অন্যত্র অভিব্যক্তি হয় নাই, তাহার জন্য দরিদ্র বঙ্গ সাহিত্য আজ আরও দরিদ্র।

আমরা এই প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে অনেকের মতে দীনবন্ধুর হাস্যরসেই প্রতিভা ছিল, অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তিনি এক জন born humourist, করুণরসে তাঁহার চেষ্টা শুধু একটা খেয়াল বা আকস্মিক উত্তেজনার ফল। এ কথার কতটা মূল্য তাহা বলিতে পারি না, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার হাস্যোদ্রেক ক্ষমতার যতটুকু বিকাশ বা অভিব্যক্তি হইয়াছিল, করুণরস সম্বন্ধে তত নয়। করুণরসে যে তাঁহার অধিকার বা শক্তি ছিল, আমরা নীলদর্পণ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আর এ শক্তির অনুশীলন করেন নাই। নীলদর্পণ ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য সকল গ্রন্থে গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা থাকিলেও করুণরসের স্ফূর্ত্তি নাই; হাস্যরসের আধিক্য আছে। সকল স্থলে যে গম্ভীর বিষয়ের অঙ্কণে তিনি ঈপ্সিত রসের উদ্রেক করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না—ললিত, লীলাবতী বা বিজয়কামিনীর প্রেমের কাহিনী কতকটা মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়কনায়িকার গল্পের মত বৈচিত্র্যবর্জ্জিত ও প্রাণহীন। কিন্তু গম্ভীর বিষয় যেখানে করুণরসরঞ্জিত সেই খানেই তাঁহার সিদ্ধ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায় এই কারণেই শিখণ্ডিবাহনের কথা, গান্ধারার উল্লাস বা সুশীলার কোমল চিত্র এত সুন্দর হইয়াছে। এমন কি হাস্যরসের ফোয়ারাস্বরূপ সধবার একাদশীতে কুমুদিনীর চিত্র অথবা লীলাবতীতে সারদা সুন্দরীর চিত্রও এই জন্য এত চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এ সকল স্থলেও করুণরসের সম্পূর্ণ প্রসর নাই; বিষয়টি গম্ভীর হইলেও হাস্যরসের রেখাপাতে সমুজ্জ্বল, করুণ রসাত্মক নহে। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে দীনবন্ধুর প্রতিভার যে বিশেষত্বটুকু নীলদর্পণে এত পরিস্ফুট, তাহা অনুশীলন অভাবে অন্য কোথাও ফুটিবার অবসর পায় নাই; ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই জন্যই সমালোচকগণ দীনবন্ধুকে প্রধানতঃ হাস্য-রসের রচয়িতা বলিয়া সাহিত্যে স্থান দিবার জন্য উৎসুক, তাঁহার প্রতিভার সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখেন না।

দীনবন্ধুর হাস্যরস ও করুণরস; তুলনায় সমালোচনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলকুমার দে।

"শিক্ষা না সেবা।"

(আলোচনা)

কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল যুগে শিক্ষার সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে এখন এ সমস্যার মীমাংসা হওয়ার কোনও উপায় নাই। কারণ আমাদের জাতীয় সাধনায় আদর্শের সুস্পষ্টতা নাই। আমাদিগকে কি করিতে হইবে ও কোনদিকে যাইতে হইবে এবং আমাদের পক্ষে কি করা সম্ভব এই তিনটি প্রশ্নের সমাধানের উপরেই আমাদের শিক্ষা-প্রণালী নির্ভর করিতেছে। জাতির নিকট আজ যাহা আদর্শ কাল তাহা বাস্তব হইবে, আমরা যাহা পাইতে আশা করিতেছি ও পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি আমাদের পৌত্রগণ তাহা ভোগ করিবে ইহাই জাতীয় জীবনের সজীবতার পরিচয়। শিক্ষা প্রণালীর মধ্য দিয়াই এই সজীবতা প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করে, শিক্ষাই বাস্তবকে মাথায় করিয়া আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়।

আমরা যে প্রণালীতে আমাদের পুত্র কন্যাগণের শিক্ষা দান করিতেছি, তাহার সহিত আমাদের জাতির কোনও ভবিষ্যৎ আশার বিশেষ কোন যোগ নাই। জীবিকার্জ্জনের জন্যই আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন। যাহা হউক শিক্ষা সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এদিকে চেষ্টাও হইতেছে। আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হরিদ্বারে গুরুকুল, কাশীতে হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, চট্টগ্রামের জুগংপুর আশ্রম ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপুল চেষ্টা প্রমান করিতেছে যে শিক্ষা সমস্যার মীমাংসার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

কিছুদিন পুর্ব্বে আমাদের মনে কোনও প্রশ্নের উদয় হইলে আমরা তাহার মীমাংসার জন্য পশ্চিম দিকে চাহিতাম। এবিষয়ে ইউরোপ কি করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। ইউরোপের অনুসৃত উপায়ই একমাত্র অমোঘ উপায় বলিয়া মনে করিতাম। 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের' মতের কোন মূল্য ছিল না কিন্তু 'শ্বেত দ্বৈপায়নের' মত বেদ অপেক্ষাও অধিক অভ্রান্ত বলিয়া আমরা অনেক দিন বিনা বিচারে ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিয়াছি। সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত বুঝিতে পারিতেছি যে কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি মানবীয় সভ্যতার সকল বিভাগে ইউরোপ যে মীমাংসা করিয়াছে তাহা চরম বা সনাতন মীমাংসা

নহে। ইউরোপকেই এই সমস্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া যখন নূতন পথ অন্বেষণ করিতে হইতেছে তখন অন্ধভাবে ইউরোপের অনুবর্ত্তন আমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নহে।

আর এক কথা এই যে প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক সভ্যতার একটি প্রকৃতিগত বিশেষত্ব আছে, এই বিশেষত্বের বিলোপ সাধন যখন সেই জাতির মৃত্যু, তখন ইউরোপের মীমাংসা আমাদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু সর্ব্বথা অনুবর্ত্তনের বিষয় নহে; আমাদিগকে আত্মপ্রকৃতির বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া সকল বিভাগে কর্ত্তব্য পথ অবধারণ করিতে হইবে।

সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষকে জানিতে ও চিনিতে হইবে। বৈদেশিকগণের গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। বৈদেশিকগণের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞানালোক পাইয়াছি তাহার সাহায্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহ্যমূর্ত্তি আমরা কিয়ৎপরিমাণে সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্তু তাহার প্রাণের কথা আমরা অধিকাংশ স্থলেই শুনিতে পাই নাই এবং শুনিতে পাইলেও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

প্রাচীনকালের আদর্শ সমূহের যাহা প্রাণ, তাহাই আজ প্রয়োজন। সেই প্রাণটুকু বুঝিতে না পারিলে বর্ত্তমান জীবনে তাহা যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারিব না।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। সে সম্বন্ধে আজ কাল সাহিত্যে খুব বেশী না হইলেও কিছু কিছু আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সে এক স্বপ্ন-রাজ্যের ব্যাপার। সেই সামমন্ত্রমুখরিত, যজ্ঞ ধূমময় তপোবন, সেই ঋষিবালকগণের সমিধ সংগ্রহ ও নিত্য হোম, সর্ব্ববিধ বিলাস পরিহার করিয়া একাগ্রচিত্তে গুরুর সেবা—সে এক স্বপ্ন রাজ্যের ব্যাপার! ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত আবার সেই আশ্রম কেবল ভারতবর্ষে নহে এবার সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, কিন্তু সে দূরের কথা। এই তপোবনের বর্ত্তমান যুগে স্থান নাই সত্য কিন্তু সেকালে শিক্ষা-দানের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা আংশিকরূপেও একালে অনুবর্ত্তন করা যায় কিনা এবং সেই অনুবর্ত্তনের দ্বারা আমাদের যুগের শিক্ষা সমস্যার মীমাংসা হয় কিনা ইহাই প্রশ্ন।

ইংরাজী ভাষায় এবিষয়ে একখানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে।* আমাদের দেশের

* Education As Service by J. Krishnamurti.

সর্ব্বজন পরিচিত সুধী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থখানি "শিক্ষা ও সেবা" এই নাম দিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার নাই, যিনি অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহার নামেই অনুবাদের সরলতা ও সৌন্দর্য্য অনুমেয়। গ্রন্থখানি আমাদের দেশের সকলেরই পাঠ করা উচিত। যিনি পাঠ করিবেন তিনিই উপকৃত হইবেন ইহাই আমাদের সরল বিশ্বাস। এরূপ বিশ্বাসের কারণ আছে।

সুলভ ছাপাখানার কৃপায় আমাদের দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, পরিবার প্রভৃতি সকল বিষয়েই নানারূপ মত, পুস্তক, সাময়িকপত্র ও সংবাদ পত্রাদির মধ্য দিয়া প্রত্যহ প্রচারিত হইতেছে। দেশের লোক এ সব বিষয়ে চিন্তা করিতেছে ইহা সুখের বিষয়ও যে নয় তাহা নহে। কিন্তু চিন্তা করিবার একটা প্রণালী আছে। উচ্চতম সত্যসমূহ বিশিষ্ট চিন্তনপ্রণালীর নিকটেই আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তা করিলেই যে একটা মত দেওয়া যায় তাহা নহে, চিন্তা করিবার প্রণালী আছে। সর্ব্বপ্রথম এই চিন্তা প্রণালীতে দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন নতুবা বক্তারূপে লেখকরূপে দেশের ইষ্ট করিতে যাইয়া অনিষ্টই করা হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিষয়ই বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালীর দ্বারাই জ্ঞাতব্য। এই বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালীর অভাবে অনেক ধর্ম্মব্যাখ্যাতা দেশের যে অনিষ্ট করিয়াছেন প্রচলিত মতের বিদ্বেষীগণ তত অনিষ্ট করেন নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রধান গুণ এই যে ইহাতে যে বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে সেই চিন্তন প্রণালীতে যদ্যপি আমরা অভ্যস্ত হই তাহা হইলেই প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে সক্ষম হইব এবং এবং প্রাচীন কালের ব্রহ্মবিৎ ও ত্রিকালদর্শী মনষিগণ যে সমস্ত উপদেশ ও শিক্ষা জগতের জন্ম রাখিয়া গিয়াছেন সেই সমস্ত উপদেশ ও শিক্ষা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্ম কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারিব। আমরা খুব উচ্চকণ্ঠে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকি, বলিয়া থাকি যে আমাদের শাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব আছে তাহা ইউরোপ আমেরিকা এখনও জানে না, ভবিষ্যতের মানব সমাজ এই সমস্ত শাস্ত্রের দ্বারা চালিত হইবে এবং ভবিষ্যযুগে ভারতবর্ষই পৃথিবীর আধ্যাত্মিক গুরু হইবে। কথাগুলি সমস্তই সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা এই কথাগুলি আবৃত্তি করিয়াই যাই, কোনও একটি বিশেষ শিক্ষা বা উপদেশ লইয়া বর্ত্তমান

জগতের কোন প্রয়োজনীয় সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য তাহার শক্তি ও উপযোগীতা দেখাইয়া দিতে পারি না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, যে বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালীর সাহায্যে আর্য্যশাস্ত্রের সত্য সমূহের মর্ম্মোপলব্ধি হয়, বহির্ম্মুখী বৈদেশিক অপরাবিদ্যা সমূহের অত্যধিক আলোচনার দ্বারা আমরা সেই বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালীর সহিত পরিচয়হীন হইয়া পড়িয়াছি সুতরাং সেই চিন্তন প্রণালীতে সর্ব্বাগ্রে দীক্ষিত ও অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। এই গ্রন্থখানি সেই বিশিষ্ট চিন্তন প্রণালী অবলম্বনে লিখিত বলিয়াই আমরা এরূপ আদরের সহিত ইহার সুদীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রের কোনও সংবাদ রাখেন তাঁহারাই সাধন চতুষ্টয়ের নাম শুনিয়াছেন। সাধন চতুষ্টয় এই—

১। বিবেক। ২। বৈরাগ্য। ৩। ষট্‌সম্পত্তি। ক। শম। খ। দম। গ। তিতিক্ষা। ঘ। উপরতি। ঙ। শ্রদ্ধা। চ। সমাধান। ৪। মুমুক্ষুত্ব।

সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার হয় না, প্রাচীন কালের ইহাই উপদেশ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের দ্বারা বর্ত্তমান জীবনে কিশোর বয়সেই যিনি সিদ্ধ গুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ বালক কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার প্রচারিত প্রথম গ্রন্থেই, ব্যক্তিগত জীবনে এই সাধন চতুষ্টয়ের উপদেশ কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানি "শ্রীগুরু চরণে" এই নামে বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। এই সাধন চতুষ্টয়ের উপদেশ কেবলমাত্র অধ্যাত্মিক সাধনাতেই প্রযোজ্য নহে অন্যান্য সমস্যার মীমাংসাতেও এই তত্ত্বগুলি প্রযোজ্য। শিক্ষা সমস্যায় এই তত্ত্বগুলি প্রয়োগ করিলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদানের যাহা আদর্শ তাহা বর্ত্তমান জীবনে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে "শিক্ষা না সেবা" নামক এই গ্রন্থে আমরা তাহা জানিতে পারিব।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষক যে আসন অধিকার করিতেন তাঁহাকে আবার সেই আসনে বসাইতে হইবে। একটি সরকারী অকাট্য প্রণালী প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং প্রাণপণে ছাত্রদিগকে তাহার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে হইবে, এরূপ করিলে চলিবে না। শিশুর স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুসারে তাহার শিক্ষা নিয়মিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়কে

একটি সদ্ভাব ও আনন্দের প্রস্রবণ করিতে হইবে, যেন ঐ কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকে ঐ সকল ভাব বিকীর্ণ হয়।

শিক্ষকের স্থান কত উচ্চ তাহা আমরা আজ কাল ভুলিয়া গিয়াছি। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"জগতের পালন কার্য্যে যে সকল মহাপুরুষ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইটি বিভাগ লক্ষিত হয়—শাসন বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ। প্রত্যেক শিক্ষক যেন নিজেকে ঐ শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং সদ্‌গুরু ও শিষ্যের যে সম্বন্ধ, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ যেন তাহারই অনুরূপ হয়। শিক্ষক ছাত্রকে রক্ষাকর ও কল্যাণপ্রদ স্নেহদান করিবেন, প্রতিদানে ছাত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তি অর্পণ করিবে ইহাই প্রাচীন হিন্দু আদর্শ। এই আদর্শ আমাদিগের নিকট অতিরঞ্জিত মনে হইতে পারে, কিন্তু যদি কোন দেশে এই আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবে তাহা ভারতীয় ছাত্রের জন্য ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারাই হইতে পারিবে।"

পূর্ব্বে যে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইবার গ্রন্থে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রণালী সম্বন্ধে মাত্র দু একটি কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

"যে বালকের প্রকৃতি সবিশেষ প্রেমপ্রবণ লক্ষিত হইবে, বুঝিতে হইবে যে, সেই বালকই শিক্ষক হইবার উপযুক্ত।" প্রেমপ্রবণ শিক্ষকের নিকটই বালক আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ শিক্ষকের অধীনে থাকিলেই ছাত্রের হৃদয়ে সম্ভ্রমের ভাব জাগ্রত হয়—এই সম্ভ্রমের ভাবই ভবিষ্যতে মহিমাজ্ঞান ও মহত্ত্ব পূজার অভ্যাসে পরিণত হয়।

শিক্ষক হইতে হইলে বিবেকের দরকার। "বালকের স্বধর্ম্ম কি শিক্ষককে তাহা জানিতে হইবে এবং তাঁহাকে সেই স্বধর্ম্ম পালনের সহায়তা করিতে হইবে অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্রকে সেই শিক্ষাই দিবেন, যাহা তাহার বিকাশের অনুকূল এবং সেই শিক্ষার প্রচার সম্বন্ধে ও প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষক বিবেক প্রয়োগ করিবেন।"

আজ কাল বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার সেরূপ সুফল হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা হয় না! বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে এরূপ কোন উপাসনা হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ে এক সত্তা ও একতার তান

ধ্বনিত হইয়া উঠে। এরূপ হইলে গৃহস্থালীর ও জীবন প্রণালীর ভেদ সত্ত্বেও ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে একতার ভাবে ভাবিত হইবে। প্রথমেই কিছুক্ষণ কণ্ঠ সঙ্গীত হওয়া ভাল। এরূপ করিলে, ছাত্রগণ যাহারা দ্রুত ভোজনের পর, ত্বরাত্বরি বিদ্যালয়ে আসিয়াছে, বিশ্রান্ত হইবার পর ধীরভাবে তাহারা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে। ইহার পরেই উপাসনা হওয়া উচিত এবং একটি সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা বালকদের সমক্ষে কোন উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হয় কিন্তু এই আদর্শকে ফলবান করিতে হইলে, সমস্ত দিনভোর তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যেন ঐ ধর্ম্ম শিক্ষার ভাব, কি পাঠ, কি ক্রীড়া সমস্তের মধ্যে অনুস্যূত থাকে।” আজ কাল শিক্ষাপ্রণালী লইয়া নানারূপ আন্দোলন হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত কথা কয়টি এই আন্দোলনের দিনে বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচিত হইবে।

শিক্ষকতা কার্য্যে বিবেক ব্যতীত নিষ্কামতা, মনঃসংযম (শম), কর্ম্মসংযম (দম); মত সহিষ্ণুতা (তিতিক্ষা), সন্তোষ (উপরতি), একাগ্রতা (সমাধান) ও বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) এই কয়টি গুণের প্রয়োজন ও প্রয়োগ অতি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের মূল্য ।৵০ ৪নং কলেজস্কোয়ার হোয়াট্ লোটাস্ পাবলিসিং কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দিদি।

দিদির সম্বন্ধ স্থির করিতে আমরা কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। ছোট কাকা কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন। তিনি আমাদের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া দেশ হইতে আমাদিগকে লইয়া আসিলেন। মা, দিদি ও আমি এই নূতন বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। সমস্ত দিন রাস্তার উপরের জানালার ধারে বসিয়া দিদি ও আমি রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। কত রকমের লোক কত রকম করিয়া চলিয়া যাইত। গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, মোটরকার অনবরত শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইত। ফেরিওয়ালারা দুর্ব্বোধ্য চীৎকার করিয়া বার বার সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত। কখনও বা ছোট ছোট মেয়েরা গাড়ীতে বই হাতে করিয়া হাসি ও গল্প করিতে করিতে করিতে স্কুল যাইত। তাহাদের সঙ্গে ভাব করিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইত। আমরা সর্ব্বদা বসিয়া এই সব দেখিতাম। কখনও দেখিতে বিরক্ত হইতাম না।

একটি ছেলের সঙ্গে দিদির বিয়ের কথাবার্ত্তা অনেক দূর স্থির হইয়াছিল। তাঁহারা মেয়ে দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া আমরা কলিকাতায় আসিয়াছিলাম দিদিকে যে পছন্দ হইবে সেবিষয়ে আমাদের মোটেই সন্দেহ ছিল না। বরটি কলেজে পড়ে—কাকারা যে কলেজে পড়েন সেই কলেজেই পড়ে। ছোট কাকার সঙ্গে চেনা আছে। পড়া শুনায় সে সব চেয়ে ভাল—দেখিতেও না কি বেশ সুন্দর। এইখানে যাহাতে বিয়ে হয় আমাদের সবারই তাই খুব ইচ্ছা। শীঘ্রই তাঁহারা দিদিকে দেখিতে আসিবেন।

সেদিন চিড়িয়াখানা দেখাইবার জন্য ছোট কাকা দিদিকে ও আমাকে গাড়িতে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আমরা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর আসিয়াছি এমন সময় ছোট কাকা আমার নাম করিয়া বলিলেন "ঐ দেখ তোর দিদির বর যাইতেছে।" আমি চাহিয়া দেখিলাম। সুন্দর দীর্ঘ দেহ। প্রফুল্ল মুখ, স্নিগ্ধ ও শান্ত দৃষ্টিক্ষেপ। তাঁহার হাতে কতকগুলি বই ছিল। তিনি সহাস্যমুখে ছোট কাকার দিকে পরিচয় জ্ঞাপক দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার সলজ্জ দৃষ্টি আনত করিলেন এবং তাঁহার সহজ দ্রুত পাদক্ষেপ দ্রুততর করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি লক্ষ্য করিলাম দিদির কর্ণমূল লোহিত হইয়া গিয়াছে এবং দিদি দুই একবার আমাদের দিকে চাহিয়া পশ্চাতে তাঁহার দিকে চাহিতেছে। আমার বড় হাসি পাইল।

আজ দিদিকে দেখিতে আসিবে। সকাল সকাল দিদিকে স্নান করাইয়া নীল রঙ্গের একটা কাপড় পরান হইল। নানা রকম গহনা পরিয়া দিদিকে সত্যসত্যই বড় সুন্দর দেখাইল। দিদি ছাড়িলেন না; আমাকেও ভাল কাপড় পরাইলেন, গহনা পরাইলেন এবং কপালে টিপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম "দিদি তোমাকে পছন্দ করিতে আসিতেছে, না আমাকে পছন্দ করিতে আসিতেছে? তুমি যে আমাকে এত সাজাইলে?" দিদি আমার দিকে চাহিয়া শুধু বলিল "তোকে বেশ দেখাইতেছে।"

দিদি যখন অপরিচিত লোকের সম্মুখে বসিয়া লজ্জায় মাটির দিকে চাহিয়াছিল, এবং ধীরে ধীরে অতি সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেছিল তখন আমি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলাম। তাঁহারা দেখিয়া চলিয়া গেলেন।

পরে শুনিলাম যে দিদি দেখিতে একটু বড় বলিয়া তাঁহারা পছন্দ করেন

নাই। তাঁহারা আমাকে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। আমাকে তাঁহাদের পছন্দ হইয়াছে।

দিদিকে তাঁহারা পছন্দ করিলেন না বলিয়া মা প্রথমে একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটী সুন্দর ও বিদ্বান জামাই পাইবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। ইহাও স্থির হইল যে দিদির সম্বন্ধ স্থির হইয়া বিবাহ হইয়া গেলেই যতশীঘ্র সম্ভব আমরও বিবাহ হইবে। দিদির মনে কিরূপ হইতেছিল তাহা আমাকে কিছু বলিলেন না। তবে আমার বোধ হইল যে তাঁহার স্বভাব একটু বেশী গম্ভীর হইতেছে! আরও দেখিলাম যে দিদি আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে অনেক ঘটকী যাতায়াত করিতে লাগিল। তাহারা নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আনিতে লাগিল। অধিকাংশ স্থলেই মা মত করিলেন না। দুই চারি স্থানে অন্য প্রকার প্রতিবন্ধক হইল। এই রকম করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর দিদির সহিত বসিয়া গল্প করিতাম ; পশ্চিম আকাশ অস্তগত সূর্য্যের আলোকে লাল হইয়া উঠিত, একটীর পর একটী করিয়া আকাশে তারা দেখা যাইত, নগরের রাজপথ গুলি আলোকিত হইয়া উঠিত এবং দূরে একটী পুষ্করিণীর সান্ধ্যসমীরণ বিকম্পিত জলের উপর গ্যাসের আলো প্রতিফলিত হইয়া ঝিকমিক করিত। সেই সময় কিছুক্ষণ গল্পের পর দুইজনেই যখন হঠাৎ অল্পকালের জন্য থামিয়া যাইতাম, তখন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতাম ও দেখিতে পাইতাম কাহার একটী সুন্দর দীর্ঘ দেহ এবং প্রফুল্ল ও গম্ভীর মুখ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। ঠিক বলিতে পারি না কিন্তু বোধ হয় দিদির সম্বন্ধ স্থির হইতে দেরী হওয়াতে আমি একটু অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

* * * *

কাল দিদির বিবাহ। আমরা একটা বড় বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি। বাবা আসিয়াছেন, দাদা আসিয়াছেন এবং দেশ হইতে অনেক আত্মীয় স্বজনও আসিয়াছেন। গত কয়দিন বড় আনন্দেই কাটিয়াছে। হাসি, গল্প, খেলা। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার ইহাও স্থির হইয়াছে যে দিদির বিবাহের দশ দিন পরে আমারও বিবাহ হইবে। দুইটি আসন্ন বিবাহ, কন্যা লইয়া আমাদের বাড়ীর সকলে খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। এ কয়দিন দিদি আবার আমাকে খুব বেশী আদর ও যত্ন করিতেছেন। আমরা

সমস্ত দিন একসঙ্গে থাকিতাম। রাত্রেও এক বিছানায় শুইতাম। দিদি রোজ নিজে আমাকে ভাল কাপড় পরাইয়া দিত। আর কাহাকেও আমার চুল বাঁধিতে দিত না। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইত যেন আমারই বিবাহ, দিদির কিছুই নয়।

দিদির বিবাহের উৎসবময় দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। সকাল হইতে সানাই বাজিতেছিল। সারাদিন লোকজন ব্যস্ত হইয়া আয়োজন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি উঠিতেছিল। তার পর, দিবসের আলোক ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। উৎসব গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরেই দূরাগত বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলে রাস্তার উপরের বারাণ্ডায় ছুটিয়া গেল। বরের জুড়ি আসিয়া আমাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ প্রবল ভাবে বাজিয়া উঠিল। বরকে নামাইয়া লইয়া আসরের উপর বসাইল। বরটি দেখিতে বেশ সুন্দর। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তার পর দিদির কাছে ছুটিয়া গেলাম।

পরের দিন দিদিকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেল। সেদিনকার বিদায় দৃশ্য এখনও আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাহার মুখের দিকে চাই তাহার চোখেই অশ্রুধারা। কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছে। আমারও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দিদির চক্ষুও অশ্রুসিক্ত কিন্তু তাহার মুখে কষ্ট সহ্য করিবার এক নূতন ক্ষমতা দেখিলাম। ধীরে ধীরে দিদি চলিয়া গেল। কষ্টে আমার মাথায় অসহ্য বেদনা হইতেছিল।

হায়, আটদিন যাহাকে দেখিতে পাইব না বলিয়া বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, আজ কত মাস কত দীর্ঘ বৎসর তাহার অদর্শনে কাটিয়া যাইতেছে!

দিদি চলিয়া গেল। ঘর আমার শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এত আত্মীয়স্বজন, এত কোলাহল, কিন্তু দিদি আজ নাই বলিয়া কিছুতেই হৃদয় স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। জন্ম হইতে এই আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি হইল। বিবাহের সঙ্গে এত কষ্ট জড়িত কে তাহা আগে জানিত? আমি অধীর হইয়া দিন গণিতে লাগিলাম; আট দিন পরে দিদি আবার ফিরিয়া আসিবে।

আট দিন কাটিয়া গেল। দিদি ফিরিয়া আসিল। তখন আবার আমার বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দিদি আসিয়া পূর্ণ উৎসাহে সে আয়োজনে যোগদান করিল। রাত্রে আমরা এক সঙ্গে শুইতে গেলাম। তখন দিদি

আমাকে কত উপদেশ দিলেন। বিবাহের পর কি রকম আচরণ করিব তাহা লইয়া কত কথা বলিলেন। কখনও যেন আমি স্বামীর কোনও ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ না করি। যে কথাটি বলিলে, যে রকম কাজ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাই যেন করি। শ্বশুর বাড়াতে যাইবার পর আমাকে যে কাজ করিতে বলা হইবে তাহা যেন খুব যত্ন করিয়া করি। সেখানে কেহ যদি আমার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করে তাহা যেন স্বামীকে না জানাই; কেন না ইহা তাঁহাকে অসুখী করিবে। সর্ব্বোপরি কায়মনোবাক্যে স্বামীর সেবা করা, তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করা। তিনি ব্যতীত জীবনে অন্য কোনও সুখের আশাও থাকিবে না। দিদি এই সব কথা এমন আগ্রহ করিয়া বলিতেছিলেন যে আমি স্থির ও নির্ব্বাক হইয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রত্যেক কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যাইতেছিল। কত রাত্রে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মা ও আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি; দিদি শ্বশুর বাড়িতে গিয়াছেন। দুই চারি দিন ছাড়া আমি নিয়মিতরূপে দিদির চিঠি পাইতাম। যে দিন দিদির চিঠি আসিবার কথা সেদিন তাহা না আসিলে আমার বড়ই মন খারাপ হইয়া যাইত—সেদিন আর কোনও কাজে উৎসাহ থাকিত না। দিদির চিঠির সহিত আর এক জনের চিঠি পাইলে আমার আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু সে চিঠির আশায় যে বসিয়া থাকিতাম সে কথা কাহাকেও জানাইতে পারিতাম না। আমার স্বামীর চিঠিগুলি পড়িতে আমার বড় আনন্দ হইত। তিনি কত সুন্দর সুন্দর গল্প লিখিয়া পাঠাইতেন; কত সব নূতন জায়গার কথা; আমাদের দেশের বিবরণ। আমি সে গুলি কতবার পড়িতাম তাহার ঠিক নাই।

আমার বোধ হয় দিদি বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার খুব বড় জমিদারের বাড়ীতে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী দেখিতেও খুব সুন্দর। কিন্তু ইনি বেশী লেখাপড়া করেন নাই, এবং ইঁহার স্বভাব তত ভাল ছিল না। কিন্তু দিদি কখনও বিন্দু মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।

প্রায় একমাস ধরিয়া দিদির রোজ একটু করিয়া জ্বর আসিত; প্রথমে গ্রাহ্য করা হয় নাই, কিন্তু যখন কোনও মতেই জ্বর ছাড়িল না এবং দিদির শরীর খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল তখন সকলেই একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। কলিকাতার ভাল ভাল ডাক্তার দেখান হইল কিন্তু বিশেষ কিছু উপকার হইল

না। স্থান পরিবর্ত্তন করিলে এবং মনের প্রফুল্লতা হইলে উপকার হইতে পারে এই ভাবিয়া ডাক্তারদের মত লইয়া দিদিকে দেশে আনা হইল। বাড়ী আসিয়া দিদির মন এত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে প্রথম প্রথম বেশ উপকার পাওয়া গেল। আমার সহিত কথা বলিতে দিদির ম্লান মুখ উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিত। আমাদের এতদিনকার কথা জমিয়াছিল যে দুইজনে সারাদিন গল্প করিয়াও কথা ফুরাইত না। আমরা ত খুব আশা করিয়াছিলাম যে দিদি ক্রমশঃ সারিয়া যাইবেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার আগের মত জ্বর আরম্ভ হইল, আমি লক্ষ্য করিলাম যে দিদির মনের উপর নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণতার একটী স্থির ছায়া পড়িয়া আছে মিলনের প্রথম উৎসাহে তাহা দেখিতে পাই নাই। তবু আমরা এখনও তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ ভয় করি নাই। আমার স্বামীকে কিছুদিনের জন্ম আনিবার জন্ম দিদি মাকে বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন। কতকটা দিদির কথা না শুনিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পারে বলিয়া, কতকটা স্বামীর সহিত আমার অনেক দিন দেখা হয় নাই বলিয়া, মা এ অশান্তির সময়েও তাঁহার ছোট জামাইকে আনিবার জন্য দাদাকে আমার শশুরবাড়ী পাঠাইলেন। তখন গ্রীষ্মের ছুটি ছিল, তিনি আসিয়া কিছুদিন এখানে থাকিতে পারিবেন। আমার স্বামী আসিবার কয়েকদিন পর হইতেই দিদির অবস্থা বড় খারাপ হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে বড় জামাইবাবু একজন ভাল ডাক্তার লইয়া আসিলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কিছু ত্রুটি হইল না। আমার স্বামী বাড়ীর এই বিপদ দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন এবং বাড়ীর লোকের সহিত অক্লান্ত ভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হইল না। আমাদের চক্ষের সমক্ষে দিদির জীবন প্রদীপ ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতে লাগিল। আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।

একদিন দিদির ঘরে আর কেহ ছিলেন না; আমার স্বামী এবং আমি বসিয়াছিলাম। আমি ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছিলাম, স্বামী চেয়ারের উপর বসিয়াছিলেন। দিদি ঘুমাইতে ছিলেন। তাঁহার রোগক্লিষ্ট শীর্ণ শরীর শয্যায় মিশাইয়া গিয়াছিল। গত বৎসর এই সময় আমরা কলিকাতায়, তখন কি আনন্দেই আমাদের দিন কাটিয়া যাইত। কোনও চিন্তা কোনও আশঙ্কাই ছিলনা। হায়, আর কি সেদিন ফিরিয়া আসিবে না? ভাবিতে ভাবিতে আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। হরি, আর কিছু চাহি না, শুধু দিদিকে আমার ফিরাইয়া দাও। দিদি না থাকিলে কি করিয়া বাঁচিব। ভাবিলে শিহরিয়া উঠি।

ধীরে ধীরে দিদি চক্ষু মেলিলেন। চাহিয়া দেখিলেন আমরা দুইজন ব্যতীত আর কেহ নাই। দিদি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "এই দিকে আয়"। তার পর আমার হাত লইয়া স্বামীর হাতের উপর রাখিলেন। রাখিয়া বলিলেন "সুধীর" বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর কাঁপিতে লাগিল "সুধীর, আমার প্রাণাধিক ছোট বোনটিকে আজ আবার নূতন করিয়া তোমার হাতে সঁপিয়া দিলাম। যেন কখনও অযত্ন না হয়। যদি ইহার কোনও দোষ হয়, তুমি রাগ করিও না, স্নেহ করিয়া ইহার দোষ সংশোধন করিয়া দিও। আমি জানি তুমি তাহা করিবে, কখনও ইহার অনাদর করিবে না। তবুও বলিলাম, বলিয়া প্রাণ বড় শীতল হইল। আর তুই বোন—যদি তুই কখনও ইঁহার মনে কষ্ট দিস্, যদি কখনও ইঁহাকে সুখী করিতে তোর যত্ন শিথিল হয়, মনে রাখিস্ তাহা জানিতে পারিলে আমি বড় অসুখী হইব। আমি মরিয়া গেলে তুই যেন শোকে ইঁহার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া না যাস।" তাহার পর দিদি নীরব হইলেন। দুই ফোটা অশ্রু তাঁহার দুইটি মুদিত চক্ষু হইতে শীর্ণগন্ড বাহিয়া পড়িয়া গেল। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিলাম।

তাহার পর চারি পাঁচ দিন দিদি বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন আমাদের গৃহে কি প্রবল শোকের বন্যা বহিয়াছিল কি করিয়া বলিব। মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিলেন—সে ক্রন্দনের প্রত্যেক শব্দে হৃদয়বিদারক শোক ও নৈরাশ্য ধ্বনিত হইতেছিল। আমি দিদির চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম, আমার কোনও বাহ্য জ্ঞান ছিল না।

সেই দিন হইতে আমার জীবনের সুখ আশা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিবার সময় আমি কল্পনায় কত সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে সে সব চিত্র আমার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিস্তব্ধ নিশীথে যখন আমি শয্যার উপর বিলুণ্ঠিত হইয়া অসহনীয় শোকাহত হইয়া ক্রন্দন করিতাম তখন স্বামী ধীরে ধীরে তাঁহার বক্ষের উপরে আমার মস্তক তুলিয়া লইয়া কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

———

চণ্ডীদাস।

নানুরে কানুর লীলা চিরমনোহর
বিরচিলে, চণ্ডীদাস, বাশুলি-আদেশে —
মধুর বিরহে মাখা মিলন সুন্দর,
হাসির মাণিক অশ্রুমুকুতায় মেশে!
নীলনভ অবলম্বি সুষমা অশেষ,—
কি সলাজ পূর্ব্বরাগ কিশোরী উষার,
সোণালীর নীলাম্বরে সন্ধ্যা চারু-বেশ
বল্লভ আগারে চলে, কেশে তারাহার!
নানা শোভা-অভিনয়,—বাহিরে কেবলি;
অন্তরে অনন্ত এক, দ্বিতীয় বিহীন,—
প্রেমের অদ্বৈত গায় তব পদাবলী,
নীরে রচা বীচিগুলি নীরেই বিলীন!
শক্তির ভজন-প্রথা কি বুঝিব আমি,—
স্তম্ভিত জনতা—একি!—চতুর্ভুজা রামী!

জয়দেব।

পদ্মাবতী-বল্লভ, হে জয়দেব কবি,
কত সুধা ছিল তব প্রিয়ার অধরে,
হরি যাহা, হৃদিভরা মধুরতা লভি,
উছালিলে লেখনীতে পীযুষ লহরে!
কেঁদুলীর চাঁদে ছিল এতই অমিয়া?
প্রেমের প্রণব ছিল কোকিল-ঝঙ্কারে?
খেলিত মলয়ানিলে মদনের হিয়া?
ছিল মোক্ষ যুবতীর প্রিয়-অভিসারে?
একি প্রেম, ভক্তি, কিম্বা লালসার মায়া?
কিম্বা তব গীতি মাঝে বাজে এই সুর,—
আনন্দের কায়া হ'তে আনন্দের ছায়া,
শোধনে মিলায় জড় চেতনে মধুর!
আনন্দের দ্বন্দে সারা বঙ্গনারী-প্রায়,
স্তন-ভারে ঢলি ভক্তি মিশে প্রেম-পায়! *

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

* 'বীরভূমবাসী' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

নিরাশার আশা।

বিদ্যা বলিয়া অবিদ্যাকে বরণ করিয়াছি, তাই দুঃস্বপ্নের নাম দিয়াছি জাগরণ। সাধুতা কেবল বণিগ্‌বৃত্তির একটি আবরণ হইয়াছে, বড় বড় উদার কথা স্বার্থপর প্রবঞ্চকদিগের হস্তে শাণিত ছুরিকা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে ত্যাগের মন্ত্রগ্রহণ পরশোণিত পান করিবার অমোঘ উপায় হইয়াছে! হায় রে দেশের উন্নতি!

সততার পথে দাঁড়াইয়া যাহারা সত্যের উপাসনা করিয়াছে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। শত অত্যাচারে উৎপীড়িত, নিন্দায় ও দৈন্যে তাঁহারা মুহ্যমান, মলিন বসনে আর্দ্রনেত্রে কোথায় যে তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন কেহই তাহা জানে না। সত্যসত্যই দেশের জন্য, দশের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর চতুর দৈত্যকুলের আত্মপ্রচারের তুমুল ঢক্কা নিনাদে ডুবিয়া গিয়াছে—তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞাত মরণের শীতল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিবেন।

অথচ দেশহিতৈষণার অভাব নাই—বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া সরল পল্লিবাসী শিক্ষালোকপ্রাপ্ত জ্ঞানোন্নত নগর সমূহের ও সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিয়াছে। তাহার মনে হয় ত্যাগশীলতায় ও সাধুতায় দেশ নৈমিষারণ্যকেও পরাস্ত করিয়াছে। সকলেই দেশের জন্য কাঁদিয়া আকুল বলিহারী অবাধ উচ্চশিক্ষার কুহকরচনার শক্তি!

শতশত দরিদ্র প্রতিবাসীর বক্ষরক্ত জমাট বাঁধিয়া যাহার প্রাসাদের ভিত্তি

গড়িয়াছে, রোরুদ্যমান শত শত সরল প্রকৃতি পরিবারের অভিশাপ যাঁহার বৈভবের অন্তরালে নীরবে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, যাঁহার চিত্ত প্রতি মুহূর্ত্ত ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে নিগৃহীত করিতেছে সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রত্যহ তাঁহার যশোগীতির ভেরি বাজিতেছে, রাজসকাশে তিনি তাঁহার দেশ-হিতৈষণার ও অকৃত্রিম ত্যাগশীলতার পুরস্কার পাইতেছেন—অর্থের জয় হউক! মঙ্গল সাধনের জন্য বিদেশ হইতে যতগুলি উপকরণ আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে তাহার সমস্তগুলিকেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষণে নিয়োগ করিয়াছি। ইহাই আমাদের সত্য ইতিহাস।

ইহাই চলিতেছে, সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু তবুও নীরব হওয়া হইবে না, আরও কিছু আছে। পূতনা আসিয়া ব্রজে প্রবেশ করিয়াছে, "লোকবালঘ্নী, রাক্ষসী রুধিরাশনা" সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মুগ্ধদৃষ্টিতে নরনারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে সত্য, প্রায় সকলেই বঞ্চিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি উপায় আছে। মাতৃক্রোড়ে শুইয়া যে শিশু স্তনপান করিতেছে সত্যের সহিত তাহার পরিচয় আছে। সেই শিশুর পানে চাহিয়াই আমাদিগকে সাহসে বুক বাঁধিতে হইবে।

অবিদ্যার কুহক অধিক দিন থাকিবে না, এই ঋষিচরণপূত পবিত্র দেশে আবার সত্যের আলোক জ্বলিয়া উঠিবে, আবার ন্যায় ধর্ম্ম ও পরার্থপরতার বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিবে। আজ যাহারা শিশু, মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আজ যাহারা স্তনপান করিতেছে, যাহাদের নির্ম্মল চিত্তগগনে এখনও বৈষয়িকতা ও স্বার্থপরতার কৃষ্ণমেঘ দেখা দেয় নাই তাহাদের ত্রিদিব-নির্ম্মল স্নিগ্ধ মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া নিরাশা ও অবসাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। ভবিষ্যতের রঙ্গভূমিতে সত্যের অভিনয় হইবে, সেই অভিনয়ের যাঁহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশ্বনাথ নির্জ্জনে বসিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ ভূমিকা অভ্যাস করাইতেছেন।

আজ যাহা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র প্রহসন—কপটতা ও মিথ্যাচারে তাহা পরিপূর্ণ। এ অভিনয় শুকপক্ষীর পাঠের মত—ইহাতে সরল প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস নাই। এতদিন এই প্রহসনে প্রশংসার অবিমিশ্র করতালি ধ্বনিই শুনিতাম। আজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিন্দা, উপহাস ও বিরক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে—তাই সাহস হইতেছে সত্যের জ্যোতিরেখা বুঝি কাহারও কাহারও নয়ন স্পর্শ করিয়াছে।

সাহিত্য সেই ভবিষ্যতে লক্ষ্য রাখিয়া গড়িয়া উঠুক। সেই ভবিষ্যত যাহাতে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয় অজ্ঞাত সাহিত্যসেবক ধনমান প্রভৃতির প্রতি না চাহিয়া উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে সেই সাধনায় রত হউক। সাহিত্যের সম্মুখেও প্রলোভন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন যে সাহিত্য বনকুসুমের মত আপন গৌরবে ও সৌরভে নির্জ্জনে শোভা পাইত আজ তাহা ধনবানের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ধনীর উদ্যানে আজ বনকুসুমের স্থান হইয়াছে, আমরা বলিতেছি ইহাই উন্নতি। কিন্তু সত্য ঠিক তাহার বিপরীত কিনা তাহাই চিন্তনীয়। একদিন বলিয়াছিলাম সাধারণের কৌতূহলের যুগ বঙ্গসাহিত্যে আসিতেছিল, অকস্মাৎ চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় যেন পৃষ্ঠপোষকতার যুগ আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া বরণ করিতেছি—সাহিত্যকে আজ তাহাই দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে হইবে। পরের মুখের শেখা কথা পেটের দায়ে আয়ত্ত করিয়াছি।—শিক্ষার দ্বারা যাহা পাইয়াছি সত্যের সহিত, পারিপার্শ্বিকের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই—যাহাকে রত্ন মনে করিয়া আহ্লাদে মাতিয়া উঠিয়াছি তাহা ছেলে ভুলাইবার ক্রীড়নক। সাহিত্যই এ তত্ত্ব দেশকে শিখাইবে। আর সাহিত্য এই জাতিকে লইয়া যাইবে সেই বেদমন্ত্র-মুখরিত, হোমানল-পূত পবিত্র তপোবনে, যেখানে আমাদের অক্ষয় জীবন ও মোক্ষ, ধ্যানসমাধিমগ্ন রহিয়াছে।

ভারতবর্ষকে পৌরাণিকেরা কর্ম্মভূমি বলিয়াছেন, আজ এই আদর্শ-সংঘর্ষের দিনে, এই ভোগবিলাস ও আত্মপুষ্টির দিনে, এই প্রাচীন কথার মর্ম্ম আমাদিগকে ধীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। গৌরব ও মহত্ত্বের দিনে, এই জাতিকে যাঁহারা সাহিত্য দিয়াছেন, দর্শন বিজ্ঞান ও মন্ত্র তন্ত্র দিয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মযোগী, সত্যের ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, সেই সাধনাতেই জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা সত্য প্রতিষ্ঠার ভেক গ্রহণ করেন নাই।

আমাদিগের আদর্শ জীবন যাহা রচনায়, বক্তৃতায় প্রকাশিত, তাহার সহিত বাস্তব জীবনের প্রভেদ প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে—ইহা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমাদের যাহা সনাতন আদর্শ, সেই আদর্শে হৃদয় ও মন শৈশব হইতে যদি গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, মানবজীবনের সেই গভীরতা ও বিশালতার

দিক ভারতবর্ষই সর্ব্ব প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও প্রচার করিয়াছে, যাহারা শিশু ও শিক্ষার্থী প্রথম হইতে যগুপি তাহাদিগকে এই ভোগবিলাসময় ইন্দ্রিয়ের চারণভূমি হইতে সরাইয়া সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা আত্মপ্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্যান্য দেশের নিকট যাহা গ্রহণীয় তাহা বীরের মত গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টিবিধান করিতে পারিব ॥

ভৃত্য। (গল্প)

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই গিরিধারীর মনিব যখন গিরিধারীর মাহিনা চুকাইয়া দিয়া বিদায় হইতে বলিলেন, তখন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কেন তাহাকে বিদায় দেওয়া হইতেছে। আপনার ঘরে জিনিষ পত্র গুছাইতে গুছাইতে।সে ভাবিতেছিল কেন তাহাকে তাড়ান হইতেছে, কৈ সেত কোনও অপরাধ করে নাই—তবে এ শাস্তি কেন? সে যে খোকাবাবুকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারে না। খোকাবাবু যে তার বড় আদরের জিনিষ—সে যে তার পুত্রশোকতপ্ত জীবনে শান্তির বারি বর্ষণ করে—বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল। অনেক দিনের পুরাণ স্মৃতি তার মনে.পড়িতে লাগিল সেই তাহাদের ক্ষুদ্র কুটিরখানির কথা, তার সেই সতীসাধ্বী স্ত্রীর কথা, আর সেই তাহাদের বড় আদরের পুত্র রামধনের কথা একে একে তার মনে পড়িতে লাগিল, কত সুখেই তাহাদের দিন কাটিত। তারপর সেই একদিন, যে দিন সে তার জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। যে দিন শত চেষ্টায়ও সে তার স্ত্রী-পুত্রকে জলন্ত গৃহ হইতে বাহির করিতে না পারিয়া পাগলের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়াছিল। কেন প্রতিবাসীরা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। অগ্নিতে মৃত্যু জ্বালাদায়ক বটে কিন্তু সে জ্বালা যে ক্ষণিক। সারা জীবন দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা সে কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বৃদ্ধের বুকের মধ্যে হু হু করিয়া উঠিল। "ভগবান! সব ত নিয়েছ, আবার এ শাস্তি কেন?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুধারা বাহিয়া পড়িল।

এমন সময় বৃদ্ধা ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু রাগ করেছেন, তুই এখনও বসে আছিস্। নে শিগ্‌গীর গোছগাছ করেনে"। বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল; সে তাড়াতাড়ি আপনার জিনিষপত্রগুলি একটি পুঁট্‌লিতে বাঁধিয়া বাহির হইল।

পুকুর-ধার দিয়া যাইতে যাইতে গিরিধারী দেখিল—খোকাবাবু একমনে লাটুতে নেত্তি পরাইতে ব্যস্ত। তার বড় ইচ্ছা হইল, একবার খোকাবাবুকে কোলে তুলিয়া লয়, কিন্তু তা হলে খোকাবাবু যদি জিজ্ঞাসা করে "গিরি তুই কোথায় যাচ্ছিস?" তখন সে কি উত্তর দিবে? গিরিধারীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে ফটক পার হইয়া গেল।

খোকাবাবু গিরিধারীর এত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল যে রাত্রে গিরিধারীর নিকটেই শুইত। খোকাবাবুর মা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খোকা কিছুতেই তাঁহার কাছে শুইতে চাহিল না। তখন খোকাবাবুর মা ক্রমেই গিরিধারীর উপর চটিতে লাগিলেন। তিনি প্রায়ই স্বামীর নিকট বলিতেন যে খোকা ক্রমে তাহাদের পর হইতেছে।

"একটা চাকরের জন্যে ছেলে পর হইবে তার চেয়ে ওকে বিদায় করে' দাও।" গিরিধারীর মনিব প্রথম প্রথম কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু অবশেষে, প্রতিদিন স্ত্রীর নাকে কান্নার জ্বালায় বিব্রত হওয়া অপেক্ষা ভৃত্যকে তাড়ানই সহজ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

ফলে তাহাই দাঁড়াইল। গিরিধারীকে বিদায় দেওয়া হইল এবং একটি খোট্টাচাকর আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। লোকটার চেহারা দেখিলে ভয় আসে। বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সময় ছাড়া খোকাবাবু বড় একটা তাহার কাছে ঘেঁসিত না। আর কেউ খুসি হউক বা না হউক খোকাবাবুর মা কিন্তু ইহাতে বড় খুসি হইলেন। তিনি প্রায়ই স্বামীর নিকট বলিতেন, "চাকর চাকরের মত থাকিবে এইত চাই।"

গিরিধারী অপর কোথাও থাকিবার স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহাদের দেশের লোক এক মুদির দোকানে কিছুদিন থাকিয়া দেশে ফিরিবে স্থির করিল। বৈকালে রামদিন যখন মুদির দোকানের সম্মুখ দিয়া খোকাবাবুকে বেড়াইতে লইয়া যাইত তখন গিরিধারী কতবার মনে করিয়াছে একবার তাকে তুলিয়া লয়। কিন্তু পাছে গিরিধারীর মনে আঘাত লাগে গিরিধারী কি এমন কাজ করিতে পারে।

সে দিন বড় শীত পড়িয়াছিল। গিরিধারীর শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, তার গাটা গরম হইয়াছিল। একটা মোটা কম্বল মুড়ি দিয়া সে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। কৈ এখনও ত খোকাবাবু বেড়াইতে গেল না। অন্যদিন ত এমন সময় রামদিন বাড়ী ফিরে, তবে কি খোকাবাবুর কোনও

অসুখ বিসুখ হইল? গিরিধারী আপনার অসুখের কথা ভুলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, "হে ঠাকুর খোকাবাবুর যেন কোনও বিপদ আপদ না হয়।" এমন সময় গিরিধারী দেখিল রামদিন নিদ্রিত খোকাবাবুকে কোলে শোয়াইয়া দ্রুতবেগে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। অন্ধকারে গিরিধারী দেখিল তাহার ভয়ঙ্কর চেহারাখানা যেন আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

তার বড় ভয় হইল, কে যেন তাকে ভিতর হইতে খোকাবাবুর আসন্ন বিপদের কথা বলিয়া দিল। গিরিধারী আপনার অসুখের কথা ভুলিয়া একেবারে যে পথে রামদিন গিয়াছিল সেইদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। অতি নিকটের বস্তুও দেখা যাইতেছিল না। গিরিধারী কতবার হোঁচট খাইয়া পড়িল, কাঁটাগাছের গায়ে তাহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আজ সে সব করিতে পারে!

গঙ্গার ভাঙ্গাঘাটের কাছে আসিয়া গিরিধারী দেখিল পাষণ্ড খোকাবাবুর গা হইতে একে একে সমস্ত গহনা খুলিয়া লইতেছে। অন্ধকারে পাষণ্ডের চক্ষু দুটা তপ্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল। গিরিধারীর তখন দাঁড়াইবার সামর্থ্য ছিল না, জ্বরের ঝোঁকে টলমল করিতেছিল। কিন্তু তার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ক্ষিপ্তের ন্যায় রামদিনের উপর গিয়া পড়িল। কিন্তু রামদিনের গায়ে অসুরের বল। বৃদ্ধের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিল। সে প্রচণ্ড পদাঘাতে বৃদ্ধের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তার পর পাষণ্ড রোরুদ্যমান বালককে জলে ফেলিয়া দিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

গিরিধারীর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তার সম্মুখে তার খোকাবাবু জলে ডুবিবে, তাও কি হয়। গিরিধারী অনেক কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর "মাগো" বলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শীতের কুয়াশা চুপি চুপি দুটি প্রাণীকে লুকাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। খোকাবাবুর মার মন আনচান্ করিতে লাগিল। অন্যদিন এতক্ষণ রামদিন বাড়ী ফিরে, তবে আজ এত দেরি হইতেছে কেন? ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। ক্রমে সাতটা আটটা বাজিয়া গেল তবুও খোকা ফিরিল না। চারিদিকে লোক ছুটিল। খোকাবাবুর মা পাগলিনীর মত একবার ঘরে একবার বারান্দায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সহসা সকলে সবিস্ময়ে দেখিল পাগলের মত গিরিধারী অচেতন খোকাকে কোলে লইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। তার চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছিল। মৃতকল্প বালককে উঠানের উপর শোয়াইয়াই গিরিধারী উঠানের উপর শুইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার খোকাবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "কোনও ভয় নাই, অধিকজল উদরে প্রবেশ করিতে পারে নাই নিশ্বাসও বেশ পড়িতেছে।"

এইবার সকলের দৃষ্টি গিরিধারীর উপর পড়িল। সে তখন জ্বরের ঝোঁকে অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাক্তার নাড়ি দেখিয়া বলিলেন "কোনও আশা নাই।" সমস্ত রাত একই ভাবে কাটিল, ভোরের বেলা রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইল। ডাক্তার নাড়ি দেখিয়া বলিলেন "আর বিলম্ব নাই।"

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ যেমন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, নির্ব্বাণোন্মুখ গিরিধারী ঠিক তেমনি করিয়া একবার চোখ চাহিল তার পর জড়িত-কণ্ঠে বলিল "বাঁচাতে পারলুম না।"

কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গিরিধারীর মনিব বলিলেন,—"তুমি নিশ্চিন্ত হও গিরিধারি খোকাবাবু এ যাত্রা বাঁচিয়া গেছে।" মুমূর্ষুর মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা বিকশিত হইল।তারপর দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

সাধনপদ্ধতির মধ্য দিয়া আমরা ভাগবত ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি। প্রাচীনেরা ভাগবত-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, রসিক ও ভাবুক হইয়া ভাগবত-রস পান করিতে বলিয়াছেন। এ কালের লোকেরা বলিবেন যাহার তত্ত্ব বুঝি না, এবং যাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে, এমন কি যাহার বিরুদ্ধে চারিদিক হইতেই নানা প্রকারের অভিযোগ শুনিতেছি তাহা শ্রবণ করিবই বা কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে ভাগবতে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা গিয়াছে, ভাষার সাহায্যে যে চিত্রগুলি অঙ্কন করা হইয়াছে, সেই চিন্তা চিত্রগুলি 'অনঘ' হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মতামত না লইয়া ধীরভাবে গ্রহণ করা যাউক,

এই প্রকারে চিন্তাচিত্রগুলি গ্রহণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব এই গ্রন্থের মূল্য কি এবং উপযোগীতা কোথায়? এ অনুরোধ কি অন্যায্য? যাঁহারা গ্রন্থ পড়িবেন না, ইহার মর্ম্ম কি তাহা শুনিবেন না অথচ যাহা হউক একটা মত প্রচার করিবেন তাঁহাদের সহিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যে সমস্ত সত্য আলোচিত হইয়াছে, তাহা অতীন্দ্রিয়। আমাদের এখনও এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই যাহার দ্বারা আমরা এই সমস্ত চরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তবে ভবিষ্যতে সেরূপ ইন্দ্রিয় আমরা পাইব। এই জন্য এই সমস্ত অচিন্ত্য-সত্যের নির্ণয় প্রণালী সাধারণ বিজ্ঞানের সত্য-নির্ণয়ের প্রণালী হইতে পৃথক। ঋষিদিগের অনুমোদিত এই প্রণালী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার পর সেই শ্রুত বাক্য সমূহের সমন্বয় করিয়া মনন করিতে হইবে, তাহার পর একান্ত ও একাগ্রচিত্তে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারণা ও ধ্যান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই এবং অন্য উপায় হইতেও পারে না।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শন হেতবঃ॥

শ্রুতি বাক্যের উক্তি সমূহ প্রথমে শ্রবণ করিবে। শ্রবণের পর যুক্তির দ্বারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। সত্যদর্শনের এইগুলিই উপায়।"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভক্তি সাধনার যে পথ কথিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম হইতে অভিন্ন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥"

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন গুরুগৃহে থাকিয়া তুমি যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহাই কিঞ্চিৎ শুনাও। এই অনুরোধের উত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন "পিতঃ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য (কর্ম্মার্পণং), সখ্য (তদ্বিশ্বাসাদি) আত্ম-নিবেদন ("দেহ সমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তা বর্জ্জনমিত্যর্থঃ"—শ্রীধরঃ), এই নব লক্ষণ

বিশিষ্ট ভক্তি যে অধ্যয়নের ফলে মানব ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, সেই অধ্যয়নই উত্তম অধ্যয়ন।"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দুইটির অতি বিশদ ও দীর্ঘ টীকা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই রূপ। প্রথমে নাম শ্রবণ। নাম শ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে। অন্তঃ-করণ শুদ্ধ হইলে রূপ শ্রবণ করিতে হইবে। শুদ্ধান্তঃকরণে রূপ শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে রূপের উদয় হইবে। রূপের উদয় হইলেই গুণের স্ফুরণ হইবে। তাহার পর পরিকর। এই প্রকারে নাম রূপ গুণ ও পরিকর স্ফুরিত হইলে, লীলার স্ফুরণ সম্যক্‌রূপেই হইবে। কীর্ত্তন ও স্মরণের ক্রম ও এইরূপ। আবার এই শ্রবণ যদি রুচি জন্মাইবার পর সাধু ও ভক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে হয় তাহার ফল অধিক। আবার বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ভাগবত শ্রবণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। নামকীর্ত্তনেরও একটা অধিকার আছে। কতকগুলি অপরাধ আছে সেগুলি হইতে মনকে নির্ম্মুক্ত করিয়া নাম গ্রহণ করিতে হইবে। পদ্মপুরাণে দশটি নামাপরাধ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১। সতাং নিন্দা—সাধুজনের নিন্দা অর্থাৎ অন্য স্থানে দোষ দর্শনের অভ্যাস।

২। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং—বিষ্ণুর নাম হইতে শিব প্রভৃতির নাম স্বতন্ত্র এইরূপ মনে করা

৩। গুর্ব্ববজ্ঞা—গুরুর অবজ্ঞা

৪। শ্রুতি তদনুগত শাস্ত্রনিন্দন—বেদও তাহার অনুগত শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ অন্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনার অভ্যাস।

৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমিতি মননং—এই যে হরিনামের এত মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে এ সমস্ত সত্য নহে, কেবলমাত্র লোককে নাম কীর্ত্তন করাইবার জন্য এত প্রশংসা করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা।

৬। তত্র প্রকারান্তরেণ অর্থকল্পনং—নানা রূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যার (যেমন আজকালকার অবোধ্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি) সাহায্যে নামের অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা। কারণ এই চেষ্টার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অবিশ্বাস লুক্কাইত থাকে।

৭। নাম-বলেন পাপ প্রবৃত্তিঃ—হরিনাম করিলেই যখন সকল পাপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তখন পাপ করা যাউক, নাম করিলেই হইবে। অথবা

নানারূপ অন্যায় ও অধর্ম্ম করিতেছি আবার মালা লইয়া নাম জপ করিতেছি আর ভাবিতেছি যখন নাম লইলাম তখন আর এই সব পাপে ভয় কি ?

৮। অন্য শুভক্রিয়াভির্নামসাম্য মননং—অন্যান্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সাম্য মনে করা।

৯। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি নামোপদেশঃ—যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাহারা বিমুখ বা বহির্মুখী, যাহারা শুনিতে ইচ্ছুক নহে তাহাদের নাম উপদেশ দেওয়া।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রুতেঽপ্যপ্রীতিঃ—নাম মাহাত্ম্য শ্রবণের পরও তাহাতে অপ্রীতি।

স্মরণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

১। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণং—ঈষৎমাত্র চিন্তার নাম স্মরণ।

২। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারে মনোধারণং ধারণা—সকল বস্তু ও বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া সমগ্র ধ্যেয় বস্তুতে যে চিন্তা প্রয়োগ তাহার নাম ধারণা।

৩। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানং—বিশেষ কোন অঙ্গ বা একটি একটি করিয়া রূপ, গুণ, বা লীলা প্রভৃতির যে একান্ত ও দৃঢ় চিন্তা তাহার নাম ধ্যান।

৪। অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতি—এই ধ্যান যখন অভ্যাস করিতে করিতে একেবারে অমৃতধারার মত অনবচ্ছিন্ন হইবে অর্থাৎ সেই ধ্যান সকল সময়েই যখন চিত্তের মধ্যে স্থিরভাবে থাকিবে তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

৫। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি। ক্বচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্ অন্যাস্ফূর্ত্তিঃ সমাধিঃস্যাৎ। কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফুরণ, আর কোন চিন্তা নাই, অথবা কেবল লীলারই স্ফূর্ত্তি হইতেছে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা নাই, সেই অবস্থার নাম সমাধি। এই সমাধির অবস্থাই আদর্শ অবস্থা।

পাদসেবনও নানাপ্রকারে অনুষ্ঠেয়। মূর্ত্তিসেবা, তীর্থসেবা, সাধুসেবা, তিথিসেবা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শুভদিন পালন ইত্যাদি।

ভক্তির এই যে নয় অঙ্গের কথা বলা হইল, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলে আমরা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের পূজা, আচার প্রভৃতির ভিত্তি ও উদ্ভব বুঝিতে পারিব। হিন্দু চিত্তের যে অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ তাহা এই সমস্ত টীকার মধ্যে বেশ সুন্দররূপেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই জন্যই আমরা বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি।

এই যে নয় অঙ্গের ভক্তি সাধনার কথা বলা হইল এই নয় অঙ্গ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অঙ্গ অনুশীলন করিলে অপরগুলি আপনা হইতেই আসিবে। এই জন্য প্রাচীন কাল হইতে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে।

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকি কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরাম্॥"

"পরীক্ষিত শ্রবণে, ব্যাসপুত্র শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদ সেবনে, পৃথুরাজা পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, বলি আত্মনিবেদনে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।"

ভক্তি সাধনার এই নয়টি পথ এবং তাহাদের বিভাগগুলি চিন্তা করিলেই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সুবিস্তৃত ক্রিয়া কলাপের মর্ম্ম ও রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। এই স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এই কথাটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। (ক্রমসন্দর্ভ টীকা ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ধর্ম্মসাধনায় স্মরণের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া বা বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মসাধনা হয় না। বাহ্যক্রিয়া সহায়তা করিতে পারে এই পর্য্যন্ত। মানব জ্ঞানস্বরূপ, ধ্যান ধারণা বা চিন্তাবিহীন ক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন। স্মরণের দ্বারা সমস্ত কার্য্যই হইতে পারে। এ বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে একটি উপাখ্যান আছে, জীব গোস্বামী এই উপাখ্যানটি তাঁহার টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন উপাখ্যানটি এই।

প্রতিষ্ঠান পুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ বড় দরিদ্র। সমস্তই কর্ম্মফল, এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের মধ্যেই বেশ শান্তভাবে বাস করিতেন। লোকটি বড়ই সরলচিত্ত। একদিন তিনি এক ব্রাহ্মণদিগের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধন কথা শ্রবণ করিলেন। এই সাধনা মনের দ্বারাই হইতে পারে এইরূপ কথা শুনিয়া, তিনি যথারীতি মানসপূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক শান্তচিত্তে নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিতেন ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া মনের দ্বারা নিজের অভিমত হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজে মনে মনে গৃহমার্জ্জনা করিতেন, তাহার পর প্রণাম করিতেন। প্রণাম করিয়া মনে মনে স্বর্ণনির্ম্মিত

কলসে করিয়া গঙ্গা প্রভৃতি নানা তীর্থের জল আহরণ পূর্ব্বক স্নান করাইতেন। তাহার পর নানা উপচারে পূজা ও আরত্রিক প্রভৃতি করাইতেন। প্রত্যহ এইপ্রকার মানসিক অনুষ্ঠান করিতে তাঁহার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। এই প্রকারে বহুদিন চলিয়া গেল। একদিন সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে ঘৃতযুক্ত পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে ভোগের জন্য আনিতেছেন। সদ্য প্রস্তুত পরমান্ন খুব উত্তপ্ত, হঠাৎ সেই উত্তপ্ত পরমান্নে ব্রাহ্মণের দুইটি আঙ্গুল পড়িয়া গেল। সমাধিভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ দেখিলেন সত্য সত্যই তাঁহার স্থূল দেহের অঙ্গুলি দুইটি পুড়িয়া গিয়াছে ও ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে। ইহার পর বৈকুণ্ঠ-পতি ঐ ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত দেখিয়া স্বধামে লইয়া আসিলেন। রূপ গোস্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির যে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণউপাসনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সহিত এই উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্বে এই সমস্ত উপাখ্যান যত সহজে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইত, এখন তাহা পারা যায় কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তীব্র ও একাগ্রচিন্তা যদ্যপি নিয়মবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দ্বারা অনেক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞান পর্য্যন্ত এ কথা স্বীকার করিতেছেন।

আমাদের দেশে এ প্রকারের ঘটনা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। একটি বিলাতী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনাটি শ্রীমতী এনি বেশান্ত তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেসান্তের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার দেহ সমাধিস্থানে কবর দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহার মাতা শূন্য ও বিমর্ষ নয়নে শোকা-ভিভূত হইয়া বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। যখন মৃতদেহ লইয়া যাইতেছিল তখন তিনি সেই দেহের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। দেহ লইয়া কিছু দূর চলিয়া যাওয়ার পর তিনি হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি এই অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি বলেন যে তিনি মৃতদেহের সহিত গির্জ্জায় গিয়াছিলেন, সেখানে অন্তিম উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন পরে সেখান হইতে কবরে যান, ও মৃতদেহের সমাধিদান দর্শন করেন। এই ঘটনায় কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি, যে কবরক্ষেত্রে তাঁহার স্বামীর দেহ সমাহিত করা হইয়াছিল, সেই সমাধি দেখিবার জন্য একজন আত্মীয়ের সহিত সেই সমাধিক্ষেত্রে গমন করেন। সমাধিক্ষেত্রটি খুব বৃহৎ।

সহচর আত্মীয় কবরটি কোথায় নিরূপণ করিতে পারিলেন না। সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন তিনি এই সমাধি ক্ষেত্রের কর্ম্মচারীকে ডাকিতে গেলেন। এমন সময়ে এনি বেসান্তের মাতা সেই সহচর আত্মীয়কে বলিলেন যে যে স্থানে অন্তিম উপাসনা করা হইয়াছিল যদি সেই থানে আমায় লইয়া যাও তাহা হইলে আমি কবরের নিকট যাইতে পারি। আত্মীয়ও অবশ্য মনে মনে ইহা অসম্ভব বলিয়াই চিন্তা করিলেন কারণ তিনি জানিতেন যে কবর দিবার সময় তিনি সঙ্গে ছিলেন না। যাহা হউক এই নববিধবার অনুরোধে আপত্তি করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে উপাসনা স্থানে লইয়া গেলেন।

এনি বেসান্তের মাতা সেই উপাসনা ঘর হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তায় মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল ঠিক সেই রাস্তায় বরাবর গেলেন ও ঠিক কবরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে সমাধিস্থানের কর্ম্মচারীও তথায় আসিয়া কবর দেখাইয়া দিলেন। এই কবর উপাসনাস্থান হইতে অনেক দূরে এবং বড় রাস্তার ধারেও নহে, অনেক ঘুরিয়া সেখানে আসিতে হয়। আর সেই কবরটিই যে তাঁহার স্বামীর তাহা নিরূপণ করিবারও কোন উপায় ছিলনা। কবরের উপর কোনরূপ নাম লেখা ছিল না। তাহার নিকটে ও চারিপার্শ্বে এই প্রকারের আরও অনেক কবরও ছিল। তিনি কেমন করিয়া রাস্তাই বা ঠিক করিলেন আর কেমন করিয়াই বা সেই কবরটি নির্দ্ধারণ করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না, সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। শ্রীমতী এনি বেসান্ত এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে এখন আমি মানবতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের যে সমস্ত রহস্য অবগত হইয়াছি তাহাতে বুঝিতেছি যে ঘটনাটি মোটেই আশ্চর্য্যজনক নহে ইহা অতি সহজ ও সামান্য ব্যাপার। মানব-চৈতন্য স্থূলদেহ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে ও দূরে যাহা ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্থূলদেহের মস্তিষ্কে সেই ঘটনার স্মৃতি মুদ্রিত করিতে পারে। তিনি যে উপাসনা স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন ইহার মর্ম্মও বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি অতীতের স্মৃতির একটি সূত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। উপাসনা স্থানে যাইবার মাত্র সেদিনের দৃষ্ট পথ প্রভৃতি তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। *

* "With my present knowledge the matter is simple enough, for I now know that Consciousness con leave the body, take part in events going on at a distance, and, returning impress on the Physical brain

পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে পুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে প্রাচীনদিগের মতে সেগুলি কতকগুলি গল্পের বা ঘটনার সমষ্টিমাত্র নহে এবং নৈতিক গল্প বলিয়া যেমন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই প্রকারের কতকগুলি উপদেশ সমাজে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ রচিত হয় নাই। সমস্ত লীলা বা সমস্ত পুরাণের কথা বলিতেছিনা কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন নমস্কৃত মহাপুরাণ সমূহ ভক্তের অধ্যাত্মসাধনার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পৌরাণিক সাধনতত্ত্বের উপর বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ক্রিয়া কলাপ ও অনুষ্ঠানাদি প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং পৌরাণিক সাধনার রহস্য না বুঝিলে হিন্দুসমাজেরও বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না। আরও দেখান হইল যে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারাও পৌরাণিক সাধনা কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থন করা অসম্ভব নহে। আমরা যাহা বলিতে চাই সংক্ষেপে তাহা আবার বলিতেছি।

পুরাণের লীলাগুলি চিন্তাচিত্র। এই চিন্তাচিত্রগুলি গ্রহণ করাই সাধনার প্রথম সোপান। চিন্তা বা জ্ঞানই মানবের স্বরূপ। সত্যের বা জ্ঞানের পথে আরোহণ করিতে হইলে এই চিন্তা বা স্মরণকেই সম্বল করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। এই চিন্তাই ধারণ, ধ্যান বা মনন ও নিদিধ্যাসন পদবাচ্য; এই চিন্তার দ্বারা প্রভূত উপকার হইবে। এই সমস্ত চিন্তাচিত্রের মধ্যে একটা শক্তি নিহিত আছে।

যেমনই হউক প্রত্যেক মানুষেরই একটা অন্তর্জগৎ বা চিন্তাজীবন আছে। টাকার বিষয়ই হউক, আর দেহ গেহ ও অপত্যাদির বিষয়ই ভাবুক, মানুষ মাত্রেই ভাবেও কল্পনা করে। এই যে ভাবনার রাজ্য সে রাজ্যটা এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে যে কিছু স্বতন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা তত্ত্ব জানে না তাহারা মনে করে ও বলে যে এই ভাবনার রাজ্যটা কিছুই নহে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা অজ্ঞানতা-প্রসূত। অধিক কি এই ভাব রাজ্যটাই অধিক সত্য, স্থূল জগৎ অপেক্ষা সত্য। আগে ভাব তাহার পর ভব। আমরা ভাবের মধ্য দিয়া ভব দেখি।

what it has experienced. The very fact that she asked to be taken to the chapel is significant, showing that she was picking up a memory of a previous going from that spot to the grave." Antobiography P. 26.

মানুষের এখনও ক্রমবিকাশ শেষ হয় নাই। মানুষের মধ্যে অনেক শক্তি এখনও নিদ্রিত। ঐ সমস্ত লীলা চিন্তা করিতে করিতে এই সব নিদ্রিত শক্তি (Latent Faculties) জাগ্রত হইবে। এই সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগিতে আরম্ভ করিলে মানব বুঝিতে পারিবে পুরাণের বর্ণনাগুলির যথার্থ অর্থ কি। এই দৃশ্যমান বিশ্ব সমস্ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। "মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত" শক্তির বিকাশ হইলে মানব বিশ্বের এমন অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবে যে তাহার আলোক তাহার এখনকার মত ও ধারণাগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও উপহাসাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইবে।

মানুষের মধ্যে যে অনেক সূক্ষ্ম শক্তি ঘুমাইয়া আছে তাহা অতি সহজেই বোঝা যায়। যেমন ছোট ছেলেটির চলিবার শক্তি, কথা কহিবার শক্তি, তর্ক করিবার শক্তি, অঙ্ক কষিবার শক্তি এখনও জাগে নাই অনুশীলন দ্বারা ক্রমে জাগিবে, এও ঠিক তেমনি। আমাদের এখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে। আবার যে অন্ধ তাহার চারিটি ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের কাছেই জগতের প্রকাশ। অন্ধের জগৎ রূপহীন ও আলোকহীন চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু অন্ধকারকে সে অন্ধকার মনে করে না কারণ সে জানে না অলোক কেমন। বধিরের জগৎ শব্দ শূন্য। আমাদের এখন যে পাচটি ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে ইহা ছাড়া আরও ইন্দ্রিয় আছে। সেগুলি ও ক্রমে জাগিবে। সাধন রাজ্যে অগ্রসর হইলে সেগুলি জাগিয়া উঠিবে।

মনে করুন পৃথিবীর সমস্ত লোক জন্মান্ধ : সেই জন্মান্ধের দেশে সূর্য্যও উঠে, ফুলও ফোটে, পাখী গান করে। অন্ধেরা সূর্য্যের উত্তাপ স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করে বটে কিন্তু সূর্য্যও দেখিতে পায় না, আলোক কি তাহাও জানে না। কিন্তু উত্তাপটা পায়। ফুলের গন্ধ পায়, পাখীর গানও শোনে, পাখার শব্দও শোনে, কখনও কখনও চলিতে চলিতে ফুলের স্পর্শও পায় কিন্তু পাখীও দেখিতে পায় না, ফুলও দেখিতে পায় না। সেই দেশে হঠাৎ একজন চক্ষুবিশিষ্ট লোক আসিয়া আলোকের কথা দৃষ্টির কথা বলিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, এই তোমাদের চারিদিকে কত কি রহিয়াছে। অন্ধেরা কি বুঝিবে? আর যে চক্ষুবিশিষ্ট লোকটি তাহাদিগকে কেমন করিয়াই বা এই সব কথা বুঝাইবে? মহা বিপদ। হয়ত অন্ধেরা চক্ষুবিশিষ্ট লোকটিকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, নয়ত তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। এখন চক্ষুবিশিষ্ট লোকটি অন্ধদের চক্ষু খুলিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি

ভাবিতেছেন যদি অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া দিতে পারি তাহা হইলে আর তাহাদের সঙ্গে বৃথা তর্ক ও ঝগড়া করিতে হইবে না। পৌরাণিক সাধনার মধ্যে এই চক্ষু খুলিবার উপায় আছে। প্রাচীনকালে এই পদ্ধতিতে অনেকের চক্ষু খুলিয়াছে। অন্ধের দেশে চক্ষুষ্মানের কথা বলিয়াই গীতা বলিয়াছেন—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন। কেহ বা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন। কেহ বা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। কেহ বা শুনিয়াও ইহাকে জানেন না।

মহাত্মা খৃষ্ট উপাখ্যানের মধ্য দিয়া তত্ত্ব উপদেশ দিতেন ও বলিতেন "Therefore speak I to them in parables ; because they seeing see not ; and hearing hear not, neither do they understand" অর্থাৎ ইহারা দেখিয়া দেখে না, শুনিয়াও শোনে না এবং দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারে না।"

মানুষ অবশ্য পরমার্থতঃ সব সমান, তবে যেমন ফোটা ফুল, আধফোটা কুঁড়ি, তেমনি কাহারও কম শক্তির বিকাশ হইয়াছে কাহারও বেশী শক্তির বিকাশ হইয়াছে। সকল শক্তিই সকলের একদিন বিকাশ হইবে সেই জন্যই জগতে অধ্যাত্ম শাস্ত্র সমূহ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে 'অনঘ' হইয়া ভাগবত শ্রবণ ও স্মরণ করিতে হইবে। একালের লোকে স্বাধীন চিন্তাকে খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে, আমরা যাহাকে স্বাধীন চিন্তা বলিয়া মনে করি তাহা যে কত পরাধীন তাহা আমাদের ভাবিবারও অবসর নাই। ভাগবত বলিতেছেন যে মানুষকে স্বাধীন চিন্তা বর্জ্জন করিতে হইবে না, তবে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, গ্রন্থের অর্থ ও মর্ম্ম ভাল লোকের নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তাহার পর যাহা হয় করিবে। আর এক কথা ভাগবত বলিতেছেন যে আগে হইতে অর্থাৎ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বা সাধনা সম্বন্ধে নিজে কিছু না জানিয়া যেমন তেমন একটা ধারণা লইয়া আসিও না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে "Unreserved and unprejudiced laying of onesself open।"

প্রকৃত প্রস্তাবে সকল প্রকার সত্য নির্ণয়েরই কি ইহাই পথ নহে? "knowledge is received only in those moments in which every judgement, every criticism, coming from ourselves, is silent."

আত্মাভিমান পরিত্যাগ করাই অনঘ হওয়া। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেই আমরা ধন্য হইব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ভাষায় বলিতে পারি।

"প্রাপ্যাপি দুর্লভং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥
অশীতিং চতুরশ্চৈবং লক্ষাস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্য্যায়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দ চরণদ্বয়ম্॥"

স্মৃতিদিনে।

১

মা আমার,
বিধির আশিস্-ভরে— বরষ বরষা-পরে,
ফিরিয়া আসিল পুন ধরণী-মাঝার;
কত বাধা, কত কর্ম্ম, কত মৃত্যু-কত জন্ম,
কত হাসি—কত কান্না পাইল সংসার!
স্ব-জন-সংসার ফেলে, সেই যে গেছ মা চলে,
এক—একবার বল আসিবে না আর?
জিজ্ঞাসে আকুল প্রাণ আজি মা আমার!

২

মা আমার,
ভরিয়া সুরভি-বাসে, কুসুম তেমনি হাসে,
বিরাজে বিটপীকোলে ফলের সম্ভার!
নদী গাহে কুলু-তান, পাখী গায় কল-গান,
শরতের আর্দ্রবায়ু ভ্রমে চারিধার,

ভূমিতলে তৃণ-গুলি, নাচে হাসে হেলিদুলি !
স্মরণে আসিছে পুণ্য স্মৃতিটি তোমার !—
কত দূরে গেছ চলে জননী আমার !

৩

মা আমার,
আসিছে সোণালী উষা, পরিয়া রঞ্জিল ভূষা,
আসে সন্ধ্যা স্নিগ্ধ হাস্যে ফিরে বার বার,
জলদের জাল-কেটে, চাঁদ বাহিরায় ছুটে—
পরিয়া কৌমুদী-বাস—সরায়ে আঁধার !
সুখদ-প্রভাত হতে—দিনমান একমতে
শরতের হৈম রোদ্র ভাতিছে আবার !
স্মরণে আসে মা পুণ্য স্মৃতিটি তোমার।

৪

মা আমার,
কত রোগে দেহ জীর্ণ— কত শোকে হৃদি-দীর্ণ
হ'তেছিল দিন দিন তব অনিবার ;
অবিরত করপুটে, যা' চাহিতে মুখ ফুটে,
তোমার দেবতা-পদে— ; সেই বিশ্বাধার—
সে প্রার্থনা শুনি কি মা, ডাকিলেন স্নেহে তোমা ?
তাই তুমি চলে গেলে নিকটে তাঁহার !
পারিল না রেখে দিতে তোমার সংসার !!

৫.

মা আমার,
কোথায়—কাছে না দূরে ? সে কোন্ অজ্ঞাতপুরে,
গিয়াছ চলিয়া ত্যজি আপন সংসার ?
(খেলিতে খেলিতে খেলা, শেষদিন শেষবেলা,
পশিল শ্রবণে স্নেহ আহ্বান কাহার— !
আর হইল না থাকা,— সে দেহ ধরিয়া রাখা—
কোন মতে কোন সাধ রহিল না—আর !
চলে গেল সেইক্ষণে জননি আমার !)

৬

মা আমার,

তারপর কতদিন— নিত্য হইতেছে লীন,

চূর্ণ বিচূর্ণিত তব সাধের সংসার!

শোভা নাই—শ্রীও নাই! হাসিনাই, আশানাই!

ক্ষুব্ধ-স্তব্ধ-মৃত আহা! তার চারিধার।

তুমি ছিলে যার প্রাণ, তোমাতেই অবসান—

শৃঙ্খলা—সৌন্দর্য্য-শূন্য হয়ে গেছে তার।

মনে পড়ে সেই কথা মাগো বারবার।

৭

মা আমার,

গেছে মধু অবকাশ, গেছে কত অভিলাষ,

প্রাণভরা তপ্তব্যথা, অশ্রু আর মর্ম্ম গাথা

উঠে উথলিয়া আজি স্মরণে তোমার!

এজীবনে একবার—পায় না সেদিন আর?

পবিত্র পরশ মাগো, পাব না তোমার?

তাই প্রাণ আজি মোর করে হাহাকার।

৮

মা আমার,

সংসার-স্ব-জন ফেলে, যে আশ্রমে চলে গেলে,

সমাপ্তি হয়েছে সেথা শুভ বাসনার?

মিলন ও শান্তিতরে, সে আকাঙ্খা প্রাণভরে,

শেষদিন শেষক্ষণে ছিল মা তোমার—

পেয়েছ কি সে মিলন? পেয়েছ সে শান্তি ধন?

ব্যথা নাই—অশ্রু নাই সেথা তব আর?

জিজ্ঞাসে ব্যাকুল প্রাণ আজি মা আমার!

৯

মা আমার,

শান্তিতে—পরম সুখে—আছ মা পিতার বুকে?

সংসারের দুঃখ-শোক ঘিরিছে না আর?

পুণ্যদিনে পুণ্যগাথা—তোমার সুখের কথা
শুনিতে উৎসুক অতি পরাণ আমার !
নাহি রোগ শোক ভ্রান্তি?—আছে অবিচ্ছিন্ন শান্তি
—ভাল আছ'—সুখে আছ', বল একবার,
পুণ্যদিনে সেই কথা শুনি মা আমার !

১০

ওহে বিশ্ব-রাজ,
দীন-অকিঞ্চন আমি—কি বলিব অন্তর্যামী,
রাখিও মায়েরে মম শান্তি-সুখ-মাঝে ;
রাখ তারে দিবারাতি, আনন্দ-আরামে মাতি
—ব্যাকুলতাভরে, তব সুমঙ্গল কাজে।
জ্ঞানহীনা আমি অতি, স্মৃতি দিনে করি নতি,
অশরীরি সে আত্মার করিও কল্যাণ—
—কাছে রেখ তাঁকে—; এই ভিক্ষা মাগে প্রাণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায়।
বীরভূম।

পরেশনাথ তীর্থ।

বিন্ধ্যাচলে পরেশনাথ নামে উচ্চ গিরি উর্দ্ধে প্রায় পঞ্চ সহস্র ফুট। এই পাহাড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া মুনিবরকে প্রণাম করিতেছে। ইহার অপর নাম সুমেত শেখর। তীর্থঙ্করসেবী জৈনগণ এই অচলকে অতি পবিত্র চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এই পবিত্র অচলের দর্শন কামনায় গুজরাত, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রাজস্থভূমি ও ভারতের অন্যান্য স্থানস্থ জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রভূত ধনব্যয় স্বীকার করিতে অকুণ্ঠিত হন এবং এই অচলের উপরিস্থ পবিত্র স্থান সমূহ দর্শন লাভ ঘটিলে তাঁহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্য-যুক্ত ও গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুমেতশেখরে কুড়িজন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ পদ লাভ করেন। তীর্থঙ্কর বা জিনগণ মহাপুরুষ বা অবতার স্বরূপ। জৈনগণের মতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে ঋষভদেব তীর্থঙ্কর পদবী লাভ

করেন। পরে (২) অজিত (৩) শম্ভব (৪) অভিনন্দন (৫) সুমতি (৬) পদ্মপ্রভু (৭) সুপার্শ্ব (৮) চন্দ্রপ্রভু (৯) সুবিধি (১০) সিতল (১১) শ্রেয়াংস (১২) বাসুপূজ্য (১৩) বিমল (১৪) অনন্ত (১৫) ধর্ম্মনাথ (১৬) শান্তিনাথ (১৭) কুন্থনাথ (১৮) অরনাথ (১৯) মল্লিনাথ (২০) মুনিসুব্রত (২১) নমীনাথ (২২) নেমিনাথ (২৩) পার্শ্বনাথ (২৪) মহাবীর ক্রমান্বয়ে তীর্থঙ্কর পদবী লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে ঋষভ, বাসুপূজ্য, নেমিনাথ ও মহাবীর এই চারিজন তীর্থঙ্কর ভিন্ন অপর কুড়িজন তীর্থঙ্কর পবিত্র সুমেতশেখরে নির্ব্বাণ।পদ প্রাপ্ত হন এবং ইহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথদেব মোক্ষ পদ লাভ করেন। এই কারণেই পরেশনাথ পাহাড় জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণের পরম তীর্থ স্থান হইয়াছে।

সুমেত শেখরের পাদদেশে মধুবন নামে এক স্থান আছে। মধুবনে পরেশনাথ যাত্রীদিগের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। পরেশনাথ যাত্রীদিগের ধর্ম্মশালাই একমাত্র বিশ্রামভূমি। মধুবন স্বভাবতই শান্তরসাস্পদ। ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে বিচিত্র বনভূমি, পক্ষীর সুমধুর কুজন গ্রামবাসীগণের সরলতা ব্যঞ্জক মুখশ্রী কিছুরই অভাব দৃষ্ট হয় না। মধুবনস্থ ধর্ম্মশালা হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে অবলোকন করিলে এক বিরাট পর্ব্বত বৃক্ষরাজি মণ্ডিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে বোধ হইবে।

মধুবন নামক স্থান গিরিধি হইতে প্রায় বিশ মাইল। গিরিধি হইতে হাজারিবাগ অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া নয় ক্রোশ পথ গমন করিলে দুইটি রাস্তা পাওয়া যায়। ইহার একটি রাস্তা বরাবর হাজারিবাগ অভিমুখে গিয়াছে। আর একটি রাস্তা মধুবন অভিমুখে গিয়াছে। রাস্তা দুইটির সন্ধিস্থল হইতে মধুবন এক ক্রোশের অধিক দূর নহে। পরেশনাথ পাহাড় গিরিধির উত্তর ধারে অবস্থিত। মধুবন যাইতে হইলে গিরিধি হইতে পুস্ পুস্ বা গোষানে আরোহণ করিতে হয়। গোযানে যাতায়াতের ভাড়া সাধারণতঃ চার টাকার অধিক নহে। গিরিধি হইতে পরেশনাথ যাইবার পথে আট মাইল গমন করিলে বরাকর নামে এক নদী পাওয়া যায়। স্থানের নামও বরাকর বা পালগঞ্জ। বরাকর নদী স্বল্পতোয়া বটে কিন্তু স্বচ্ছসলিলা। নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর। তখন বোধ হয় মধ্যে এক হাত জলও ছিল না। গোযান সহজেই জলের উপর দিয়া

পার হইয়া গেল। আমরা পালগঞ্জে উপস্থিত হইলে দুই তিনটি ব্রাহ্মণবটু দর্শন করিলাম। তাহারা পরেশনাথ পাহাড়ের পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিল এবং সুললিত স্বরে স্তোত্র গাহিয়া পয়সা ভিক্ষা করিতে লাগিল। এই স্থানে করুণোদ্দীপক আরও কয়েকটি দরিদ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। দেখিলেই বোধ হয় জীবের সেবাই পরম ধর্ম্ম।

বরাকর নামক নদী হইতে স্থানের নামও বরাকর হইয়াছে। বরাকরে একজন রাজা আছেন। তাঁহাকে একজন বড় ভূস্বামী বলিলেই চলে। রাজার উদ্যোগে প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে বরাকরে একটি মেলা হইয়া থাকে। বরাকর বা পালগঞ্জ হইতে মধুবন নয় মাইল দূরবর্ত্তী। রাস্তার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও অরণ্য ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। রাস্তা হইতে দূরে দূরে পল্লী সমূহ মধ্যে প্রাচীন অধিবাসীদিগের বাসস্থান।

মধুবন নামক স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণের তিনটি ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালাগুলি বর্ণনা করিতে হইলে জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। জৈনগণ দুই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় ও দিগম্বরী সম্প্রদায়। দিগম্বরীগণ আবার দুই পন্থীতে বিভক্ত। তের পন্থী ও বিশ পন্থী। মধুবনে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের একটি ও দিগম্বরী সম্প্রদায়ের তের পন্থী ও বিশ পন্থীগণের এক একটি সমুদায়ে তিনটি ধর্ম্মশালা আছে।

বিদ্যাসাগর শান্তি মুনি বিজয়জী মহারাজ নামে একজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী 'শ্রাবক শান্তিসুধা' বা মানব ধর্ম্ম সংহিতা নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনি স্বপুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন জৈনধর্ম্ম অতি প্রাচীন। তাঁহাদের মতে শেষ জিনদেবই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থের গুরু। অনেকে বলেন জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এক রূপ। শান্তি মুনি মহারাজ বলেন, জৈনগণের বিশ্বাস তাহা নহে। তাঁহাদের মতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে পার্থক্য আছে। জৈনগণের পঞ্চচত্বারিংশ সংখ্যক আগম গ্রন্থ (দর্শন ও সংহিতা গ্রন্থ) আছে। এই সমস্ত পুস্তক বৌদ্ধ দর্শন ও সংহিতা গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক। বৌদ্ধদিগের পূজা পদ্ধতি জৈনদিগের পূজা পদ্ধতি হইতে পৃথক। জৈনগণ চব্বিশ জন তীর্থঙ্করকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেব বোধিসত্বকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। এই সকল ও অন্যান্য

কারণে জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে এক বা এক রূপ তীর্থঙ্করসেবীগণ তাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন না।

বিজয়জী স্বামী বলেন, জীন ধর্ম্ম অতি পুরাতন ও ইহার মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ আধুনিক। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এইরূপ কোন সম্প্রদায় বিভাগ পূর্ব্বে ছিল না। শিবভূতি সহস্রমল্ল নামে একজন সাধক দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। যাঁহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারাই দিগম্বর আখ্যা প্রাপ্ত হন। বস্ত্রত্যাগের উপর বিশিষ্টতা থাকায় দিগম্বর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। (দিক—শূন্য নগ্নভাব; অম্বর বস্ত্র) দিগম্বরগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের মূর্ত্তি বস্ত্রভূষণাদি দ্বারা অলংকৃত করেন না। শ্বেতাম্বরীগণ পবিত্রতাই (শ্বেত=শুভ্রতা=পবিত্রতা) দেবতার বস্ত্র বলিয়া তাঁহাদের উপাস্য মূর্ত্তিকে নানারূপ অলংকারে ভূষিত করেন। দিগম্বরদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে,—

'রথবীরপুর নগরে দীপক উদ্যানে শ্রীআচার্য্যকৃষ্ণ নামে একজন আচার্য্য বিহার করিতেন। সেই নগরে শিবভূতি সহস্রমল্ল নামে এক প্রসিদ্ধ গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি প্রতি রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেন বলিয়া স্ত্রী শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিয়া দেন। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী পুত্রবধূকে অর্গল বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতে ও দ্বার খুলিয়া না দিতে আদেশ দিয়া নিজে জাগিয়া থাকেন। পুত্র আসিয়া ডাকাডাকি করিলে মাতা রুক্ষস্বরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর বাক্যে বলিলেন 'যেখানে এত রাত্রে দ্বার খোলা আছে, সেখানে প্রবেশ কর'। মাতার বাক্যে পুত্রের মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। শিবভূতি সহস্রমল্ল সেই গভীর রাত্রিতেই বাটী পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সাধু আচার্য্যকৃষ্ণের আশ্রমের দ্বারদেশ খোলা দেখিতে পাইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং সাধু হইবার জন্য আচার্য্যের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আচার্য্য অবশেষে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া কিছুদিন পরে সেই নগর পরিত্যাগ করেন। কিছু কাল পরে আচার্য্য আবার সেই নগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া শিবভূতি রাজপ্রদত্ত একখানি উত্তম রত্ন কম্বল উপহার দিবার জন্য আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হন। আচার্য্য তাহা দেখিয়া শিবভূতিকে বলিলেন এইরূপ বহুমূল্যবান বস্ত্রের প্রয়োজন কি? ইহা রাখা উচিত নহে। এই বলিয়া উক্ত রত্ন কম্বলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। ইহাতে শিবভূতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। একদিন

ঐ সাধু আচার্য্য কৃষ্ণ জিনি-কল্পী মুনিদিগের অধিকার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ছিলেন। উক্ত উপদেশের মধ্যে জিনেশ্বরদিগের বস্ত্র পরিত্যাগের কথা উল্লেখ থাকায় শিবভূতি আচার্য্যকে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। আচার্য্য উত্তর করেন যে যদিও জৈনেশ্বরদিগের বস্ত্র পরিত্যাগের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি আমাদের পক্ষে এখন সম্পূর্ণ নগ্ন থাকা অসম্ভব। আর তা ছাড়া জিনদিগের কেহই একেবারে বস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। শিবভূতি কিন্তু আপনার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সমস্ত বস্ত্র ও পাত্র পরিত্যাগ করিয়া নগ্নভাবে উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহার মত জৈনধর্ম্ম মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি করিল।

এইরূপে দিগম্বর সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর শান্তিমুনি বিজয়জী মহারাজ শান্তিসুধা নামক তৎপ্রণীত মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, শ্বেতাম্বরী মতই প্রাচীন। তাঁহার মতে তীর্থঙ্কর ও আর্হতগণের জন্ম গ্রহণের পরে দিগম্বরী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর পাওয়া-পুরী নগরীতে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিলে ছয়শত নয় বৎসর পরে এই মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। নিগ্রন্থনাথ মহাবীর বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কোন পল্লী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। নিগ্রন্থ শব্দের অর্থ দিগম্বর। এই জন্য কেহ কেহ মহাবীরকেই দিগম্বর মতের প্রবর্ত্তক বলেন। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে প্রধানতঃ মত পার্থক্য এইরূপ ;—

(১) দিগম্বরগণ বস্ত্রত্যাগ স্বীকার করেন।

(২) দিগম্বর জৈনগণের মতে স্ত্রীলোকদিগের মোক্ষ নাই।

(৩) শ্বেতাম্বর জৈনগণের মতে বন্দনা দ্বারা ধর্ম্ম লাভ আর দিগম্বর জৈনগণের মতে ধর্ম্মবৃদ্ধি ঘটে।

(৪) শ্বেতাম্বরী জৈনগণের মধ্যে যাঁহারা মুনিব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার 'জিনকল্পী' ও অপর 'স্থবির কল্পী'। জম্বুস্বামী নির্ব্বাণ লাভ করিলে পর জিনকল্পী মুনি আর দেখা যায় না। এখন যাঁহারা মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই স্থবির কল্পী। দিগম্বর সংসার ত্যাগীগণের মধ্যে এরূপ কোন বিভাগ নাই।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কতকগুলি মত পার্থক্য আছে। দিগম্বরীগণ [illegible]নাদের উপাস্য দেবতা কোনরূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেন না। এমন কি

ফুল চন্দন প্রভৃতি পাদ্যার্ঘ্যও প্রদান করেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশর দ্বারা তাঁহাদের উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশ্‌পন্থী নামে অভিহিত। আর যাঁহারা তাহাও করেন না তাঁহারা তেরপন্থী নামে অভিহিত। ইহারা বলেন পুষ্প বিল্বপত্র চয়নে বহু প্রাণী হিংসার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এইরূপ না করাই ভাল।

দিগম্বরীগণের মতে স্ত্রীলোকদিগের মোক্ষ নাই। কিন্তু শ্বেতাম্বরীগণ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন সাধনা দ্বারা কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই নির্ব্বাণ পদলাভ করিতে পারেন। উনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ স্ত্রীলোক ছিলেন একথা শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। আরও সুখের বিষয় এই যে যখন আমরা দেখিতে পাই যে একজন স্ত্রীলোক সাধনা দ্বারা সিদ্ধ মনোরথ হইয়া তীর্থঙ্কর পদবীতে আরূঢ়া ছিলেন এবং জৈন ধর্ম্মের পথ প্রদর্শিকা হইয়াছিলেন তখন আমরা বুঝিতে পারি যে জৈন ধর্ম্মে আত্মার শান্তিপ্রদা ও শিবদাত্রী শক্তিসমূহ উপযুক্ত অবস্থায় এবং যথাযোগ্য পাত্রে ভারতের স্বাধীনযুগে কিছুকালের জন্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল।

জৈনধর্ম্মীগণ সকলেই ধূপ, দীপ, পুষ্প, আলতা, তণ্ডুল, হরিদ্রা, চন্দন, আমলকি প্রভৃতি দিয়া তীর্থঙ্করগণের পূজা করিয়া থাকেন। পূজা প্রণালী আমাদের নারায়ণ শিবাদিপূজারই অনুরূপ। তবে সংক্ষিপ্ত। সেই ওঁ, হ্রীং, স্বাহা প্রভৃতি বীজমন্ত্র তাঁহাদের দেবতার পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। তীর্থঙ্করগণের পূজা প্রণালী প্রায় একরূপ। তবে স্তব ভিন্ন ভিন্ন। রত্নসাগর, আরাধনপ্রকরণমালা প্রভৃতি পুস্তকে পূজা পদ্ধতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। মধুবনে তেরপন্থী ধর্ম্মশালায় দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত কতক-গুলি পুরুষ ও স্ত্রীর পূজা প্রণালী দেখিয়াছিলাম। পূজাপদ্ধতিতে একটু বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। একজন একচক্ষুহীনা অল্পবয়স্কা তেজস্বিনী বিধবা সমধিক অনুরাগের সহিত মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, অপরাপর পুরুষ ও স্ত্রীলোক-গুলি সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন এবং "ওঁ হ্রীং পার্শ্বনাথায় স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া পূজার দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন।

স্বস্ব সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন অর্থপতিগণ প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মশালা-গুলি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার চত্বরভূমি তিনভাগে বিভক্ত। (১) অতিথিশালা (২) অর্থশালা (৩) উপাসনালয়। ইহাদের মধ্যে শ্বেতাম্বরী জৈনদিগের, ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণগৌরব সমধিক প্রশংসনীয়, এই ধর্ম্মশালা

জগৎশেঠ ধনপতিসিংহ বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দিগম্বরজৈন মন্দিরের হেমখচিত অগ্রভাগ সমূহে রক্তপতাকা এবং শ্বেতাম্বরী জৈন মন্দিরের সুবর্ণ-মণ্ডিত শিখরে অর্দ্ধশুভ্র অর্দ্ধরঞ্জিত পতাকা বিরাজ করিতেছে।

ধর্ম্মশালায় যাত্রীদিগের আবাসস্থানের ব্যবস্থা পরিপাটী, অতি সুন্দর। ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেই অনুমান দুইশত হাত প্রশস্ত ও পাঁচশত হাত দীর্ঘ এক সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে অতিথিদিগের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আতিথ্যালয়ে এক শতেরও অধিক প্রকোষ্ঠ আছে। অতিথি-শালার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তিনটি মন্দির দৃষ্ট হয়। অতিথিশালা অতিক্রম করিলে পর অর্থশালা বিভাগ দৃষ্ট হয়। এই বিভাগে ঠাকুরের ধন সম্পত্তি সংরক্ষণের নিমিত্ত গৃহ, কাছারি গৃহ, পুষ্পোদ্যান, গোশালা, নূতন অতিথিশালা ও পুস্তকাগার আছে। অতিথি-সেবালয় ও ঠাকুরের অর্থশালা চতুর্দ্দিকেই হয় গৃহভিত্তি, নয় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কাছারি বাড়ীতে দেওয়ান, মুনসি, খাজাঞ্জি, জামাদ্দার, বরকন্দাজ, পাইক ও বহু ভৃত্য আছে। প্রহরে প্রহরে নহবত বাজিয়া থাকে। রাত্রিতে তিন তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক জন লোক বন্দুক হস্তে ঠাকুরবাড়ী পাহারা দিয়া থাকে। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে স্নানাগার। কাছারি বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি সুরঙ্গ পথে কিছুদূর গমন করিলেই স্নানাগার পাওয়া যায়। এখানে একটি ইন্দারা আছে। স্নানের নিমিত্ত গরম ও শীতল জল নিয়ত জোগাইবার জন্য পরিচারক নিযুক্ত আছে। স্নানের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত এখানে মজুত আছে।

কাছারি বাড়ীতে যে নূতন অতিথিশালা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার একটি ঘরে প্রায় ত্রিশখানি চেয়ার একটী টেবিল ও কয়েকখানি পুস্তক সহ একটি আলমারি আছে। ইহাই লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার। কিন্তু দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে পুস্তকাবলি ষষ্টিসংখ্যকের অধিক হইবে না। ইহাদের মধ্যে ১। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা শান্তি সুধা ২। জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র (শ্রীধর শিব লালজী), ৩। পঞ্চাঙ্গ জ্যোতিষ (ধর্ম্মসভা), ৪। শ্রীঅষ্টোত্তর শত কাশিক পঞ্চাঙ্গ চিহ্নম্ জ্যোতিষ, ৫। জৈন পঞ্চাঙ্গ ৬। আরাধন প্রকরণ মালা ৭। শ্রীজীন গুণ জাহির সংগ্রহ ৮। শ্রীজৈনরত্ন মণি ৯। শ্রীচতুর্বিংশতি জিন স্তবাবলী ১০। অর্হন্নীতি ১১। বৈরাগ্য তরঙ্গ ভেদ মালা ১২। ষট্‌পুরুষ চরিত্র ১৩। নিত্য পূজা সংস্কৃত রত্নাবলী ১৪। জম্বুস্বামী চরিত্র ১৫। শ্রীপূর্ব্বদেশ তীর্থস্তবাবলী ১৬। বৈরাগ্য তরঙ্গ ভক্তিমালা ১৭। আত্মশিক্ষা ভাবনা ১৮। জৈন নিত্য

পাঠ সংগ্রহ ১৯। জীনস্তোত্র সংগ্রহ ২০। সুখপ্রাপ্তি সাধন ২১। শ্রীপঞ্চোপদেশ তীর্থস্তবাবলী ২২। শুদ্ধোপযোগ বা সহজ সমাধি ইত্যাদি পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা শান্তিসুধা বিদ্যাসাগর শান্তিমুনি বিজয়জি প্রণয়ন করেন! শ্বেতাম্বরী জৈন মন্দিরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি পটাঙ্কনে রক্ষিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানি দেখিলে বোধ হয় যেন মনুসংহিতার অনুকরণেই লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে যাহা উল্লেখ-যোগ্য :—

১। প্রমাণ নয়তত্ত্বালোকালঙ্করি (শ্রীদেবহুরি)

২। হৈমলিঙ্গানুশাসন—(হেমচন্দ্রাচার্য্য)

৩। সিদ্ধহেম ব্যাকরণ লঘুবৃত্তি

৪। গুর্ব্বাবলী

৫। রত্নাকরাবতারিকা

৬। শ্রীজৈন স্তোত্র সংগ্রহ—১ম ও ২য় ভাগ।

এই সকল গ্রন্থপ্রণেতৃগণ মধ্যে বহু বহু পণ্ডিত ছিলেন। দেবসুন্দর সূরি, জ্ঞানসাগর সূরি, সোমসুন্দর সূরি, মুনিসুন্দর সূরি, প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম শ্রদ্ধা সহকারে জৈনগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

জৈনধর্ম্ম তত্ত্বদর্শনের অনুকূল পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক আগম আছে। যোগী ও আর্হতগণ এই সমস্ত গ্রন্থে দর্শন ও সাধনাতত্ত্ব সমূহ বিচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত বিচার কথা শ্রবণ করিলে মন অনুরাগপূর্ণ ও পবিত্রভাব রসে আপ্লুত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'জিন জাহির গুণ সংগ্রহ' নামক পুস্তকে বিশ্বকোষ প্রণেতা হেমচন্দ্রের নাম পাওয়া গেল শ্লোকটি এই :—

"শ্রীহেমচন্দ্র গুরু সিদ্ধগুণৈঃ পরং ন
শ্রীসোমসুন্দর গুরু প্রভবোঽহকুর্য্যুঃ।
কিং ত্বদীয় নব বিম্ব মহা প্রতিষ্ঠা
কৃতৈর পীশ দানভোগ্র কলি প্রভাবৈঃ॥"

পুস্তকাগারে সারণী দৃষ্টে জানা গেল যে 'সিদ্ধ হেম ব্যাকরণ' নামে হেমচন্দ্র প্রণীত একখানি ব্যাকরণ আছে। 'হৈমলিঙ্গানুশাসন' নামক পুস্তক ও আচার্য্য

হেমচন্দ্র প্রণীত। এই সমস্ত গ্রন্থের বৃত্তি, পঞ্জী, টীকা আদি বর্ত্তমান আছে।

গ্রন্থ প্রকোষ্ঠে 'শ্রীশুদ্ধোপযোগ (সহজ সমাধি) নামে একখানি পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দেখিলাম। ইহা একখানি পরমাত্মাদর্শন গ্রন্থ। জৈনাচার্য্য শুভচন্দ্র কর্ত্তৃক পুস্তকখানি বিরচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে শতাধিক শ্লোক দৃষ্ট হইল। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বোধ হয় গ্রন্থকার সভাষ্য পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শন সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন, ভক্তি ও জ্ঞান একাধারে বর্ণনা করিতেছেন। গ্রন্থখানি হিন্দুদার্শনিক ও সাধকগণের অতি আদরের জিনিস। পাঠকবর্গকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

ধর্ম্মশালায় যে নূতন আতিথ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার একটি ঘরে গঙ্গাঋষি নামে এক সংসার ত্যাগী পুরুষ সাময়িক ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সুবে বিহার ও মির্জাপুরে বেশীরভাগ কালযাপন করেন। ইনি কিশোর বয়সে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কিছুকাল তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে ও বহুকাল তীর্থ সমূহ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। সংসারত্যাগী জৈনগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যতি ও সম্বুদ্ধ। ইনি যতি সম্প্রদায়ভুক্ত। যতি সম্প্রদায়ীগণ যদিও বিবাহ প্রভৃতি সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না তত্রাচ অনেকের ধনরত্ন ও সংসারের প্রতি একটু আধটু আসক্তি থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু সম্বুদ্ধ সম্প্রদায়ী সংসারত্যাগীগণ স্বভাবতঃ বিষয় বিরক্ত ও সতত মননশীল।

কাছারি বাড়ী অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মশালার তৃতীয় বিভাগে উপস্থিত হইতে হয়। এই তৃতীয় বিভাগে দেবালয় বা ঠাকুর বাড়ী অবস্থিত। দুইশত হস্তের ও অধিক চতুষ্কোণাকৃতি সুবেষ্টিত উচ্চ ভূখণ্ডে দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিষ্কৃত সুবিস্তৃত শুভ্র অঙ্গনে দশটি উচ্চ শিখর বর্ত্তমান। মন্দিরগুলি তিন পার্শ্বে তিনটি তিনটি করিয়া নয়টি ও অপর পার্শ্বে আর একটি এই দশটি এইরূপ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুশোভন এই দশটি মন্দিরে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের সুন্দরালঙ্কৃত মূল্যবান প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে। বিশেষত্ব এই যে সকল মন্দিরেই পরেশনাথ দেবের মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালার কথা উল্লিখিত হইল। দিগম্বরী সম্প্রদায়েরও এইরূপ দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। তবে দিগম্বরী সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য ও [illegible] বৈভব শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় অপেক্ষা অল্প বলিয়া বোধ হইল কিন্তু দিগম্বরী [illegible] ধর্ম্মশালায় তীর্থ যাত্রী অনেক অধিক দেখিয়াছিলাম। ইহাদের মন্দির

সংখ্যা পাঁচ ছয়টির অধিক না হইলেও প্রত্যেক মন্দিরের পুরোভাগে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে মালা লইয়া জপ করিতে দেখিয়াছিলাম।

শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দির গাত্রে কোন পৌরাণিক ছবি দেখিতে পাইলাম না। কাছারি ঘরে একখানি পৌরাণিক ছবি দেখিতে পাইয়াছিলাম। পাঁচটি সাধুশীলা তপস্বিনী মূর্ত্তি আকুল ভাবে ভগবানের প্রার্থনাপরায়ণা। কিন্তু দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলির পুরোগাত্রে অনেকগুলি ছবি দেখিলাম। ছবিগুলি কাগজে আঁকাইয়া কাচাধারে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। কোনখানি আবু পাহাড়স্থ গির্ণার পাহাড়ের ছবি। এখানে তীর্থঙ্কর নেমিনাথ দেব নির্ব্বাণ-পদ লাভ করেন। কোনখানি পরেশ নাথ পাহাড়ের ছবি। কোনখানি গজকুমারের ছবি। একখানি ছবিতে নীলরঙ্গে রঞ্জিত একটি সুবৃহৎ সংসার-বৃক্ষ। বৃক্ষ হইতে একটি সুপুরুষ (কাম-কলসে করিয়া) মদিরা বর্ষণ করিতেছে। কতকগুলি নরনারী একান্ত উৎসুক নেত্রে তৎপানাশায় বৃক্ষমূলে সমবেত হইয়াছে। কতকগুলি ছবি দেখিলাম তাহার নিচে ইংরাজিতে লেখা আছে;— 1. Grand Temple of Jarangajee Hill. 2. The View of Shatrunjee River. 3. The Temple of Shree Kesharinathjee. 4. The First Tank of the Girnar Hills. 5. The foot of the Shatrunjaya Hill. এই সমস্ত পৌরাণিক ছবিগুলির সহিত তীর্থঙ্করগণের স্মৃতি বিশেষরূপে জড়িত আছে।

পরেশনাথ পাহাড়ের নাম সুমেত শেখর। এই পাহাড় ঊর্দ্ধে পঞ্চ সহস্র ফুট! ইহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথ দেব নির্ব্বাণ পদ-প্রাপ্ত হন। এই পাহাড়ের অন্যান্য শিখর দেশে আরও উনিশ জন তীর্থঙ্কর মোক্ষ লাভ করেন। চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অষ্টাপদ পর্ব্বতে (কৈলাসে) মোক্ষলাভ করেন। সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর পাওয়াপুরীতে নির্ব্বাণলাভ করেন। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ রাজপুতনায় আবু পাহাড়স্থ গির্ণারে নির্ব্বাণলাভ করেন এবং তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য চম্পাপুরীতে নির্ব্বাণলাভ করেন। চম্পাপুরী বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত।

নেমিনাথের পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দেব। ইনি নেমিনাথের সহস্র বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে জৈনদিগের আচার পদ্ধতি, দর্শন, জ্ঞান, অবিশুদ্ধ ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। পার্শ্বনাথ দেব জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্র ও তপস্যা প্রভাবে সিদ্ধত্বলাভ করেন এবং জৈনদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া

দেন। পার্শ্বনাথ দেব ইক্ষাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বারানসী নগরের সন্নিকটস্থ ভেলুপুরী ইহার জন্মস্থান। ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অহিংসা, তপস্যা, দান, শীল ও ভাবনা দ্বারা দিনাতিপাত করিতেন ও কঠোর তপস্যা করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার তপশ্চরণকালে মায়া তাঁহাকে একাগ্রভূমি হইতে পাতিত করিবার জন্য বহুবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। অবশেষে প্রচুর বর্ষণ আরম্ভ হইল। অবিরাম বারিপাত, বিকটাকার শিখরাংশসমূহ স্থানচ্যুত হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিজলি লেখা, মুহুর্ম্মুহু অশনি সম্পাত। সমস্ত পর্ব্বত যেন বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যোগী কিন্তু অচল অটল। জৈনজাতকে কথিত আছে যে, পার্শ্বনাথ দেবের তপশ্চরণে মুগ্ধ হইয়া অনন্তশক্তি বাসুকী স্বীয় মস্তকরাজি তাঁহার শিরোভাগে ছত্ররূপে স্থাপন করতঃ তাঁহাকে প্রবল বারিপাত হইতে রক্ষা করেন। সেইজন্য আজও পার্শ্বনাথ দেবের মস্তকোপরি ফণা চিহ্ন বিদ্যমান।

এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথ দেবের মন্দির। আরও চব্বিশটি মন্দির আছে। পার্শ্বনাথদেবের মন্দির মধুবন হইতে তিন ক্রোশ দূর। পরেশনাথ পাহাড়ের উপর পঁচিশটি মন্দির পরিভ্রমণ করিতে হইলে তিন ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে হয়। অবরোহণের সময়ও তিন ক্রোশ। এই নয় ক্রোশ পথ আরোহণ, ভ্রমণ ও অবরোহণ বড়ই দুরূহ। এই নয় ক্রোশ পথের ভ্রমণ ক্লেশ পরিহারের জন্য ডুলি পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপর সমস্ত মন্দিরগুলি দর্শন করাইবার জন্য ডুলির শুল্ক তিন টাকার অধিক হইবে না। প্রত্যুষে যাত্রা করিলে এই নয় ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে নয় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। যাঁহারা ভ্রমণপটু নহেন তাঁহারা যেন এই দারুণ চড়াই উৎরাই পদব্রজে ভ্রমণ করিতে সাহস না করেন। বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন এই চারিমাস পর্ব্বতারোহণের প্রশস্ত সময় এবং অধিকাংশ যাত্রীই এই সময়ে পরেশনাথ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

অতি প্রত্যুষে স্নানাহার সমাপন করতঃ ১লা মাঘ দুইটা পয়তাল্লিশ মিনিটের সময় মধুবন হইতে চড়াই উঠিতে আরম্ভ করি। সাতটা কুড়ি-মিনিটের সময় অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ মিনিটে দুই হাজার ফিট ঊর্দ্ধে 'করিকা' নামে একটি পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলাম। ইহা খানিকটা সমতল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকে শ্যামল শস্যরাজী। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু আবাস-ভূমি। ক্ষেত্রজাত শস্যই পল্লীবাসীগণের জীবিকা। কুক্কুট ও বরাহ তাহাদের

গৃহপালিত জন্তু। তাহারা কাহারও খাজনা দেয় না। তাহাদের মলিন-বেশ সরল বালকবালিকাগুলি পথিক দেখিলে কাছে আসিয়া একটি পয়সার প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করে। পাইলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা আসিয়া পথিপার্শ্বে অঞ্চল বিছায়। একটি পয়সা, একটি আধ্‌লা একমুষ্টি ভুট্টা পাইলে ইহারা আকাশের চাঁদ করতলস্থ বিবেচনা করে। ইহাদের মর্ম্মবেদনা, ইহাদের নীরব অশ্রুপতন, দুর্ভিক্ষক্লেশবার্ত্তার সংবাদ যদি আমরা সংগ্রহ করি তাহা হইলে আমাদের তীর্থগমনক্লেশ সার্থক হয়।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পাহাড়ীদিগের ও হাজারিবাগ জেলার আদিম অধিবাসীদিগের (ইহারা আপনাদিগকে সাঁওতাল হইতে পৃথক বলে) একটি মহোৎসবের দিন। এই দিন তাহারা নৃত্যগীত, উৎসব, যাত্রা ও গানাদি করিয়া কাটাইয়া দেয়। বালক যুবক, প্রৌঢ় সকলে মিলিয়া দলে দলে তীর ধনুক, বর্শা, কুঠার ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া শীকারে বহির্গত হয়। এক এক বনের এক এক প্রদেশ ঘিরিয়া ফেলে। ইহাদের মধ্যে একজন মর্দ্দলধ্বনি করিতে থাকে। সেই শব্দে পশুগণ চঞ্চল হইয়া ইতস্তত গমন করিতে দেখিলে তখন তাহার অস্ত্র দ্বারা পশুশীকারে প্রবৃত্ত হয়।

পরেশনাথ পাহাড়ের সমীপস্থ পল্লীবাসীগণ পৌষসংক্রান্তিকে আরও একটি বিশেষ কারণে আমোদের দিন বলিয়া বিবেচনা করে। মধুবন হইতে দুই ক্রোশ দূরে (পালগঞ্জের নিকট) চম্পাপুরী নামে এক পল্লী আছে। এই গ্রামে বরাকরের রাজা এক সুপ্রসিদ্ধ মেলা বসাইয়া থাকেন। এই মেলা পাহাড়ীদিগের বড়ই আদরের জিনিষ।

করিকা গ্রাম হইতে কিছুদূর উতরাই নামিলেই পরেশনাথের চা' সম্পত্তি দেখা যায়। এখানে বিস্তৃত সমতলভূমির উপর বহু স্থান ব্যাপিয়া চা'র চাষ করা হইয়া থাকে।

২৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত ফিট উর্দ্ধে 'গঙ্গানালা' নামক একটি প্রস্রবণের নিকট বেলা আটটার সময় উপস্থিত হইলাম। এখানে অতিথি-দিগের বিশ্রামের জন্য একটি স্থান আছে। ইহার কিছু উর্দ্ধে গমন করিলেই দুইটি রাস্তা পাওয়া যায়। দক্ষিণদিকের রাস্তাটি বরাবর পরেশনাথ শৃঙ্গে উঠিয়াছে। বামদিকের রাস্তাটি সীতানালারদিকে গিয়াছে। সীতানালাও একটি প্রস্রবণ। এই দুই প্রস্রবণের জল স্বচ্ছ হইলেও বৃক্ষ সমূহের পত্র-রাজি উহাতে নিত্য পচিতে থাকে বলিয়া উহা পেয় নহে।

সীতানালা হইতে 'জলমন্দির' অধিক দূর নহে। জলমন্দিরে পার্শ্বনাথ-দেবের দেহ ভস্ম রক্ষিত আছে। এই মন্দিরের নিকট একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ও আর একটি শীতল প্রস্রবণ আছে। এই দুইটি প্রস্রবণ থাকায় ইহার নাম জলমন্দির হইয়াছে। এই মন্দির জগৎশেঠ মাণিক চন্দ্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ধনাঢ্য শেঠ মন্দিরে যাইবার জন্য পরেশনাথ পাহাড়ের বহু স্থানে বহু সহস্র ইষ্টক নির্ম্মিত সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

জলমন্দিরটি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠটি বড়। আর দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। তিনটি প্রকোষ্ঠে সুন্দর প্রস্তরময় দেবতা মূর্ত্তি। সম্মুখের প্রকোষ্ঠে পাঁচটি প্রতিমূর্ত্তি। ইহার মধ্যস্থ প্রধান পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে খোদিত ও মূল্যবান উচ্চ মর্ম্মরবেদীর উপর সংরক্ষিত।

আমরা প্রথমে পার্শ্বনাথদেবের সর্ব্বোচ্চ মন্দির দর্শন করিয়া বেলা এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় জলমন্দিরে উপস্থিত হই। সেদিন ১লা মাঘ বলিয়া পাহাড়ীরা অতি উৎসাহের সহিত জলমন্দিরে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের উৎসব দেখিবার জন্য ও তাহাদিগকে দেবদেবীমূর্ত্তি দর্শন করাইবার জন্য পাণ্ডারা অতি প্রত্যূষে মধুবন হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাহাড়ীদিগের সজীবতা-পূর্ণ আলাপ পরিচয়, হাস্য কৌতুক, দর্শকদিগকে বেশ সজীবতা প্রদান করে। দেবতা দর্শনে জৈন পাণ্ডাদিগের কোনরূপ অত্যাচার নাই। কেহ ধান্য শিষ দিয়া, কেহ বা আমলকী দিয়া দেবতা দর্শন করিতেছে। পাহাড়ীরা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও ইহারাও পরেশনাথ পাহাড়স্থ মন্দিরের দেবতাগুলিকে পূজা করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিকট আপনাদিগের মনোভিলাষ প্রার্থনা করে।

জলমন্দির হইতে পার্শ্বনাথ মন্দিরে যাইতে হইলে এক ক্রোশ উর্দ্ধাভিমুখে আরোহণ করি। সুতরাং গাঙ্গানালার কিছু উর্দ্ধে যে দুইটি রাস্তার কথা বলা হইয়াছে তাহার দক্ষিণদিকস্থ রাস্তা দিয়া আমরা চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা আটটার সময় আমরা তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে উপস্থিত হইলাম। বেলা আটটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় তিন হাজার পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে, বেলা সওয়া নটার সময় চার হাজার তিন শত পঞ্চাশ ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম। এইস্থানে একটি ডাকবাংলা আছে। এখানে একটি পারসী ভদ্রলোক স্ত্রীকন্যাসমভি-ব্যাহারে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন সুখে দিনযাপন করিতেছেন। এই স্থানে একখানি ফলকলিপি বর্ত্তমান আছে। লাট বাহাদুরের এই ব্যবস্থা লিপিতে

লিখিত হইয়াছে যে জৈন, বৌদ্ধ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ভিন্ন চার হাজার পঞ্চাশ ফিট ঊর্দ্ধ স্থানে যে পাঁচটি মন্দির আছে, অন্য কোন জাতির পক্ষে সেই সকল স্থানে গমন, দর্শন, স্পর্শাদি নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সুমেতশিখর অতি পবিত্র চক্ষে দর্শন করেন। এখান হইতে কতকটা দূর ন্যূনাধিক দুই হস্ত প্রশস্ত ক্রমোচ্চ পিচ্ছিল রাস্তার এক দিকে প্রায় চার শত ফিট উচ্চ পাহাড় আর অন্যদিকে অনুমান তিন হাজার ফিট গহ্বরাকার স্থান এইরূপ ভাবে চলিয়াছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পদতল শিহরিয়া উঠে। মৃত্যুভয় জিনিষটা কি বুঝাইয়া দেয়। এক একবার ইচ্ছা হয় সেই সুগভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কে যেন আমাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন, 'Man has a fascination for death' বেলা নয়টা পঞ্চাশ মিনিটের সময় আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উপনীত হইলাম! ধরিতে গেলে আমরা তিন ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলাম। এই শৃঙ্গের উপর আশিটি সিঁড়ির উপর পার্শ্বনাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পার্শ্বনাথদেবের চরণরেণু এই মন্দির মধ্যে প্রায় তিন ফুট উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদীর মধ্যে সংরক্ষিত। বেদীর উপরে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত প্রস্তরাঙ্কিত চরণদ্বয়ের উপর তিনটি মণিমাণিক্য খচিত সুবর্ণালঙ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবছত্র শোভা পাইতেছে। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সুশীতল প্রস্তর স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে বিগ্রহের মূর্ত্তি উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একভাগে উপাসকগণের ধ্যান ধারণা ও বিশ্রামের স্থান। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার জন্য একটি বারান্দা আছে। পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করা যায় তখন প্রকৃতই জীবন সার্থক বোধ হয়। সেই উচ্চস্থান হইতে পৃথিবীতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে উচ্চ অনুচ্চ সমস্ত ভূমিই সমান বলিয়া বোধ হয়। আর বোধ হয় যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তিনি না জানি কত মহান্। সেই স্নিগ্ধ শীতল মন্দিরে প্রাণ মন সুশীতল করিয়া একবার সেই সুমহান্ ভাবের ধারণা করিলে কাহার না চিত্তপ্রসাদ জন্মিয়া থাকে? একবার সেই মন্দির মধ্যে বসিয়া পূর্ব্বেকার প্রিয় স্মৃতিগুলি স্মরণ করিয়া লইলাম। তিন চার দণ্ড সেখানে বিশ্রাম করিলে যেন এক অভিনব স্বর্গে আছি

বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের মধ্যে ভক্তগণ অনেকে পার্শ্বনাথদেবের ও অন্যান্য তীর্থঙ্করগণের স্তব গান করিতেছেন। কেহ বা আমলক, কেহ বা খাদ্যশীর্ষ এবং অত্যন্ন লোকেই পয়সা দিয়া ভগবানকে প্রণাম করিতেছেন। সেই মন্দির মধ্যে কিছুক্ষণ বসিলেই সংসারতাপীর সমস্ত জ্বালা দূর হইয়া যায়।

মন্দিরটি কলিকাতার রত্নব্যবসায়ী বদরি দাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্দির ১৩০২ সালে নির্ম্মাণ হইয়াছে। জৈনগণ পার্শ্বনাথ দর্শন কালে পরেশনাথ পাহাড়ের উপর থুথু ফেলেন না, মলমূত্র ত্যাগ করেন না ও জুতা পায়ে দিয়া ইহার উপর উঠেন না।

পরেশনাথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গস্থ পার্শ্বনাথদেবের মন্দির ছাড়া আরও চব্বিশটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির আছে। ইহার মধ্যে উনিশটি মন্দির উনিশজন তীর্থঙ্করের নির্ব্বাণ স্থানে নির্ম্মাণ হইয়াছে। ঋষভদেব, বাসপূজ্য, নেমিনাথ ও মহাবীর পরেশনাথ পাহাড়ের উপর তাঁহাদের নির্ব্বাণ লাভ না ঘটিলেও এখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে চারিটি মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

পরেশনাথ পাহাড়টি দেখিতেও সুন্দর। নানাবিধ অত্যুচ্চ বিশালবৃক্ষ সমূহ সরলভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়া পর্ব্বতের মহামহিমভাব আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। বনভূমি সতত্ই সুমধুর পক্ষীকূজনে মুখরিত ও দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত। পাহাড়টি স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপযুক্ত আবাসভূমি। ছোটলাট বাহাদুর এই পর্ব্বতের উপর স্বাস্থ্যাবাস মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু জৈন-ধর্ম্মাবলম্বীগণ আপত্তি উত্থাপিত করায় পাহাড়ের উপর স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ আজ্ঞা রহিত হইয়াছে। পর্ব্বতের দৃশ্য বেশ সুন্দর। পৌষ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের উপর মেঘ ও বায়ুপ্রভাব কম।

'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা।' তীর্থঙ্করেরা যে মহাজন বা অবতার স্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জৈনগণ চব্বিশ জন তীর্থঙ্করকে অবতার রূপে স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করেন। জৈনধর্ম্মের মধ্যে জানিবার, বুঝিবার, ও শিখিবার বিষয় আছে। আমাও নিজের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির ধর্ম্ম বুঝিবার প্রয়োজন। সেই হিসাবে ও হিন্দু ধর্ম্ম কি বুঝিতে হইলে ভারতের ও অন্যান্য দেশের ধর্ম্মসমূহ আলোচনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিন্দু যদি জৈনধর্ম্ম আলোচনায় নিজেকে অভিজ্ঞ ও পরিতৃপ্ত করিতে চান তাহা হইলে পরেশনাথ পরিক্রমণাশা পরিপূরণে প্রয়াস হইবেন। তীর্থঙ্করগণ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

জেলেখা ।

(মাধবী কঙ্কণ)

স্ত্রীস্বভাবসুলভ দয়া কোমলতাদি, অন্তরের অন্তরে সঞ্চিত অনন্ত প্রেম ও তাতার দেশীয় প্রতিহিংসানিচয়-সমন্বিত উগ্র মনোবৃত্তি, এই তিন ধর্ম্ম লইয়া জেলেখা-চরিত্র অঙ্কিত।

প্রথম দর্শনে মনে হয়, বুঝি জেলেখা প্রেমলালসায় পর্য্যবসিত; বুঝি তাহার নরেন্দ্রের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বিকৃতি ! বুঝি তাহার উগ্র প্রবৃত্তি, প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের ভীষণ দুর্দ্দমনীয় প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু একটু গভীর মনোযোগের সহিত দেখিলে মনে হয় যে, জেলেখা-হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে প্রেম অনন্ত, অপরিমেয়;—পরে দেশ কাল পাত্র ও রুচিভেদে কোথাও বা স্ত্রীস্বভাবসুলভ দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সাজে, কোথাও বা দারুণ তৃষায়—উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষায়,—আবার কোথাও বা তাতার দেশীয় প্রতিহিংসাদি উগ্র প্রবৃত্তিতে সজ্জিত, পরিণত ও বিকৃত হইয়া তাহার নিজের অস্তিত্বের সহিত অনন্তে বিলীন হইয়া গেল !

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে এই প্রেমের উৎপত্তি, কিরূপে ইহার পরিপুষ্টি এবং কিরূপেই বা ইহার পরিণতি বা অবসাদ !

প্রধানত জেলেখা-চরিত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত।

১ম—নীরব প্রেম, নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রেমবীজ রোপন,—প্রেমের পরিপুষ্টি, বিচার ও মুক্তি।

২য়—প্রেমের পরিব্যাপ্তি—প্রেমিকা জেলেখা দেওয়ানা।

৩য়—হৃদয়ে প্রতিহিংসার উদ্রেক, স্বার্থসিদ্ধির উপায়ানুসন্ধান; উপায় প্রয়োগ—তাহার বিফলতা।

৪র্থ—প্রতিশোধ-বৃত্তি চরিতার্থতা—মৃত্যু।

প্রথম অধ্যায়।

জেলেখার প্রেমোৎপত্তি জেলেখার পত্রে প্রকাশ। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে প্রেমের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা

যাউক। প্রথমত—আমরা দেখিতে পাই যে, এক সুরম্য হর্ম্ম্যে কারুকার্য্য-খচিত রত্নাভরণ-পারিপাট্যের মধ্যে তিনটি জীবের অস্তিত্ব বর্ত্তমান।

১। পীড়িত প্রপীড়িত অর্দ্ধচেতন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নরেন্দ্রনাথ।

২। এক সুন্দরী তম্বঙ্গী যুবতী—বেশে যবনী, লালিত্যে, মাধুর্য্যে ও কমনীয়তায় অনুপমা, স্বর্গীয় 'পরী'জন-বাঞ্ছিত রূপযৌবনসম্পন্না জেলেখা।

৩। এক যবন খোজা—মসরুর।

"দুর্গেশনন্দিনী"র রুগ্ন শয্যা মনে পড়িল। কুমার জগৎসিংহকে মনে পড়িল; ওসমানকে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল—প্রভাতের স্থলপদ্মস্বরূপা সুন্দরী নবাব-নন্দিনী আয়েসাকে। আরো অধিক অনুসন্ধিৎসুচিত্তে পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম—"যবন-কন্যার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গিতে যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে।" কই?—আয়েসার চরিত্রে তেজ বা দর্প কিছুই নাই—তবে নবাবপুত্রীর উপযুক্ত হৃদয়ের নাতিকোমল নাতিকঠোর এক মহান্ ভাবের সমষ্টি বর্ত্তমান। আয়েসার একটিমাত্র উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা—"ওসমান, আবশ্যক হয় কল্য পিতার সমক্ষে বলিব তোমার সেজন্য চিন্তা নাই।"

এখানে পড়িলাম,—"যবন-কন্যা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্নভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে লজ্জার সহিত কথা কহিতেছে।" ক্রমে বুঝিলাম এই হিন্দুর ও জেলেখার সর্ব্বনাশ করিতে মসরুর উদ্যত। জেলেখা কাতরকণ্ঠে বলিতেছে,—"সে আমার দোষ, ইহার কি দোস? ইনি ত নির্দ্দোষী।"

পাঠক, ইহাই প্রেম-বিদগ্ধচেতসার ভাবান্তরে প্রেমব্যক্তি। হৃদয়ের প্রত্যেক তারে আঘাত কর শুনিবে—"আমি মরি তায় ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক।" প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার দাও—শুনিবে সব এক সুরে বাঁধা!

জেলেখার কথা শুনিয়া মসরুর কহিল—"এত মায়া কিসের জন্য? এ কাফের কি তোমার আসেক?"

'জেলেখা যোদ্ধ্-কন্যা, সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল; রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইল; সক্রোধে বলিল,—"মসরুর! যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে, তাহা হইলে মায়ার কাতরতা [illegible], যদি পুরুষ হইতে, তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত। তোমার পুরুষের

সহিত দয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।"

সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে জেলেখার পার্থক্য হৃদয়ের এই দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে প্রকাশিত। অপর কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধোন্মত্ত না হইয়া কৌশলান্তরে স্বার্থসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিত, অথবা আয়েসার ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীরে হৃদয়ের মহান্ ভাব প্রকাশ করিত! কিন্তু জেলেখা সে উপাদানে গঠিত নহে। প্রথমে প্রণয়-পাত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় হৃদয়ের ক্রোধ-বৃত্তি, রুক্ষ-বৃত্তি কিঞ্চিৎ শমিত কিঞ্চিৎ দমিত হইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। তর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রোধ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই ক্রোধ, এই রুক্ষতা তাহার স্বর্গীয় প্রেম-ছবিকে লালসার কৃত্রিমতায় আমাদের চক্ষে বিকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছে! এক্ষণে দেখা যাউক জেলেখা নিজে এই ক্রোধোৎপত্তি সম্বন্ধে কতদূর দায়ী।

প্রথমত, জেলেখা তাতার দেশীয়া। তজ্জন্য স্বাভাবিক উগ্রতা তাহার একটি বৃত্তি। ইহার উপর সাহেব-বেগম সেই উগ্রতাকে প্রশ্রয় দিতেন। এই দ্বিবিধ কারণে ক্রোধের আতিশয্য এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রেমের প্রাবল্যে ক্ষণিক কথঞ্চিৎ নম্রতা প্রাপ্ত হইলেও মজ্জায়-মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে লুক্কায়িত থাকিয়া অল্প ঘর্ষণেই জ্বলিয়া উঠিত। অপিচ, এই ক্রোধ না থাকিলে জেলেখাকে—সম্পূর্ণ না হউক কতকাংশে আয়েসার তুল্য দেখিতে পাইতাম।

এখন জেলেখার ব্যবহার আরো পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক।

নরেন্দ্র বলিলেন,—"আমি অসহায় ও নিরাশ্রয়। আমি কোথায় আছি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" জেলেখা উত্তর না দিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্র তাহার উজ্জ্বল গণ্ডে যেন দুই বিন্দু অশ্রু দেখিতে পাইলেন।

এইরূপে কলহে, আবেগে জেলেখা প্রেমের নিদর্শন ভাবান্তরে দেখাইয়া, কাতর হৃদয়ের সহানুভূতিকে প্রেমের রঙে অতি নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত করিয়া, জগৎসিংহের কারাগৃহের নীরব রোদনটুকু আমাদের স্মরণ করাইয়া দিল।

বিচার।—বিচারের কারণ নির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন। তবে বিচারের মনোহর উপক্রমণিকাটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কোনো ঝটিকা

উত্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়টি কেমন নির্ব্বাত নিষ্কম্প, এক প্রশান্ত-ভাব-পূর্ণ হয়, মাধবীকঙ্কণে বিচারের পূর্ব্বক্ষণটি ঠিক সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে অঙ্কিত!

নরেন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন। চিন্তাস্রোত মথিত করিয়া যেন ভাগ্যবিণী তাঁহার মনশ্চক্ষু হইতে দৈহিক চক্ষু-সমীপে সমুদ্ভাসিত। কিন্তু এ জেলেখা সে জেলেখা নয়। সে উগ্রস্বভাবা তেজঃপরিপূর্ণা, জাতদর্পা যে আজ আলু-লায়িতকুন্তলা, বিবর্ণা, পাণ্ডুবর্ণা, নিঃশব্দা জেলেখার জীবন্ত ছবি! নরেন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তখনো জানিতে পারিলেন না যে, সেদিন উভয়ের বিচার।

এই স্থানে জেলেখাকে গ্রন্থকার নিঃশব্দা করিয়া আশ্চর্য্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কারণ, প্রথমত জেলেখা নরেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী, ইহার উপর কার্য্য-কারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরা। নরেন্দ্রের এই প্রকার অবস্থা তাঁহার স্বকৃত। যবনীর প্রাণ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল। বাক্য-স্ফূর্ত্তি না করিয়া ধীরে ধীরে অশ্রু মোচন পূর্ব্বক সে চলিয়া গেল। এই স্থানে অশ্রু মোচনের অর্থ দ্বিবিধ;—১। নরেন্দ্রের অমঙ্গলাশঙ্কা ও আত্মকৃতাপরাধ-জনিত অনুতপ্ত হৃদয়ের অসহনীয় যাতনা। ২। একটি মহা ব্যাপারের পূর্ব্ব-লক্ষণ, এক প্রকার প্রশান্ত ভাবের নিদর্শন।

বিচারে জেলেখার রুক্ষ বৃত্তির বহু পরিমাণে হ্রাস দেখিতে পাই। বন্দিনী রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে।

বস্তুত এই অবস্থায় পড়িলে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী রমণী মান, অভিমান, অহঙ্কার এমন কি আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে। এইবার একবার আমরা জেলেখার পত্রখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করি।

"জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ!" প্রিয়তমের অমঙ্গলাশঙ্কায় নারীর প্রাণ তো প্রথমেই কাঁদিয়া উঠে। ইহার উপর আশার আশ্বাস—"তোমার সুন্দর-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব।" আবার ভাগ্যবিণী অপরাধিনী, প্রতিপালিকা সম্রাজ্ঞী বেগম সাহেবার সম্মুখে আনীতা। অভিমানিনী যে [illegible]স্থলে অভিমান দর্প তেজ ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! [illegible] স্থানে বেগমের প্রতি জেলেখার হৃদয়-ভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য।

সম্ভবত জেলেখা বেগম সাহেবকে কথঞ্চিৎ ভয় ও কথঞ্চিৎ ভক্তিও করিত। বেগম জেলেখাকে স্নেহ করিতেন। রমণী-হৃদয় তাহার কিছু না কিছু প্রতিদান না দিয়া থাকিতে পারে না।

"সাহজাদি! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বাঁদী, আমার স্বাধীনতা নাই, সেইজন্য আমার পাপের দণ্ড দিলে। কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাজদুহিতা, আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?" জেলেখার পত্রের এই অংশের ভাষা ও ভাব যেন কারুণ্য এবং আবেগে বিজড়িত। যেন প্রিয় বেগম এরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন, ইহা তাহার ধারণার অতীত। ইহাতে ক্রোধের ভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা মানসিক বৈকল্যে দুই একটি বেদনাসূচক সম্বোধন মাত্র। এই ভয়, ভক্তি ও প্রিয়তমের অমঙ্গলাশঙ্কায় বেগমের নিকট জেলেখা অবনতমুখী, কাতরা ও কৃপাপ্রার্থিনী।

কারাগৃহের অন্ধকারে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী করুণ রোদনের সহিত জেলেখা-জীবনের নীরব প্রেমের অধ্যায় শেষ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জেলেখা দেওয়ানা।

জেলেখা এ অবস্থায় আত্মপ্রেম মুক্তকণ্ঠে নরেন্দ্রের সম্মুখে প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু জেলেখা যে তাহার প্রতি অনুরাগিনী, ইহা দেওয়ানা সাজিয়া বলিয়াছে। সেইজন্য এই অধ্যায়কে "নীরব প্রেম" শীর্ষক অধ্যায়ের ভিতর আনা যায় না। এই অবস্থাটি উহার জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী। প্রেমিকা প্রেমের আবেগে কতদূর পর্য্যন্ত আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পারে, দেওয়ানা তাতারিণী তাহার একটি উজ্জ্বল ছবি।

জেলেখা কি বলিতেছে শ্রবণ করুন ;—

কি কৌশলে সেই রাত্রে আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই তুমি সৈনিকবেশে দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষ-বেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব, এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই; দিবা রাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের

স্থায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি।” ইত্যাদি। এই গভীর কাতরোক্তি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; তথাপি ইহাতে একটি তর্ক উঠিতে পারে। জেলেখা বলিতেছে—“নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই।”

বোধ হয় জেলেখা স্ত্রীস্বভাবসুলভ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিজের হৃদয় ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। উৎকৃষ্টরূপে সমালোচনা করিয়া দেখিলে সে দেখিতে পাইত যে, নরেন্দ্রের আশায়—নরেন্দ্র-প্রাপ্তির বাসনায় তাহার হৃদয় নাচিত, উঠিত, উত্তেজিত হইত। আবার তাহার অপ্সরা-কণ্ঠ-বিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীতের সুরে, মূর্চ্ছনায়, দমকে দমকে তাহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে নরেন্দ্রকে পাইবার আশা কাতর করুণভাবে ব্যক্ত হইত!

“তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের স্থায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব” ইত্যাদি স্থিতি, দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাগুলি মিলনাকাঙ্ক্ষার এক একটি সোপান। উচ্চতম শিখরে উঠিবার এক একটি শাখা প্রশাখা।

এই ভাব বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

জেলেখার দেওয়ানা অবস্থাটি তিনটি বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে।

১। দিল্লী—এখানকার সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই।

২। সিপ্রাতীর—যশোবন্ত শিবির।

এইস্থানে নরেন্দ্রের সুমোহন স্বপ্ন স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তিত হইল। ভাগীরথী-কল্লোল, রমণী-কণ্ঠ-বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত-লহরীতে পরিবর্ত্তিত হইল!

সেই গীত বড় দুঃখের গীত। জেলেখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—অতএব রহিয়া রহিয়া প্রেমের আবেগে হৃদয়ের আত্ম-কথা সুরে বিবৃত করিতেছে। আজ সে রত্নরাজিভূষিত কেশপাশ লুকাইয়া, রত্নাভরণ-পারিপাট্য দূরে রাখিয়া তাতার-বালক-সাজে সজ্জিত হইয়াছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, এ তাহার গান। গান শুনিতে [illegible] নরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আরো আবেশে শুনিলেন, ‘রত্নপুর [illegible]

সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে।'

সপ্তস্বরের আরোহণ অবরোহণে সুরের গতি ঐরূপই হইয়া থাকে। এই গতি বিভিন্ন করিবার জন্য মূর্চ্ছনা, গমক, স্থিতি, অবস্থিতি ইত্যাদি ভেদে সুর সঙ্গীত বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী এক একটি রূপ মনশ্চক্ষে আনিয়া দেয়। বস্তুত কবি বড়ই চতুর, বড়ই স্বভাবানুশীলক।

নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা কাতর হৃদয় বুঝিল,—'নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোনো গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয় আমাকে বল. আমি তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। মন খুলিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা বল।" বালক একদৃষ্টে নরেন্দ্রের দিকে চহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল' কারণ নরেন্দ্র বলিয়াছেন, তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। ইহা প্রায় সকলেরই ঘটে যে, যখন আমাদের প্রণয়াস্পদ অন্তরের যাতনা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিতে থাকে, যখন সস্নেহ প্রিয় সম্বোধনে হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দেয়, যখন আদরে কাতরে হৃদয়ের সমবেদনায় প্রণয়-কুসুম-বনে বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গের অস্তিত্ব দেখায়, তখন বিষাদ-কালিমা-মাখা আমাদের হৃদয়গুলি আলোড়িত হইয়া উঠে, হৃদয়ের প্রত্যেক হাবভাব মথিত হয়। কিন্তু পরেই সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকৃত করে। মনে ভয় হয়—বুঝি সে আমার, আমার নয়! জেলেখার সেই অবস্থা। সে হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া কহিল,—"মার্জ্জনা করুন, আমি দেওয়ানা—যখন যাহা মনে আসে তখন তাহাই গান করি।" একবার মনে হয় হৃদয় খুলিয়া, ব্যথা জানাইয়া পদতলে লুটিয়া প্রাণ জুড়াই। পরক্ষণেই সন্দেহ-মিশ্রিত কি এক অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া রসনা চাপিয়া ধরিতে লাগিল। বালক ফকিরী গ্রহণের কারণের একমাত্র উত্তর দিল—"আমি দেওয়ানা।"

এই ঘটনাটির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের বাপীতটে নগেন্দ্রনাথ এবং কুন্দনন্দিনীর উত্তর "না" প্রায় সমতুল। প্রভেদ এই যে, নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি আসক্ত।

৩। রাজস্থান—উদয়পুর।

দেওয়ানা নিত্যই প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত। দিল্লী হইতে সিপ্রাতীর, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থান ভ্রমণে তাহার সুখ কি দুঃখ? বোধ হয়, তাহার

সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ, তাহার ক্রন্দনে হাসি, হাসিতে ক্রন্দন। সংসর্গে হৃদয়-ভার কমিত, আবার আকাঙ্ক্ষা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। দেওয়ানা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত।

উদয়পুরের হ্রদের চিত্রটি অতি মনোরম।—ভাবুক-হৃদয়গ্রাহী ও কবি-কল্পনা-প্রসূত ভাবময়। প্রথমত নৈসর্গিক বর্ণনা অতি স্বাভাবিক। অতএব সুন্দর।

শান্ত সান্ধ্য গগন নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ, পর্ব্বতমালা—নির্ম্মল শব্দশূন্য হ্রদ—তাহার উপর ভাসমানা বাহিত্রী—উপরে ভ্রান্তপ্রণয় নরনারী—একে অপরের পার্শ্বে রহিয়াছে! কথনো বা নিদাঘ-সায়াহ্ন-সমীর দেওয়ানা-হৃদয়-নির্গত সুর-সঙ্গীতের লহরী তুলিতেছে, আর সেই সুমধুর স্বরে নৈশ হ্রদ, পর্ব্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে।

হৃদয়ের সুমোহন ভাব প্রকাশক মধুরে-বিষাদে-মাখা এ ছবি বড়ই কবিত্বময়। ইহার উপর গ্রন্থকারের আর এক কবিত্ব দেখাইতে চেষ্টা করা যাউক।

হৃদয়ের ভাবানুকরণ দ্বারা জড় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আরো উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ দৃশ্যে সে মাধুর্য্যেরও অভাব নাই।

১। গগন—পর্ব্বতমালা—হ্রদ—প্রকৃতিহৃদয় সব শান্ত, নিস্তব্ধ। প্রণয়ী যুগলের হৃদয়ের প্রত্যেক হাবভাব, হৃদয়ের প্রকৃত ছবি বিভ্রান্ত প্রণয়ে স্থির প্রশান্ত—গম্ভীর।

২। কাল—সন্ধ্যা। প্রণয়ী-প্রণয়িণীর হৃদয়ে আধো আশা আধো ভয়, আধো আলো আধো আঁধার।

৩। নিস্তব্ধ হ্রদে ভাসমান তরী। প্রশান্ত হৃদয়ে ঈষৎ আবেগময়ী আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে মৃদু হিল্লোল তুলিতেছে—হৃদয়ে আশার লহরী ছড়াইতেছে!

৪। জেলেখার গীতে হ্রদ, পর্ব্বতরাশি, আকাশমণ্ডল ভাসিয়া গেল! ভাতারিণীর অধিকতর আবেগ (কারণ নরেন্দ্র নিকটে) হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিল!

এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি। জেলেখা বলিয়াছে,—"নরেন্দ্র, ভালবাসিয়াছ। যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী, তাহাকেও আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তুমি প্রেমের জন্য দেওয়ানা হও নাই।"

উন্মত্ত প্রণয়িণী আত্ম-প্রেমের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিতেছে। নরেন্দ্রের শৈশবের অকৃত্রিম স্নেহের সহিত, বাল্যের বাল্যক্রীড়ার সহিত,

প্রথম জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গের সহিত যৌবনের মধুর, মধুরতম পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত বর্দ্ধিত প্রণয়-বীজ, দাহকারী প্রণয়-বীজ—যে তাহার হৃদয়ের এক একটি পঞ্জর ভাঙিয়াছে ও ভাঙিতেছে, তাহার সমস্ত না হউক কতকাংশ জেলেখা জানিত—তথাপি বলিতেছে,—"তুমি কখনও ভালবাসার জন্য দেওয়ানা হও নাই।"

জীবনে এমন অনেক ঘটনা উপস্থিত হয় যাহাতে মনে হয় যে, আমার ন্যায় হতভাগা পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যন্ত্রণার প্রবল আঘাতে আমার ন্যায় আর কাহারো হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই। আমার যাহা হইয়াছে তাহা যেন শীর্ষস্থানীয়, অতুলনীয়। অথচ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখি যে, বিধাতার রাজ্যে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সাধারণ শোক দুঃখ ও নিরাশ-প্রেম—এই তিন অবস্থায় মানবের হৃদয় এই ভাবে অভিভূত হয়। তাই, জেলেখা নরেন্দ্রের অপেক্ষা আত্ম-প্রণয়ের উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে চাহিতেছে।

ইহা তো গেল উভয়ের হৃদয়ের ভাব। আমাদের চক্ষে উভয়ের প্রেমের তারতম্য কিরূপ অনুভূত হয় তাহা দেখা যাউক। অবশ্য, উভয়েই তুল্য প্রেমে প্রেমিক সন্দেহ নাই। নরেন্দ্র-হৃদয় যে জেলেখার তুল্য প্রেমে আলোড়িত, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহার আবেগ সহনাতিশয্যে মৃদু বলিয়া বোধ হয়। জেলেখা তাতার দেশীয়া—প্রেম-চিন্তাকে হৃদয়ে পাতিয়া—হৃদয় দিয়া ঢাকিয়া—অন্তরের অন্তরে আর লুকাইতে পারে না; হৃদয়ের উৎস তাই স্বরে প্রকটিত করে। তাহার প্রেমে যেন অধিকতর মাদকতা বর্ত্তমান।

তাই কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস।"

চন্দ্রশেখরের প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম পর্য্যালোচনা করুন। প্রতাপের প্রেম শৈবলিনী অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক, কিন্তু সাধারণ চক্ষে, যাহাদের নিকট গূঢ় তত্ত্ব অবিদিত—শৈবলিনীর অনুরাগ প্রতাপ অপেক্ষা কত অধিক দেখায়!

জগৎসিংহ বলিয়াছেন,—"আমি মরিলে তোমার সখীকে একবার ভিন্ন দুইবার দেখিতে পাইলাম না,—এই জন্য শত্রু বধে খড়্গ তুলিয়াছি।" কিন্তু সাধারণ সৈনিক কে বলিবে যে, জগৎসিংহের হৃদয় প্রণয়-বিক্ষুব্ধ! বস্তুত পুরুষের প্রেম নারী-প্রেম অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন না হইলেও অবস্থা বিশেষে ন্যূন দেখায়।

নরেন্দ্রের বীরত্ব-প্রদর্শনের 'উপায়' আছে, মনোভিনিবেশের বিষয়ান্তর আছে, কার্য্যান্তরে রত হইবার আশু কর্ত্তব্য আছে—যাহা বীরের, পুরুষের বড় আদরের—বড় সাধের—বড় যত্নের, সেই কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত। জেলেখা—কাতরা জেলেখা—অপরিণতবুদ্ধি জেলেখা, জগতের বাধা বিঘ্নের অতি অল্পই তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। আর যাহা হইয়াছে, তাহা শৈশবাবস্থায় হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রেম লইয়া—আর কত সহ্য করিবে সে! সঙ্গীতে হৃদয়-ভার শমিত করিতে চেষ্টা করিল!

সিপ্রাতীরে যশোবন্ত-শিবিরে ও এই স্থানে—এই উদয়পুরের শান্তিপ্রদ হ্রদে—জেলেখার রীতি, পদ্ধতি, হৃদয়ের সুমোহন ভাব, নরেন্দ্রের প্রতি দাসীরূপে সেবা, তাহার উপর সান্ধ্য সমীরে প্রেমাত্মক সঙ্গীত-লহরী—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কে বলিবে যে, জেলেখার প্রণয় প্রেম-মূলক নয়? কে না বলিবে যে তেজ, দর্প, ক্রোধ সমস্ত শমিত হইয়া আসিয়া কেবল মধুর বিষাদে হৃদয় ভরিয়া আছে! কারণ লালসার স্থিতি এত দীর্ঘকালব্যাপী হয় না বা এত ভাবাত্মকও হয় না।

বোধ হয় হেমলতার কথা জানিতে না পারিলে জেলেখা-জীবন এই ভাবে অতিবাহিত হইতে পারিত! সেই মধুরে-বিষাদে—আশায়-নিরাশায়—সুখে-দুঃখে সোহাগের নরেন্দ্রকে দেখিয়া হৃদয় শান্ত করিতে পারিত। হৃদয়োত্থিত আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে বিলীন করিয়া 'মাধবী কঙ্কণে'র বুকে আর এক ছবি আঁকিতে পারিত! ফলকথা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নারী-জীবনে অভাবনীয় ঘটনা ঘটায়। কিন্তু তাহা পরে বলিব।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রতিহিংসা উদ্রেকের কারণ যে হেমলতা সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া ইহা সকলেই জানেন। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

এই অধ্যায়ে জেলেখার উগ্রতার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সে উগ্রতার ভিতরেও যে কত সংযম, কত সাবধানতা বর্ত্তমান তাহাও আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ পর্য্যায়ক্রমে তাহার হৃদয়ের ভাবগুলি দেখা যাউক।

যাহাকে এভাবে হৃদয় দান করিয়াছে তাহার হৃদয় হেমলতার আকৃষ্ট। [illegible] চেষ্টা—তখন হেমকে তাহার মন হইতে দূর করিয়া সেই

স্থান অধিকার করা। বোধ হয় তাতারিণী সাধ করিয়া ভাবিত যে, নরেন্দ্রও তাহার প্রেমে আকৃষ্ট। ক্রমে সন্দেহ-সঞ্চারিত গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল—এত দিনের পোষিত প্রেমের মূলে সহসা দুঃসহ আঘাত লাগিল। তথাপি তাহার চেষ্টা, হেমের পরিবর্ত্তে তাহার নরেন্দ্র-হৃদয় অধিকার করা। এ চিত্র অতি স্বাভাবিক, অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। জেলেখা স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা 'মাধবী কঙ্কণে'র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার সহিত নিম্নলিখিত কথাটি যোগ করিয়া লইবেন,—"নরেন্দ্র দেওয়ানার নিকট শুনিলেন যে, ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে কোনো এক গোস্বামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন।"

তাহার পর আমরা গুহা-মধ্যে বীণা-হস্তে ও খড়্গ-হস্তে জেলেখাকে দেখিতে পাই। বস্তুত এই দুইটি ঘটনা—নরেন্দ্রের সম্মুখে স্বপ্নময় সত্য অথবা সত্যময় স্বপ্ন—তাতারিণীর জীবনে, এমন কি মাধবী কঙ্কণের ভিতর সর্ব্বপ্রধান।

১। অবশ্য ইহারা যে হৃদয়-মন্থনকারী নাটকীয় রসোৎপাদনের পরাকাষ্ঠা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাপেক্ষা আরো কোনো অধিকতর আবশ্যক গূঢ়তত্ত্ব ইহার ভিতর নিহিত আছে।

২। জেলেখা-জীবনের শেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবার ইহারা যেন শেষস্তর (climax)। ইহার পর জীবন অন্যদিকে প্রধাবিত হইবে। অপিচ এই ঘটনা দুইটি না ঘটিলে 'মাধবী কঙ্কণে'র ছবিগুলি যেন একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইত।

৩। জেলেখার হৃদয় না পুড়িলে সে নরেন্দ্রের হৃদয় পোড়াইবার চেষ্টা করিত না। প্রত্যাখ্যান না পাইয়া নরেন্দ্রকে যমুনার জলে মাধবী কঙ্কণ ভাসাইতে হইত না। তাহার জীবনের শেষ অধ্যায়ের উজ্জ্বল চিত্রখানি যেন একেবারেই দৃষ্ট হইত না।

৪। এই ঘটনাবলম্বনে হেমলতা-চরিত্রেরও যেন আরো উৎকর্ষ সাধিত হইল। হৃদয়ের বল, দুর্দ্দমনীয় আকাজ্ক্ষা-নিবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা, প্রিয় নরেন্দ্রের প্রতি ভ্রাতৃসম্বোধন, মহতী উক্তির দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা হেমলতা-চরিত্রও যেন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

৫। এই ঘটনা-সাহায্যে তাতারিণীর প্রেমাকাজ্ক্ষা, পৈতৃক উগ্রতা, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাইলাম। অথচ উহাদের উপর প্রণয়ের প্রভুত্বও বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইল। তাহার হস্ত হইতে

ভূমিকা পড়িয়া গেল। এইস্থানে গ্রন্থকারের আর একটি স্বভাবানুশীলনের পরিচয় দিতেছি। "নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখন জেলেখা তাহাপেক্ষা উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।" বাস্তবিক যখন মানব-হৃদয় প্রেমের ক্রীড়াভূমি হয়, তখন শরীর অপেক্ষাকৃত কৃশ হইলেও সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটিয়া উঠে। উজ্জ্বলতর হৃদয়-ভাবে দেহ-কান্তি যেন উজ্জ্বলতর আকার ধারণ করে।

জেলেখা-জীবনের তৃতীয় অধ্যায় এই স্থানেই সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের বিষয় দুইটি ;—(indirectly) প্রতিশোধ ও প্রকারান্তরে মৃত্যু। পূর্ব্বে প্রতিশোধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাটি সংক্ষেপে সমালোচনা করা যাউক।

আমরা রাজস্থানের পর দেখি, যে, জেলেখা রুগ্না, শীর্ণা, পাণ্ডুবর্ণা—সমাধি-স্থানে সমাসীনা! মৃত্যুর শ্বেতবর্ণ তাহার শরীরে দেদীপ্যমান ; চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক! নিরাশ-কাতর-হৃদয়ে অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি জ্বল জ্বল করিতেছে। গোরস্থানে যে বায়েৎটি লেখা ছিল জেলেখা উহা মর্ম্মস্পর্শী স্বরে গাহিতেছিল।—"বন্ধু আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম। তুমি যদি হতভাগা হও, আমার জন্য একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনা-বায়ু সেই শীতল স্থানকে আরো সুশীতল করিতেছে। কল্লোলিনী যমুনার সুমধুর কলকল শব্দের সহিত শীতল বায়ু সেই সঙ্গীতকে দূরে—বহুদূরে আকাশের কোলে ছাড়িয়া দিতেছে!

এই স্থানেও সেই জড়-প্রকৃতি ও অন্তর-প্রকৃতির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

প্রথম দৃশ্য—একটি পুরাতন কবর-স্থান। প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষলতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে।

১ম ভাব—জেলেখা-হৃদয় মানসিক ও তজ্জনিত শারীরিক তাপে তাপিত, শীর্ণ, চূর্ণ, বিদীর্ণ। মানসিক দুশ্চিন্তায় নানা গতি, নানা আবেগ হৃদয়ের পরতে পরতে প্রবিষ্ট।

দ্বিতীয় দৃশ্য—স্থান নিস্তব্ধ ; কেবল বিশাল তমাল বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটি পক্ষী দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে।

২য় ভাব—হৃদয়ের সবই গিয়াছে। আশা গিয়াছে, ভরসা ফুরাইয়াছে

বাকী আছে,—এখনো চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া ক্ষীণ জীবনের অসহনীয় যাতনার মর্ম্মস্পর্শী উক্তি,—"বন্ধু, আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী।"

এ সুন্দর ছবি, কাতর ব্যথিত তাপিত হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী ছবি, সমালোচনার বিকৃত রঙে কদর্য্য করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করি, যখন হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন শেষ করাই ভালো।

এক্ষণে তাহার মানসিক বৈকল্য স্থূলভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাউক।

যে ভাবে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি শতধা ছিন্ন হইয়া যায়; চক্ষের জল, বক্ষের শোণিত শুকাইয়া যায়; বাকী থাকে প্রেমনয়নে উদাস দৃষ্টি, আর মর্ম্মস্পর্শী গভীর দীর্ঘশ্বাস; স্মরণে থাকে অতীতের স্মৃতি অর্থাৎ 'ছিল কি আর হইল কি' এই দুইয়ের তুলনা! জেলেখা-হৃদয় ঠিক সেই ভাবে পূর্ণ। কেন না, তাহার ইহজন্মের আশা একেবারে ফুরাইয়াছে। মানবজীবনের এই অবস্থাটি crisis.

আমাদের বিশ্বাস, জেলেখা আর কিছুদিন নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ না পাইলে আত্মপ্রাণ উচ্চতম, মধুরতম, গভীরতম পাত্র, ভগবদ্-পাদপদ্মে স্বতই সমর্পণ করিতে পারিত। কেন না, তাহার হৃদয় গঠিত হইয়া আসিতেছিল। সংসারের অবিরত জ্বালা যন্ত্রণা, প্রেমের প্রতিদানাভাব, স্বার্থের নশ্বরতা প্রভৃতি অবিনশ্বর ঐহিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে কঠিনীভূত মানবহৃদয় স্বতই পারমার্থিক চিন্তায় ধাবিত হয়।

কিন্তু যখন প্রণয়-পাত্রের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখনো জেলেখা-হৃদয়ে প্রেম-মিলনাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাই জেলেখা বলিতেছে, "নিষ্ঠুর নরেন্দ্র, (পরজগতে) এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র, তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে, নতুবা এই ছুরিকা দ্বারা ওই তোমার পাষাণ হৃদয় চূর্ণ করিব।"

তাই জেলেখার হৃদয়-গতি বিভিন্ন পথাবলম্বী হইয়া প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইল। তাই জেলেখা এত দিনে আত্মহত্যা করিয়া তাহার জীবনের সুমোহন ইতিহাসের সারাংশমূলক বিদ্যাপতির দুইটি কবিতা আমাদের স্মৃতি-পটে অঙ্কিত করিয়া দিল।—

১

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল
মনে কিছু না গণহু ও রসে ভোল;

কুলজ-রীতি ছোড়নু যহু লাগি
সো অব বিছুরিল হামারি অভাগী।

২

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা,
বয়কে জীবন, কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা।
ঝাঁপন কুপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই
তখনক লঘু গুরু কুছ না বিচারিনু
অব পাছু তরইতে (?) চাই—
মধুসম বচন প্রেমসম মানহু
পহিলহি জানন ন ভেলা,
আপন চতুর পণ পরহাতে সোঁপিনু
হৃদি সেঁ গরব দূরে গেলা॥

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সাধুর কার্য্য।

—:*:*:—

সমুদ্রের লোনা জল করিয়া গ্রহণ
সুপেয় পানীয় রবি করেন অর্পণ;
নিশাকর প্রখর রবির কর ল'য়ে,
না জানি আপনি কত দুঃখ ক্লেশ স'য়ে,
সুশীতল সুধামাখা কর-বিতরণে
তাপতপ্ত ধরারে তোষেন সযতনে!
বৈদ্য সদ্যঃ প্রাণ-ঘাতী কালকূট বিষে
ঔষধ করেন সৃষ্টি ব্যাধির বিনাশে।
সাধু সহি অপরের তিক্ত ব্যবহার,
করিতে বিরত নহে পর উপকার।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
পৌষ, ১৩১৯।

চিন্তা ও কার্য্য।

সেকালে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ ছিল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সকলের অধিকার ছিল না। যিনি গুরু তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও উচ্চশিক্ষার বিশেষতঃ সকল শিক্ষার যাহা সার সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেন না। একালে এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নাই, সকল শাস্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার। মুদ্রাযন্ত্র ও অবাধ উচ্চশিক্ষা এ কালের প্রধান গৌরবের কথা আর উচ্চবিদ্যা সকলকে না দেওয়া সে কালের প্রধান নিন্দার কথা। সেকাল ও একাল এই উভয়ের মধ্যে যখনই আমরা তুলনা করি তখনই এই প্রকারের একটা মত সর্ব্বদাই আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা আমাদের এ কালের প্রশংসায় অতিমাত্রায় মুগ্ধ ও আত্মহারা ;—কিন্তু সকল লোকে যাহার নিন্দা বা প্রশংসা করে তাহার নিন্দা বা প্রশংসা করা, যাহা রীতি হইয়া পড়িয়াছে তাহার অনুবর্ত্তন করা, এক কথা আর সকলদিক দেখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নির্দ্ধারণ করা আর এক কথা। এ কালের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা বড় কঠিন, আমরা কিন্তু বলি যে আমাদের যুগ স্বাধীন চিন্তার যুগ। এত বক্তৃতা হইতেছে, এত নূতন নূতন গ্রন্থ পাঠ হইতেছে, আমরা এত বেশী জনতার মধ্যে বাস করিতেছি যে, আমাদের কোন্ মত বা ধারণা নিজের চিন্তা বা অভিজ্ঞতা প্রসূত আর কোন্ মত বা ধারণা অপরের প্রতিধ্বনি মাত্র তাহা ভাবিবার সময় নাই। এই রেল টেলিগ্রাফ ও জীবন সংগ্রামের অতি ব্যস্ততার দিনে আমাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, যেমন আমাদের ব্যবহার্য্য জিনিষ

একেবারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, পয়সা দিলেই পাওয়া যায় তেমনি মত ও ধারণা আমাদিগকে ভাবিয়া ঠিক করিতে হয় না, একমাত্র স্মরণশক্তি থাকিলেই সকল বিষয়ে অপরের চিন্তা আমরা নিজের করিয়া লইতে পারি। কিন্তু এই প্রকারের ভাড়া করা চিন্তায় বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ন্যায় সংসারে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে জীবন সমস্যার মীমাংসা হয় না, অন্তরের শূন্যতা যায় না। এই জন্যই বলিতে হয় যে আমরা অপরের কথায় সুর মিলাইয়া যতই উচ্চৈঃস্বরে বলিনা কেন যে এ যুগ স্বাধীন চিন্তার যুগ, কথাটা কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত এ যুগ পরাধীন চিন্তার যুগ, ধার করা বা ভাড়া করা চিন্তার যুগ।

আমরা বলি সে কালে অবাধ উচ্চশিক্ষা ছিল না—সকলের সকল শাস্ত্রে অধিকার ছিল না ইহা সে কালের বড় অগৌরবের কথা। এই সমস্যাটি একটু স্থিরভাবে আলোচনা করা যাউক। বেদান্ত শাস্ত্রের মধ্যে বড় বড় কথার আলোচনা আছে—ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আছে। বেদান্ত বুঝিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে এই বেদান্তে সকলের অধিকার ছিল না—স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই অভিযোগ আমরা সর্ব্বদাই করিয়া থাকি, কিন্তু এই প্রশ্নের যে আর একটা দিক আছে তাহা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বড় বড় তত্ত্ব আয়ত্ত করিলে কি হইবে, সুন্দর সুন্দর যুক্তি প্রয়োগে দক্ষতা লাভ করিয়া কি হইবে, তাহাতে বড় জোর পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি হইতে পারে, এই সংসারে জীবিকার্জ্জনের বেশ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহা ছাড়া জীবনের যদি কোন গভীরতর বা ব্যাপকতর উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইলে সংসারে যশোলাভ বা অর্থলাভ করাই তো বিদ্যার উদ্দেশ্য নহে। ঋষি বলিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এক কথা আর প্রকৃত প্রস্তাবে ঋষি হওয়া আর এক কথা এ তত্ত্ব আমরা ভুলিয়া যাইতেছি।

প্রাচীনেরা জীবনকে খুব বড় করিয়া দেখিতেন। ইহা তাঁহাদের দোষ কি গুণ তাহা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে বড় করিয়া দেখিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কেবল শেখা বা কেবল যুক্তি সংগ্রহ করা বা কেবল স্মৃতিশক্তির দ্বারা আয়ত্ত করিয়া চিন্তা করিতে পারাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না; [illegible] জানিব ও বুঝিব, তাহা জীবনে সফল করিব ইহাই তাঁহাদের

উদ্দেশ্য ছিল। যেমন সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্য স্থূল দেহের তুষ্টি শান্তি ও পুষ্টি বিধান করে তেমনি তত্ত্বসমূহের দ্বারা যিনি দেহী বা প্রকৃত মানব, তাঁহার তুষ্টি শান্তি ও পুষ্টি হওয়া চাই। তত্ত্বের সহিত মানবের ইহাই সম্বন্ধ। কেবল লোককে দেখাইবার জন্য ঋষিগণ জগতে অমূল্য তত্ত্বসমূহ প্রচার করেন নাই।

এ কালে কি হইয়াছে চক্ষু খুলিয়া দেখিবেন কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য দেশে বিদেশে অতীতে ও বর্ত্তমানে সাধু ভক্ত ও জ্ঞানীগণ এ পর্য্যন্ত যত যুক্তি দিয়াছেন তাহার সমস্তগুলি যাঁহার মুখাগ্রে বিদ্যমান এই সমস্ত যখন তিনি আবৃত্তি করেন তখন তাঁহার কথা শুনিলে হয়ত সাক্ষাৎ শঙ্করাচার্য্যকেও চমৎকৃত হইতে হয়, সেই ব্যক্তি জীবনের কোনও কার্য্যে ঈশ্বর আছেন ইহা সপ্রমাণ করেন না। নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত মানবজাতি যত কিছু গবেষণা করিয়াছে, তাহার সমস্তগুলি যিনি জানেন তাঁহার জীবন দুর্নীতিতে কলঙ্কিত। দেশ-হিতৈষণার মন্ত্র প্রচারে যাঁহার বাগ্মীতা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ ভক্তের করতালি লাভ করে তিনি প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। এ কথা কি সত্য নহে? অবাধ উচ্চশিক্ষায় মানব সাধারণতঃ আত্মগোপন শিক্ষা করিয়াছে।

কোন মহাপুরুষের উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি ঘুমাইয়া ঘুমায় তাহাকে জাগাইতে পারা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমায় তাহাকে জাগাইবার উপায় কি? অবাধ উচ্চশিক্ষা আমাদিগকে জাগিয়া ঘুমাইতে শিখাইয়াছে কেবল যাহা স্মৃতি শক্তির দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছি, যাহা গ্রন্থলব্ধ শেখা কথা তাহা আমার নিজের জীবনের কথা নহে এটুকু আমরা আর ভাবিতে পারি না।

মানুষের জীবন দুইভাগে বিভক্ত। একটি আদর্শ জীবন আর একটি বাস্তব জীবন। আদর্শ জীবনকে চিন্তাজীবন আর বাস্তব জীবনকে কর্ম্ম বা ব্যবহার জীবন বলে। আদর্শ জীবন আমাদের জীবনের সেইরূপ, যাহা বক্তৃতায়, লেখায় সাধারণ স্থানে কথোপকথনে প্রকাশ পায়, আর বাস্তব জীবন আমাদের জীবনের সেইরূপ যাহা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারে, পিতারূপে, পুত্র রূপে, ভ্রাতারূপে, স্বামীরূপে, প্রতিবেশীরূপে গ্রামবাসীরূপে, বন্ধুরূপে, উত্তমর্ণ অধমর্ণরূপে, গৃহস্থরূপে প্রকাশ পায়। এই দুইটি রূপের মধ্যে প্রভেদ যত কম হয় ততই ভাল। সে কালে এই দুইটির মধ্যে যাহাতে প্রভেদ না থাকে অর্থাৎ মনুষ্যে মিথ্যাচার বা কপটতা যাহাতে কমিয়া যায় সে বিষয়ে সমাজ-

পতিগণের বড়ই তীব্র দৃষ্টি ছিল। একালে এ দৃষ্টি কমিয়া যাইতেছে। বাস্তব জীবন (private life) লইয়া কেন আলোচনা কর? ইহা এ কালের একটি তিরস্কার। অবাধ উচ্চশিক্ষার দ্বারা যে ভাল হয় নাই তাহা বলিতেছি না, অনেক ভাল হয়ত হইয়াছে, হয়ত আরও ভাল হইবে, কিন্তু ইহার দ্বারা যে ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সে সর্ব্বনাশ এই যে ইহা দ্বারা আমরা আত্মগোপন করিতে দক্ষতালাভ করিয়াছি, অপরের নিকট আত্মগোপন করিতে করিতে নিজের কাছেও নিজে অপরিচিত হইয়া পড়িতেছি ইহা যে বড় ভয়ানক কথা। আমি যাহা নই নিজেকে তাহাই বলিয়া মনে করি এ বড় ভীষণ রোগ। এই রোগ নিবারণের জন্যই ভগবানকে গীতা শাস্ত্র প্রচার করিতে হইয়াছিল। এই রোগ দূর করিবার জন্যই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রবর্ত্তনা। হৃদয় ও মনের মধ্যে এই যে বিরোধ ইহাই মানবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শত্রু। ইহাকে দমন করিতে না পারিলে কোন ব্যক্তির বা কোন জাতির মঙ্গল হয় না।

ইহাই আমাদের এ যুগের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। চিন্তা পক্ষবিস্তার করিয়া পক্ষীর ন্যায় উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারে, আমরা চিন্তার এই আরোহণ ক্ষমতায় এতই মুগ্ধ, এতই আত্মহারা হইয়া পড়ি যে কর্ম্ম যে গভীর হইতে আরও গভীরতর পঙ্করাশির মধ্যে ক্ষিপ্রবেগে ডুবিয়া যাইতেছে তাহা ভাবিবার সময় নাই। বিদ্যা বলিয়া বড় আনন্দ উল্লাসের সহিত যাহাকে বরণ করিয়াছি তাহা অবিদ্যা কিনা, এই তত্ত্ব আজ একটু স্থিরভাবে ভাবিতে হইবে, সংসারে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়াই কি জীবনের পরম পুরুষার্থ? ভাল হইতে হইবে, বড় হইতে হইবে, আমি ভাল বা বড় এ কথা সপ্রমাণ করিলেই কার্য্য শেষ হইবে না।

আমরা দুইটি শক্তি লাভ করিয়াছি: একটি আত্মগোপন করিবার শক্তি। আর একটি প্রমাণ করিবার শক্তি। যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিব তাহাই সত্য বলিয়া চলিয়া যাইবে, রাজবিধি ও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। এই প্রকারে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কত মিথ্যা সত্য বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কত দিবা রাত্রি হইতেছে, কত রাত্রি দিবা হইতেছে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ-ভাবে মানবকে এই দুইটি মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

এই সমস্যা যে জগতে আজ নূতন আসিয়াছে তাহাই বা বলি কেন? প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এ প্রকারের অবস্থা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। এই প্রকারের

অবস্থাতেই ভারতের ঋষি "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া" বলিয়া গিয়াছেন, এই অবস্থাতেই সক্রেতিস্, বুদ্ধ ও শঙ্করের উদ্ভব।

উচ্চশিক্ষার দোষ দিয়াছি, কিন্তু যখন ভাবি যে সেই উচ্চশিক্ষাই আবার উচ্চশিক্ষার যাহা দোষ তাহা ধরিয়া দিতেছে তখন তাহাকে দোষই বা দিই কি করিয়া? ভাগবত শাস্ত্রে আছে।

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎসিতং॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥"

"হে সুব্রত! ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজন দ্বারা রোগ জন্মে, কেবল সেই রোগজনক দ্রব্য দ্বারা কখন রোগের শান্তি হয় না কিন্তু ঘৃতাদি দ্রব্যান্তরের দ্বারা যদি ভাবিত (মিশ্রিত) হয়, তবেই রোগ নিবৃত্তি করিতে পারে। সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম মনুষ্যদিগের সংসারের হেতু হয়, তৎসমস্ত পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে আত্ম বিনাশের অর্থাৎ কর্ম্ম নিবৃত্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়।"

যাহা হইতে এই ব্যাধি সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা দ্বারাই আরোগ্য হইবে কিন্তু সেই বস্তুকে দ্রব্যান্তরের দ্বারা ভাবিত করিয়া লইতে হইবে।

তাই ভাবিতেছি মানব সভ্যতার প্রথম প্রত্যূষে নির্ম্মল তপোবনে বসিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যে মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধান্বিত ভাবে সেই সমস্ত মহাসত্য আজ হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাব চূর্ণ হইয়া যাউক, দুর্বিনীত অশ্রদ্ধা ও দাম্ভিক তার্কিকতা চূর্ণ হউক; এস শ্রদ্ধা, এস ভক্তি তোমাদের হৃদয়ে ধরিয়া অনুধ্যান করি।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য।
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাং॥
নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

সন্ন্যাসী।

(গল্প)

আর একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন গঙ্গাতীরে একটি প্রাচীন মন্দিরগৃহে বাস করিতেছিলেন। আমি যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর ধুনী জ্বালিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখে আজ যেন অধিক আনন্দের ভাব লক্ষ্য করিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঠাকুর, আজ ভাবান্তর কেন ?'

ঠাকুর উত্তর করিলেন, 'আজ নেশাটা বেশী আছে।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি খাইতে হয় ?' তিনি বলিলেন, 'কিছুই নয়, গুরুর কৃপায় সদাসর্ব্বদা আপনা আপনি নেশায় বিভোর থাকিতে পাই।' আমি বলিলাম, 'বুঝিয়াছি, প্রেমানন্দ !'

'শুধু আনন্দ বল না ?'

'কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'প্রেম কথাটির সদর্থ হয় না। সাধারণতঃ যাহাকে প্রেম বলে তাহা উচ্চভাব নয়। তাই আমি ও কথাটা ত্যাগ করিয়াছি।' সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, 'তোমাদের প্রেম জিনিষটা মায়া, মোহ; এমন কি রিপুও বলা যায়। সে প্রেম অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আছে, তাহার নিকটে প্রেম নিম্নতম সোপান মাত্র। হৃদয়বৃত্তি যাহার নাই, তাহাকে তোমরা পাষণ্ড বলিবে—তাহাও ঠিক; কিন্তু অতি উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিলেও যে, হৃদয়বৃত্তি থাকে না, তাহা তোমরা ভাবিতে পার না। হৃদয়বৃত্তি যতদিন থাকিবে ততদিন সুখ দুঃখ থাকিবে; আনন্দ সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা! 'প্রেমানন্দ' বলিলে প্রেমকে আনন্দহেতু বলা হয়, কিন্তু সে যে কি প্রেম তাহা সংসারি-প্রেমিক তোমরা বুঝিবে না। তাই তোমার মুখে প্রেমানন্দ কথাটিতে আপত্তি করিয়াছিলাম।"

আমি নদীর উপরেই মন্দিরের পৈঠায় বসিয়া অস্তমান সূর্য্যের সিন্দূরলোহিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। সন্ন্যাসী নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি নীরব হইলে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহাকে আর কোনও দিন সংসার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে শুনি নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, তিনি অন্য জগতের লোক, এ জগতের সংবাদ জানেন না। আজ তিনি আমাকে

এতখানি বুঝাইতে গেলেন কেন? আপনার প্রাণকেও কি মাঝে মাঝে বুঝাইতে হয়। আমি কৌতূহলপরবশ হইয়া বলিলাম, 'ঠাকুর, আপনি যাহা বলিলেন, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলে চরিতার্থ হইব।' তিনি একটু হাসিয়া আমার পার্শ্বেই একটু দূরে উপবেশন করিলেন। নদীতে তখন জোয়ার আসিয়াছে, আমাদের পায়ের অতি নিকটে জলশব্দ হইতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, একটি গল্প বলিতেছি, শুন।

২

স্বামী ও স্ত্রী। স্ত্রীকে সরলা বুদ্ধিহীনা বলিয়া বোধ হইত। তাহার মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া আছে। সে বেশী কথা কহিত না। তাহার কোনও অভাব স্বামীকে কখনও জানাইত না। স্বামী যাহা বলিত, সে তাহা পালন করিত। স্বামীর আদরেও উদাসীন ভাব দেখাইত না। পিত্রালয়ে যাইবার আগ্রহও ছিল না। প্রবাস কালে স্বামীকে দীর্ঘ পত্রও লিখিত।

তথাপি স্বামীর মনে হইত, স্ত্রীর চরিত্র যেন একটু অসাধারণ, সন্দেহ হইত, বুঝি তাহার অন্তরে ভালবাসা নাই। সে কখনও কিছু পাইলে আহ্লাদ প্রকাশ করিত না, না পাইলেও অসুখী হইত না। স্বামী মনে করিত, সে যেন একটি হাসির মুখোস পরিয়া আছে। জীবনে, যে কোনও কারণেই হউক, তাহার চাহিবার কিছুই নাই। সে যেটুকু ভালবাসিবার ভাণ করে, সে যেন তাহার নির্ব্বিরোধ স্বভাবের জন্য।

ক্রমে স্বামীর মনে অন্যরূপ সন্দেহও হইতে লাগিল। 'স্ত্রী যেমন সকল বিষয়েই উদাসীন, তেমনই সতীধর্ম্ম সম্বন্ধেও উদাসীন নয় ত?' তারপর সে লক্ষ্য করিয়াছিল, বধূজনোচিত লজ্জা বা সঙ্কোচ তাহার একেবারেই নাই। পিত্রালয়ে অবস্থান কালে সে আত্মীয় যুবকদিগের সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশিত। আত্মীয় সমাজেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে গণ্ডী আছে, তাহা অতিক্রম করিতে সে দ্বিধা বোধ করিত না। এ সকল হইতে স্বামীর সন্দেহ হইত, স্ত্রী অন্যপূর্ব্বা।

কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসিত, এজন্য নিজের সন্দেহে নিজে অতিশয় কষ্ট পাইত। স্ত্রী সময়ে সময়ে ভালবাসার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু স্বামীর স্পষ্ট মনে হইত, সে উচ্ছ্বাস সাময়িক, সে তাহার স্বভাবের ক্ষণিক বিকার মাত্র।

এমন করিয়া কিছুদিন কাটিল। স্বামীর সন্দেহ কোনও প্রমাণ পাইয়া

যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়া একটা রোগের মত হইয়া দাঁড়াইল। একবার অধিকদিন পিত্রালয়ে অবস্থান কালে স্ত্রীর জননী হইবার সম্ভাবনা হইল। সন্দেহের কোনও কারণ ছিল না, তথাপি এই ঘটনায় স্বামীর অস্থিরতা বাড়িয়া গেল। সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন স্ত্রীকে সব বলিল। স্ত্রী ক্রোধ প্রকাশ করিল। স্বামী তাহার কথা বিশ্বাস করার সুখ ও অবিশ্বাস করার দুঃখ উভয়ই এক সঙ্গে ভোগ করিল। সে কাঁদিল, ক্ষমা চাহিল: কিন্তু চুম্বন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। অবশেষে স্ত্রীকে এক ভীষণ দিব্য করিতে বলিল। বলিল, "তুমি তোমার গর্ভ স্পর্শ করিয়া দেবতা সাক্ষী করিয়া বল, যদি তাহা অপবিত্র হয়, তবে জন্মের অষ্ট রাত্রির মধ্যে সন্তান মরিয়া যাইবে—যদি না মরে তবে মাতৃ ধর্ম্ম মিথ্যা।"

স্ত্রীর মুখ চক্ষু অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে স্বামীর মুখের দিকে না চাহিয়া অকম্পিত স্বরে বলিল, 'না, তাহা পারিব না, আমি সন্তানঘাতিনী হইতে পারিব না।' স্বামী তখন মুমূর্ষুর মত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, 'তবে তুমি ব্যভিচারিণী!' স্ত্রী এবার কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল 'হাঁ'। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, 'তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি আমার প্রাণ রাখিব না। আমি বিষ খাইব, তোমার ইচ্ছা হয় হাতে করিয়া দিও।"

স্ত্রী মরিয়া গেল। স্বামী তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিল, সে সে ক্ষমা গ্রহণ করে নাই। স্বামী তাহাকে কখনও ভুলে নাই, তাহার হৃদয়ের ক্ষত কখনও শুকায় নাই। সেই ব্যভিচারিণীর স্মৃতি তাহার জীবনকে দীর্ঘশ্বাসময় করিয়াছিল।

গল্প শেষ করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার প্রশংসা কর—স্বামীর না স্ত্রীর?' আমি বলিলাম 'কেন, ইহা ত সহজ কথা! যে স্ত্রী পাপিষ্ঠা, লোক-সমাজে তাহার স্থান নাই', এমন স্ত্রী বিষধরীর মত পরিত্যজ্যা। স্বামী বেচারীর জন্য আমার দুঃখ হয়। ভালবাসা ইহারই নাম, যে—ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ক্ষমা করিয়া তাহার স্মৃতি পোষণ করে!' সন্ন্যাসী আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'তুমি প্রাকৃতজনের ন্যায় কথা বলিতেছ, সাধারণ সমাজনীতির কথা বলিতেছ। লোক-সমাজ সম্বন্ধে তোমার সংস্কার যথার্থ বটে; কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে যে দুঃখ প্রকাশ করিলে, তাহা অযথার্থ। সে যাহাকে প্রেম মনে করিয়াছিল, তাহা প্রকৃত প্রেম নহে, তাহা দুর্ব্বল হৃদয়ের

স্বার্থপরতা মাত্র। ভালবাসার অর্থ স্বার্থত্যাগ করিবার শক্তি। সে দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রচেতা—ভালবাসা ফিরিয়া চাহিয়াছিল, পায় নাই বলিয়া স্ত্রীর চরিত্রে এমন সন্দেহ করিয়াছিল। সে যদি প্রকৃত ভালবাসিত, তবে এমন করিয়া সন্দেহের বশবর্ত্তী হইরা স্ত্রীর পাপ খুঁজিয়া বাহির করিত না। যে ভালবাসে তাহার মন সরল, বিশ্বাস অপরিসীম; তাহার চক্ষে কেবল আলোক; পাপ, কলঙ্কের অন্ধকার, সে কল্পনাও করিতে পারে না। অতএব এই স্বামীকে তুমি দুর্ব্বল হৃদয় বলিয়া দয়া করিতে পার, প্রশংসা করিতে পার না। আমি কিন্তু দয়াও করিব না। আমি হৃদয়-বল ভিন্ন আর কিছুই সত্য মনে করি না। যে ভালবাসায় নিজের জন্য দীর্ঘশ্বাস আছে, তাহার জন্য আমার অশ্রু আসে না হাসি পায়।

আমি নীরবে বসিয়াছিলাম, সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। তাঁহার চক্ষুতারকা যেন স্তিমিত বোধ হইতে লাগিল। তিনি যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন।

আর সেই স্ত্রী! আমি তাহাকে ভক্তি করি, তাহাকে গুরু বলিয়া মানিতে পারি। তুমি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ; কিন্তু আমি বুঝাইয়া দিব। এই স্ত্রী মহা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দেখিলে না, সে কিছুই চাহিল না; প্রেমপিপাসা তাহার মোটেই ছিল না। তথাপি সে সর্ব্বদা স্বামীর জন্য হাসিমুখ করিয়া থাকিত। তাহার মন এমন নির্ব্বিকার যে তাহা পাপ পুণ্যের অতীত। ভাব, অভাব, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ তাহার কাছে একই। লৌকিক কর্ম্মের সৎ-অসৎ ভেদ তাহার কাছে ছিল না। যাহার আকাজ্ক্ষা নাই তাহার প্রবৃত্তি নাই, যাহার প্রবৃত্তি নাই তাহার কর্ম্ম নাই, যাহার কর্ম্ম নাই তাহার কাছে সমাজ-নীতির কোনও অর্থই নাই। কিন্তু এত সাধনার পরও নারী-হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী কামনা, মাতৃস্নেহ চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি, তখনও সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই। তাই এমন বাহ্যতঃ বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহা তুমি আদৌ বুঝিতে পার নাই, কেবল ধিকৃত করিতেছ। সেই দিব্য করিবার সময়ে তাহার অদ্ভুত আচরণ স্মরণ কর। কি দৃপ্ত তেজ! কি আত্মসম্বরণ! সে দেখিল, যখন তাহার স্বার্থ রহিয়াছে, তখন ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি পালন না করা মিথ্যাচার। কি সর্ব্বনাশ! সে আকাজ্ক্ষার বশে আত্মার স্বাধীনতা হারাইতে বসিয়াছে! তৎক্ষণাৎ সে সকল আকাজ্ক্ষা বিসর্জ্জন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিল। আমি তাহাকে প্রণাম করি। সন্ন্যাসী

আবার নীরব হইলেন। আমার কিন্তু ভাল লাগিল না। স্বামীর সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে কথাগুলা যেন একটু টানিয়া আনা, যেন ওকালতীর মত। সে সময়ে তাঁহার কণ্ঠস্বরের বিকৃতিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মুখের দিকে আবার চাহিয়া দেখিলাম, অধরোষ্ঠের হাসিটি তেমনি রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রেম কি তবে কিছুই নহে? তিনি নিম্নস্বরে উত্তর করিলেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম, স্বার্থত্যাগ করিবার শক্তি— বললাভ করিবার উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য আত্মাকে লাভ করা; কারণ, 'নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্য।' আত্মাকে যে লাভ করিয়াছে তাহার আর প্রেমের প্রয়োজন নাই।

এতক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিকটে শিবমন্দিরে আরতি শেষ হইয়া গেল। কাঁসর ঘণ্টাধ্বনির অবসানে, কেবল একটিমাত্র ভক্তকণ্ঠের বম্ বম্ শব্দ মন্দিরটি প্রতিধ্বনিত করিতেছে। আমি অন্ধকারে জলস্থল কেমন একাকার হইয়াছে, তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সন্ন্যাসীর কথায় প্রাণের ভিতর একটা কি বাজিতেছিল। তাঁহার দিকে না চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলিলাম 'আমি আত্মা চাই না, প্রেম চাই।' এমন সময়ে ভিতর হইতে গান উঠিল—সন্ন্যাসী কখন উঠিয়া গিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করি নাই। দুয়ারের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তিনি আসনে বসিয়াছেন, পার্শ্বে ধুনী জ্বলিতেছে। হাত দুইটি জানুর উপর ঋজুভাবে অবস্থিত, মুখ ঈষৎ উন্নমিত, চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। সন্ন্যাসী গাহিতেছেন,—

"প্রেম একরূপ, প্রেম দুই নয়
বহুরূপে বহুজনা যে যার প্রেম বেছে লয়।
এই প্রেমেতে, দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়
শুকদেব গৃহ ত্যজে, গৃহবাসী কভু নয়।
ধ্রুব, ধ্রুব মনে করি, প্রেমে হ'য়ে মত্ত
চরমেতে পেয়েছিলেন পরম পদার্থ।
পুরুষ-প্রকৃতি-প্রেম শশীর সমুদয়—
যৌবন-পূর্ণিমা গেলে ক্ষয়কলা তারে কয়।
কুসুম ফুটিলে বনে বাসি হ'লে বাসক্ষয়,
নিশীথে সৌরভ কিন্তু প্রভাতেতে তত নয়।'

জোয়ার ভাঁটার জল কোনোখানে স্থিতি নয়।"
আবার ঠিকা প্রেমের মুখে আগুন, দুঃখ বই ত' সুখ নয়।"

শেষ দুই চরণ গাহিবার সময় তাঁহার সেই সঘন করতালি যেন আমায় তালে তালে নাচাইতে লাগিল। অন্ধকারে নদী তীরের পথে ফিরিয়া আসিবার সময় এই গানটি কেবলই কানে আসিতে লাগিল। আমারও যেন নেশা হইয়াছিল; সন্ন্যাসীর সেই ভাবদীপ্ত মুখমণ্ডল চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনার কথা কিছু কিছু আলোচনা করা গিয়াছে, ভগবদ্গীতার সাধনার সহিত তুলনায় আলোচনা করিলে এই সাধনতত্ত্ব আর একটু পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমে ভগবদ্গীতার প্রশ্নটি কি তাহাই ভাবিয়া দেখা যাউক। রাজার পুত্র অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন চারিদিকে বিরাট সেনাদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই যুদ্ধের যাঁহারা নেতা তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্বজন। যুদ্ধে জয়ই হউক আর পরাজয়ই হউক এই সমস্ত স্বজনের রক্তে পৃথিবী নিশ্চয়ই রঞ্জিত হইবে। কি সর্ব্বনাশ। এই সব স্বজন ইহাদের সাহচর্য্য ও অনুগত্যই জীবনের প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। রাজাই হই আর ধনীই হই, ইহাদের সঙ্গ দ্বারাই সুখে সুখী হওয়া যায়, ইহাদেরই যদি হারাইতে হয় তবে আর রাজ্য লইয়াই কি হইবে, আর সংসারে ভোগায়তন সংগ্রহ করিয়াই বা কি হইবে?

এই প্রকার চিন্তার দ্বারা অর্জ্জুন আক্রান্ত হইলেন। বৈরাগ্য জিনিষটা ভাল, কিন্তু অর্জ্জুনের এই বৈরাগ্য ইহা বৈরাগ্য নহে, বিবেক হইতে যে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়, অর্জ্জুনের বৈরাগ্য সে প্রকৃতির নহে। বিবেক হইতে যে বৈরাগ্য জন্মায় তাহার প্রণালী অন্যরূপ। বিবেক বলিতে আত্মানাত্ম বিচার বুঝায়। ইহা আত্ম ও ইহা অনাত্ম এইটি বুঝিয়া আত্মজ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তুতে অনাস্থা জন্মায় তাহা অর্জ্জুনের হয় নাই। তাহা হইলে অর্জ্জুন বলিতেন না যে

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমুপস্থিতান্।"

"এই সমস্ত স্বজনকে যুদ্ধে দেখিয়া" একথা অর্জ্জুন বলিতেন না। বিবেক হইলে আর এই সমস্ত লোককে স্বজন বলিবেন কেন? এই স্বস্বামীত্ব বুদ্ধিই যে অবিদ্যা।

বিবেক হইতে যে বৈরাগ্য হয় তাহা ভিতর হইতে জন্মায়। (comes from within) কিন্তু অর্জ্জুনের এই যে মোহ ইহা বাহির হইতে আসিতেছে, ইহা গীতা হইতে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

"সীদন্তি মমগাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।"
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চমে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥"

যুদ্ধে যাহারা আসিয়াছে তাহারা স্বজন, অর্থাৎ তাহাদের অস্তিত্ব আমার ব্যক্তিগত সুখের ও তাহাদের অনস্তিত্ব আমার ব্যক্তিগত দুঃখের হেতু বলিয়াই অর্জ্জুনের মোহ। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বীর, ইহার পূর্ব্বেও ত তিনি অবিকম্পিত চিত্তে যুদ্ধ করিয়াছেন; এই সমস্ত লোক যদি তাঁহার পরজন হইত তাহা হইলে আর তাঁহার বিষন্ন হওয়ার কোন কারণ থাকিত না। এই অবিদ্যা ও অস্মিতাতেই যত গোল ঘটিয়াছে। বিকারটা বাহির হইতে আসিতেছে। কারণ প্রথম গাত্রে ঘর্ম্ম, তাহার পর মুখে শুষ্কতা, তাহার পর গাত্রে কম্প ও রোমহর্ষ। হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। শরীর পুড়িয়া যাইতেছে আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, মন ঘুরিতেছে। চারিদিকে দুর্লক্ষণ দেখিতেছেন। এই ত অর্জ্জুনের অবস্থা। কিন্তু নিজের অবস্থা নিজেই জানেন না। নিজে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, অথচ ভাবিতেছেন আমি যাহা ভাবিতেছি তাহাই ঠিক। অহঙ্কার টুকুও আছে। তাই বলিলেন

"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।"

আবার সেই স্বজনের কথা! স্বজনকে বধ করার কথা। অথচ বলিতেছেন আমি এই কার্য্যে শ্রেয়ঃ দেখিতেছিনা।

এখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয় এই দুইটি অতি প্রাচীন শব্দ। কঠোপনিষদে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রেয়ঃ বলিতে যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর তাহাই বুঝায়, আর যাহা আপাতসুখকর তাহাকে প্রেয় বলে। এই শ্রেয় ও প্রেয় সম্বন্ধে যমরাজ

নচিকেতাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রেয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ আশ্রয় করাই মানবের কর্ত্তব্য এবং তাহাই ধর্ম্ম। অর্জ্জুন বলিতেছেন আমি শ্রেয়ঃ দেখিতে ছিনা। এস্থলে অর্জ্জুনকে বক্তব্য এই যে তুমি এখন অবিদ্যা ও অস্মিতায় মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ, তোমার বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে তুমি তোমার শ্রেয়ঃ কি, তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে? সকলেই কি শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিতে পারে? তাহা যদি হইত তবে আর ভাবনা ছিল কি? যমরাজ বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে।
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥"

ধীর অর্থাৎ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি প্রেয় পরিহার করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া থাকেন। আর বিবেকহীন ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর রক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়কে প্রার্থনা করেন।

আর যে ব্যক্তি এই প্রকারে শ্রেয়ঃকে বরণ করেন সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার বা তত্ত্বোপদেশলাভের পাত্র। তাই যমরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন—

"স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥"

"দেখ নচিকেতা, আমি তোমাকে প্রিয় দারাপত্যাদি ও প্রিয়রূপ আরাম-ক্ষেত্রাদি দিতে চাহিলাম, কিন্তু তুমি নশ্বর জানিয়া সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি ধন্য, এই ভোগ্যবস্তুর মালাতে বহুতর মানব আসক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি সেই সুবর্ণময়ী মালা ত্যাগ করিয়াছ।"

নচিকেতা প্রিয় ও প্রিয়রূপ কামনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ত তাহা পারেন নাই। অর্জ্জুন যে তাহা পারেন নাই তাহা তাঁহার কথাগুলি শুনিয়াই ত বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইত অর্জ্জুনের অবস্থা। কিন্তু তাহার সঙ্গে অহঙ্কারটুকুও আছে।

আসল কথা বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। অবিদ্যারও একটা উপযোগীতা আছে, একটা প্রয়োজন আছে। মানুষ যখন অবিদ্যায় আচ্ছন্ন সেই সময়ে সে যদি আপনাকে বিদ্যার অধিকারী বলিয়া মনে করে তাহা হইলে বড়ই বিপদ ঘটে। অর্জ্জুনের এই বিপদ ঘটিয়াছিল আর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই বিদ্যা ও অবিদ্যার যে একটি সমন্বয় আছে তাহাই দেখাইয়া দিলেন ! এই সমন্বয় অবশ্য ঈশোপনিষদেই বর্ণিত হইয়াছে—

"বিদ্যাঞ্চা বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা (সন্ন্যাস ও কর্ম্ম) এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় দেখেন তিনি অবিদ্যা বা কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুজনক চিত্তমালিন্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে পারমার্থিক সমন্বয় রহিয়াছে, যিনি তাহা না বুঝিতে পারেন, যিনি একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিয়া দেখেন তিনি অবিদ্যাচ্ছন্ন, তিনি প্রাজ্ঞ নহেন।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় এব তো তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"

যাঁহারা কেবল অবিদ্যারই উপাসনা করেন তাঁহারা ঘোর তামস লোকে গমন করেন। আবার যাঁহারা কেবল বিদ্যারই উপাসনা করেন তাঁহারাও তামস লোকে গমন করেন।

এই বিদ্যা ও অবিদ্যার যে সমন্বয়ের ভূমি তাহাই প্রকৃত বিদ্যার বা ঈশ্বরের ভূমি।* অর্জ্জুন কে সেই ভূমিতে উত্তোলন করাই গীতার সাধনা।

গীতার সাধনা সম্বন্ধে এইবার একটু আলোচনা করা যাউক। অর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, সেই সময়েই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান দূরীভূত হইল। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ আর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। গীতার ভক্তিযোগ ও ভাগবতের ভক্তিযোগের সাধন প্রণালীর মধ্যে সামান্য একটা প্রভেদ আছে। গীতায় ভগবান বলিতেছেন—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

* সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে গীতা বা ভাগবতে ঈশ্বরতত্ত্ব ইংরাজীতে যাহাকে Negative বা Antithetic Idea বলে, তাহা নহে। "God s the Great Unity, in which every man's particular being is contained and made one with all others, so that living in Him we have, as it were, one common

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥
যেতু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৩-২০।

"সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র এবং কৃপালু (উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানে বন্ধুত্ব সম্পন্ন ও হীনে করুণাবান) মমতাহীন, অহঙ্কারশূন্য, অন্যের সুখদুঃখী, তুল্যরূপ সুখীদুঃখী, ক্ষমাশীল, (লাভে বা অলাভে) সর্ব্বদা তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতমনা, অধ্যবসায়শীল ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।

যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি শ্রী নিজে ও লোক হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না হর্ষ, কাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

অনপেক্ষ (যদৃচ্ছয়া উপস্থিত অর্থেও নিস্পৃহ) বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচশীল, অনলস, পক্ষপাতশূন্য, চিত্তক্লেশাবিহীন এবং সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী তাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়।

যিনি প্রিয় বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তুতে বিদ্বেষ করেন না, এবং ইষ্টনাশে দুঃখিত হন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়।

শত্রুমিত্র ও মানাপমানে নির্ব্বিকার, শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে তুল্যদর্শী, আসক্তি পরিশূন্য এবং নিন্দা ও প্রশংসায় অবিচলিত, সংযতবাক্ যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান-বিহীন ও স্থিরচিত্ত—এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাসম্পন্ন মৎ-পরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

ভগবদ্গীতার এই ভক্তিযোগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিযোগের তুলনায় আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। যে ধর্ম্মের আলোচনা করা যাউক সাধনার দুইটি দিক দেখিতে পাওয়া যাইবে। যেমন হিন্দু সাধনায় একবার ভাবিতে হইবে

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্তো স্বভাববান্"॥

"আমি দেব, আমি ব্রহ্ম, আমি শোকভাক্ নহি, আমি সচ্চিদানন্দরূপ, আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।"

আবার বলিতে হইবে ও চিন্তা করিতে হইবে—

"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপ হরো হরিঃ॥"

"আমি পাপ, পাপ কর্ম্মা, পাপাত্মা ও পাপসম্ভব, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে সর্ব্বপাপ-হরোহরি আমায় রক্ষা কর।"

খৃষ্টীয় সাধনায় ও সাধনার এই দুইটি দিক পরিস্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে যে মানবকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি (Image of God), ঈশ্বরের বাসস্থান ও মন্দির (Habitation of God, Temple of God, Temple of the Holy Ghost ?) বলা হইয়াছে আবার বলা হইয়াছে "অনুতাপ কর স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" (Repent ye for the Kingdom of God is coming)

সাধনার এই যে দুইটি দিক ইহাদের নাম বিধিমুখী পথ ও নিষেধমুখী পথ। প্রথমে মনে হয় দুইটি বুঝি ভিন্ন। কিন্তু তাহা নহে। ইহারা বিপরীত হইলেও গোলকের মেরুদ্বয়ের মত (Like the Poles of a Globe) অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। তবে একটু কথা আছে। এই দুইটি দিকের মধ্যে কোন্‌টির উপর অধিক জোর দিতে হইবে অর্থাৎ কোন্‌টিকে মুখ্য ও কোন্‌টিকে গৌণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবদ্গীতায় নিষেধের দিকে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বিধির দিকে অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে গীতা ও ভাগবতের প্রভেদ বেশ পরিষ্কাররূপেই বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্ব্বে গীতার ভক্তিযোগের যে শ্লোকগুলি উদ্ধার করা হইল তাহাতে দেখা যাইবে যে তথায় এই বিধি ও নিষেধ উভয়েরই উল্লেখ আছে কিন্তু নিষেধের দিকেই জোর অধিক দেওয়া হইয়াছে।

আর একটি কথা ভাবিবার আছে। গীতায় ভগবান বলিতেছেন যিনি

দ্বেষহীন, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, তিনি আমার ভক্ত ও তিনি আমার প্রিয়। এখানে একটি কথা বিশেষরূপেই ভাবিবার আছে, এই সমস্ত কাজ হইতে নিবৃত্ত হও, এই সমস্ত কাজ কর তাহা হইলে হে মানব, তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় হইবে। মানব কি কোন সময়ে ভগবানের প্রিয় ছিল না? ভগবান কি কোন সময়ে মানবের উপর বিরক্ত ছিলেন, তাহার পর মানবের কার্য্য দেখিয়া তিনি মানবকে প্রীতি বা অনুগ্রহের পাত্র করিলেন? ভাগবতের মতে মানুষ চিরদিনই ভগবানের প্রিয়, ভগবান প্রেমের বস্তু, মানুষ যদি ভগবানকে প্রিয় বলিয়া ধরিতে বা বুঝিতে পারে তাহা হইলে তাহার অন্যান্য কার্য্যগুলি আপনি হইয়া যাইবে, এই কথা ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

"যৎসঙ্গ লব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসং।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমং।" ৫-১৮।২১

"ভগবৎপ্রিয় সাধুগণের সঙ্গ হইতে ভগবান্ মুকুন্দের বিক্রম অবগত হইতে পারা যায়, সেই বিক্রমের অসাধারণ প্রভাব, যে সকল পুরুষ শ্রবণ দ্বারা তাহা সেবা করেন, ভগবান বিষ্ণু তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া মানসিক মল হরণ করেয়া দেন। বারম্বার তীর্থাদি সেবা করিলে মলোপশান্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে শারীরিক মলই বিনষ্ট হয়, অন্তর্গত মল সেইরূপই থাকে। ইহাতে কে না ভগবানের বিক্রম সেবা করিবে?"

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য কিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে স্থরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৫।১৮-১২

"ভগবানের প্রতি যাঁহার নিস্কামা ভক্তি জন্মে, দেবতাগণ ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতির সহিত ঐ ব্যক্তিতে আসিয়া বসতি করেন। যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত তাহার ভক্তিও হয় না মহদ্‌গুণাদিও হয় না। সে সর্ব্বদা বিষয় সুখ অন্বেষণ করে, যদি তাহা না পায় মনোরথের দ্বারা তাহার প্রতি বহির্ম্মুখ হইয়া ধাবিত হয় অর্থাৎ মনে মনে বিষয়সুখ কল্পনা করিয়াও সুখ পায়।"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—

"ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে

ন বৈ রুচিন্মে মনসো মৃষা গতি।
ন মে হৃষীকানি পতন্ত্য সৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতাধৃতো হরিঃ ॥"

"হে পুত্র, আমার মুখ হইতে কখন মিথ্যা কথা বাহির হয় না, আমার মন কখন কুপথে যায় না, আমার ইন্দ্রিয়গণও কখনও অসৎপথে পতিত হয় না অর্থাৎ ধর্ম্মশীলতা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, কারণ আমি হৃদয়ের উৎকণ্ঠার সহিত হরিকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া রহিয়াছি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

"জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা।"

"দেহের অভ্যন্তর হইতে জঠরানল যেমন নীরবে ভুক্তদ্রব্যকে জীর্ণ করে, অনিমিত্তা ভাগবতী-ভক্তিও সেইরূপ, কামনার বাসস্থান যে সূক্ষ্ম দেহ তাহাকে নিঃশব্দে ভিতর হইতে ধ্বংস করিয়া ফেলে।"

এইবার আমরা গীতা ও ভাগবতের সাধনতত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারিতেছি। গীতা বলিলেন এই এই সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন কর ও এই এই অসদ্‌বৃত্তি পরিহার কর তাহা হইলেই ভগবানের প্রিয় হইবে। মনে করুন এই সাধনার পথ অনেকে আশ্রয় করিলেন ও সাধনার শেষে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে মানবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভয়ের বা আদান প্রদানের সম্বন্ধ নহে এ সম্বন্ধ প্রেমের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন আমরা ভগবানের প্রিয় চিরকালই আছি। ইহাই মানবের প্রকৃতি "জীবের স্বভাব হয় নিত্য কৃষ্ণদাস"—যদি কোন প্রকারে মানব উপলব্ধি করিতে পারে যে সে ঈশ্বরের প্রিয় তাহা হইলেই ত তাহার জীবন সফল হইবে এবং অন্যান্য সমস্ত সদ্‌গুণ আপনা আপনি তাহার মধ্যে উদয় হইবে। ভাগবত এই মত প্রচার করিতেছেন মানুষ ভগবানের প্রিয় এইটুকু মানুষকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ভগবদ্গীতার উপসংহারও এই যে মানুষ ভগবানের প্রিয়।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥"

গীতা ১৮-৬৫

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন "অতি গম্ভীরং গীতাশাস্ত্রম অশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতম অশক্তবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তত্ত্ব

সারং সংগৃহ্য কথয়তি ত্রিভিঃ” গীতাশাস্ত্র অতীব গম্ভীর সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা কঠিন, এই জন্য পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে সার সংগ্রহ করিয়া বলা হইয়াছে। “মদেকচিত্ত, মদেক ভক্ত ও একমাত্র আমারই উপাসক হও একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর। নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তুমি আমার প্রিয়।”

ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার উপরেই ভাগবতের ভিত্তি। ভগবান প্রিয় ও মধুর। ভগবানের সেই চিন্ময় মাধুর্য্য যদি কোন প্রকারে উপলব্ধি করা যায় তাহা হইলেই জীবন সফল হইবে। প্রেমও অমৃতরূপে ভগবানের এই উপলব্ধির উপরেই নৈতিক উপদেশের সার্থকতা। একদল পিপীলিকা দূরে কোন মিষ্ট দ্রব্যের সন্ধান পাইয়া উত্তরমুখে সারি বাঁধিয়া যাইতেছে, এই পিপীলিকাগুলিকে যদি বলা যায় হে পিপীলিকাগণ! বেদে লিখিত আছে উত্তরমুখে যাওয়া নিষিদ্ধ তোমরা দক্ষিণদিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এ উপদেশ কি তাহারা শুনিতে পারে? তাহাদের উদরে ক্ষুধা, নাসিকায় মধুগন্ধ, তাহারা কি শূন্য আশ্বাসের প্রলোভনে তাহাদের গতি ফিরাইতে পারে? উপদেশে যখন হইল না তখন লাঠি লইয়া যদি তাহাদিগকে আঘাত করা যায় তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইবে, দল ভাঙ্গিয়া চারিদিকে পলাইয়া যাইবে; কিন্তু দক্ষিণদিকে ফিরিবে না। এই গেল দুইটি উপায়। এই দুই উপায়ের নিরর্থকতা বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহা ছাড়া আর একটি উপায় আছে। যে মিষ্ট দ্রব্যের জন্য পিপীলিকাগণ উত্তরদিকে যাইতেছে, যদি তদপেক্ষা মিষ্টতর দ্রব্য দক্ষিণদিকে রাখিয়া সেই মিষ্ট দ্রব্যের ঘ্রাণ পিপীলিকাদিগের নাসিকায় লাগাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে পিপীলিকাগণ আপনি আনন্দের সহিত দক্ষিণমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

মানুষ ইন্দ্রিয়াসক্ত বলিয়া মানুষকে গালাগালি করিয়া কি হইবে? ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ দিয়াই বা কি হইবে? মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক গরিব লোকের বাড়ীর ক্ষুধিত ও লোভী ছেলের মত! তাহাদের ক্ষুধা আছে লোভ আছে। ইহা তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। অথচ বাড়ীতে খাবার নাই। কাজেই তাহারা পেটের জ্বালায় লোকের বাড়ী বাড়ী খাইয়া বেড়ায়। আমরা তাহাদের গালাগালি দিই, উপদেশ দিই, শেষে প্রহার করি, কিন্তু তাহারা করিবে কি? তাহাদের ক্ষুধা যে একটা সত্য জিনিস। তাহার পর একদিন সেই গরিব লোকের বাড়ীতে ভোজ আরম্ভ হইল। সে দিন গরিবের ঘরে

অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিয়াছে, সে দিন আর বাড়ীর ছেলেরা পরের বাড়ী যায় না, সে দিন তাহারা বাড়ীর ভিতরেই থাকে! এই রূপে ধ্যান ধারণা বা শ্রবণ স্মরণ প্রভৃতির দ্বারা যদি আনন্দ পাওয়া যায়, ঈশ্বর হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের অমৃতময় মাধুর্য্য যদি বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ হয় না। এই পথই ভাগবতের পথ।

তবেই দেখা যাইতেছে যে গীতার সাধনা প্রধানতঃ বাহির হইতে ভিতরের দিকে। আর ভাগতের সাধনা ভিতর হইতেবাহিরের দিকে এইটিই মেটোমুটি প্রভেদ।

এই উক্তি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে ভাগবত, গীতার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অধিকারীভেদে শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশেরই সার্থকতা ও প্রয়োজন আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক স্থলেই ভক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩য় স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের নাম ভক্তি-যোগ। সেখানে ভক্তিযোগকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ভাগবতের ভক্তিসাধনায় যে বিশেষত্ব তাহা অতীব স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"ভক্তিযোগা বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেন পুংসঃ ভাবো বিভিদ্যতে॥"

৩।২৯-৬

কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহুতিকে বলিতেছেন, হে ভাবিনি, ভক্তিযোগ বহুবিধ। ইহা বিশেষ বিশেষ মার্গে প্রকাশিত। স্বভাবের গুণে বৃত্তিভেদ ও তদনুসারে পুরুষের অভিপ্রায় ভিন্ন হয়। এই বিভিন্নতা হইতেই ভক্তিরও প্রকার ভেদ।

প্রথমে ভক্তিকে সগুণা ও নির্গুণা এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সগুণা ভক্তি প্রথমতঃ ত্রিবিধ। সাত্বিকী, রাজসী ও তামসিকী। ইহাদের প্রত্যেকটিকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে ভাগ করিলে সগুণা ভক্তি নয় প্রকার হইল। এই নয় প্রকার ভক্তির প্রত্যেকটি আবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নয়টি করিয়া অঙ্গে বিভক্ত। সুতরাং সগুণা ভক্তি একাশীতি প্রকার হইল। কিন্তু এই সগুণাভক্তি ভাগবতের বিশেষত্ব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষত্ব নির্গুণাভক্তি।

"মদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে॥"

৩।২৯।১০

"ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্রে সেই সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামি গঙ্গা সলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্নাও ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদদর্শনবর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ!"

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বকপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥১১

"এই নির্গুণাভক্তি প্রাপ্ত হইলে মানব ভগবানের সহিত একলোকে বাস, ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্য, ভগবানের সমীপে অবস্থান, ভগবানের সমান রূপত্ব এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য এই সকল মুক্তি গ্রহণ করেন না। ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না।"

"স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥" ১২

"ঐ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া যে ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাহা ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল।"

আমরা ক্রমশঃ এই নির্গুণাভক্তিব রহস্য আলোচনা করিব।

পরিবর্ত্তন।

সে দিন আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া কাপড় জামা ছাড়িতেছি, এমন সময় আমাদের চাকর আসিয়া বলিল যে একটি বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়।

"বস্‌তে বল", বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া নীচে গিয়ে দেখি,—অনেকদিনের পুরান বন্ধু রমেশ। রমেশ খুব ধনীর সন্তান। তার বাপ এক গ্রামের

জমিদার। সে আমাদের সঙ্গে একক্লাসে পড়ত, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে বড় একটা মিশত না।

আজ হঠাৎ তাহাকে আমার বৈঠকখানায় দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। আর ও বিস্মিত হইলাম তার পরিবর্ত্তনে। চুলের সে পারিপাট্য নাই। পোষাকও আড়ম্বর শূন্য, এমন কি স্বভাবটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত।

আমাকে দেখিয়া সে কাতর কণ্ঠে বলিল, "নবীন আমাকে ক্ষমা কর ভাই, আমাকে ক্ষমা কর।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি অপরাধ করেছ, যে ক্ষমা করব?"

সে কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমার সব চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার সমস্ত দুর্দ্দশার কথা পড়েছিলুম, কিন্তু একটা জবাব পর্য্যন্ত দিই নি! তুমি মাত্র ৫০০৲ টাকা ধার চেয়েছিলে, একবার আধবার নয়, অমন পঞ্চাশ বার তুমি তোমার অভাবের কথা লিখেছিলে। কিন্তু আমি সে সব চিঠি পড়েই ছিড়ে ফেলেছিলুম!"

রমেশের উপর বাস্তবিকই আমার বিতৃষ্ণা জন্মেছিল, কিন্তু আজ তার আনুশোচনায় আমার মন ভিজে গেল। আমি বললুম, "তার আর কি হয়েছে—ভগবানের কৃপায় আমি একটি চাকরি যোগাড় করেছি। এখন আমার দিন একরকম চলে যাচ্ছে।"

রমেশ কি ভাবিয়া বলিল, "তুমি বোধ হয় জান পিতার মৃত্যুর পর আমি কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলুম।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, কিছু কিছু শুনেছিলুম বটে। তোমার এই পরিবর্ত্তনে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি তা আর কি বলব।"

রমেশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "না নবীন, এ এত সুখের পরিবর্ত্তন নয়! এই পরিবর্ত্তনের মূলে আমি একটি এমন জিনিষ হারিয়েছি যা জগতে দুর্লভ। তবে শোন, বলিয়া রমেশ বলিতে আরম্ভ করিল;—আমাদের পুরাণ চাকর হরিয়াকে মনে পড়ে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ মনে পড়ে। সেই, যে তোমার জন্য টিফিনের সময় খাবার নিয়ে যেত? সে কি তোমাকে বড় ভাল বাসত, না?"

"হাঁ সেই বটে", বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া রমেশ আবার বলিল, 'সে আর নাই নবীন, সে আর এ জগতে নাই!" এই বলিয়া রমেশ জানালা দিয়া পথের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "কেন, তার কি কোনও অসুখ বিসুখ করেছিল ?"

"না, অসুখ বিসুখ কিছুই হয় নি। "তবে শোন", বলিয়া রমেশ ভারী গলায় বলিতে লাগিল, "পিতার মৃত্যুর পর আমার স্বভাব আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল।

চারিদিক থেকে পঙ্গপালের মত, কুচরিত্র মোসাহেবের দল এসে আমাকে ঘিরে ফেললে। অজস্র টাকা ব্যয় হতে লাগল। আমি বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম।"

"কর্ম্মচারীরা এই সুযোগে সকলেই কিছু না কিছু ফাঁকি দিল।"

"সেই দুঃসময়ে কেবল বৃদ্ধ হরিয়া", রমেশের গলা বাধিয়া যাইতেছিল, কষ্টে সে বলিতে লাগিল, "কেবল বৃদ্ধ হরিয়া তখনও পূর্ব্বেরই মতন আমার বিশ্বস্ত ছিল।"

"তুমি বোধ হয় জান, সে ছেলেবেলা থেকেই আমাকে আপনার ছেলের মত তিরস্কার করত। আমার অধঃপতনে তার বুকে শেল বিঁধেছিল। সে অনেকবার সেই স্বভাব বশতঃ দু এক কথা বলত। তদুত্তরে আমি কেবল তাকে গালি দিয়ে আমার সামনে থেকে সরে যেতে বলতুম।"

"আর আমার যে সব মোসাহেব ছিল, তাহাদের মধ্যে নিমাই চরণ সকলের চেয়ে অধিক পাপী। তার সংস্পর্শেই আমার সমস্ত অবনতি হয়েছিল।

"বৃদ্ধের সমস্ত রাগ, সমস্ত ঘৃণা এই নিমাই চরণের উপর পড়েছিল। নিমাইকে বাগে পেলে সে যেন ছিঁড়ে ফেলে, এমনি ভাব তার মুখে চোখে প্রকাশ পেত। নিমাইও হরিয়াকে দেখলে জ্বলে যেত।"

"তুমি বোধ হয় শুনে থাকবে পিতার জীবিত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে ওপারের জমিদারদের একটা খুব বড় গোছের মোকদ্দমা চলছিল। পিতার মৃত্যুর ঠিক একটি বৎসর পরেই আমি এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করলুম। বন্ধুদের অনুরোধে একটা খুব বড় গোছের ভোজের আয়োজন হল। বিলাসিতার কোনও সরঞ্জামই বাকি রইল না।"

"বৈঠকখানায় বসে সকলে আনন্দে গা ভাসায়ে দিয়েছিলুম, এমন সময় নিমাই চরণ চক্ষু রক্ত বর্ণ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে এসে সেই ঘরে প্রবেশ করল। তার সেই সময়কার মূর্ত্তি বড় ভয়ানক হয়েছিল।

আমি বলিলাম, "কি হে নিমাই—কি হয়েছে ?"

সে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বল্‌লে, "আমি আর এখানে আসব না। তোমার সখের চাকর হরিয়া শুয়ার আমাকে Insult করেছে।"

"আমার মেজাজটা তখন ভারী গরম ছিল। আমার প্রধান ইয়ারের অপমান,—তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের ডাক পড়ল।"

তারপর সেই বৃদ্ধ পিতৃতুল্য হরিয়াকে কি শাস্তি দেওয়া হল জান?" বলিয়া রমেশ বালকের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "যদি কষ্ট হয় ত বলে কাজ নেই।"

"আমাদের আবার কষ্ট, হা ভগবান!" বলিয়া রমেশ চোখ মুছিয়া আবার বলিল, "আমার সামনে নিমাই তাকে জুতা মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল।

আমাদের বাড়িতে তার চাকরি ঘুচে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে বেড়াচ্ছিলুম। ভৃত্যকে তাড়িয়ে নেশা ভাঙ্গলে পর মনে কতকটা অনুশোচনা এসেছিল। নদী-তীরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলুম—কাজটা ভাল হয় নি। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে আমি পাচারি করছি এমন সময় সহসা বন্দুকের আওয়াজে আমি চমকে উঠলুম।

সম্মুখে চেয়ে দেখি অদূরে গাছের ঝোঁপের ভিতর দিয়ে শাদা শাদা ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আর অদূরে একটি লোক ধুলায় পড়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছে।

তাড়াতাড়ি লোকটির কাছে গিয়ে যা দেখলুম—সে কথা বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। দেখলুম—বেচারা হরিয়ার বক্ষ ভেদ করে গুলি চলে গেছে।

আমাকে দেখে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে হরিয়া বল্‌ল, "খোকাবাবু তুমি বাড়ী যাও। আবার কোনও বিপদ ঘটতে পারে।"

আমি বৃদ্ধের মস্তক নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে বললুম, "আমার জন্যে কেন প্রাণ দিলে হরিয়া?"

ক্ষীণ কণ্ঠে হরিয়া বল্‌ল, "তুমি তার কি বুঝবে? এখন আমার একটি কথা শুনবে কি?"

আমি বললাম, "তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না হরিয়া, তোমার কথা আমি বুঝেছি। আর না হরিয়া, এবার তোমার পুণ্যে এ হতভাগা মুক্তি পাবে।"

অতিকষ্টে ক্ষীণ হাস্য রেখা অধরপ্রান্তে এনে হরিয়া বল্‌ল, "আর একটি কথা, কে তোমাকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল জান?—নিমাইচরণ—

তোমার সেই বড় আদরের নিমাই চরণ। ওপারের জমিদারেরা টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে এই কাযে নিযুক্ত করেছিল।

আমি পাগলের মত বলে উঠলুম, "এই পাষণ্ডের কথা শুনে আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি হরিয়া? ভগবান্! আমার নরকেও স্থান নেই! সত্যই নবীন আমার নরকেও স্থান নেই।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের চাকর কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালিয়া টেবিলের উপর দিয়া গেল। আলোতে দেখিলাম, রমেশের দুই চোখ দিয়া জলধারা বহিতেছে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

দুইখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

(আলোচনা)

প্রকৃতি পরিচয়। ঢাকা অতুল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান, ৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ও ইস্‌লামপুর রোড, ঢাকা।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় আজ প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বহু প্রাচীনকালের "বঙ্গদর্শন" হইতে সম্প্রতি নানা পত্রিকায় তাঁহার যে আসনটি পূর্ণ রহিয়াছে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকের তাহা নাই। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব। যে দুই একজন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক আছেন তাঁহাদের সকলের হয় ত সমান প্রকাশের ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞান বলিতে প্রথমে যে একটা দুরুহ শব্দবহুল ভাষা সমষ্টির নাম মনে আইসে সাধারণ বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখকগণ আমাদিগকে সে ভীতি হইতে মুক্তিদান করিতে পারেন না। তা' ছাড়া কলেজের অধ্যাপকগণ নিজেদের অধ্যাপনায় এত ব্যস্ত থাকেন যে, কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়কে ইংরাজি হইতে বাংলায় বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়াস তাঁহাদের সময়ের বাহিরেই রহিয়া যায়। কিন্তু এই ভারটি অধ্যাপকগণেরই গ্রহণীয়। কারণ ছাত্রগণকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া যাঁহারা পাকা হইয়া গেছেন, পাঠকগণের মাথায় সহজে একটা জটিল বিষয়কে ঢুকাইতে হইলে তাঁহাদের হাত ব্যতীত আর উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইতেছে সকলের বুঝাইবার শক্তি সমান নহে

এবং সকলে সময় করিয়াও উঠিতে পারেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার অধ্যাপনা সমাপনান্তে প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত সময় করিয়া লইয়া, এতদিন ধরিয়া অতি সুন্দরভাবে জটিল বিষয়গুলিকে পাঠকের বোধগম্য করিয়া বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-বিহীন বাংলা ভাষায় সরলভাবে প্রকাশিত করিয়া তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন তাহা বঙ্গবাণীর সত্য রত্ন। বিজ্ঞানের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাবান্ না হইলে এই একাগ্রতা কদাপি সম্ভবে না। জগদানন্দ বাবু সত্যই বাণী মন্দিরে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর দ্বারপ্রান্তে শ্রদ্ধাবান্ পূজারী। সম্প্রতি বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের অভাব হইলেও পরে যে ইহা যথার্থ স্থায়ী আসনলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি, অধ্যাপনা শেষ করিয়া সন্ধ্যায় জগদানন্দ বাবু খাতা পেন্সিল লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বাণীর একনিষ্ঠ সাধক ব্যতীত ইহা কদাপি সম্ভব হয় না।

"প্রকৃতিপরিচয়" গ্রন্থটি লেখকের পূর্ব্ব ও আধুনাতন লিখিত বিচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্ত চয়ন। ইহাতে বিজ্ঞানের প্রাচীন ও আধুনিক নানা সরস তথ্য সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানের মন্দিরের চৌকাঠে যাঁহারা পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এবং মন্দিরের ভক্তগণের নিকট ইহা তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। এই প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের যে কোনটি বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলি পাঠ না করিলেও চলে। প্রত্যেক প্রবন্ধ নিজেই এক একটি সম্পূর্ণ সরস সন্দর্ভ।

সকল মাসিকে এবং সপ্তাহিকে "প্রকৃতি পরিচয়ের" যে সকল সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি যে বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হয় ত আর পঞ্চাশ বৎসর পরে যখন আধুনিক নাটক নভেলের স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিবে, তখন ইহা মাথা তুলিয়া জাগ্রত থাকিবে।

"হিতবাদী"র ভাষায় আমরাও বলিতেছি "এরূপ সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বিলাতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে এক সপ্তাহ কালের মধ্যে উহার অন্যূন দশ সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইয়া যাইত। এ দেশের শিক্ষিত সমাজে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আদর না হইলে ঘোর কলঙ্কের বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই।"

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে সিদ্ধহস্ত সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী মহাশয় গ্রন্থ প্রারম্ভে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা আধুনিক বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ভূমিকার একাংশে আছে, "কত প্রমাণ পরম্পরা সংগ্রহের পর, কত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও আয়াস সাধ্য পরীক্ষার পর, কত বিচার-বিতর্ক-বিতণ্ডার পর বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতিদেবীর রহস্যলোক হইতে গুপ্ত তত্ত্বের সংবাদ সংকলন করেন, ইতরলোকে তাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্ম্মের গুরুত্ব নির্দ্ধারণও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অভিনব সত্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের যে বিস্ময়, যে আনন্দ জন্মে, ইতরজনে তাহার অল্পাংশের অনুভবেও অধিকারী নহে। যে আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের লোমহর্ষ উপস্থিত হয় সেই আবিষ্কারের সংবাদে অবৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে না। বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হইয়া নিরূপণ করেন, সূর্য্যের দূরত্ব নয়কোটী মাইল, অবৈজ্ঞানিক তাহা নির্ব্বিকারে শুনিয়া থাকেন এবং নব্বই কোটী হইলেও তাহার বিস্ময়ের মাত্রা অধিক হয় না। আলোক সেকেণ্ডে নয় ক্রোশ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক অসাধ্যসাধনের স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধিত হন, অবৈজ্ঞানিক অতি অকাতরে তাঁহার সেই অসাধ্যসাধন সংবাদ মানিয়া লয়। তাহার কোন ইন্দ্রিয় কোনরূপ বিকার লক্ষণ দেখায় না! বিশ্বব্যাপী ঈথরের অথবা অভেদ্য অচ্ছেদ্য পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক যখন আস্ফালন করেন, তাঁহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন পুঁথির ছেঁড়া পাতা খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহার চৌদ্দপুরুষ পূর্ব্বে এই তথ্য আবিস্কৃত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই! সেই বিশ্বব্যাপী ঈথর কঠিন পদার্থ না তরল পদার্থ এই দারুণ সমস্যার সমাধানে বসিয়া যখন বৈজ্ঞানিকের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, অথবা সেই পরমাণুগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইলেক্ট্রনের গুঁড়ায় পরিণত হইতেছে দেখিয়া যখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, তাঁহার অকারণ দুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়া তাঁহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হন। তাঁহার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাঁহাকে কোনরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক মনে করিয়া তাঁহার বাক্য বেদবাক্য বলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে মানিয়া লয়। পাগল ঠাওরানো বরং সহা যায়; কিন্তু এই নির্ব্বিকারতা একেবারে অসহ্য। নির্জ্জন দ্বীপের সমস্ত ক্লেশ আলেকজান্দার সেলকার্ক সহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মত গোটা মানুষকে নূতন দেখিয়াও পশু পাখীতে বিকারলক্ষণ দেখায় নাই, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল।

অনধিকারীর নিকট তত্ত্বকথা প্রকাশে তত্ত্বদর্শীরা চিরকালই কুণ্ঠিত এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিকের বার্ত্তা উপস্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সঙ্কোচ বোধ করেন। যত সহজ ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপদিষ্ট হউক না, অনধিকারী, যে বৈজ্ঞানিক সত্যের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। জহুরি ব্যতীত ইতর লোকে মণিমাণিক্যের সমুচিত আদর করিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। মুক্তার মালা সকলের গলায় শোভা পায় না। নরের নিকট উহার আদর হইতে পারে, কিন্তু নরের শাখাবিহারী কুটুম্বের গলায় উহার যথোচিত আদরের সম্ভাবনা কিছু বিরল!

এ সমস্তই সত্য। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সময়ে অসময়ে ইতর জনকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার সম্মুখে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গুরুগম্ভীর তত্ত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার প্রচুর উদাহরণ আছে।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করিতেছি এইরূপ বৈজ্ঞানিক পুস্তক, যথার্থ সমাদৃত হইয়া বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে। ইহা সম্প্রতি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের I. Sc. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে পুস্তকখানির কিরূপ সমাদর হওয়া উচিৎ। প্রত্যেক লাইব্রেরি ও বিদ্যালয়ে ইহা গ্রহণ করা হউক্ এবং বঙ্গদেশে যথার্থ বিজ্ঞানচর্চ্চা ফিরিয়া আসুক্ ইহাই আমাদের শেষ কথা।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার। মূল্য ১।০।

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তি স্থান;—অতুল লাইব্রেরি ৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ও ইস্‌লামপুর রোড, ঢাকা।

বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন, আমাদের স্বদেশীয় অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের নাম পৃথিবীর সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজে সুপরিচিত। যে স্থানে বিজ্ঞানচর্চ্চা হইয়া থাকে সেস্থানেই জগদীশচন্দ্র সম্মানিত হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুরোপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের ভারতবর্ষীয় এই ভাবিয়া আমরা স্বভাবতঃ গর্ব্বিত হইতে পারি বটে কিন্তু তিনি কি আবিষ্কার করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, এ সংবাদ অতি অল্প বঙ্গবাসীই রাখিয়া থাকেন। তাঁহার আবিষ্কারগুলি আমাদের নিকটই যদি

অজ্ঞাত থাকিয়া যায় তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা এখনও যদি উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত সম্মান দান করিতে না পারি তবে সে লজ্জা কেবল বাংলা দেশের নহে—সমগ্র ভারতবর্ষের। বাংলাদেশে যদিও বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্র বিস্তৃত নহে, যদিও আমরা এবং আমাদের স্কুল কলেজের অধ্যাপকগণ স্ব স্ব শিক্ষার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তথাপি আমাদের দেশের লোকে কি নূতন আবিষ্কার করিলেন,—ইহা জানিবার নিমিত্ত যদি কৌতুহল জাগ্রত না হয় তবে আমরা কি করিয়া গর্ব্ব করিব ?

জগদীশচন্দ্র যে সকল অপূর্ব্ব আবিষ্কারাবলী দ্বারা বিজ্ঞান জগতে ঐক্যবাদের কথা বলিতেছেন উক্ত পুস্তকে তাহারই কতকগুলি, জগদানন্দবাবু বঙ্গীয় পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। অনেকে মনে করিবেন, "উহা উচ্চ বিজ্ঞানের প্রমাণপূর্ণ; আমরা বুঝিব কি করিয়া ?"

কিন্তু জগদীশবাবু যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সহজে যদি কেহ বুঝিতে পারে, সে একমাত্র ভারতবাসী। কারণ প্রমাণ এবং যুক্তিতর্কের বিষয় যাহাই হউক, মোট কথাটা বুঝিতে হইলে ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের তপোবনে যে একের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাই নূতন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উদ্ভিদ, জড় এবং জীব সকলেরই যে অনুভূতি আছে, উহাদের মধ্যেও যে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাইতেছে, জগদীশচন্দ্র তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। বিচিত্র বিভেদ-বিচ্ছেদের বিভাগকারী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আচার্য্য বসু মহাশয়ের এই সাম্যবাদের অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেছেন। বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কারগুলিকে লইয়া প্রায় চার পাঁচখানি ইংরাজি পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে "Plant Response" ও "Comparative Electro-Physiology" নামক পুস্তক দুইখানির বিষয়গুলি আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত জগদানন্দ বাবু আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তা'ছাড়া বসু মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তকের নানা অংশ এই পুস্তক খণ্ডে স্থান পাইয়াছে।

এইরূপ জটিল বিষয়গুলি ইংরাজিতে যেরূপভাবে বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে, বঙ্গভাষায় তদ্রূপ প্রমাণ যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ করা যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা মনে করিতেই পারি না—বাংলা ভাষায় জগদানন্দবাবু, বসু মহাশয়ের আবিষ্কার-গুলির প্রমাণ যুক্তি অটুট রাখিয়া কেমন করিয়া অত সরলভাবে লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। জগদানন্দবাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য সুলেখক ব্যতীত অপর কাহারো দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইত না এবং হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যে কয়জন জগদীশচন্দ্রের নবাবিষ্কার বঙ্গভাষায় মাসিকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই সরল করিয়া এবং সহজ করিয়া বিষয়টিকে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বিচিত্র শব্দাকীর্ণ, বহু প্রমাণযুক্তির অসজ্জিত ভারে তাঁহারা প্রবন্ধকে পাঠকগণের নিকট দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিজ্ঞান তথ্য-জ্ঞানে কৃতী এবং লিপিকুশল জগদানন্দ বাবু এই বিষয়ে যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ।

গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে গ্রন্থকার, আচার্য্য বসু মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্মুখবর্ত্তী জগদীশ বাবুর তৈলচিত্রের প্রতিকৃতি খানিও সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি তিনটি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বিদ্যুৎ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে উদ্ভিদের সজীবতার প্রমাণস্বরূপ জীবের সহিত তাহার সাড়ার একতা, ও অন্যান্য প্রমাণসহ ১৪টি সন্দভে পূর্ণ তৃতীয় খণ্ডটি সজীব ও নির্জ্জীব, জড় ও জীবের আঘাত অনুভূতি, অবসাদ, দৃষ্টিতত্ত্ব, দৃষ্টিবিভ্রম ও ফোটোগ্রাফি এই ছয়টি সম্পূর্ণ।

উক্ত তিন খণ্ডের প্রত্যেক প্রবন্ধ হইতেই নূতন কিছু না কিছু জ্ঞানলাভ করা যায়। প্রবন্ধগুলি, সাধারণ মাসিক পত্রিকার বাজে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অসংবদ্ধ প্রলাপ হইতে বিশেষরূপে বিশিষ্ট।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় গ্রন্থের প্রারম্ভে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। সংক্ষেপে অথচ সারগর্ভ ভাষাদ্বারা ইন্দুবাবু, আচার্য্য বসু মহাশয়ের জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন সত্য সমূহের যে বিবরণ দান করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থপাঠেচ্ছু প্রত্যেকেরই সর্ব্ব প্রথমে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

জগদানন্দবাবু ইতিপূর্ব্বে এবং সম্প্রতিও বাংলা মাসিকে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নবপ্রকাশিত "প্রকৃতিপরিচয়ে"র ন্যায় আরও কয়েকখানি—গ্রন্থ দেখিতে আমরা একান্ত উৎসুক আছি। আশা করি গ্রন্থকার আমাদের এই অনুরোধ—রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষাকে বৈজ্ঞানিক সম্পদে ভূষিত করিবেন।

পরিশেষে আমরাও কবির ভাষায় জগদানন্দ বাবুর সহিত সমান সুরে বসু মহাশয়কে বলিতেছি ;—

"হে তপস্বি, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
'উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!' ডাক শাস্ত্র অভিমানী জনে
পণ্ডিতের পণ্ডতর্ক হ'তে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও যত শিষ্যদলে—
একত্র দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
নিষ্ঠায় শ্রদ্ধায় ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত-চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধশান্ত গুরুর বেদীতে!"

সত্য সাধনা।

—:*:—

আমার করে হবে বল সত্য-সাধনা!
নির্ব্বাসনে বাঁধে মোরে মিথ্যা কামনা!
　তোমার সে পথ নয় ত সোজা,
　বইতে হবে অনেক বোঝা—
সইতে হবে অনেক বাধা—না মানি মানা!
　ধূলায় পড়ে লুটেলুটে,
　বল যে আমার যায় হে টুটে,
অধীর করে তোলে আমায় মিথ্যা ভাবনা!
আমার কেমন করে হবে বল সত্য-সাধনা!
　দুখের পরে দুঃখ এসে,
　জ্বালায় জ্বালায় সর্ব্বনেশে,
পরকে করে আপনা সে, অজানারে জানা!
　তোমার আলোয় মেলে আঁখি,
　মেটাব মোর যাহা বাকি,
থামাও তুমি এবার ওগো ইহার কাঁদনা!
নইলে কেমন ক'রে হবে বল, সত্য সাধনা!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

চীনদেশে স্ত্রীশিক্ষা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের অবস্থা একেবারে নগণ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা জগতের একটী স্বাধীন রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কালক্রমে চীনদেশবাসীর রাজ্যে ও জাতীয় জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষাই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীশিক্ষা চীনদেশে যেরূপ দ্রুতগতিতে ও অটলভাবে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

দশ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত কোন বালিকা বিদ্যালয় ছিল না, কেবলমাত্র কতিপয় ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্মপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত কয়েকটী মাত্র উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু চীনদেশের লোক সংখ্যার তুলনায় এই বিদ্যালয় কয়টী সমুদ্রে জল বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হইত।

বর্ত্তমান সময়ে চীনদেশের প্রত্যেক নগরে এমন কি প্রত্যেক পল্লীতেই বালিকাদিগের জন্য স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত আরও অনেক উচ্চ বিদ্যালয় রহিয়াছে, যে সমস্ত বালিকাগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে ঐ সকল বিদ্যালয় হইতেই উপাধি প্রদান করা হইয়া থাকে। Secondary বালিকা বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সম্প্রতি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্কুল ও কলেজ সমূহে দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল বালিকাদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রকৃত সারবান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

চীনদেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রধান কারণ এই যে ইহার পরিচালন ভার কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। যে সকল লোক দেশের শিক্ষা বিস্তারকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তন্মধ্যে প্রায় সকলেই জাপান ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের শিক্ষিতা স্ত্রীলোক; কিন্তু ক্রমশঃ দেশীয় বালিকারা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সকলেই এক্ষণে উপলব্ধি করিয়াছেন যে উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রদানই চীনদেশের উন্নতির সর্ব্ব প্রধান কারণ। সুতরাং

যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা দেশে সর্ব্বতোভাবে প্রদত্ত হইতে পারে তজ্জন্য দেশীয় কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন।

উদ্যমশীলা ও প্রতিভাশালিনী বালিকাগণকে জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রেরণ করিবার ব্যয় সংকুলানের নিমিত্ত বহু সভাসমিতি স্থাপিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই এই সকল বালিকাদিগের মধ্যে অনেকে য়ুরোপে ও আমেরিকার শিক্ষা শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং জন্মভূমির কল্যাণ সাধন জন্য কতিপয় মঙ্গলকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে গেলে চীন সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্য তত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডাক্তার লিয়ুস কিয়াং মহাশয়ের শিক্ষিতা পত্নীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি একজন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। য়ুরোপ ও আমেরিকা উভয় স্থান হইতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি স্বামীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ এবং তাহার গুরুভার ও শ্রমজনক সরকারী কার্য্য সম্পাদনের প্রধান সহায়। আমরা চীনদেশের স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলন ও তৎপরতার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিতেছি। এই আন্দোলনের ফলেই চীনদেশবাসিগণ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত য়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দূরদেশে প্রেরণ করেন। এই ইতিবৃত্ত হইতে চীনদেশের স্ত্রীশিক্ষার ক্রমোন্নতির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চীনদেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস।

১৮৯৮ খৃঃ সাঙ্গাই নগরের কর্ত্তৃপক্ষ ও বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দেশীয় ব্যক্তিবর্গের স্থাপিত বিদ্যালয়ের মধ্যে এইটীই প্রথম! কিয়ৎকাল এই বালিকা বিদ্যালয়টীর ব্যয়ভার চাঁদার সাহায্যে বহন করা হইয়াছিল কিন্তু প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হইলে পর বিদ্যালয়টীর সুন্দররূপে পরিচালনভার ‘পরিদর্শক সমিতির’ স্ত্রীসভ্য দিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তাহারাও তাহার উন্নতি ও স্থায়ীত্বের নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ ও প্রযত্নের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিতে থাকেন। এবং য়ুরোপীয় শিক্ষিতা মহিলাদিগের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েন। দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়টী স্থাপন কালে দেশবাসীর এত ব্যগ্রতা ও

তৎপরতা সত্ত্বেও এমনকি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিবসেই ১৬ জন বালিকা যোগদান করিলেও ইহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ পরলোকগতা সাম্রাজ্ঞী টাসীহাসি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন, তাহার মনে এই ভাব উদিত হইয়াছিল যে বিদ্যালয়টি দ্বারা মাঞ্চু বংশের ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। যদিও বিদ্যালয়টী প্রথম দুই বৎসর সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাহার আশু উচ্ছেদের আদেশ প্রদান করেন। সাম্রাজ্ঞীর আদেশ সত্ত্বেও প্রজাগণ আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিলেন না। দুইটী বালিকা বিদ্যালয়ের আদর্শে আরও দশটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সময় চীন দেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের ইচ্ছা খুব বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল; এমন কি যে সকল বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল তদ্বারা প্রজাদিগের অভাব সম্যক্ পূরণ হয় নাই। সুতরাং ১৯০৪ সালে আর একটী স্কুল স্থাপিত হয়। তৎপর ১৯০৫ সালে ৪টী ও ১৯০৬ সালে আরো চারিটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইরূপে ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে দৃষ্ট হয় যে, যে সাঙ্গাই নগরে একটীমাত্র বালিকা বিদ্যালয় রাখিবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল সেই স্থানেই বারটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯০৭ সালে এই বিদ্যালয় সমূহে ছয়শত বালিকা অধ্যয়ন করিত। বর্ত্তমানে বালিকার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অচিরেই সাঙ্গাই নগর স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের কেন্দ্র হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই কলেজ সমূহে দেশীয় বালিকাদিগকে শিল্প, চিকিৎসা বিদ্যা ও অপরাপর বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

অবশেষে প্রজাবর্গের উৎসাহে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং গবর্ণমেণ্টই তাহাদের ঈদৃশ মহৎ কার্য্যের বিস্তৃতি কল্পে সাহায্য করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত।

মহাপুরুষ।

—:*:—

দীপ্ত তপন অস্ত গিয়াছে কনকগিরির পার ;
অভ্র উরসে স্নিগ্ধ জ্যোছনা ঢালিয়া রজতধার।
বিশ্বভরা এই দুঃখশোকরাশি আর না সহিতে পারি
কে ওই যুবক অধীর পরাণে ছুটেছেন গৃহ ছাড়ি ?
ত্যজি পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র ত্যজিয়া সিংহাসন,
নূতন স্বর্গ ধরায় হরষে করিল প্রবর্ত্তন।
তখনো নামেনি সন্ধ্যা-আঁধার তখনো ফুটেনি তারা ;
শ্রান্ত তপন তখনো ডুবেনি ঘুচেনি কিরণধারা।
সান্ধ্য রবির রক্তিম আভা মাখিয়া দীপ্ত বদনে,
কে গো সহিছেন ক্রুসের যাতনা হাস্য ফুল্ল আননে ?
নূতন ধর্ম্ম প্রচারি ধরায় গাহিয়া নূতন গান ,
মৃত্যুকালেতে শত্রুরে ক্ষমি ত্যাজিলেন নিজ প্রাণ।
চন্দ্র তখনো নেয়নি বিদায় গগনের কোল হতে ,
ঊষার মিনতি তারাগণে ধরি রাখিয়াছে কোন মতে।
হিরণ বরণ তপন তখনো খুলেনি পূরব দ্বার ;
তখনো ঝরেনি গগন-অঙ্গে রক্ত-কিরণ-ধার।
এহেন সময়ে কে ওই যুবক ছুটেছে মেদিনা-পথে
ভাসাইতে এই বিপুল বিশ্ব নূতন ধর্ম্মস্রোতে ?
মধুর নিশীথে পূর্ণচন্দ্র গগনে হাসিছে বসিয়া ;
লক্ষ তারকা অম্বরমাঝে রয়েছে নীরবে চাহিয়া।
স্নিগ্ধ-গন্ধ কুন্দ-সুবাসে মুগ্ধ সারাটি বিশ্ব ;
কে ওই যুবক জগতবাসীরে দেখাইছে নব দৃশ্য ?
মস্তক হ'তে দরদরধারে ঝরিছে শোণিত-ধার ;
তবু ও যুবক বিলাইছে প্রেম প্রহারকারীরে তার।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

যুগধর্ম্ম।
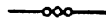
আমরা ভারতবাসী; বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে আমরা অতি নগণ্য জাতি। আমাদের এই দেশে চৈতন্য ও রামমোহন জন্মিয়াছেন, সীতারাম প্রতাপাদিত্য ও শিবাজি জন্মিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জন্মিয়াছেন, প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধ্য ও আধুনিক যুগে রাষ্ট্রক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধনক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাঁদের অপেক্ষা খুব বেশী শক্তিশালী পুরুষ পৃথিবীর আর কোন্ দেশে জন্মিয়াছে? কিন্তু তবুও আমরা নগণ্য; বুদ্ধির অভাবে নহে, জ্ঞানের অভাবে নহে, ত্যাগের অভাবে নহে, শুধু একটা জিনিসের অভাবে। যে জিনিসটা হইতেছে যুগধর্ম্ম।

এই বিশাল ভারত আদিম সভ্যতার জন্মভূমি। পৃথিবীর আর সমস্ত জাতি যখন নিদ্রিত, ভারত তখন জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রবুদ্ধ; যখন আর সকলে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পালন-কর্ত্তৃত্ব ও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কল্পনাতেও আনিতে পারিত না, তখন ভারতের আর্য্যঋষি তপোবনে বসিয়া বেদ-মন্ত্রের সূক্ত প্রকাশ করিতেন এবং যাহা মানব-বুদ্ধির একান্তই দুরধিগম্য সেই ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধি সম্বন্ধে আপনাদের অমানুষী প্রতিভা ও চিন্তা-শক্তি চালনা করিতেন। তখন প্রেমানুশীলন-রত অতি উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য হইতে সমাজের নিম্নতম স্তরের সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এমন একটা শৃঙ্খলা ছিল, সমাজের প্রত্যেক বিভাগের অনুকূল শক্তির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্যের লীলা চলিত, যাহা দ্বারা সমগ্র সমাজ প্রমত্ত নদীস্রোতের ন্যায় কালবক্ষে অতি তীব্রগতিতে প্রবাহিত হইত, এবং সম্মুখের যত কিছু মলিনতা ও আবর্জ্জনাকে আপনার কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে ধুইয়া লইয়া যাইত। তাহার পর কত বৎসর, কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সেই বিশ্ববিশ্রুত প্রাচীন সভ্যতা, বিশিষ্টের কাছে তাহার স্মৃতি এবং সাধারণের কাছে তাহার কঙ্কাল-মাত্রকে রাখিয়া অনন্ত কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমরা সেই স্মৃতি ও কঙ্কালকে অবলম্বন করিয়া একান্ত তন্ময় হইয়া আছি, অথচ ইহার ভিতর হইতে আমরা আমাদের বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠাকে এই কর্ম্ম কোলাহল-মগ্ন জগতের সমক্ষে কিরূপে যে সার্থক করিয়া তুলিব, ব্যাপকভাবে সেবিষয়ে কোন চিন্তাই করিতেছি না। আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতা এক হস্তে তাহার

শিল্পসাহিত্য ও বাণিজ্য সমৃদ্ধি লইয়া এবং অপর হস্তে তাহার সাম্য স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার লইয়া, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দৃপ্তভাবে যে নৃত্য করিতেছে, তাহাতে আমাদের অচঞ্চল বিশিষ্টতা মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে বটে, ধমনীতে রক্তের স্রোত থাকিয়া থাকিয়া একটু প্রবল হইয়া উঠিতেছে সত্য, কিন্তু তবুও আমরা আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের আদর্শকে নব যুগের নবীন সাধন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে সজীব এবং সচল করিয়া তুলিবার একটা মর্ম্মপ্লাবী প্রবল আগ্রহ কোথাও প্রকাশ করিতেছি না।

উন্নতির পর অবনতি এবং অবনতির পর উন্নতি উভয়ই জগতের নিয়ম। আমরা এই নিয়মে অবিশ্বাস করি না। আমরা এটা বেশ বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছি যে, আমাদের বর্ত্তমান অবনতির পর উন্নতি অবশ্যই আসিবে, এবং তাহা নিতান্ত দূরবর্ত্তীও নহে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই বিশ্বাস যে, আমাদের এই উত্থান, পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া হইবে না। আমরা যে উঠিব, তাহা গতানুগতিক সংস্কার, দেশাচার এবং শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মাদি পালনের ভিতর দিয়াই উঠিব।

কিন্তু এ দেশের যথার্থ জ্ঞানী এবং কর্ম্মী মহাপুরুষ যাঁহারা তাঁহারা এ প্রকার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, "তোমরা যদি জাতীয়-জীবনের সজীবতা রক্ষা করিতে চাও, তবে এই জগতের অভিব্যক্তিশালী গতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পার না। দেশ ও কালের যে স্থানটাতে তোমরা আসিয়া পড়িয়াছ, যদি তাহার সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল অভিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাও তবে রাষ্ট্রে এবং সমাজে, সাহিত্যে এবং শাস্ত্রে সকল প্রকার দেশ কালোপযোগী পরিবর্ত্তনকে তোমাদের মানিয়া লইতেই হইবে।"

বাস্তবিক এ কথা অযথার্থ নহে। যে ব্যক্তি বনে বাস করে, অযত্নলভ্য বনজাত ফলমূলে তাহার জীবন ধারণ হইতে পারে, কিন্তু সে যদি এই কর্ম্ম-স্রোতময় মানব-সমাজে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়, তবে সেই ফলমূলের আহরণ করিতে গেলেও তাহার অর্থের প্রয়োজন হয়, এবং সেই অর্থ সাধারণ জনমণ্ডলীর সহিত একই নিয়মে বাধ্য হইয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে উপার্জ্জন করিতে হয়। সে যদি বলে আমি ফল সংগ্রহ করিব বটে কিন্তু অর্থ সংগ্রহ করিব না, তবে তাহার ভাগ্যে উপবাস ও মৃত্যু ভিন্ন আর কি ঘটিতে পারে? আমরাও একদিন এই সমুদ্র-মেখলা, সুজলা সুফলা ভারতভূমির সামগান মুখরিত

ছায়াস্নিগ্ধ তপোবন হইতে মনুষ্যত্বের আহার সংগ্রহ করিতাম; তাহার পর কালচক্রের অমোঘ নিয়মে বহু বিপ্লবের উপর দিয়া, বর্ত্তমানের সর্ব্ব জাতির এই মিলন-তীর্থভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি। এ ভারতবর্ষ এখন সে ভারতবর্ষ নহে। এখানে এখন আর সে তপোবন নাই এবং সেই তপঃসিদ্ধ জ্ঞানযোগী মহর্ষিরাও কোন্ সুদূর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। এখন এখানে শুধু কর্ম্মের কোলাহল গাড়ী ঘোড়া মানুষের ছুটাছুটি, এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রের একাধিপত্য। এখন এখানে থাকিয়া যদি আমাদের মনুষ্যত্বকে গড়িয়া তুলিতে হয় তবে বাহিরের এই সভ্যতাকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না, উপেক্ষা করিলে মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠিবে না, সে খর্ব্ব হইয়া যাইবে। এখন শুধু ব্রত, উপবাস, প্রতিমা পূজা করিয়া, স্মৃতির শ্লোক মুখস্থ করিয়া এবং বেদান্তের চিন্তা করিয়া আমরা মনুষ্যত্বের আহার যোগাইতে পারিব না এই সকলের অন্তরালে যে মহান আদর্শ রহিয়াছে তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া, ইহার সহিত জাতি নির্ব্বিশেষে কৃষি, বাণিজ্য ও রসায়ন বিজ্ঞানকেও আন্তরিক আগ্রহের সহিত আমাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে। এজন্য শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থাদি এবং দেশাচারের যাহা কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহা আমাদিগকে করিয়া লইতে হইবে এই পরিবর্ত্তন যুগধর্ম্মের কাজ।

বাঙ্গালা দেশের সে যুগের কর্ম্মী মহা-পুরুষেরা—যাঁহারা রামমোহন ও বঙ্কিমযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লোক-শ্রেয় সাধনের পূতপ্রসূনে এবং সাহিত্যসৃষ্টির ভাব-বারি-ধারায় এই যুগ-ধর্ম্মের বোধন ক্রিয়া সমাধা করিয়া গিয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীর অনেক সুশিক্ষিত কর্ম্মবীরও এই ধর্ম্মকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দিবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ইহাঁদের এই জীবনব্যাপী সাধনাও এ দেশে সার্থক হইতেছে না। সাধারণ জনমণ্ডলী আপনাদের গতানু-গতিকতাকে ত্যাগ করিয়া যুগধর্ম্মের মধ্যে আত্মপ্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না। আজকাল তাহারা বাধ্য হইয়া বাহিরের জগতে উঁকি ঝুকি মারিতেছে বটে, ধীরে ধীরে সভয়ে পদচালনা করিতেছে সত্য কিন্তু সে নিতান্তই দায়ে পড়িয়া, তাহাতে জীবনী শক্তির উন্মত্ত প্রেরণা কিছুমাত্রও নাই।

এই ভারতবর্ষ যেমন প্রকাণ্ড দেশ তেমনি ভারতবাসী হিন্দুর বিশেষত্বও জগৎবিশ্রুত। এই বিশেষত্ব হিন্দুর ধর্ম্মের মধ্যেই সবিশেষ প্রকাশমান। হিন্দু কখনও রাষ্ট্র এবং জাতি গঠনের চেষ্টা করে নাই। সে বৎসরের পর

বৎসর, যুগের পর যুগ কেবল ধর্ম্ম ও সমাজ গঠনের চেষ্টা করিয়াছে এবং বিধি প্রণয়ন করিয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ বিশাল হইতে বিশালতর হইয়াছে। অতি কঠোর ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধির চেষ্টা হইতে গমন, ভোজন শয়ন উপবেশনাদি পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। এ দেশের কোন কোন প্রতিভাশালী মহাত্মা বলেন, আমাদের ধর্ম্মের এই বিশালতা আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের একটি প্রধান কাবণ।

বাস্তবিক কথাটা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম জিনিসটা আমাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার জিনিস হওয়াতে এবং আমাদের জীবন-যাপনের প্রত্যেক খুটিনাটি কাজটী পর্য্যন্ত ধর্ম্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া, সে সকল প্রচলিত কার্য্য বা নিয়ম যখন আমাদের স্থিতির অনুকূল হইয়াছে, তখনই তাহা আমাদের পালনীয় হইয়াছে এবং যখন তাহা উন্নতির অনুকূল হয় নাই, তখনও তাহা পালিত হইয়া আসিয়াছে; এবং আজও তাহা পালিত হইতেছে। ইহার ফল এখনও এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের চারিদিকের জগৎ ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু আমরা বিশাল ধর্ম্মের ভারে স্থবির ও নিশ্চল হইয়া প্রায় এক স্থানেই দাঁড়াইয়া আছি।

কিন্তু এরূপভাবে আর আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিতেছে না। জগৎ যত ছুটিয়া চলিতেছে ততই সে প্রতি-মুহূর্ত্তে আমাদিগকে আঘাত করিয়া যাইতেছে। এই আঘাতে হয় আমাদিগকে ধরাশায়ী হইতে হইবে, নচেৎ জগতের সঙ্গে ছুটিয়া চলিতে হইবে।

এখন যদি আমরা চলিতে চাই তবে আমাদের যে সকল ব্যবহারিক ধর্ম্মবন্ধন কালচক্রে আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিকূল হইয়াছে, সেই সকলের বন্ধন হইতে আত্মমুক্তি সাধন করিয়া আমাদিগকে নবীন যুগধর্ম্ম অবলম্বন করিতেই হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যাহার প্রতিষ্ঠাতা, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি যাহার ব্যাখ্যা-কর্ত্তা, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন. আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিলে কদাপি শ্রেয়লাভ করিতে পারিব না।

অবশ্য আমি এমন বলিতেছি না যে, ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের খেয়ালই যুগধর্ম্ম; অথবা এমনও বলিতেছি না যে, কোন্ নিয়ম বা কার্য্য-গুলি আমাদের উন্নতির অনুকূল এবং কোন্‌গুলি উন্নতির অনুকূল নহে

তাহা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বিচার করিয়া যুগধর্ম্ম নিরূপণ করা উচিত। আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, আধুনিক সভ্য জগতের বিচিত্র শিক্ষা ও বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তির ভিতর দিয়া যে সকল সত্য আপনা হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, এবং যাহা জাতিগত ও মানব সমষ্টিগত শক্তি বিকাশের অগ্নি পরীক্ষায় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেছে, আমাদের চির প্রচলিত রীতি নীতির অথবা সামাজিক ব্যবস্থা শাস্ত্রের দুই চারিটি শুষ্ক বচনের অপেক্ষা আমরা সেই সকল সত্যকে বড় করিয়া মানিব। এবং সেই সকল সত্যের দ্বারা আমাদের জাতিগত ও ব্যক্তিগত শক্তিকে বিকসিত করিয়া তুলিবার জন্য, আমাদের প্রাত্যহিক ও নৈমিত্তিক জীবন-যাত্রার সকল প্রকার ধরা বাঁধা নিয়মগুলির মধ্যে কোন কোনটির অথবা কতকগুলির কঠোর শৃঙ্খল হইতে আত্মমুক্তি সাধন না করিলে যদি আমাদের না চলে, তবে তাহাও আমরা করিয়া লইব। যদি ইহাতে উপেক্ষা করি, তবে আধুনিক জগতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সর্ব্বজাতির যে মিলন-রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে সেই পথে চলিবার উপযুক্ত পাথেয় আমরা কোনও কালে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিব না, এবং অন্য জাতির অবহেলা ও অবজ্ঞার ক্রূর দৃষ্টি হইতে কোনও কালে আত্মমুক্তি সাধন করিতে পারিব না।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্লক্ষ্য অতিশয় উদার ও অতিশয় মহান্। কাল-ধর্ম্মানুসারে ইহা পরিবর্ত্তনীয় নহে, কারণ ইহা নিত্য। কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার বাহিরের সাধন ক্রিয়াকেও অপরিবর্ত্তনীয় করিয়া লইয়াছি, সাধন যে, অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারে না সে আমরা মনে করিয়া রাখি নাই। সমুদ্র পার হওয়াই উদ্দেশ্য কিন্তু সমুদ্র যখন বারিপূর্ণ ছিল তখন বহিত্র বহিয়া তাহা পার হইবার চেষ্টা করিতাম, এখন জীবন-সমুদ্র শুষ্ক হইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছে এখনও কিন্তু আমরা ইহা পার হইবার জন্য নৌকা-যাত্রারই বৃথা চেষ্টা করিতেছি। এখন ইহা পার হইতে গেলে যে, বিভিন্ন যান বাহনের প্রয়োজন তাহা আমরা আজও ভালরূপে বুঝিলাম না।

শ্রীসুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরাজ শাসনে ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যার উন্নতি।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কোন প্রকার আলোচনা হইত না এ কথা বলা যায় না। ভগবান মনু উদ্ভিদ্ জাতিকে ওষধি, বনস্পতি, গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণ, প্রতান, বল্লী প্রভৃতি কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এমন কি ইহাদিগের চৈতন্য আছে—ইহারা সুখ দুঃখ অনুভব করে ইহাও বলিয়াছেন।

উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজ কাণ্ড প্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছ গুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণ জাতয়ঃ।
বীজকাণ্ড রুহান্যেব প্রতানা বল্ল্য এবচ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ॥ মনু ১।৪৬-৪৯।

বিশ্বকোষকার এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ, মহাভারত, ও শার্ঙ্গধরের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এদেশে নূতন নহে। ইহার আলোচনাও প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে হইত।

ইহা ছাড়া কৃষিপরাশর প্রভৃতি গ্রন্থ পর্য্যালেচনা করিলে জানা যায় যে বিবিধ প্রকার রোপন প্রণালী ও তাঁহাদের জ্ঞাত ছিল। তদ্ভিন্ন দ্রব্যগুণ সম্বন্ধেও তাঁহারা যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সে সময়ের পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইলেও, আধুনিক যুগে এইরূপ শ্রেণী বিভাগে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, ও এ বিষয়ে যে আমাদিগকে পাশ্চাত্য জগতের সাহায্য লইতে হইবে, একথাও অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের দেশে আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে—ও বহুসংখ্যক যুবক বৎসর বৎসর উদ্ভিদ্ বিদ্যায় এম, এ ডিগ্রি লইয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। কই, তাঁহাদের কয়জন ভবিষ্যত জীবনে ইহার চর্চ্চা

রাখিয়াছেন। কবির ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষা—"পিতলক কাটারি কামে নাহি আওল উপরকি ঝকমকি সার"—নয় কি ?

ভারতবাসীর দ্বারা ভারতীয় উদ্ভিদ্ বিদ্যার কোন উন্নতি না হইলেও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা ইহার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বিষয়ের সম্যক আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কেবল কয়েকজন মনীষির জীবনী ও কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ইংরাজ শাসনের কালে আমাদিগের দেশে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার আলোচনাও তাহার একটি। এই আলোচনার ফলে ভারতীয় উদ্ভিদ্ সকল পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় উদ্ভিদ সকলের সহিত কিরূপে সমকক্ষ ও কিরূপে বিভিন্ন ইহা বিশেষভাবে জানা যায়। সুধু ইহাই নয়, ইহার দ্বারা আরও আমরা জানিতে পারি যে, কোনও প্রকারের উদ্ভিদ্, স্থানভেদে ও জল বায়ু ভেদে কিরূপ বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিরূপেই বা উদ্ভিদ্ সকলের উন্নতি বিধান করিতে পারা যায়।

এই প্রকার জ্ঞানের ফলে ভিন্ন দেশীয় উদ্ভিদ্ সকল আমাদের দেশে স্বচ্ছন্দে রোপিত হইয়া ফলদান করিতেছে। কে না জানে যে শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য চা, এ দেশে জন্মিত না, জ্বর হইলে কুইনাইন পাওয়া বড় সহজ সাধ্য ছিল না, এমন কি যে গোলআলু না হইলে ব্যঞ্জনে রুচি হয় না, সে আলুর কথা কেহ শুনে নাই এইরূপ কত শত উদ্ভিজ্জ আমাদিগের দেশে আনীত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন।

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে কেহ এ বিষয়ে হাত দিয়াছিলেন কি না তাহা জ্ঞাত নই। তবে ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম

১। কর্নেল কিড (Lt. Col. Robert Kyd) রবার্ট কিডের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ সামরিক বিভাগের (cadet papers) তালিকা ১৭৮৯ খৃঃঅব্দ হইতে লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বহুপূর্ব্বে, ১৭৬৪ খৃঃঅব্দে তিনি সামরিক বিভাগে চাকরি লইয়া ভারতবর্ষে আসেন। সে সময়ে এদেশ নানা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল সুতরাং তাঁহার কর্ম্মস্থানে উন্নতি হইতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে নাই। ১৭৮২ খৃঃঅব্দে তিনি সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির পদ ও (Lt. Col.) লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল পদবি প্রাপ্ত হন।

তিনি বাল্যকালে অতি সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মস্থানে প্রবিষ্ট হইয়াও শিক্ষার বিশেষ সুবিধা পান নাই। কেবল অসাধারণ অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি উদ্ভিদবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়েন। ইনিই ১৭৮৬ খৃঃঅব্দে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন বা উদ্ভিজ্জ বাগান স্থাপন করেন, এবং মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খৃঃ উহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসে ও উইলিয়ম রক্সবর্গ সাহেব ইহার অধ্যক্ষ Superintendent নিযুক্ত হন। ডোরোজেরিও (Dorozario) সাহেব বলেন যে, মৃত্যুর পর কিড্‌ সাহেবকে ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে সমাধিস্থ করা হয়।†

১। উইলিয়ম রক্সবর্গ (William Roxburgh) রবার্ট কিডের পর যাহার নামোল্লেখ করা হইল ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন। ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ বিদ্যায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমাদের যে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার অধিকাংশই ইঁহারই অধ্যবসায় ও আলোচনার ফল।

এই মহানুভব ব্যক্তি ১৭৫১ খৃঃঅব্দে স্কটল্যাণ্ডের আরসায়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষার পর এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এই স্থানে তাঁহার বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ জন হোপের (John Hope) সহিত পরিচয় হয়। এই উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট ইনি যাহা শিক্ষা করেন. ইঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্যাবলী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই হোপ সাহেব সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। ইনি পারিসে বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ (Jussien) জুস্যুর অধীনে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা করেন, ও চার্লস্‌ আলস্‌টনের (Charles Alston) পর এডিনবরার উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি (Linnaeos) লিনিয়াস্‌ নামক প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বিদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই লিনিয়াস্‌ সাহেব তাঁহার Genera planteram নামক পুস্তকে ইঁহার নামে Genus Hopea নামে এক শ্রেণীর বৃক্ষের নামকরণ করেন; এবং ইনিও লিনিয়সের Genera Anemalium নামক পুস্তকের সঙ্কলন কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন।

হোপের অধীনে শিক্ষার পর, হোপ সাহেব স্বীয় চেষ্টায় ইঁহাকে ইষ্ট

---

† ইঁহার স্মৃতিকল্পে শিবপুরের বাগানের কেন্দ্রস্থলে একটী মর্ম্মর নির্ম্মিত স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে সহকারী চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। পরে নানা স্থানে ভ্রমণের পর ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ইনি সহকারী চিকিৎসক হইয়া মান্দ্রাজে আগমন করেন। এই সময় হইতে তিনি যে কার্য্যে মনোযোগ করেন তাহাতে তাঁহার নাম ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সহিত চিরদিনের জন্য অমর হইয়া রহিয়াছে।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইনি প্রধান চিকিৎসকের (Surgeon) পদে নিযুক্ত হন, ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে কোকনদ হইতে ৭ মাইল দূরস্থ সামুনকোটা নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থানে ইনি সরকারী কার্য্যের মধ্যে যেটুকু অবসর পাইতেন, তাহা নীল, কাফি, দারুচিনি, ইক্ষু, গুটিপোকা প্রভৃতির চাষে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, চারি বৎসর কালের মধ্যে অসংখ্য আবশ্যকীয় দেশীয় গাছ সংগ্রহ করেন। একজন দেশীয় চিত্রকর নিযুক্ত করিয়া এই সকল গাছের চিত্র অঙ্কিত করেন, এবং নিজে ঐ গাছগুলির ব্যবচ্ছেদ কার্য্য ও দেশীয় প্রণালীতে রোপনাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহাকে কর্ণাটিকে (Carnatic) কোম্পানীর উদ্ভিদ্‌বিদ্ পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ইহার অভীষ্ট কার্য্যের কিছু সুবিধা ঘটে। তিনি গাছ গাছড়া সংগ্রহের জন্য দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সে সময়ে এদেশে ভ্রমণাদি এরূপ সুকর ছিল না, ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে জলপ্লাবনে তাঁহার সমস্ত সংগৃহীত সামগ্রী নষ্ট হইয়া যায়।

ইহাতেও তিনি ভগ্নোদ্যম হইবার লোক নহেন। ইহার পর ইনি দ্বিগুণ উদ্যমে আবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন ও চারি বৎসর পরে ১৭৯১ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথম চিত্রাবলীর পার্শ্বেল বিলাতে পাঠান।

১৭৯৪ খৃঃ অব্দে আবার ৫০০ শত চিত্র বিলাতে পাঠান হয়। সার জোসেফ ব্যাঙ্কস্ সাহেব ইহার মধ্যে ৩০০ শত খানি বাছিয়া 'করোমণ্ডল উপকূলের বৃক্ষাবলী' (Plants of the coast of Coromandal) নামে প্রকাশিত করেন।

ইহার অন্যগুলি রবার্ট ওয়াইট (Robert Wight) 'ভারতীয় উদ্ভিদ্ সকলের চিত্র' (Illustrations of Indian Botany) নামে প্রকাশিত করেন।

এতদিন দাক্ষিণাত্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইনি ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে

সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালায় আগমন করেন। এই সময় রবার্ট কিড্ সাহেবের মৃত্যু হওয়ায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইঁহাকে শিবপুরের উদ্ভিজ্জ বাগানের (Botanical Garden) অধ্যক্ষ (Superintendent) নিযুক্ত করেন।

বর্ত্তমান সময়ে, শিবপুর বাগানের যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী অধ্যক্ষের বাস-গৃহ দেখা যায় তাহা তিনিই নির্ম্মাণ করান। কিন্তু এই স্থানের জল বায়ু তাঁহার সহ্য হইল না, তাহার উপর অতিরিক্ত খাটুনিতে শীঘ্রই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে তিনি বিলাত গমন করেন ইহার পর পুনরায় ১৮০৫ খৃঃ অব্দে তিনি আর একবার বিলাত যান। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার শরীর পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং এইবার তিনি শেষবারের জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লন ও উত্তমাশা অন্তরীপ, সেণ্ট হেলেনা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কোন উপকার না পাওয়ায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই স্থানে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। এডিনবরার গ্রেফ্রায়ার চার্চ্চে ইঁহার কবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ইনি তিনবার বিবাহ করেন প্রথম স্ত্রী মিস্ বণ্টে (Miss Bonte), দ্বিতীয় মিস্ হুটেন্‌ম্যান (Miss Huttenman), তৃতীয়, মিস্ বসওয়েল (Miss Boswell), এবং ইঁহাদের দ্বারা সর্ব্বসমেত তাঁহার ৬টী পুত্র ও ৬টী কন্যা জন্মে।

এতক্ষণ রক্স্‌বর্গের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা হইল, এইবার তাঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের নিকট শেষ বিদায় লইবার সময় তিনি বন্ধু শ্রেষ্ঠ উইলিয়ম কেরীর (William Carey) নিকট বাগানের ভার, 'Hortus Bengalensis' নামক পুস্তকের একখণ্ড হস্তলিখিত পুঁথি 'Flora Indica' নামক পুস্তকের একখণ্ড পুঁথি ও দুই সহস্র পাঁচ শত তেত্রিশটী গাছের অবিকল তৈলময় চিত্র ও ব্যবচ্ছেদের অঙ্কন রাখিয়া গমন করেন।

কেরী সাহেব উক্ত 'Hortus Bengalensis' নামক পুস্তক ১৮১৪খৃঃ অব্দে দুইভাগে প্রকাশিত করেন। ইহার প্রথম ভাগে তাঁহার শিবপুরের বাগানের রোপিত ৩৫০০ প্রকারের গাছের বিবরণ আছে। যখন তিনি ঐ বাগানের ভার প্রাপ্ত হন তখন উহার ৩০০টী মাত্র কেবল ঐ স্থানে ছিল, অবশিষ্ট ৩২০০ প্রকারের গাছ তিনি কেবল সমগ্র ভারত নয়, পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ স্থানে রোপিত করেন ও কোন গাছ কোন

স্থান হইতে কখন কাহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার Flora Indicaতে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহাদিগের গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে ৫৪৩ প্রকারের গাছের নাম আছে। এই গাছগুলি সে সময় শিবপুরের বাগানে ছিল না, বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কালে ঐ সকল গাছ ঐ স্থানে রোপিত করিবেন কিন্তু সে সুবিধা আর ঘটিয়া উঠিল না।

১৮২০ খঃ অব্দে কেরী সাহেব তাঁহার 'Flora Indica' নামক গ্রন্থ ওয়ালিক (Nathenial Wallich) নামক পরবর্ত্তী অধ্যক্ষের টিপ্পনির সহিত বাহির করেন। ইহার প্রথম ভাগ ১৮২০ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ওয়ালিক সাহেবের টিপ্পনি ছিল না। দ্বিতীয় ভাগ ঐ স্থান হইতে ওয়ালিক সাহেবের টিকার সহিত ১৮২৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। ক্লার্ক সাহেব বলেন যে, ইহার পর ওয়ালিকের টিকা ও টিপ্পনির দ্বারা পুস্তকের কলেবর এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে প্রকাশকেরা আর অবশিষ্ট ভাগ প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলেন না। তৎপরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে রক্‌স্‌বর্গ সাহেবের জেমস্ ও ক্রস্ নামক দুই পুত্রের ব্যয়ে ও চেষ্টায়, কেরী সাহের ওয়ালিকের টিপ্পনি বাদ দিয়া সমস্ত বইখানি তিন ভাগে প্রকাশিত করেন।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ক্লার্ক সাহেব দ্বারা ইহা আবার পুনর্মুদ্রিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদ্ শাস্ত্র বিষয়ে, রক্‌স্‌বর্গের Flora Indica একখানি অমূল্য গ্রন্থ। যদিও পুস্তকের বর্ণিত বিষয় শতবর্ষ পূর্ব্বে সংকলিত হইয়াছিল তথাপি কালে ইহার গৌরবের কিছু মাত্র হানি হয় নাই। ক্লার্ক সাহেব ইহার গুণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন।—"There are few Botanical Books of the date of Roxburgh's flora that have not been superseded by modern work. No Indian Flora published, however, since Roxburgh's time has attained completion and besides this many of the corrections Proposed upon Roxburgh, are mistakes. Roxburgh's work is so excellent, and his species so well concieved that they form a solid framework, which being once put together all the other species are easily fitted into their due places. ইনি আরও বলেন—"Also Roxburgh contains an account of all the plants ordinarily cultivated in India in his day, and we have added wonderfully few since."

যদিও ইহাতে কতিপয় দোষ ও ভুল লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে

মার্জ্জনীয় কারণ তাঁহার পাণ্ডুলিপি তাঁহার হস্তে পরিমার্জ্জিত হইবার অবকাশ পায় নাই। ক্লার্ক বলেন—Excellent as the Flora Indica is, it does not shew us what Roxburgh could have done had he lived to edit his own work."

এদেশীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণের এই পুস্তকের দ্বারা কিরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রক্সবর্গ সাহেব এই পুস্তকে প্রত্যেক রকম গাছের অবয়ব সক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি প্রত্যেক গাছের ইংরাজি নামের সহিত বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দি, আরবিক, পারসিক, তৈলঙ্গি প্রভৃতি প্রাদেশিক নাম সংযোজিত করিয়া গ্রন্থখানিকে অমূল্য রত্ন বিশেষ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের যে প্রদেশীয় লোকই হউক না কেন, তিনি অক্লেশে এই পুস্তকের সাহায্যে আবশ্যকীয় উদ্ভিদ্‌ নিরাকরণে সমর্থ হইবেন। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সংস্কৃত—হরিদ্রা; হলদি, পীত, কাঞ্চনি, নিশা, বরবর্ণিণী, ক্রিমিঘ্ন যোষিৎ-প্রিয়া, হরিবিলাসিনী।

হিন্দি ও বাঙ্গলা—হল্‌দি, হলুদি, পীতরস।

Heb.—Hurdam.

Arab.—Urukus—sufr, urukus—Saboghin.

Teling.—Pampee. Pers.—Zerd-chob.

মহারাষ্ট্রীয়—হলুদ বা হল্‌দি।

ইহার পর দেশীয় চাষ আবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে।

এইরূপ সমস্ত দেশীয় গাছের সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আর কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় না, এই জন্যই ক্লার্ক সাহেব এই পুস্তক খানিকে এই বিষয়ে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে ইহাও বলা আবশ্যক যে এই পুস্তকের একটা প্রধান দোষ যে ইহাতে গাছগুলি সেই প্রাচীন অস্বাভাবিক বিভাগে (Artificial system) শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে! কিন্তু ইহা তাঁহার দোষ নহে, ইহা সময়ের দোষ, কারণ, তাঁহার সময়ে আধুনিক কালের স্বভাবিকরূপে বিভাগ (Natural system) করণের উপায় প্রচলিত হয় নাই।

আধুনিক যুগে এই প্রকার বিভাগ করণের উপায় প্রচলিত হইলেও, ভারতবাসীদিগের তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। কারণ এই প্রকার লিখিত

সাধারণ লোকের ব্যবহারোপযোগী কোন পুস্তক পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়। প্রথমটি হুকার সাহের কৃত The Flora British India—এখানি এত বৃহৎ ও মূল্যবান যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সমানভাবে কৃপা না থাকিলে এ পুস্তক স্পর্শ করা অসম্ভব! দ্বিতীয়টি প্রেল সাহেব কৃত Bengal plants—এখানি সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক গ্রন্থ, এ কারণ বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য প্রদেশীয় লোকের ইহা কোনও উপকারে আইসে না, পুনশ্চ, ইহা দুষ্প্রাপ্য, কাজেই রক্সবর্গের এই পুস্তকই ভারতের একমাত্র উপযোগী পুস্তক।

ইহা ছাড়াও তিনি—(১) Botanical description of a new species of Sweetenia Mehogany নামে মেহগনি গাছ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ, (২) Indian fibres বা ভারতীয় বৃক্ষের আঁস সম্বন্ধে কতিপয় পত্র বিলাতের আর্ট সোসাইটীতে প্রকাশিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়, নিকলসনের পত্রিকায় (Nicholsion's journal) টিলকের পত্রিকায় (Tillochs Philosophical Magazine), ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকায় (Transactions of Indian Medical society), ও লিনিয়ান্ সোসাইটীর পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তাঁহার অঙ্কিত উদ্ভিদ্ চিত্রগুলি আজও বিলাতের কিউ বাগানে ও শিবপুরস্থ বাগানে আছে।

শিবপুরের বাগানে সেই প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষের সন্নিকটে একটী উচ্চ ভিত্তির উপর তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কেরী প্রমুখ তাঁহার বন্ধুবর্গের দ্বারা ১৮২২ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডায়ার্নানডার নামে একজন উদ্ভিদবিদ তাঁহার স্মৃতিকল্পে এক প্রকার ভারতীয় উদ্ভিদের genus Roxburghia নাম করণ করেন। ইহার বিশেষ বিবরণের জন্য Annals of Royal Botanical garden Calcutta Vol. v. (1895) দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১২।১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত।

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

নিরাশার আশা।

বিদ্যা বলিয়া অবিদ্যাকে বরণ করিয়াছি, তাই দুঃস্বপ্নের নাম দিয়াছি জাগরণ। সাধুতা কেবল বণিগ্‌বৃত্তির একটি আবরণ হইয়াছে, বড় বড় উদার কথা স্বার্থপর প্রবঞ্চকদিগের হস্তে শাণিত ছুরিকা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে ত্যাগের মন্ত্রগ্রহণ পরশোণিত পান করিবার অমোঘ উপায় হইয়াছে! হায় রে দেশের উন্নতি!

সততার পথে দাঁড়াইয়া যাহারা সত্যের উপাসনা করিয়াছে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। শত অত্যাচারে উৎপীড়িত, নিন্দায় ও দৈন্যে তাঁহারা মুহ্যমান, মলিন বসনে আর্দ্রনেত্রে কোথায় যে তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন কেহই তাহা জানে না। সত্যসত্যই দেশের জন্য, দশের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর চতুর দৈত্যকুলের আত্মপ্রচারের তুমুল ঢক্কা নিনাদে ডুবিয়া গিয়াছে—তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞাত মরণের শীতল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিবেন।

অথচ দেশহিতৈষণার অভাব নাই—বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া সরল পল্লিবাসী শিক্ষালোকপ্রাপ্ত জ্ঞানোন্নত নগর সমূহের ও সভ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিয়াছে। তাহার মনে হয় ত্যাগশীলতায় ও সাধুতায় দেশ নৈমিষারণ্যকেও পরাস্ত করিয়াছে। সকলেই দেশের জন্য কাঁদিয়া আকুল; বলিহারী অবাধ উচ্চশিক্ষার কুহকরচনার শক্তি!

শতশত দরিদ্র প্রতিবাসীর বক্ষরক্ত জমাট বাঁধিয়া যাঁহার প্রাসাদের ভিত্তি

গড়িয়াছে, রোরুদ্যমান শত শত সরল প্রকৃতি পরিবারের অভিশাপ যাঁহার বৈভবের অন্তরালে নীরবে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, যাঁহার চিত্ত প্রতি মুহূর্ত্ত ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মবুদ্ধিকে নিগৃহীত করিতেছে সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রত্যহ তাঁহার যশোগীতির ভেরি বাজিতেছে, রাজসকাশে তিনি তাঁহার দেশ-হিতৈষণার ও অকৃত্রিম ত্যাগশীলতার পুরস্কার পাইতেছেন— অর্থের জয় হউক! মঙ্গল সাধনের জন্য বিদেশ হইতে যতগুলি উপকরণ আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে তাহার সমস্তগুলিকেই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষণে নিয়োগ করিয়াছি। ইহাই আমাদের সত্য ইতিহাস।

ইহাই চলিতেছে, সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু তবুও নীরব হওয়া হইবে না, আরও কিছু আছে। পূতনা আসিয়া ব্রজে প্রবেশ করিয়াছে, "লোকবালঘ্নী, রাক্ষসী রুধিরাশনা" সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মুগ্ধদৃষ্টিতে নরনারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে সত্য, প্রায় সকলেই বঞ্চিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি উপায় আছে। মাতৃক্রোড়ে শুইয়া যে শিশু স্তনপান করিতেছে সত্যের সহিত তাহার পরিচয় আছে। সেই শিশুর পানে চাহিয়াই আমাদিগকে সাহসে বুক বাঁধিতে হইবে।

অবিদ্যার কুহক অধিক দিন থাকিবে না, এই ঋষিচরণপূত পবিত্র দেশে আবার সত্যের আলোক জ্বলিয়া উঠিবে, আবার ন্যায় ধর্ম্ম ও পরার্থপরতার বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিবে। আজ যাহারা শিশু, মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আজ যাহারা স্তনপান করিতেছে, যাহাদের নির্ম্মল চিত্তগগনে এখনও বৈষয়িকতা ও স্বার্থপরতার কৃষ্ণমেঘ দেখা দেয় নাই তাহাদের ত্রিদিব-নির্ম্মল স্নিগ্ধ মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া নিরাশা ও অবসাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। ভবিষ্যতের রঙ্গভূমিতে সত্যের অভিনয় হইবে, সেই অভিনয়ের যাঁহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশ্বনাথ নির্জ্জনে বসিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ ভূমিকা অভ্যাস করাইতেছেন।

আজ যাহা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র প্রহসন—কপটতা ও মিথ্যাচারে তাহা পরিপূর্ণ। এ অভিনয় শুকপক্ষীর পাঠের মত—ইহাতে সরল প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস নাই। এতদিন এই প্রহসনে প্রশংসার অবিমিশ্র করতালি ধ্বনিই শুনিতাম। আজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিন্দা, উপহাস ও বিরক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে—তাই সাহস হইতেছে সত্যের জ্যোতিরেখা বুঝি কাহারও কাহারও নয়ন স্পর্শ করিয়াছে।

সাহিত্য সেই ভবিষ্যতে লক্ষ্য রাখিয়া গড়িয়া উঠুক। সেই ভবিষ্যত যাহাতে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয় অজ্ঞাত সাহিত্যসেবক ধনমান প্রভৃতির প্রতি না চাহিয়া উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে সেই সাধনায় রত হউক। সাহিত্যের সম্মুখেও প্রলোভন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন যে সাহিত্য বনকুসুমের মত আপন গৌরবে ও সৌরভে নির্জ্জনে শোভা পাইত আজ তাহা ধনবানের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। ধনীর উদ্যানে আজ বনকুসুমের স্থান হইয়াছে, আমরা বলিতেছি ইহাই উন্নতি। কিন্তু সত্য ঠিক তাহার বিপরীত কিনা তাহাই চিন্তনীয়। একদিন বলিয়াছিলাম সাধারণের কৌতূহলের যুগ বঙ্গসাহিত্যে আসিতেছিল, অকস্মাৎ চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইল, যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় যেন পৃষ্ঠপোষকতার যুগ আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া বরণ করিতেছি—সাহিত্যকে আজ তাহাই দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে হইবে। পরের মুখের শেখা কথা পেটের দায়ে আয়ত্ত করিয়াছি।—শিক্ষার দ্বারা যাহা পাইয়াছি সত্যের সহিত, পারিপার্শ্বিকের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই—যাহাকে রত্ন মনে করিয়া আহ্লাদে মাতিয়া উঠিয়াছি তাহা ছেলে ভুলাইবার ক্রীড়নক। সাহিত্যই এ তত্ত্ব দেশকে শিখাইবে। আর সাহিত্য এই জাতিকে লইয়া যাইবে সেই বেদমন্ত্র-মুখরিত, হোমানল-পূত পবিত্র তপোবনে, যেখানে আমাদের অক্ষয় জীবন ও মোক্ষ, ধ্যানসমাধিমগ্ন রহিয়াছে।

ভারতবর্ষকে পৌরাণিকেরা কর্ম্মভূমি বলিয়াছেন, আজ এই আদর্শ-সংঘর্ষের দিনে, এই ভোগবিলাস ও আত্মপুষ্টির দিনে, এই প্রাচীন কথার মর্ম্ম আমাদিগকে ধীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। গৌরব ও মহত্ত্বের দিনে, এই জাতিকে যাঁহারা সাহিত্য দিয়াছেন, দর্শন বিজ্ঞান ও মন্ত্র তন্ত্র দিয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মযোগী, সত্যের ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাই তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, সেই সাধনাতেই জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা সত্য প্রতিষ্ঠার ভেক গ্রহণ করেন নাই।

আমাদিগের আদর্শ জীবন যাহা রচনায়, বক্তৃতায় প্রকাশিত, তাহার সহিত বাস্তব জীবনের প্রভেদ প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে—ইহা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমাদের যাহা সনাতন আদর্শ, সেই আদর্শে হৃদয় ও মন শৈশব হইতে যদি গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, মানবজীবনের সেই গভীরতা ও বিশালতার

দিক ভারতবর্ষই সর্ব্ব প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও প্রচার করিয়াছে, যাহারা শিশু ও শিক্ষার্থী প্রথম হইতে যদ্যপি তাহাদিগকে এই ভোগবিলাসময় ইন্দ্রিয়ের চারণভূমি হইতে সরাইয়া সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা আত্মপ্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্যান্য দেশের নিকট যাহা গ্রহণীয় তাহা বীরের মত গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টিবিধান করিতে পারিব ॥

ভৃত্য। (গল্প)

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই গিরিধারীর মনিব যখন গিরিধারীর মাহিনা চুকাইয়া দিয়া বিদায় হইতে বলিলেন, তখন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কেন তাহাকে বিদায় দেওয়া হইতেছে। আপনার ঘরে জিনিষ পত্র গুছাইতে গুছাইতে।সে ভাবিতেছিল কেন তাহাকে তাড়ান হইতেছে, কৈ সেত কোনও অপরাধ করে নাই—তবে এ শাস্তি কেন? সে যে খোকাবাবুকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারে না। খোকাবাবু যে তার বড় আদরের জিনিষ—সে যে তার পুত্রশোকতপ্ত জীবনে শান্তির বারি বর্ষণ করে—বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল। অনেক দিনের পুরাণ স্মৃতি তার মনে পড়িতে লাগিল সেই তাহাদের ক্ষুদ্র কুটিরখানির কথা, তার সেই সতীসাধ্বী স্ত্রীর কথা, আর সেই তাহাদের বড় আদরের পুত্র রামধনের কথা একে একে তার মনে পড়িতে লাগিল, কত সুখেই তাহাদের দিন কাটিত। তারপর সেই একদিন, যে দিন সে তার জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। যে দিন শত চেষ্টায়ও সে তার স্ত্রী-পুত্রকে জ্বলন্ত গৃহ হইতে বাহির করিতে না পারিয়া পাগলের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়াছিল। কেন প্রতিবাসীরা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। অগ্নিতে মৃত্যু জ্বালাদায়ক বটে কিন্তু সে জ্বালা যে ক্ষণিক। সারা জীবন দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা সে কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বৃদ্ধের বুকের মধ্যে হু হু করিয়া উঠিল। "ভগবান! সব ত নিয়েছ, আবার এ শাস্তি কেন?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুধারা বাহিয়া পড়িল।

এমন সময় বুড়া ঝি আসিয়া বলিল, "বাবু রাগ করেছেন, তুই এখনও বসে আছিস্। নে শিগ্‌গীর গোছগাছ কররেনে"। বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল; সে তাড়াতাড়ি আপনার জিনিষপত্রগুলি একটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া বাহির হইল।

পুকুর-ধার দিয়া যাইতে যাইতে গিরিধারী দেখিল—খোকাবাবু একমনে লাটুতে নেত্তি পরাইতে ব্যস্ত। তার বড় ইচ্ছা হইল, একবার খোকাবাবুকে কোলে তুলিয়া লয়, কিন্তু তা হলে খোকাবাবু যদি জিজ্ঞাসা করে "গিরি তুই কোথায় যাচ্ছিস ?" তখন সে কি উত্তর দিবে ? গিরিধারীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে ফটক পার হইয়া গেল।

খোকাবাবু গিরিধারীর এত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল যে রাত্রে গিরিধারীর নিকটেই শুইত। খোকাবাবুর মা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খোকা কিছুতেই তাঁহার কাছে শুইতে চাহিল না। তখন খোকাবাবুর মা ক্রমেই গিরিধারীর উপর চটিতে লাগিলেন। তিনি প্রায়ই স্বামীর নিকট বলিতেন যে খোকা ক্রমে তাহাদের পর হইতেছে।

"একটা চাকরের জন্যে ছেলে পর হইবে তার চেয়ে ওকে বিদায় করে' দাও।" গিরিধারীর মনিব প্রথম প্রথম কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু অবশেষে, প্রতিদিন স্ত্রীর নাকে কান্নার জ্বালায় বিব্রত হওয়া অপেক্ষা ভৃত্যকে তাড়ানই সহজ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

ফলে তাহাই দাঁড়াইল। গিরিধারীকে বিদায় দেওয়া হইল এবং একটি খোট্টাচাকর আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। লোকটার চেহারা দেখিলে ভয় আসে। বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সময় ছাড়া খোকা-বাবু বড় একটা তাহার কাছে ঘেঁসিত না। আর কেউ খুসি হউক বা না হউক খোকাবাবুর মা কিন্তু ইহাতে বড় খুসি হইলেন। তিনি প্রায়ই স্বামীর নিকট বলিতেন, "চাকর চাকরের মত থাকিবে এইত চাই।"

গিরিধারী অপর কোথাও থাকিবার স্থান না পাইয়া অবশেষে তাহাদের দেশের লোক এক মুদির দোকানে কিছুদিন থাকিয়া দেশে ফিরিবে স্থির করিল। বৈকালে রামদিন যখন মুদির দোকানের সম্মুখ দিয়া খোকাবাবুকে বেড়াইতে লইয়া যাইত তখন গিরিধারী কতবার মনে করিয়াছে একবার তাকে তুলিয়া লয়। কিন্তু পাছে গিরিধারীর মনে আঘাত লাগে গিরিধারী কি এমন কাজ করিতে পারে।

সে দিন বড় শীত পড়িয়াছিল। গিরিধারীর শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, তার গাটা গরম হইয়াছিল। একটা মোটা কম্বল মুড়ি দিয়া সে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। কৈ এখনও ত খোকাবাবু বেড়াইতে গেল না। অন্যদিন ত এমন সময় রামদিন বাড়ী ফিরে, তবে কি খোকাবাবুর কোনও

অসুখ বিসুখ হইল? গিরিধারী আপনার অসুখের কথা ভুলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, "হে ঠাকুর খোকাবাবুর যেন কোনও বিপদ আপদ না হয়।" এমন সময় গিরিধারী দেখিল রামদিন নিদ্রিত খোকাবাবুকে কোলে শোয়াইয়া দ্রুতবেগে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। অন্ধকারে গিরিধারী দেখিল তাহার ভয়ঙ্কর চেহারাখানা যেন আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

তার বড় ভয় হইল, কে যেন তাকে ভিতর হইতে খোকাবাবুর আসন্ন বিপদের কথা বলিয়া দিল। গিরিধারী আপনার অসুখের কথা ভুলিয়া একেবারে যে পথে রামদিন গিয়াছিল সেইদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন। অতি নিকটের বস্তুও দেখা যাইতেছিল না। গিরিধারী কতবার হোঁচট খাইয়া পড়িল, কাঁটাগাছের গায়ে তাহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আজ সে সব করিতে পারে!

গঙ্গার ভাঙ্গাঘাটের কাছে আসিয়া গিরিধারী দেখিল পাষণ্ড খোকাবাবুর গা হইতে একে একে সমস্ত গহনা খুলিয়া লইতেছে। অন্ধকারে পাষণ্ডের চক্ষু দুটা তপ্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল। গিরিধারীর তখন দাঁড়াইবার সামর্থ্য ছিল না, জ্বরের ঝোঁকে টলমল করিতেছিল। কিন্তু তার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ক্ষিপ্তের ন্যায় রামদিনের উপর গিয়া পড়িল। কিন্তু রামদিনের গায়ে অসুরের বল। বৃদ্ধের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিল। সে প্রচণ্ড পদাঘাতে বৃদ্ধের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তার পর পাষণ্ড রোরুদ্যমান বালককে জলে ফেলিয়া দিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

গিরিধারীর উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তার সম্মুখে তার খোকাবাবু জলে ডুবিবে, তাও কি হয়। গিরিধারী অনেক কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর "মাগো" বলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শীতের কুয়াশা চুপি চুপি দুটি প্রাণিকে লুকাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। খোকাবাবুর মার মন আন্‌চান্ করিতে লাগিল। অন্যদিন এতক্ষণ রামদিন বাড়ী ফিরে, তবে আজ এত দেরি হইতেছে কেন? ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। ক্রমে সাতটা আটটা বাজিয়া গেল তবুত খোকা ফিরিল না। চারিদিকে লোক ছুটিল। খোকাবাবুর মা পাগলিনীর মত একবার ঘরে একবার বারান্দায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সহসা সকলে সবিস্ময়ে দেখিল পাগলের মত গিরিধারী অচেতন খোকাকে কোলে লইয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে। তার চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছিল। মৃতকল্প বালককে উঠানের উপর শোয়াইয়াই গিরিধারী উঠানের উপর শুইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার খোকাবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "কোনও ভয় নাই, অধিকজল উদরে প্রবেশ করিতে পারে নাই নিশ্বাসও বেশ পড়িতেছে।"

এইবার সকলের দৃষ্টি গিরিধারীর উপর পড়িল। সে তখন জ্বরের ঝোঁকে অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ডাক্তার নাড়ি দেখিয়া বলিলেন "কোনও আশা নাই।" সমস্ত রাত্ত একই ভাবে কাটিল, ভোরের বেলা রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইল। ডাক্তার নাড়ি দেখিয়া বলিলেন "আর বিলম্ব নাই।"

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ যেমন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, নির্ব্বাণোন্মুখ গিরিধারী ঠিক তেমনি করিয়া একবার চোখ চাহিল তার পর জড়িত-কণ্ঠে বলিল "বাঁচাতে পারলুম না।"

কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গিরিধারীর মনিব বলিলেন,—"তুমি নিশ্চিন্ত হও গিরিধারি খোকাবাবু এ যাত্রা বাঁচিয়া গেছে।" মুমূর্ষুর মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা বিকশিত হইল।তারপর দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

ভাগবত ধর্ম্ম।

সাধনপদ্ধতির মধ্য দিয়া আমরা ভাগবত ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি। প্রাচীনেরা ভাগবত-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, রসিক ও ভাবুক হইয়া ভাগবত-রস পান করিতে বলিয়াছেন। এ কালের লোকেরা বলিবেন যাহার তত্ত্ব বুঝি না, এবং যাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে, এমন কি যাহার বিরুদ্ধে চারিদিক হইতেই নানা প্রকারের অভিযোগ শুনিতেছি তাহা শ্রবণ করিবই বা কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি যে ভাগবতে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা গিয়াছে, ভাষার সাহায্যে যে চিত্রগুলি অঙ্কন করা হইয়াছে, 'সেই চিন্তা চিত্রগুলি 'অনঘ' হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মতামত না লইয়া ধীরভাবে গ্রহণ করা যাউক,

এই প্রকারে চিন্তাচিত্রগুলি গ্রহণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব এই গ্রন্থের মূল্য কি এবং উপযোগীতা কোথায়? এ অনুরোধ কি অন্যায্য? যাঁহারা গ্রন্থ পড়িবেন না, ইহার মর্ম্ম কি তাহা শুনিবেন না অথচ যাহা হউক একটা মত প্রচার করিবেন তাঁহাদের সহিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রে যে সমস্ত সত্য আলোচিত হইয়াছে, তাহা অতীন্দ্রিয়। আমাদের এখনও এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই যাহার দ্বারা আমরা এই সমস্ত চরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তবে ভবিষ্যতে সেরূপ ইন্দ্রিয় আমরা পাইব। এই জন্য এই সমস্ত অচিন্ত্য-সত্যের নির্ণয় প্রণালী সাধারণ বিজ্ঞানের সত্য-নির্ণয়ের প্রণালী হইতে পৃথক। ঋষিদিগের অনুমোদিত এই প্রণালী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার পর সেই শ্রুত বাক্য সমূহের সমন্বয় করিয়া মনন করিতে হইবে, তাহার পর একান্ত ও একাগ্রচিত্তে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারণা ও ধ্যান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই এবং অন্য উপায় হইতেও পারে না।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শন হেতবঃ॥

শ্রুতি বাক্যের উক্তি সমূহ প্রথমে শ্রবণ করিবে। শ্রবণের পর যুক্তির দ্বারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। সত্যদর্শনের এইগুলিই উপায়।"

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক ভক্তি সাধনার যে পথ কথিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম হইতে অভিন্ন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥"

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন গুরুগৃহে থাকিয়া তুমি যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহাই কিঞ্চিৎ শুনাও। এই অনুরোধের উত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন "পিতঃ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য (কর্ম্মার্পণং), সখ্য (তদ্বিশ্বাসাদি) আত্ম-নিবেদন ("দেহ সমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তা বর্জ্জনমিত্যর্থঃ"—শ্রীধরঃ), এই নব লক্ষণ

বিশিষ্ট ভক্তি যে অধ্যয়নের ফলে মানব ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, সেই অধ্যয়নই উত্তম অধ্যয়ন।”

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক দুইটির অতি বিশদ ও দীর্ঘ টীকা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই রূপ। প্রথমে নাম শ্রবণ। নাম শ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ শ্রবণ করিতে হইবে। শুদ্ধান্তঃকরণে রূপ শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে রূপের উদয় হইবে। রূপের উদয় হইলেই গুণের স্ফুরণ হইবে। তাহার পর পরিকর। এই প্রকারে নাম রূপ গুণ ও পরিকর স্ফুরিত হইলে, লীলার স্ফূরণ সম্যক্‌রূপেই হইবে। কীর্ত্তন ও স্মরণের ক্রম ও এইরূপ। আবার এই শ্রবণ যদি রুচি জন্মাইবার পর সাধু ও ভক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে হয় তাহার ফল অধিক। আবার বৈষ্ণবাচার্য্যেরা ভাগবত শ্রবণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। নামকীর্ত্তনেরও একটা অধিকার আছে। কতকগুলি অপরাধ আছে সেগুলি হইতে মনকে নির্ম্মুক্ত করিয়া নাম গ্রহণ করিতে হইবে। পদ্মপুরাণে দশটি নামাপরাধ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১। সতাং নিন্দা—সাধুজনের নিন্দা অর্থাৎ অন্য স্থানে দোষ দর্শনের অভ্যাস।

২। শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাচ্ছিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননং—বিষ্ণুর নাম হইতে শিব প্রভৃতির নাম স্বতন্ত্র এইরূপ মনে করা

৩। গুর্ব্ববজ্ঞা—গুরুর অবজ্ঞা

৪। শ্রুতি তদনুগত শাস্ত্রনিন্দন—বেদও তাহার অনুগত শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ অন্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনার অভ্যাস।

৫। হরিনামমহিম্নি অর্থবাদমিতি মননং—এই যে হরিনামের এত মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে এ সমস্ত সত্য নহে, কেবলমাত্র লোককে নাম কীর্ত্তন করাইবার জন্য এত প্রশংসা করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করা।

৬। তত্র প্রকারান্তরেণ অর্থকল্পনং—নানা রূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যার (যেমন আজকালকার অবোধ্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি) সাহায্যে নামের অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা। কারণ এই চেষ্টার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অবিশ্বাস লুকাইত থাকে।

৭। নাম-বলেন পাপ প্রবৃত্তিঃ—হরিনাম করিলেই যখন সকল পাপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তখন পাপ করা যাউক, নাম করিলেই হইবে। অথবা

নানারূপ অন্যায় ও অধর্ম্ম করিতেছি আবার মালা লইয়া নাম জপ করিতেছি আর ভাবিতেছি যখন নাম লইলাম তখন আর এই সব পাপে ভয় কি ?

৮। অন্য শুভক্রিয়াভির্নামসাম্য মননং—অন্যান্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সাম্য মনে করা।

৯। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি নামোপদেশঃ—যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাহারা বিমুখ বা বহির্মুখী, যাহারা শুনিতে ইচ্ছুক নহে তাহাদের নাম উপদেশ দেওয়া।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রুতেঽপ্যপ্রীতিঃ—নাম মাহাত্ম্য শ্রবণের পরও তাহাতে অপ্রীতি।

স্মরণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

১। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণং—ঈষৎমাত্র চিন্তার নাম স্মরণ।

২। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারে মনোধারণং ধারণা—সকল বস্তু ও বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া সমগ্র ধ্যেয় বস্তুতে যে চিন্তা প্রয়োগ তাহার নাম ধারণা।

৩। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানং—বিশেষ কোন অঙ্গ বা একটি একটি করিয়া রূপ, গুণ, বা লীলা প্রভৃতির যে একান্ত ও দৃঢ় চিন্তা তাহার নাম ধ্যান।

৪। অমৃতধারাবদনবচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতি—এই ধ্যান যখন অভ্যাস করিতে করিতে একেবারে অমৃতধারার মত অনবচ্ছিন্ন হইবে অর্থাৎ সেই ধ্যান সকল সময়েই যখন চিত্তের মধ্যে স্থিরভাবে থাকিবে তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

৫। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি। ক্বচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্ অন্যাস্ফূর্ত্তিঃ সমাধিঃস্যাৎ। কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফুরণ, আর কোন চিন্তা নাই, অথবা কেবল লীলারই স্ফূর্ত্তি হইতেছে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা নাই, সেই অবস্থার নাম সমাধি। এই সমাধির অবস্থাই আদর্শ অবস্থা।

পাদসেবনও নানাপ্রকারে অনুষ্ঠেয়। মূর্ত্তিসেবা, তীর্থসেবা, সাধুসেবা, তিথিসেবা অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শুভদিন পালন ইত্যাদি।

ভক্তির এই যে নয় অঙ্গের কথা বলা হইল, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলে আমরা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের পূজা, আচার প্রভৃতির ভিত্তি ও উদ্ভব বুঝিতে পারিব। হিন্দু চিত্তের যে অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ তাহা এই সমস্ত টীকার মধ্যে বেশ সুন্দররূপেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই জন্যই আমরা বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি।

এই যে নয় অঙ্গের ভক্তি সাধনার কথা বলা হইল এই নয় অঙ্গ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অঙ্গ অনুশীলন করিলে অপরগুলি আপনা হইতেই আসিবে। এই জন্য প্রাচীন কাল হইতে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে।

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকি কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্তেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরাম্॥"

"পরীক্ষিত শ্রবণে, ব্যাসপুত্র শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদ সেবনে, পৃথুরাজা পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান দাস্তে, অর্জ্জুন সখ্যে, বলি আত্মনিবেদনে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।"

ভক্তি সাধনার এই নয়টি পথ এবং তাহাদের বিভাগগুলি চিন্তা করিলেই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সুবিস্তৃত ক্রিয়া কলাপের মর্ম্ম ও রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। এই স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এই কথাটির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। (ক্রমসন্দর্ভ টীকা ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ধর্ম্মসাধনায় স্মরণের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া বা বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মসাধনা হয় না। বাহ্যক্রিয়া সহায়তা করিতে পারে এই পর্য্যন্ত। মানব জ্ঞানস্বরূপ, ধ্যান ধারণা বা চিন্তাবিহীন ক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন। স্মরণের দ্বারা সমস্ত কার্য্যই হইতে পারে। এ বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে একটি উপাখ্যান আছে, জীব গোস্বামী এই উপাখ্যানটি তাঁহার টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন উপাখ্যানটি এই।

প্রতিষ্ঠান পুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ বড় দরিদ্র। সমস্তই কর্ম্মফল, এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যের মধ্যেই বেশ শান্তভাবে বাস করিতেন। লোকটি বড়ই সরলচিত্ত। একদিন তিনি এক ব্রাহ্মণদিগের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধন কথা শ্রবণ করিলেন। এই সাধনা মনের দ্বারাই হইতে পারে এইরূপ কথা শুনিয়া, তিনি যথারীতি মানসপূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক শান্তচিত্তে নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিতেন ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া মনের দ্বারা নিজের অভিমত হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজে মনে মনে গৃহমার্জ্জন করিতেন, তাহার পর প্রণাম করিতেন। প্রণাম করিয়া মনে মনে স্বর্ণনির্ম্মিত

কলসে করিয়া গঙ্গা প্রভৃতি নানা তীর্থের জল আহরণ পূর্ব্বক স্নান করাইতেন। তাহার পর নানা উপচারে পূজা ও আরত্রিক প্রভৃতি করাইতেন। প্রত্যহ এইপ্রকার মানসিক অনুষ্ঠান করিতে তাঁহারা প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। এই প্রকারে বহুদিন চলিয়া গেল। একদিন সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে ঘৃতযুক্ত পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে ভোগের জন্য আনিতেছেন। সদ্য প্রস্তুত পরমান্ন খুব উত্তপ্ত, হঠাৎ সেই উত্তপ্ত পরমান্নে ব্রাহ্মণের দুইটি আঙ্গুল পড়িয়া গেল। সমাধিভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ দেখিলেন সত্য সত্যই তাঁহার স্থূল দেহের অঙ্গুলি দুইটি পুড়িয়া গিয়াছে ও ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে। ইহার পর বৈকুণ্ঠ-পতি ঐ ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত দেখিয়া স্বধামে লইয়া আসিলেন। রূপ গোস্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির যে অন্তরঙ্গ কৃষ্ণউপাসনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সহিত এই উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্বে এই সমস্ত উপাখ্যান যত সহজে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইত, এখন তাহা পারা যায় কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তীব্র ও একাগ্রচিন্তা যদ্যপি নিয়মবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দ্বারা অনেক প্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞান পর্য্যন্ত এ কথা স্বীকার করিতেছেন।

আমাদের দেশে এ প্রকারের ঘটনা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। একটি বিলাতী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনাটি শ্রীমতী এনি বেশান্ত তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেসান্তের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার দেহ সমাধিস্থানে কবর দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহার মাতা শূন্য ও বিমর্ষ নয়নে শোকাভিভূত হইয়া বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। যখন মৃতদেহ লইয়া যাইতেছিল তখন তিনি সেই দেহের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। দেহ লইয়া কিছু দূর চলিয়া যাওয়ার পর তিনি হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তিনি এই অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়িয়াছিলেন। শেষে তিনি বলেন যে তিনি মৃতদেহের সহিত গির্জ্জায় গিয়াছিলেন, সেখানে অন্তিম উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন পরে সেখান হইতে কবরে যান, ও মৃতদেহের সমাধিদান দর্শন করেন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি, যে কবরক্ষেত্রে তাঁহার স্বামীর দেহ সমাহিত করা হইয়াছিল, সেই সমাধি দেখিবার জন্য একজন আত্মীয়ের সহিত সেই সমাধিক্ষেত্রে গমন করেন। সমাধিক্ষেত্রটি খুব বৃহৎ।

সহচর আত্মীয় কবরটি কোথায় নিরূপণ করিতে পারিলেন না। সঙ্গে আর একজন লোক ছিলেন তিনি এই সমাধি ক্ষেত্রের কর্ম্মচারীকে ডাকিতে গেলেন। এমন সময়ে এনি বেসান্তের মাতা সেই সহচর আত্মীয়কে বলিলেন যে যে স্থানে অন্তিম উপাসনা করা হইয়াছিল যদি সেই খানে আমায় লইয়া যাও তাহা হইলে আমি কবরের নিকট যাইতে পারি। আত্মীয়ও অবশ্য মনে মনে ইহা অসম্ভব বলিয়াই চিন্তা করিলেন কারণ তিনি জানিতেন যে কবর দিবার সময় তিনি সঙ্গে ছিলেন না। যাহা হউক এই নববিধবার অনুরোধে আপত্তি করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে উপাসনা স্থানে লইয়া গেলেন।

এনি বেসান্তের মাতা সেই উপাসনা ঘর হইতে বাহির হইয়া যে রাস্তায় মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল ঠিক সেই রাস্তায় বরাবর গেলেন ও ঠিক কবরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে সমাধিস্থানের কর্ম্মচারীও তথায় আসিয়া কবর দেখাইয়া দিলেন। এই কবর উপাসনাস্থান হইতে অনেক দূরে এবং বড় রাস্তার ধারেও নহে, অনেক ঘুরিয়া সেখানে আসিতে হয়। আর সেই কবরটিই যে তাঁহার স্বামীর তাহা নিরূপণ করিবারও কোন উপায় ছিলনা। কবরের উপর কোনরূপ নাম লেখা ছিল না। তাহার নিকটে ও চারিপার্শ্বে এই প্রকারের আরও অনেক কবরও ছিল। তিনি কেমন করিয়া রাস্তাই বা ঠিক করিলেন আর কেমন করিয়াই বা সেই কবরটি নির্দ্ধারণ করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না, সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। শ্রীমতী এনি বেসান্ত এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে এখন আমি মানবতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের যে সমস্ত রহস্য অবগত হইয়াছি তাহাতে বুঝিতেছি যে ঘটনাটি মোটেই আশ্চর্য্যজনক নহে ইহা অতি সহজ ও সামান্য ব্যাপার। মানব-চৈতন্য স্থূলদেহ ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে ও দূরে যাহা ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্থূলদেহের মস্তিষ্কে সেই ঘটনার স্মৃতি মুদ্রিত করিতে পারে। তিনি যে উপাসনা স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন ইহার মর্ম্মও বুঝিতে পারা যাইতেছে। তিনি অতীতের স্মৃতির একটি সূত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। উপাসনা স্থানে যাইবার মাত্র সেদিনের দৃষ্ট পথ প্রভৃতি তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। *

* "With my present knowledge the matter is simple enough, for I now know that Consciousness con leave the body, take part in events going on at a distance, and, returning impress on the Physical brain

পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে পুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে প্রাচীনদিগের মতে সেগুলি কতকগুলি গল্পের বা ঘটনার সমষ্টিমাত্র নহে এবং নৈতিক গল্প বলিয়া যেমন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই প্রকারের কতকগুলি উপদেশ সমাজে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ রচিত হয় নাই। সমস্ত লীলা বা সমস্ত পুরাণের কথা বলিতেছিনা কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন নমস্কৃত মহাপুরাণ সমূহ ভক্তের অধ্যাত্মসাধনার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পৌরাণিক সাধনতত্ত্বের উপর বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ক্রিয়া কলাপ ও অনুষ্ঠানাদি প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং পৌরাণিক সাধনার রহস্য না বুঝিলে হিন্দুসমাজেরও বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না। আরও দেখান হইল যে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারাও পৌরাণিক সাধনা কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থন করা অসম্ভব নহে। আমরা যাহা বলিতে চাই সংক্ষেপে তাহা আবার বলিতেছি।

পুরাণের লীলাগুলি চিন্তাচিত্র। এই চিন্তাচিত্রগুলি গ্রহণ করাই সাধনার প্রথম সোপান। চিন্তা বা জ্ঞানই মানবের স্বরূপ। সত্যের বা জ্ঞানের পথে আরোহণ করিতে হইলে এই চিন্তা বা স্মরণকেই সম্বল করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। এই চিন্তাই ধারণ, ধ্যান বা মনন ও নিদিধ্যাসন পদবাচ্য; এই চিন্তার দ্বারা প্রভূত উপকার হইবে। এই সমস্ত চিন্তাচিত্রের মধ্যে একটা শক্তি নিহিত আছে।

যেমনই হউক প্রত্যেক মানুষেরই একটা অন্তর্জগৎ বা চিন্তাজীবন আছে। টাকার বিষয়ই হউক, আর দেহ গেহ ও অপত্যাদির বিষয়ই ভাবুক, মানুষ মাত্রেই ভাবেও কল্পনা করে। এই যে ভাবনার রাজ্য সে রাজ্যটা এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে যে কিছু স্বতন্ত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা তত্ত্ব জানে না তাহারা মনে করে ও বলে যে এই ভাবনার রাজ্যটা কিছুই নহে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা অজ্ঞানতা-প্রসূত। অধিক কি এই ভাব রাজ্যটাই অধিক সত্য, স্থূল জগৎ অপেক্ষা সত্য। আগে ভাব তাহার পর ভব। আমরা ভাবের মধ্য দিয়া ভব দেখি।

---

what it has experienced. The very fact that she asked to be taken to the chapel is significant, showing that she was picking up a memory of a previous going from that spot to the grave." Antobiography P. 26.

মানুষের এখনও ক্রমবিকাশ শেষ হয় নাই। মানুষের মধ্যে অনেক শক্তি এখনও নিদ্রিত। ঐ সমস্ত লীলা চিন্তা করিতে করিতে এই সব নিদ্রিত শক্তি (Latent Faculties) জাগ্রত হইবে। এই সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগিতে আরম্ভ করিলে মানব বুঝিতে পারিবে পুরাণের বর্ণনাগুলির যথার্থ অর্থ কি। এই দৃশ্যমান বিশ্ব সমস্ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। "মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত" শক্তির বিকাশ হইলে মানব বিশ্বের এমন অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবে যে তাহার আলোক তাহার এখনকার মত ও ধারণাগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও উপহাসাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইবে।

মানুষের মধ্যে যে অনেক সূক্ষ্ম শক্তি ঘুমাইয়া আছে তাহা অতি সহজেই বোঝা যায়। যেমন ছোট ছেলেটির চলিবার শক্তি, কথা কহিবার শক্তি, তর্ক করিবার শক্তি, অঙ্ক কষিবার শক্তি এখনও জাগে নাই অনুশীলন দ্বারা ক্রমে জাগিবে, এও ঠিক তেমনি। আমাদের এখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে। আবার যে অন্ধ তাহার চারিটি ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের কাছেই জগতের প্রকাশ। অন্ধের জগৎ রূপহীন ও আলোকহীন চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু অন্ধকারকে সে অন্ধকার মনে করে না কারণ সে জানে না অলোক কেমন। বধিরের জগৎ শব্দ শূন্য। আমাদের এখন যে পাচটি ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে ইহা ছাড়া আরও ইন্দ্রিয় আছে। সেগুলি ও ক্রমে জাগিবে। সাধন রাজ্যে অগ্রসর হইলে সেগুলি জাগিয়া উঠিবে।

মনে করুন পৃথিবীর সমস্ত লোক জন্মান্ধ। সেই জন্মান্ধের দেশে সূর্য্যও উঠে, ফুলও ফোটে, পাখী গান করে। অন্ধেরা সূর্য্যের উত্তাপ স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করে বটে কিন্তু সূর্য্যও দেখিতে পায় না, আলোক কি তাহাও জানে না। কিন্তু উত্তাপটা পায়। ফুলের গন্ধ পায়, পাখীর গানও শোনে, পাখার শব্দও শোনে, কখনও কখনও চলিতে চলিতে ফুলের স্পর্শও পায় কিন্তু পাখীও দেখিতে পায় না, ফুলও দেখিতে পায় না। সেই দেশে হঠাৎ একজন চক্ষুবিশিষ্ট লোক আসিয়া আলোকের কথা দৃষ্টির কথা বলিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, এই তোমাদের চারিদিকে কত কি রহিয়াছে। অন্ধেরা কি বুঝিবে? আর যে চক্ষুবিশিষ্ট লোকটি তাহাদিগকে কেমন করিয়াই বা এই সব কথা বুঝাইবে? মহা বিপদ। হয়ত অন্ধেরা চক্ষুবিশিষ্ট লোকটিকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, নয়ত তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। এখন চক্ষুবিশিষ্ট লোকটি অন্ধদের চক্ষু খুলিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি

ভাবিতেছেন যদি অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া দিতে পারি তাহা হইলে আর তাহাদের সঙ্গে বৃথা তর্ক ও ঝগড়া করিতে হইবে না। পৌরাণিক সাধনার মধ্যে এই চক্ষু খুলিবার উপায় আছে। প্রাচীনকালে এই পদ্ধতিতে অনেকের চক্ষু খুলিয়াছে। অন্ধের দেশে চক্ষুষ্মানের কথা বলিয়াই গীতা বলিয়াছেন—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥"

কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন। কেহ বা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন। কেহ বা ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। কেহ বা শুনিয়াও ইহাকে জানেন না।

মহাত্মা খৃষ্ট উপাখ্যানের মধ্য দিয়া তত্ত্ব উপদেশ দিতেন ও বলিতেন "Therefore speak I to them in parables ; because they seeing see not ; and hearing hear not, neither do they understand" অর্থাৎ ইহারা দেখিয়া দেখে না, শুনিয়াও শোনে না এবং দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারে না।"

মানুষ অবশ্য পরমার্থতঃ সব সমান, তবে যেমন ফোটা ফুল, আধফোটা কুঁড়ি, তেমনি কাহারও কম শক্তির বিকাশ হইয়াছে কাহারও বেশী শক্তির বিকাশ হইয়াছে। সকল শক্তিই সকলের একদিন বিকাশ হইবে সেই জন্যই জগতে অধ্যাত্ম শাস্ত্র সমূহ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে 'অনঘ' হইয়া ভাগবত শ্রবণ ও স্মরণ করিতে হইবে। একালের লোকে স্বাধীন চিন্তাকে খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে, আমরা যাহাকে স্বাধীন চিন্তা বলিয়া মনে করি তাহা যে কত পরাধীন তাহা আমাদের ভাবিবারও অবসর নাই। ভাগবত বলিতেছেন যে মানুষকে স্বাধীন চিন্তা বর্জ্জন করিতে হইবে না, তবে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, গ্রন্থের অর্থ ও মর্ম্ম ভাল লোকের নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তাহার পর যাহা হয় করিবে। আর এক কথা ভাগবত বলিতেছেন যে আগে হইতে অর্থাৎ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বা সাধনা সম্বন্ধে নিজে কিছু না জানিয়া যেমন তেমন একটা ধারণা লইয়া আসিও না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে "Unreserved and unprejudiced laying of onesself open।"

প্রকৃত প্রস্তাবে সকল প্রকার সত্য নির্ণয়েরই কি ইহাই পথ নহে? "knowledge is received only in those moments in which every judgement, every criticism, coming from ourselves, is silent."

আত্মাভিমান পরিত্যাগ করাই অনঘ হওয়া। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেই আমরা ধন্য হইব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ভাষায় বলিতে পারি।

"প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥
অশীতিং চতুরশ্চৈবং লক্ষাস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্য্যায়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দ চরণদ্বয়ম্॥"

স্মৃতিদিনে।

১

মা আমার,
বিধির আশিস্-ভরে— বরষ বরষা-পরে,
ফিরিয়া আসিল পুন ধরণী-মাঝার;
কত বাধা, কত কর্ম্ম, কত মৃত্যু-কত জন্ম,
কত হাসি—কত কান্না পাইল সংসার!
স্ব-জন-সংসার ফেলে, সেই যে গেছ মা চলে,
এক—একবার বল আসিবে না আর?
জিজ্ঞাসে আকুল প্রাণ আজি মা আমার!

২

মা আমার,
ভরিয়া সুরভি-বাসে, কুসুম তেমনি হাসে,
বিরাজে বিটপীকোলে ফলের সম্ভার!
নদী গাহে কুলু-তান, পাখী গায় কল-গান,
শরতের আর্দ্রবায়ু ভ্রমে চারিধার,

ভূমিতলে তৃণ-গুলি, নাচে হাসে হেলিদুলি !
স্মরণে আসিছে পুণ্য স্মৃতিটি তোমার !—
কত দূরে গেছ চলে জননী আমার !

৩

মা আমার,
আসিছে সোণালী উষা, পরিয়া রঙ্গিল ভূষা,
আসে সন্ধ্যা স্নিগ্ধ হাস্যে ফিরে বার বার,
জলদের জাল-কেটে, চাঁদ বাহিরায় ছুটে—
পরিয়া কৌমুদী-বাস—সরায়ে আঁধার !
সুখদ-প্রভাত হতে—দিনমান একমতে
শরতের হৈম রোদ ভাতিছে আবার !
স্মরণে আসে মা পুণ্য স্মৃতিটি তোমার।

৪

মা আমার,
কত রোগে দেহ জীর্ণ— কত শোকে হৃদি-দীর্ণ
হ'তেছিল দিন দিন তব অনিবার ;
অবিরত করপুটে, যা' চাহিতে মুখ ফুটে,
তোমার দেবতা-পদে— ; সেই বিশ্বাধার—
সে প্রার্থনা শুনি কি মা, ডাকিলেন স্নেহে তোমা ?
তাই তুমি চলে গেলে নিকটে তাঁহার !
পারিল না রেখে দিতে তোমার সংসার !!

৫

মা আমার,
কোথায়—কাছে না দূরে ? সে কোন্ অজ্ঞাতপুরে,
গিয়াছ চলিয়া ত্যজি আপন সংসার ?
(খেলিতে খেলিতে খেলা, শেষদিন শেষবেলা,
পশিল শ্রবণে স্নেহ আহ্বান কাহার— !
আর হইল না থাকা,— সে দেহ ধরিয়া রাখা—
কোন মতে কোন সাধ রহিল না—আর !
চলে গেল সেইক্ষণে জননি আমার !)

৬

মা আমার,

তারপর কতদিন— নিত্য হইতেছে লীন,
চূর্ণ বিচূর্ণিত তব সাধের সংসার!
শোভা নাই—শ্রীও নাই! হাসিনাই, আশানাই!
ক্ষুব্ধ-স্তব্ধ-মৃত আহা! তার চারিধার।
তুমি ছিলে যার প্রাণ, তোমাতেই অবসান—
শৃঙ্খলা—সৌন্দর্য্য-শূন্য হয়ে গেছে তার।
মনে পড়ে সেই কথা মাগো বারবার।

৭

মা আমার,

গেছে মধু অবকাশ, গেছে কত অভিলাষ,
প্রাণভরা তপ্তব্যথা, অশ্রু আর মর্ম্ম গাথা
উঠে উথলিয়া আজি স্মরণে তোমার!
এজীবনে একবার—পায় না সেদিন আর?
পবিত্র পরশ মাগো, পাব না তোমার?
তাই প্রাণ আজি মোর করে হাহাকার।!

৮

মা আমার,

সংসার-স্ব-জন ফেলে, যে আশ্রমে চলে গেলে,
সমাপ্তি হয়েছে সেথা শুভ বাসনার?
মিলন ও শান্তিতরে, সে আকাঙ্খা প্রাণভরে,
শেষদিন শেষক্ষণে ছিল মা তোমার—
পেয়েছ কি সে মিলন? পেয়েছ সে শান্তি ধন?
ব্যথা নাই—অশ্রু নাই সেথা তব আর?
জিজ্ঞাসে ব্যাকুল প্রাণ আজি মা আমার!

৯

মা আমার,

শান্তিতে—পরম সুখে—আছ মা পিতার বুকে?
সংসারের দুঃখ-শোক ফিরিছে না আর?

পুণ্যদিনে পুণ্যগাথা—তোমার সুখের কথা
শুনিতে উৎসুক অতি পরাণ আমার !
নাহি রোগ শোক ভ্রান্তি?—আছে অবিচ্ছিন্ন শান্তি
—ভাল আছ'—সুখে আছ', বল একবার,
পুণ্যদিনে সেই কথা শুনি মা আমার !

১০

ওহে বিশ্ব-রাজ,
দীন-অকিঞ্চন আমি—কি বলিব অন্তর্যামী,
রাখিও মায়েরে মম শান্তি-সুখ-মাঝে ;
রাখ তারে দিবারাতি, আনন্দ-আরামে মাতি
—ব্যাকুলতাভরে, তব সুমঙ্গল কাজে।
জ্ঞানহীনা আমি অতি, স্মৃতি দিনে করি নতি,
অশরীরি সে আত্মার করিও কল্যাণ—
—কাছে রেখ তাঁকে—; এই ভিক্ষা মাগে প্রাণ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা রায়।
বীরভূম।

পরেশনাথ তীর্থ।

বিন্ধ্যাচলে পরেশনাথ নামে উচ্চ গিরি ঊর্দ্ধে প্রায় পঞ্চ সহস্র ফুট। এই পাহাড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত থাকিয়া মুনিবরকে প্রণাম করিতেছে। ইহার অপর নাম সুমেত শেখর। তীর্থঙ্করসেবী জৈনগণ এই অচলকে অতি পবিত্র চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। এই পবিত্র অচলের দর্শন কামনায় গুজরাত, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রাজপুতভূমি ও ভারতের অন্যান্য স্থানস্থ জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ প্রভূত ধনব্যয় স্বীকার করিতে অকুণ্ঠিত হন এবং এই অচলের উপরিস্থ পবিত্র স্থান সমূহ দর্শন লাভ ঘটিলে তাঁহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্য-যুক্ত ও গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সুমেতশেখরে কুড়িজন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ পদ লাভ করেন। তীর্থঙ্কর বা জিনগণ মহাপুরুষ বা অবতার স্বরূপ। জৈনগণের মতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে ঋষভদেব তীর্থঙ্কর পদবী লাভ

করেন। পরে (২) অজিত (৩) শম্ভব (৪) অভিনন্দন (৫) সুমতি (৬) পদ্মপ্রভু (৭) সুপার্শ্ব (৮) চন্দ্রপ্রভু (৯) সুবিধি (১০) সিতল (১১) শ্রেয়াংস (১২) বাসুপূজ্য (১৩) বিমল (১৪) অনন্ত (১৫) ধর্ম্মনাথ (২৬) শান্তিনাথ (১৭) কুন্থনাথ (১৮) অরনাথ (১৯) মল্লিনাথ (২০) মুনিসুব্রত (২১) নমীনাথ (২২) নেমিনাথ (২৩) পার্শ্বনাথ (২৪) মহাবীর ক্রমান্বয়ে তীর্থঙ্কর পদবী লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে ঋষভ, বাসুপূজ্য, নেমিনাথ ও মহাবীর এই চারিজন তীর্থঙ্কর ভিন্ন অপর কুড়িজন তীর্থঙ্কর পবিত্র সুমেতশেখরে নির্ব্বাণ।পদ প্রাপ্ত হন এবং ইহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথদেব মোক্ষ পদ লাভ করেন। এই কারণেই পরেশনাথ পাহাড় জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণের পরম তীর্থ স্থান হইয়াছে।

সুমেত শেখরের পাদদেশে মধুবন নামে এক স্থান আছে। মধুবনে পরেশনাথ যাত্রীদিগের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। পরেশনাথ যাত্রীদিগের ধর্ম্মশালাই একমাত্র বিশ্রামভূমি। মধুবন স্বভাবতই শান্তরসাস্পদ। ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে বিচিত্র বনভূমি, পক্ষীর সুমধুর কূজন গ্রামবাসীগণের সরলতা ব্যঞ্জক মুখশ্রী কিছুরই অভাব দৃষ্ট হয় না। মধুবনস্থ ধর্ম্মশালা হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে অবলোকন করিলে এক বিরাট পর্ব্বত বৃক্ষরাজি মণ্ডিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে বোধ হইবে।

মধুবন নামক স্থান গিরিধি হইতে প্রায় বিশ মাইল। গিরিধি হইতে হাজারিবাগ অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া নয় ক্রোশ পথ গমন করিলে দুইটি রাস্তা পাওয়া যায়। ইহার একটি রাস্তা বরাবর হাজারিবাগ অভিমুখে গিয়াছে। আর একটি রাস্তা মধুবন অভিমুখে গিয়াছে। রাস্তা দুইটির সন্ধিস্থল হইতে মধুবন এক ক্রোশের অধিক দূর নহে। পরেশনাথ পাহাড় গিরিধির উত্তর ধারে অবস্থিত। মধুবন যাইতে হইলে গিরিধি হইতে পুস্ পুস্ বা গোযানে আরোহণ করিতে হয়। গোযানে যাতায়াতের ভাড়া সাধারণতঃ চার টাকার অধিক নহে। গিরিধি হইতে পরেশনাথ যাইবার পথে আট মাইল গমন করিলে বরাকর নামে এক নদী পাওয়া যায়। স্থানের নামও বরাকর বা পালগঞ্জ। বরাকর নদী স্বল্পতোয়া বটে কিন্তু স্বচ্ছসলিলা। নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর। তখন বোধ হয় মধ্যে এক হাত জলও ছিল না। গোযান সহজেই জলের উপর দিয়া

পার হইয়া গেল। আমরা পালগঞ্জে উপস্থিত হইলে দুই তিনটি ব্রাহ্মণবটু দর্শন করিলাম। তাহারা পরেশনাথ পাহাড়ের পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিল এবং সুললিত স্বরে স্তোত্র গাহিয়া পয়সা ভিক্ষা করিতে লাগিল। এই স্থানে করুণোদ্দীপক আরও কয়েকটি দরিদ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম। দেখিলেই বোধ হয় জীবের সেবাই পরম ধর্ম্ম।

বরাকর নামক নদী হইতে স্থানের নামও বরাকর হইয়াছে। বরাকরে একজন রাজা আছেন। তাঁহাকে একজন বড় ভূস্বামী বলিলেই চলে। রাজার উদ্যোগে প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে বরাকরে একটি মেলা হইয়া থাকে। বরাকর বা পালগঞ্জ হইতে মধুবন নয় মাইল দূরবর্ত্তী। রাস্তার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও অরণ্য ও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। রাস্তা হইতে দূরে দূরে পল্লী সমূহ মধ্যে প্রাচীন অধিবাসীদিগের বাসস্থান।

মধুবন নামক স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণের তিনটি ধর্ম্মশালা আছে। এই ধর্ম্মশালাগুলি বর্ণনা করিতে হইলে জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। জৈনগণ দুই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় ও দিগম্বরী সম্প্রদায়। দিগম্বরীগণ আবার দুই পন্থীতে বিভক্ত। তের পন্থী ও বিশ পন্থী। মধুবনে শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের একটি ও দিগম্বরী সম্প্রদায়ের তের পন্থী ও বিশ পন্থীগণের এক একটি সমুদায়ে তিনটি ধর্ম্মশালা আছে।

বিদ্যাসাগর শান্তি মুনি বিজয়জী মহারাজ নামে একজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী 'শ্রাবক শান্তিসুধা' বা মানব ধর্ম্ম সংহিতা নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনি স্বপুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন জৈনধর্ম্ম অতি প্রাচীন। তাঁহাদের মতে শেষ জিনদেবই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থের গুরু। অনেকে বলেন জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এক রূপ। শান্তি মুনি মহারাজ বলেন, জৈনগণের বিশ্বাস তাহা নহে। তাঁহাদের মতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে পার্থক্য আছে। জৈনগণের পঞ্চচত্বারিংশ সংখ্যক আগম গ্রন্থ (দর্শন ও সংহিতা গ্রন্থ) আছে। এই সমস্ত পুস্তক বৌদ্ধ দর্শন ও সংহিতা গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক। বৌদ্ধদিগের পূজা পদ্ধতি জৈনদিগের পূজা পদ্ধতি হইতে পৃথক। জৈনগণ চব্বিশ জন তীর্থঙ্করকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু বৌদ্ধগণ দশজন বোধিসত্ত্বকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। এই সকল ও অন্যান্য

কারণে জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে এক বা এক রূপ তীর্থঙ্করসেবীগণ তাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন না।

বিজয়জী স্বামী বলেন, জীন ধর্ম্ম অতি পুরাতন ও ইহার মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ আধুনিক। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এইরূপ কোন সম্প্রদায় বিভাগ পূর্ব্বে ছিল না। শিবভূতি সহস্রমল্ল নামে একজন সাধক দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। যাঁহারা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারাই দিগম্বর আখ্যা প্রাপ্ত হন। বস্ত্রত্যাগের উপর বিশিষ্টতা থাকায় দিগম্বর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। (দিক—শূন্য নগ্নভাব; অম্বর বস্ত্র) দিগম্বরগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের মূর্ত্তি বস্ত্রভূষণাদি দ্বারা অলংকৃত করেন না। শ্বেতাম্বরীগণ পবিত্রতাই (শ্বেত=শুভ্রতা=পবিত্রতা) দেবতার বস্ত্র বলিয়া তাঁহাদের উপাস্য মূর্ত্তিকে নানারূপ অলংকারে ভূষিত করেন। দিগম্বরদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে,—

রথবীরপুর নগরে দীপক উদ্যানে শ্রীআচার্য্যকৃষ্ণ নামে একজন আচার্য্য বিহার করিতেন। সেই নগরে শিবভূতি সহস্রমল্ল নামে এক প্রসিদ্ধ গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি প্রতি রাত্রিতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেন বলিয়া স্ত্রী শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে বলিয়া দেন। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী পুত্রবধূকে অর্গল বদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতে ও দ্বার খুলিয়া না দিতে আদেশ দিয়া নিজে জাগিয়া থাকেন। পুত্র আসিয়া ডাকাডাকি করিলে মাতা রুক্ষস্বরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর বাক্যে বলিলেন 'যেখানে এত রাত্রে দ্বার খোলা আছে, সেখানে প্রবেশ কর'। মাতার বাক্যে পুত্রের মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। শিবভূতি সহস্রমল্ল সেই গভীর রাত্রিতেই বাটী পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সাধু আচার্য্যকৃষ্ণের আশ্রমের দ্বারদেশ খোলা দেখিতে পাইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন এবং সাধু হইবার জন্য আচার্য্যের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আচার্য্য অবশেষে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া কিছুদিন পরে সেই নগর পরিত্যাগ করেন। কিছু কাল পরে আচার্য্য আবার সেই নগরে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া শিবভূতি রাজপ্রদত্ত একখানি উত্তম রত্ন কম্বল উপহার দিবার জন্য আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হন। আচার্য্য তাহা দেখিয়া শিবভূতিকে বলিলেন এইরূপ বহুমূল্যবান বস্ত্রের প্রয়োজন কি? ইহা রাখা উচিত নহে। এই বলিয়া উক্ত রত্ন কম্বলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। ইহাতে শিবভূতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। একদিন

ঐ সাধু আচার্য্য কৃষ্ণ জিনি-কল্পী মুনিদিগের অধিকার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ছিলেন। উক্ত উপদেশের মধ্যে জিনেশ্বরদিগের বস্ত্র পরিত্যাগের কথা উল্লেখ থাকায় শিবভূতি আচার্য্যকে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। আচার্য্য উত্তর করেন যে যদিও জৈনেশ্বরদিগের বস্ত্র পরিত্যাগের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি আমাদের পক্ষে এখন সম্পূর্ণ নগ্ন থাকা অসম্ভব। আর তা ছাড়া জিনদিগের কেহই একেবারে বস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। শিবভূতি কিন্তু আপনার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি সমস্ত বস্ত্র ও পাত্র পরিত্যাগ করিয়া নগ্নভাবে উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে তাঁহার মত জৈনধর্ম্ম মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পদ্ধতি সৃষ্টি করিল।

এইরূপে দিগম্বর সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর শান্তিমুনি বিজয়জী মহারাজ শান্তিসুধা নামক তৎপ্রণীত মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, শ্বেতাম্বরী মতই প্রাচীন। তাঁহার মতে তীর্থঙ্কর ও আর্হতগণের জন্ম গ্রহণের পরে দিগম্বরী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর পাওয়া-পুরী নগরীতে নির্ব্বাণ পদ লাভ করিলে ছয়শত নয় বৎসর পরে এই মত প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। নির্গ্রন্থনাথ মহাবীর বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কোন পল্লী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ দিগম্বর। এই জন্য কেহ কেহ মহাবীরকেই দিগম্বর মতের প্রবর্ত্তক বলেন। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে প্রধানতঃ মত পার্থক্য এইরূপ ;—

(১) দিগম্বরগণ বস্ত্রত্যাগ স্বীকার করেন।

(২) দিগম্বর জৈনগণের মতে স্ত্রীলোকদিগের মোক্ষ নাই।

(৩) শ্বেতাম্বর জৈনগণের মতে বন্দনা দ্বারা ধর্ম্ম লাভ আর দিগম্বর জৈনগণের মতে ধর্ম্মবৃদ্ধি ঘটে।

(৪) শ্বেতাম্বরী জৈনগণের মধ্যে যাঁহারা মুনিব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকার 'জিনকল্পী' ও অপর 'স্থবির কল্পী'। জম্বুস্বামী নির্ব্বাণ লাভ করিলে পর জিনকল্পী মুনি আর দেখা যায় না। এখন যাঁহারা মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই স্থবির কল্পী। দিগম্বর সংসার ত্যাগীগণের মধ্যে এরূপ কোন বিভাগ নাই।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কতকগুলি মত পার্থক্য আছে। দিগম্বরীগণ আপনাদের উপাস্য দেবতা কোনরূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেন না। এমন কি

ফুল চন্দন প্রভৃতি পাত্যার্ঘ্যও প্রদান করেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশর দ্বারা তাঁহাদের উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিশ্‌পন্থী নামে অভিহিত। আর যাঁহারা তাহাও করেন না তাঁহারা তেরপন্থী নামে অভিহিত। ইহারা বলেন পুষ্প বিল্বপত্র চয়নে বহু প্রাণী হিংসার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এইরূপ না করাই ভাল।

দিগম্বরীগণের মতে স্ত্রীলোকদিগের মোক্ষ নাই। কিন্তু শ্বেতাম্বরীগণ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন সাধনা দ্বারা কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই নির্ব্বাণ পদলাভ করিতে পারেন। উনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ স্ত্রীলোক ছিলেন একথা শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। আরও সুখের বিষয় এই যে যখন আমরা দেখিতে পাই যে একজন স্ত্রীলোক সাধনা দ্বারা সিদ্ধ মনোরথ হইয়া তীর্থঙ্কর পদবীতে আরূঢ়া ছিলেন এবং জৈন ধর্ম্মের পথ প্রদর্শিকা হইয়াছিলেন তখন আমরা বুঝিতে পারি যে জৈন ধর্ম্মে আত্মার শান্তিপ্রদা ও শিবদাত্রী শক্তিসমূহ উপযুক্ত অবস্থায় এবং যথাযোগ্য পাত্রে ভারতের স্বাধীনযুগে কিছুকালের জন্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল।

জৈনধর্ম্মীগণ সকলেই ধূপ, দীপ, পুষ্প, আলতা, তণ্ডুল, হরিদ্রা, চন্দন, আমলকি প্রভৃতি দিয়া তীর্থঙ্করগণের পূজা করিয়া থাকেন। পূজা প্রণালী আমাদের নারায়ণ শিবাদিপূজারই অনুরূপ। তবে সংক্ষিপ্ত। সেই ওঁ, হ্রীং, স্বাহা প্রভৃতি বীজমন্ত্র তাঁহাদের দেবতার পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছে। তীর্থঙ্করগণের পূজা প্রণালী প্রায় একরূপ। তবে স্তব ভিন্ন ভিন্ন। রত্নসাগর, আরাধনপ্রকরণমালা প্রভৃতি পুস্তকে পূজা পদ্ধতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। মধুবনে তেরপন্থী ধর্ম্মশালায় দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত কতক-গুলি পুরুষ ও স্ত্রীর পূজা প্রণালী দেখিয়াছিলাম। পূজাপদ্ধতিতে একটু বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। একজন একচক্ষুহীনা অল্পবয়স্কা তেজস্বিনী বিধবা সমধিক অনুরাগের সহিত মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, অপরাপর পুরুষ ও স্ত্রীলোক-গুলি সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন এবং "ওঁ হ্রীং পার্শ্বনাথায় স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া পূজার দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন।

স্বস্ব সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন অর্থপতিগণ প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মশালা-গুলি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার চত্বরভূমি তিনভাগে বিভক্ত। (১) অতিথিশালা (২) অর্থশালা (৩) উপাসনালয়। ইহাদের মধ্যে শ্বেতাম্বরী জৈন দিগের, ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণগৌরব সমধিক প্রশংসনীয়, এই ধর্ম্মশালা

জগৎশেঠ ধনপতিসিংহ বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দিগম্বরজৈন মন্দিরের হেমখচিত অগ্রভাগ সমূহে রক্তপতাকা এবং শ্বেতাম্বরী জৈন মন্দিরের স্বুবর্ণ-মণ্ডিত শিখরে অর্দ্ধশুভ্র অর্দ্ধরঞ্জিত পতাকা বিরাজ করিতেছে।

ধর্ম্মশালায় যাত্রীদিগের আবাসস্থানের ব্যবস্থা পরিপাটী, অতি সুন্দর। ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেই অনুমান দুইশত হাত প্রশস্ত ও পাঁচশত হাত দীর্ঘ এক সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে অতিথিদিগের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আতিথ্যালয়ে এক শতেরও অধিক প্রকোষ্ঠ আছে। অতিথি-শালার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তিনটি মন্দির দৃষ্ট হয়। অতিথিশালা অতিক্রম করিলে পর অর্থশালা বিভাগ দৃষ্ট হয়। এই বিভাগে ঠাকুরের ধন সম্পত্তি সংরক্ষণের নিমিত্ত গৃহ, কাছারি গৃহ, পুষ্পোদ্যান, গোশালা, নূতন অতিথিশালা ও পুস্তকাগার আছে। অতিথি-সেবালয় ও ঠাকুরের অর্থশালা চতুর্দ্দিকেই হয় গৃহভিত্তি, নয় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। কাছারি বাড়ীতে দেওয়ান, মুনসি, খাজাঞ্চি, জামাদ্দার, বরকন্দাজ, পাইক ও বহু ভৃত্য আছে। প্রহরে প্রহরে নহবত বাজিয়া থাকে। রাত্রিতে তিন তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক জন লোক বন্দুক হস্তে ঠাকুরবাড়ী পাহারা দিয়া থাকে। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে স্নানাগার। কাছারি বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একটি সুরঙ্গ পথে কিছুদূর গমন করিলেই স্নানাগার পাওয়া যায়। এখানে একটি ইন্দারা আছে। স্নানের নিমিত্ত গরম ও শীতল জল নিয়ত জোগাইবার জন্য পরিচারক নিযুক্ত আছে। স্নানের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত এখানে মজুত আছে।

কাছারি বাড়ীতে যে নূতন অতিথিশালা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার একটি ঘরে প্রায় ত্রিশখানি চেয়ার একটা টেবিল ও কয়েকখানি পুস্তক সহ একটি আলমারি আছে। ইহাই লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার। কিন্তু দারুণ পরিতাপের বিষয় এই যে পুস্তকাবলি ষষ্টিসংখ্যকের অধিক হইবে না। ইহাদের মধ্যে ১। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা শান্তি সুধা ২। জ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র (শ্রীধর শিব লালজী), ৩। পঞ্চাঙ্গ জ্যোতিষ (ধর্ম্মসভা), ৪। শ্রীঅষ্টোত্তর শত কাশিক পঞ্চাঙ্গ চিহ্নম্ জ্যোতিষ, ৫। জৈন পঞ্চাঙ্গ ৬। আরাধন প্রকরণ মালা ৭। শ্রীজীন গুণ জাহির সংগ্রহ ৮। শ্রীজৈনরত্ন মণি ৯। শ্রীচতুর্বিংশতি জিন স্তবাবলী ১০। অর্হন্নীতি ১১। বৈরাগ্য তরঙ্গ ভেদ মালা ১২। ষট্পুরুষ চরিত্র ১৩। নিত্য পূজা সংস্কৃত রত্নাবলী ১৪। জম্বুস্বামী চরিত্র ১৫। শ্রীপূর্ব্বদেশ তীর্থস্তবাবলী ১৬। বৈরাগ্য তরঙ্গ ভক্তিমালা ১৭। আত্মভিক্ষা ভাবনা ১৮। জৈন নিত্য

পাঠ সংগ্রহ ১৯। জীনস্তোত্র সংগ্রহ ২০। সুখপ্রাপ্তি সাধন ২১। শ্রীপঞ্চোপদেশ তীর্থস্তবাবলী ২২। শুদ্ধোপযোগ বা সহজ সমাধি ইত্যাদি পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা শান্তিসুধা বিদ্যাসাগর শান্তিমুনি বিজয়জি প্রণয়ন করেন! শ্বেতাম্বরী জৈন মন্দিরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি পটাঙ্কনে রক্ষিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানি দেখিলে বোধ হয় যেন মনুসংহিতার অনুকরণেই লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে যাহা উল্লেখ-যোগ্য :—

১। প্রমাণ নয়তত্ত্বালোকালঙ্করি (শ্রীদেবস্থরি)

২। হৈমলিঙ্গানুশাসন—(হেমচন্দ্রাচার্য্য)

৩। সিদ্ধহেম ব্যাকরণ লঘুবৃত্তি

৪। গুর্বাবলী

৫। রত্নাকরাবতারিকা

৬। শ্রীজৈন স্তোত্র সংগ্রহ—১ম ও ২য় ভাগ।

এই সকল গ্রন্থপ্রণেতৃগণ মধ্যে বহু বহু পণ্ডিত ছিলেন। দেবসুন্দর স্থরি, জ্ঞানসাগর স্থরি, সোমসুন্দর স্থরি, মুনিসুন্দর স্থরি, প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম শ্রদ্ধা সহকারে জৈনগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন।

জৈনধর্ম্ম তত্ত্বদর্শনের অনুকূল পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক আগম আছে। যোগী ও আর্হতগণ এই সমস্ত গ্রন্থে দর্শন ও সাধনাতত্ত্ব সমূহ বিচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত বিচার কথা শ্রবণ করিলে মন অনুরাগপূর্ণ ও পবিত্রভাব রসে আপ্লুত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'জিন জাহির গুণ সংগ্রহ' নামক পুস্তকে বিশ্বকোষ প্রণেতা হেমচন্দ্রের নাম পাওয়া গেল শ্লোকটি এই :—

"শ্রীহেমচন্দ্র গুরু সিদ্ধগুণৈঃ পরং ন
শ্রীসোমসুন্দর গুরু প্রভবোহমুকুর্য্যঃ।
কিং ত্বদীয় নব বিম্ব মহা প্রতিষ্ঠা
কৃতৈর পীশ দানতোগ্র কলি প্রভাবৈঃ॥"

পুস্তকাগারে সারণী দৃষ্টে জানা গেল যে 'সিদ্ধ হেম ব্যাকরণ' নামে হেমচন্দ্র প্রণীত একখানি ব্যাকরণ আছে। 'হৈমলিঙ্গানুশাসন' নামক পুস্তক ও আচার্য্য

হেমচন্দ্র প্রণীত। এই সমস্ত গ্রন্থের বৃত্তি, পঞ্জী, টীকা আদি বর্ত্তমান আছে।

গ্রন্থ প্রকোষ্ঠে 'শ্রীশুদ্ধোপযোগ (সহজ সমাধি) নামে একখানি পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দেখিলাম। ইহা একখানি পরমাত্মাদর্শন গ্রন্থ। জৈনাচার্য্য শুভচন্দ্র কর্ত্তৃক পুস্তকখানি বিরচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে শতাধিক শ্লোক দৃষ্ট হইল। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বোধ হয় গ্রন্থকার সভাষ্য পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শন সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন, ভক্তি ও জ্ঞান একাধারে বর্ণনা করিতেছেন। গ্রন্থখানি হিন্দুদার্শনিক ও সাধকগণের অতি আদরের জিনিস। পাঠকবর্গকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

অর্থশালায় যে নূতন আতিথ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার একটি ঘরে গঙ্গাঋষি নামে এক সংসার ত্যাগী পুরুষ সাময়িক ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইনি সুবে বিহার ও মির্জাপুরে বেশীরভাগ কালযাপন করেন। ইনি কিশোর বয়সে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কিছুকাল তত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে ও বহুকাল তীর্থ সমূহ ভ্রমণে অতিবাপিত করেন। সংসারত্যাগী জৈনগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যতি ও সম্বুদ্ধ। ইনি যতি সম্প্রদায়ভুক্ত। যতি সম্প্রদায়ীগণ যদিও বিবাহ প্রভৃতি সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না তত্রাচ অনেকের ধনরত্ন ও সংসারের প্রতি একটু আধটু আসক্তি থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু সম্বুদ্ধ সম্প্রদায়ী সংসারত্যাগীগণ স্বভাবতঃ বিষয় বিরক্ত ও সতত মননশীল।

কাছারি বাড়ী অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মশালার তৃতীয় বিভাগে উপস্থিত হইতে হয়। এই তৃতীয় বিভাগে দেবালয় বা ঠাকুর বাড়ী অবস্থিত। দুইশত হস্তের ও অধিক চতুষ্কোণাকৃতি সুবেষ্টিত উচ্চ ভূখণ্ডে দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। পরিস্কৃত সুবিস্তৃত শুভ্র অঙ্গনে দশটি উচ্চ শিখর বর্ত্তমান। মন্দিরগুলি তিন পার্শ্বে তিনটি তিনটি করিয়া নয়টি ও অপর পার্শ্বে আর একটি এই দশটি এইরূপ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুশোভন এই দশটি মন্দিরে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের সুন্দরালঙ্কৃত মুল্যবান প্রস্তরময় মূর্ত্তি আছে। বিশেষত্ব এই যে সকল মন্দিরেই পরেশনাথ দেবের মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশালার কথা উল্লিখিত হইল। দিগম্বরী সম্প্রদায়েরও এইরূপ দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। তবে দিগম্বরী সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য ও দেব বৈভব শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায় অপেক্ষা অল্প বলিয়া বোধ হইল কিন্তু দিগম্বরী সম্প্রদায় ধর্ম্মশালার তীর্থ যাত্রী অনেক অধিক দেখিয়াছিলাম। ইহাদের মন্দির

সংখ্যা পাঁচ ছয়টির অধিক না হইলেও প্রত্যেক মন্দিরের পুরোভাগে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে মালা লইয়া জপ করিতে দেখিয়াছিলাম।

শ্বেতাম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দির গাত্রে কোন পৌরাণিক ছবি দেখিতে পাইলাম না। কাছারি ঘরে একখানি পৌরাণিক ছবি দেখিতে পাইয়াছিলাম। পাঁচটি সাধুশীলা তপস্বিনী মূর্ত্তি আকুল ভাবে ভগবানের প্রার্থনাপরায়ণা। কিন্তু দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলির পুরোগাত্রে অনেকগুলি ছবি দেখিলাম। ছবিগুলি কাগজে আঁকাইয়া কাচাধারে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। কোনখানি আবু পাহাড়স্থ গির্ণার পাহাড়ের ছবি। এখানে তীর্থঙ্কর নেমিনাথ দেব নির্ব্বাণ-পদ লাভ করেন। কোনখানি পরেশ নাথ পাহাড়ের ছবি। কোনখানি গজকুমারের ছবি। একখানি ছবিতে নীলরঙ্গে রঞ্জিত একটি সুবৃহৎ সংসার-বৃক্ষ। বৃক্ষ হইতে একটি সুপুরুষ (কাম-কলসে করিয়া) মদিরা বর্ষণ করিতেছে। কতকগুলি নরনারী একান্ত উৎসুক নেত্রে তৎপানাশায় বৃক্ষমূলে সমবেত হইয়াছে। কতকগুলি ছবি দেখিলাম তাহার নিচে ইংরাজিতে লেখা আছে ;— 1. Grand Temple of Jarangajee Hill. 2. The View of Shatrunjee River. 3. The Temple of Shree Kesharinathjee. 4. The First Tank of the Girnar Hills. 5. The foot of the Shatrunjaya Hill. এই সমস্ত পৌরাণিক ছবিগুলির সহিত তীর্থঙ্করগণের স্মৃতি বিশেষরূপে জড়িত আছে।

পরেশনাথ পাহাড়ের নাম সুমেত শেখর। এই পাহাড় উর্দ্ধে পঞ্চ সহস্র ফুট! ইহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথ দেব নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হন। এই পাহাড়ের অন্যান্য শিখর দেশে আরও উনিশ জন তীর্থঙ্কর মোক্ষ লাভ করেন। চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অষ্টাপদ পর্ব্বতে (কৈলাসে) মোক্ষলাভ করেন। সর্ব্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর পাওয়াপুরীতে নির্ব্বাণলাভ করেন। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ রাজপুতনায় আবু পাহাড়স্থ গির্ণারে নির্ব্বাণলাভ করেন এবং তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য চম্পাপুরীতে নির্ব্বাণলাভ করেন। চম্পাপুরী বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত।

নেমিনাথের পরবর্ত্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দেব। ইনি নেমিনাথের সহস্র বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে জৈনদিগের আচার পদ্ধতি, দর্শন, জ্ঞান, অবিশুদ্ধ ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। পার্শ্বনাথ দেব জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্র ও তপস্যা প্রভাবে সিদ্ধত্বলাভ করেন এবং জৈনদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া

দেন। পার্শ্বনাথ দেব ইক্ষাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বারানসী নগরের সন্নিকটস্থ ভেলুপুরী ইহার জন্মস্থান। ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অহিংসা, তপস্যা, দান, শীল ও ভাবনা দ্বারা দিনাতিপাত করিতেন ও কঠোর তপস্যা করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার তপশ্চরণকালে মায়া তাঁহাকে একাগ্রভূমি হইতে পাতিত করিবার জন্য বহুবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। অবশেষে প্রচুর বর্ষণ আরম্ভ হইল। অবিরাম বারিপাত, বিকটাকার শিখরাংশসমূহ স্থানচ্যুত হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিজলি লেখা, মুহুর্ম্মুহু অশনি সম্পাত। সমস্ত পর্ব্বত যেন বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যোগী কিন্তু অচল অটল। জৈনজাতকে কথিত আছে যে, পার্শ্বনাথ দেবের তপশ্চরণে মুগ্ধ হইয়া অনন্তশক্তি বাসুকী স্বীয় মস্তকরাজি তাঁহার শিরোভাগে ছত্ররূপে স্থাপন করতঃ তাঁহাকে প্রবল বারিপাত হইতে রক্ষা করেন। সেইজন্য আজও পার্শ্বনাথ দেবের মস্তকোপরি ফণা চিহ্ন বিদ্যমান।

এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে পার্শ্বনাথ দেবের মন্দির। আরও চব্বিশটি মন্দির আছে। পার্শ্বনাথদেবের মন্দির মধুবন হইতে তিন ক্রোশ দূর। পরেশনাথ পাহাড়ের উপর পচিশটি মন্দির পরিভ্রমণ করিতে হইলে তিন ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে হয়। অবরোহণের সময়ও তিন ক্রোশ। এই নয় ক্রোশ পথ আরোহণ, ভ্রমণ ও অবরোহণ বড়ই দুরূহ। এই নয় ক্রোশ পথের ভ্রমণ ক্লেশ পরিহারের জন্য ডুলি পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপর সমস্ত মন্দিরগুলি দর্শন করাইবার জন্য ডুলির শুল্ক তিন টাকার অধিক হইবে না। প্রত্যূষে যাত্রা করিলে এই নয় ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে নয় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। যাঁহারা ভ্রমণপটু নহেন তাঁহারা যেন এই দারুণ চড়াই উৎরাই পদব্রজে ভ্রমণ করিতে সাহস না করেন। বৎসরের মধ্যে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন এই চারিমাস পর্ব্বতারোহণের প্রশস্ত সময় এবং অধিকাংশ যাত্রীই এই সময়ে পরেশনাথ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

অতি প্রত্যূষে স্নানাহার সমাপন করতঃ ১লা মাঘ দুইটা পয়তাল্লিশ মিনিটের সময় মধুবন হইতে চড়াই উঠিতে আরম্ভ করি। সাতটা কুড়ি মিনিটের সময় অর্থাৎ পয়ত্রিশ মিনিটে দুই হাজার ফিট উর্দ্ধে 'করিকা' নামে একটি পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলাম। ইহা খানিকটা সমতল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুর্দ্দিকে শ্যামল শস্যরাজী। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু আবাস-ভূমি। ক্ষেত্রজাত শস্যই পল্লীবাসীগণের জীবিকা। কুক্কুট ও বরাহ তাহাদের

গৃহপালিত জন্তু। তাহারা কাহারও খাজনা দেয় না। তাহাদের মলিন-বেশ সরল বালকবালিকাগুলি পথিক দেখিলে কাছে আসিয়া একটি পয়সার প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করে। পাইলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা আসিয়া পথিপার্শ্বে অঞ্চল বিছায়। একটি পয়সা, একটি আধ্‌লা একমুষ্টি ভুট্টা পাইলে ইহারা আকাশের চাঁদ করতলস্থ বিবেচনা করে। ইহাদের মর্ম্মবেদনা, ইহাদের নীরব অশ্রুপতন. দুর্ভিক্ষক্লেশবার্ত্তার সংবাদ যদি আমরা সংগ্রহ করি তাহা হইলে আমাদের তীর্থগমনক্লেশ সার্থক হয়।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পাহাড়ীদিগের ও হাজারিবাগ জেলার আদিম অধিবাসীদিগের (ইহারা আপনাদিগকে সাঁওতাল হইতে পৃথক বলে) একটি মহোৎসবের দিন। এই দিন তাহারা নৃত্যগীত, উৎসব, যাত্রা ও গানাদি করিয়া কাটাইয়া দেয়। বালক যুবক, প্রৌঢ় সকলে মিলিয়া দলে দলে তীর ধনুক, বর্ষা, কুঠার ও লাঠি প্রভৃতি লইয়া শীকারে বহির্গত হয়। এক এক বনের এক এক প্রদেশ ঘিরিয়া ফেলে। ইহাদের মধ্যে একজন মর্দ্দলধ্বনি করিতে থাকে। সেই শব্দে পশুগণ চঞ্চল হইয়া ইতস্তত গনন করিতে দেখিলে তখন তাহার অস্ত্র দ্বারা পশুশীকারে প্রবৃত্ত হয়।

পরেশনাথ পাহাড়ের সমীপস্থ পল্লীবাসীগণ পৌষসংক্রান্তিকে আরও একটি বিশেষ কারণে আমোদের দিন বলিয়া বিবেচনা করে। মধুবন হইতে দুই ক্রোশ দূরে (পালগঞ্জের নিকট) চম্পাপুরী নামে এক পল্লী আছে। এই গ্রামে বরাকরের রাজা এক সুপ্রসিদ্ধ মেলা বসাইয়া থাকেন। এই মেলা পাহাড়ীদিগের বড়ই আদরের জিনিষ।

করিকা গ্রাম হইতে কিছুদূর উতরাই নামিলেই পরেশনাথের চা' সম্পত্তি দেখা যায়। এখানে বিস্তৃত সমতলভূমির উপর বহু স্থান ব্যাপিয়া চা'র চাষ করা হইয়া থাকে।

২৫০০ দুই হাজার পাচ শত ফিট উর্দ্ধে 'গঙ্গানালা' নামক একটি প্রস্রবণের নিকট বেলা আটটার সময় উপস্থিত হইলাম। এখানে অতিথি-দিগের বিশ্রামের জন্য একটি স্থান আছে। ইহার কিছু উর্দ্ধে গমন করিলেই দুইটি রাস্তা পাওয়া যায়। দক্ষিণদিকের রাস্তাটি বরাবর পরেশনাথ শৃঙ্গে উঠিয়াছে। বামদিকের রাস্তাটি সীতানালারদিকে গিয়াছে। সীতানালাও একটি প্রস্রবণ। এই দুই প্রস্রবণের জল স্বচ্ছ হইলেও বৃক্ষ সমূহের পত্র-রাজি উহাতে নিত্য পচিতে থাকে বলিয়া উহা পেয় নহে।

সীতানালা হইতে 'জলমন্দির' অধিক দূর নহে। জলমন্দিরে পার্শ্বনাথদেবের দেহ ভস্ম রক্ষিত আছে। এই মন্দিরের নিকট একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ও আর একটি শীতল প্রস্রবণ আছে। এই দুইটি প্রস্রবণ থাকায় ইহার নাম জলমন্দির হইয়াছে। এই মন্দির জগৎশেঠ মাণিক চন্দ্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ধনাঢ্য শেঠ মন্দিরে যাইবার জন্য পরেশনাথ পাহাড়ের বহু স্থানে বহু সহস্র ইষ্টক নির্ম্মিত সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

জলমন্দিরটি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠটি বড়। আর দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। তিনটি প্রকোষ্ঠে সুন্দর প্রস্তরময় দেবতা মূর্ত্তি। সম্মুখের প্রকোষ্ঠে পাঁচটি প্রতিমূর্ত্তি। ইহার মধ্যস্থ প্রধান পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে খোদিত ও মূল্যবান উচ্চ মর্ম্মরবেদীর উপর সংরক্ষিত।

আমরা প্রথমে পার্শ্বনাথদেবের সর্ব্বোচ্চ মন্দির দর্শন করিয়া বেলা এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় জলমন্দিরে উপস্থিত হই। সেদিন ১লা মাঘ বলিয়া পাহাড়ীরা অতি উৎসাহের সহিত জলমন্দিরে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের উৎসব দেখিবার জন্য ও তাহাদিগকে দেবদেবীমূর্ত্তি দর্শন করাইবার জন্য পাণ্ডারা অতি প্রত্যুষে মধুবন হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পাহাড়ীদিগের সজীবতাপূর্ণ আলাপ পরিচয়, হাস্য কৌতুক, দর্শকদিগকে বেশ সজীবতা প্রদান করে। দেবতা দর্শনে জৈন পাণ্ডাদিগের কোনরূপ অত্যাচার নাই। কেহ ধান্য শিষ দিয়া, কেহ বা আমলকী দিয়া দেবতা দর্শন করিতেছে। পাহাড়ীরা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও ইহারাও পরেশনাথ পাহাড়স্থ মন্দিরের দেবতাগুলিকে পূজা করিয়া থাকে এবং তাঁহার নিকট আপনাদিগের মনোভিলাষ প্রার্থনা করে।

জলমন্দির হইতে পার্শ্বনাথ মন্দিরে যাইতে হইলে এক ক্রোশ উর্দ্ধাভিমুখে আরোহণ করি। সুতরাং গাঙ্গানালার কিছু উর্দ্ধে যে দুইটি রাস্তার কথা বলা হইয়াছে তাহার দক্ষিণদিকস্থ রাস্তা দিয়া আমরা চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। বেলা আটটার সময় আমরা তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে উপস্থিত হইলাম। বেলা আটটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় তিন হাজার পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে, বেলা সওয়া নটার সময় চার হাজার তিন শত পঞ্চাশ ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম। এইখানে একটি ডাকবাংলা আছে। এখানে একটি পারসী ভদ্রলোক স্ত্রীকন্যাসমভিব্যাহারে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন সুখে দিনযাপন করিতেছেন। এই স্থানে একখানি ফলকলিপি বর্ত্তমান আছে। লাট বাহাদুরের এই ব্যবস্থা লিপিতে

লিখিত হইয়াছে যে জৈন, বৌদ্ধ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ভিন্ন চার হাজার পঞ্চাশ ফিট উর্দ্ধ স্থানে যে পাঁচটি মন্দির আছে, অন্য কোন জাতির পক্ষে সেই সকল স্থানে গমন, দর্শন, স্পর্শাদি নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সুমেতশিখর অতি পবিত্র চক্ষে দর্শন করেন। এখান হইতে কতকটা দূর ন্যূনাধিক দুই হস্ত প্রশস্ত ক্রমোচ্চ পিচ্ছিল রাস্তার এক দিকে প্রায় চার শত ফিট উচ্চ পাহাড় আর অন্যদিকে অনুমান তিন হাজার ফিট গহ্বরাকার স্থান এইরূপ ভাবে চলিয়াছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পদতল শিহরিয়া উঠে। মৃত্যুভয় জিনিষটা কি বুঝাইয়া দেয়। এক একবার ইচ্ছা হয় সেই সুগভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কে যেন আমাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন, 'Man has a fascination for death' বেলা নয়টা পঞ্চাশ মিনিটের সময় আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উপনীত হইলাম! ধরিতে গেলে আমরা তিন ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলাম। এই শৃঙ্গের উপর আশিটি সিঁড়ির উপর পার্শ্বনাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পার্শ্বনাথদেবের চরণরেণু এই মন্দির মধ্যে প্রায় তিন ফুট উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদীর মধ্যে সংরক্ষিত। বেদীর উপরে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত প্রস্তরাঙ্কিত চরণদ্বয়ের উপর তিনটি মণিমাণিক্য খচিত সুবর্ণালঙ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবছত্র শোভা পাইতেছে। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সুশীতল প্রস্তর স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে বিগ্রহের মূর্ত্তি উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একভাগে উপাসকগণের ধ্যান ধারণা ও বিশ্রামের স্থান। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার জন্য একটি বারান্দা আছে। পাঁচ হাজার ফিট উচ্চে এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করা যায় তখন প্রকৃতই জীবন সার্থক বোধ হয়। সেই উচ্চস্থান হইতে পৃথিবীতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে উচ্চ অনুচ্চ সমস্ত ভূমিই সমান বলিয়া বোধ হয়। আর বোধ হয় যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তিনি না জানি কত মহান্। সেই স্নিগ্ধ শীতল মন্দিরে প্রাণ মন সুশীতল করিয়া একবার সেই সুমহান্ ভাবের ধারণা করিলে কাহার না চিত্তপ্রসাদ জন্মিয়া থাকে? একবার সেই মন্দির মধ্যে বসিয়া পূর্ব্বেকার প্রিয় স্মৃতিগুলি স্মরণ করিয়া লইলাম। তিন চার দণ্ড সেখানে বিশ্রাম করিলে যেন এক অভিনব স্বর্গে আছি

বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের মধ্যে ভক্তগণ অনেকে পার্শ্বনাথদেবের ও অন্যান্য তীর্থঙ্করগণের স্তব গান করিতেছেন। কেহ বা আমলক, কেহ বা ধান্যশীর্ষ এবং অত্যল্প লোকেই পয়সা দিয়া ভগবানকে প্রণাম করিতেছেন। সেই মন্দির মধ্যে কিছুক্ষণ বসিলেই সংসারতাপীর সমস্ত জ্বালা দূর হইয়া যায়।

মন্দিরটি কলিকাতার রত্নব্যবসায়ী বদরি দাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্দির ১৩০২ সালে নির্ম্মাণ হইয়াছে। জৈনগণ পার্শ্বনাথ দর্শন কালে পরেশনাথ পাহাড়ের উপর থুথু ফেলেন না, মলমূত্র ত্যাগ করেন না ও জুতা পায়ে দিয়া ইহার উপর উঠেন না

পরেশনাথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গস্থ পার্শ্বনাথদেবের মন্দির ছাড়া আরও চব্বিশটি ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির আছে। ইহার মধ্যে উনিশটি মন্দির উনিশজন তীর্থঙ্করের নির্ব্বাণ স্থানে নির্ম্মাণ হইয়াছে। ঋষভদেব, বাসপূজ্য, নেমিনাথ ও মহাবীর পরেশনাথ পাহাড়ের উপর তাঁহাদের নির্ব্বাণ লাভ না ঘটিলেও এখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে চারিটি মন্দির উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

পরেশনাথ পাহাড়টি দেখিতেও সুন্দর। নানাবিধ অত্যুচ্চ বিশালবৃক্ষ সমূহ সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিয়া পর্ব্বতের মহামহিমভাব আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। বনভূমি সততই সুমধুর পক্ষীকূজনে মুখরিত ও দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত। পাহাড়টি স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপযুক্ত আবাসভূমি। ছোটলাট বাহাদুর এই পর্ব্বতের উপর স্বাস্থ্যাবাস মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু জৈন-ধর্ম্মাবলম্বীগণ আপত্তি উত্থাপিত করায় পাহাড়ের উপর স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ আজ্ঞা রহিত হইয়াছে। পর্ব্বতের দৃশ্য বেশ সুন্দর। পৌষ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের উপর মেঘ ও বায়ুপ্রভাব কম।

'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা।' তীর্থঙ্করেরা যে মহাজন বা অবতার স্বরূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জৈনগণ চব্বিশ জন তীর্থঙ্করকে অবতার রূপে স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য প্রণালী অনুসরণ করেন। জৈনধর্ম্মের মধ্যে জানিবার, বুঝিবার, ও শিখিবার বিষয় আছে। আরও নিজের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির ধর্ম্ম বুঝিবার প্রয়োজন। সেই হিসাবে ও হিন্দু ধর্ম্ম কি বুঝিতে হইলে ভারতের ও অন্যান্য দেশের ধর্ম্মসমূহ আলোচনা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হিন্দু যদি জৈনধর্ম্ম আলোচনায় নিজেকে অভিজ্ঞ ও পরিতৃপ্ত করিতে চান তাহা হইলে পরেশনাথ পরিক্রমাশা পরিপূরণে যত্নবান হইবেন। তীর্থঙ্করগণ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

জেলেখা।

—০০০—

(মাধবী কঙ্কণ)

স্ত্রীস্বভাবসুলভ দয়া কোমলতাদি, অন্তরের অন্তরে সঞ্চিত অনন্ত প্রেম ও তাতার দেশীয় প্রতিহিংসানিচয়-সমন্বিত উগ্র মনোবৃত্তি, এই তিন ধর্ম্ম লইয়া জেলেখা-চরিত্র অঙ্কিত।

প্রথম দর্শনে মনে হয়, বুঝি জেলেখা প্রেমলালসায় পর্য্যবসিত; বুঝি তাহার নরেন্দ্রের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার বিকৃতি! বুঝি তাহার উগ্র প্রবৃত্তি, প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের ভীষণ দুর্দ্দমনীয় প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু একটু গভীর মনোযোগের সহিত দেখিলে মনে হয় যে, জেলেখা-হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে প্রেম অনন্ত, অপরিমেয়;—পরে দেশ কাল পাত্র ও রুচিভেদে কোথাও বা স্ত্রীস্বভাবসুলভ দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সাজে, কোথাও বা দারুণ তৃষায়—উদ্বেলিত আকাঙ্ক্ষায়,—আবার কোথাও বা তাতার দেশীয় প্রতিহিংসাদি উগ্র প্রবৃত্তিতে সজ্জিত, পরিণত ও বিকৃত হইয়া তাহার নিজের অস্তিত্বের সহিত অনন্তে বিলীন হইয়া গেল!

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে এই প্রেমের উৎপত্তি, কিরূপে ইহার পরিপুষ্টি এবং কিরূপেই বা ইহার পরিণতি বা অবসাদ!

প্রধানত জেলেখা-চরিত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত।

১ম—নীরব প্রেম, নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রেমবীজ রোপন,—প্রেমের পরিপুষ্টি, বিচার ও মুক্তি।

২য়—প্রেমের পরিব্যাপ্তি—প্রেমিকা জেলেখা দেওয়ানা।

৩য়—হৃদয়ে প্রতিহিংসার উদ্রেক, স্বার্থসিদ্ধির উপায়ানুসন্ধান; উপায় প্রয়োগ—তাহার বিফলতা।

৪র্থ—প্রতিশোধ-বৃত্তি চরিতার্থতা—মৃত্যু।

প্রথম অধ্যায়।

জেলেখার প্রেমোৎপত্তি জেলেখার পত্রে প্রকাশ। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে প্রেমের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা

যাউক। প্রথমত—আমরা দেখিতে পাই যে, এক সুরম্য হর্ম্ম্যে কারুকার্য্য-খচিত রত্নাভরণ-পারিপাট্যের মধ্যে তিনটি জীবের অস্তিত্ব বর্ত্তমান।

১। পীড়িত প্রপীড়িত অর্দ্ধচেতন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নরেন্দ্রনাথ।

২। এক সুন্দরী তন্বঙ্গী যুবতী—বেশে যবনী, লালিত্যে, মাধুর্য্যে ও কমনীয়তায় অনুপমা, স্বর্গীয় 'পরী'জন-বাঞ্ছিত রূপযৌবনসম্পন্না জেলেখা।

৩। এক যবন খোজা—মসরুর।

"দুর্গেশনন্দিনী"র রুগ্ন শয্যা মনে পড়িল। কুমার জগৎসিংহকে মনে পড়িল; ওসমানকে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল—প্রভাতের স্থলপদ্মস্বরূপা সুন্দরী নবাব-নন্দিনী আয়েসাকে। আরো অধিক অনুসন্ধিৎসুচিত্তে পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম—"যবন-কন্যার দৃষ্টিতে ও অঙ্গভঙ্গিতে যেন তেজ ও দর্পের পরিচয় দিতেছে।" কই?—আয়েসার চরিত্রে তেজ বা দর্প কিছুই নাই—তবে নবাবপুত্রীর উপযুক্ত হৃদয়ের নাতিকোমল নাতিকঠোর এক মহান্ ভাবের সমষ্টি বর্ত্তমান। আয়েসার একটিমাত্র উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; যথা—"ওসমান, আবশ্যক হয় কল্য পিতার সমক্ষে বলিব তোমার সেজন্য চিন্তা নাই।"

এখানে পড়িলাম,—"যবন-কন্যা এক একবার পীড়িত হিন্দুর দিকে চাহিতেছে, এক একবার বিষণ্নভাবে ভূমির দিকে চাহিতেছে, আবার মৃদুস্বরে লজ্জার সহিত কথা কহিতেছে।" ক্রমে বুঝিলাম এই হিন্দুর ও জেলেখার সর্ব্বনাশ করিতে মসরুর উদ্যত। জেলেখা কাতরকণ্ঠে বলিতেছে,—"সে আমার দোষ, ইঁহার কি দোষ? ইনি ত নির্দ্দোষী।"

পাঠক, ইহাই প্রেম-বিদগ্ধচেতসার ভাবান্তরে প্রেমব্যক্তি। হৃদয়ের প্রত্যেক তারে আঘাত কর শুনিবে—"আমি মরি তায় ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক।" প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার দাও—শুনিবে সব এক সুরে বাঁধা!

জেলেখার কথা শুনিয়া মসরুর কহিল—"এত মায়া কিসের জন্য? এ কাফের কি তোমার আসেক?"

জেলেখা যোদ্ধৃ-কন্যা, সহসা তাহার বদনে পৈতৃক ক্রোধ ও তেজের আবির্ভাব হইল; রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া যাইল; সক্রোধে বলিল,—"মসরুর! যদি তুমি স্ত্রীলোক হইতে, তাহা হইলে মায়ার কাতরতা বুঝিতে, যদি পুরুষ হইতে, তথাপি হৃদয়ে দয়া থাকিত। তোমার পুরুষত্বের

সহিত দয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এক্ষণে এই প্রস্তর-শাণের অপেক্ষা তোমার হৃদয় কঠিন ও দুর্ভেদ্য।”

সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে জেলেখার পার্থক্য হৃদয়ের এই দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে প্রকাশিত। অপর কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধোন্মত্ত না হইয়া কৌশলান্তরে স্বার্থসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিত, অথবা আয়েসার ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীরে হৃদয়ের মহান্ ভাব প্রকাশ করিত! কিন্তু জেলেখা সে উপাদানে গঠিত নহে। প্রথমে প্রণয়-পাত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় হৃদয়ের ক্রোধ-বৃত্তি, রুক্ষ-বৃত্তি কিঞ্চিৎ শমিত কিঞ্চিৎ দমিত হইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। তর্কের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রোধ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই ক্রোধ, এই রুক্ষতা তাহার স্বর্গীয় প্রেম-ছবিকে লালসার কৃত্রিমতায় আমাদের চক্ষে বিকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছে! এক্ষণে দেখা যাউক জেলেখা নিজে এই ক্রোধোৎপত্তি সম্বন্ধে কতদূর দায়ী।

প্রথমত, জেলেখা তাতার দেশীয়া। তজ্জন্য স্বাভাবিক উগ্রতা তাহার একটি বৃত্তি। ইহার উপর সাহেব-বেগম সেই উগ্রতাকে প্রশ্রয় দিতেন। এই দ্বিবিধ কারণে ক্রোধের আতিশয্য এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রেমের প্রাবল্যে ক্ষণিক কথঞ্চিৎ নম্রতা প্রাপ্ত হইলেও মজ্জায়-মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে লুক্কায়িত থাকিয়া অল্প ঘর্ষণেই জ্বলিয়া উঠিত। অপিচ, এই ক্রোধ না থাকিলে জেলেখাকে—সম্পূর্ণ না হউক কতকাংশে আয়েসার তুল্য দেখিতে পাইতাম।

এখন জেলেখার ব্যবহার আরো পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক।

নরেন্দ্র বলিলেন,—“আমি অসহায় ও নিরাশ্রয়। আমি কোথায় আছি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।” জেলেখা উত্তর না দিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক সহসা মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্র তাহার উজ্জ্বল গণ্ডে যেন দুই বিন্দু অশ্রু দেখিতে পাইলেন।

এইরূপে কলঙ্কে, আবেগে জেলেখা প্রেমের নিদর্শন ভাবান্তরে দেখাইয়া, কাতর হৃদয়ের সহানুভূতিকে প্রেমের রঙে অতি নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত করিয়া, জগৎসিংহের কারাগৃহের নীরব রোদনটুকু আমাদের স্মরণ করাইয়া দিল।

বিচার।—বিচারের কারণ নির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন। তবে বিচারের মনোহর উপক্রমণিকাটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কোনো ঝটিকা

উত্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়টি কেমন নির্ব্বাত নিষ্কম্প, এক প্রশান্ত-ভাব-পূর্ণ হয়, মাধবীকঙ্কণে বিচারের পূর্ব্বক্ষণটি ঠিক সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে অঙ্কিত!

নরেন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন। চিন্তাস্রোত মথিত করিয়া যেন তাতারিণী তাঁহার মনশ্চক্ষু হইতে দৈহিক চক্ষু-সমীপে সমুদ্ভাসিত। কিন্তু এ জেলেখা সে জেলেখা নয়। সে উগ্রস্বভাবা তেজঃপরিপূর্ণা, জাতদর্পা যে আজ আলু-লায়িতকুন্তলা, বিষণ্ণা, পাণ্ডুবর্ণা, নিঃশব্দা জেলেখার জীবন্ত ছবি! নরেন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তখনো জানিতে পারিলেন না যে, সেদিন উভয়ের বিচার।

এই স্থানে জেলেখাকে গ্রন্থকার নিঃশব্দা করিয়া আশ্চর্য্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কারণ, প্রথমত জেলেখা নরেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী, ইহার উপর কার্য্য-কারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরা। নরেন্দ্রের এই প্রকার অবস্থা তাঁহার স্বকৃত। যবনীর প্রাণ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল। বাক্য-স্ফূর্ত্তি না করিয়া ধীরে ধীরে অশ্রু মোচন পূর্ব্বক সে চলিয়া গেল। এই স্থানে অশ্রু মোচনের অর্থ দ্বিবিধ;—১। নরেন্দ্রের অমঙ্গলাশঙ্কা ও আত্মকৃতাপরাধ-জনিত অনুতপ্ত হৃদয়ের অসহনীয় যাতনা। ২। একটি মহা ব্যাপারের পূর্ব্ব-লক্ষণ, এক প্রকার প্রশান্ত ভাবের নিদর্শন।

বিচারে জেলেখার রুক্ষ বৃত্তির বহু পরিমাণে হ্রাস দেখিতে পাই। বন্দিনী রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে।

বস্তুত এই অবস্থায় পড়িলে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী রমণী মান, অভিমান, অহঙ্কার এমন কি আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে। এইবার একবার আমরা জেলেখার পত্রখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করি।

"জগতে কোন্ স্থল আছে, নরকে কোন্ স্থল আছে, যথায় এই সুখের আশায় অভাগিনী যাইতে পরাঙ্মুখ!" প্রিয়তমের অমঙ্গলাশঙ্কায় নারীর প্রাণ তো প্রথমেই কাঁদিয়া উঠে। ইহার উপর আশার আশ্বাস—"তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব।" আবার তাতারিণী অপরাধিনী, প্রতিপালিকা সম্রাজ্ঞী বেগম সাহেবার সম্মুখে আনীতা। অভিমানিনী যে তৎকালে অভিমান দর্প তেজ ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! এই স্থানে বেগমের প্রতি জেলেখার হৃদয়-ভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য।

সম্ভবত জেলেখা বেগম সাহেবকে কথঞ্চিৎ ভয় ও কথঞ্চিৎ ভক্তিও করিত। বেগম জেলেখাকে স্নেহ করিতেন। রমণী-হৃদয় তাহার কিছু না কিছু প্রতিদান না দিয়া থাকিতে পারে না।

"সাহজাদি! আমার পাপের কি এই উচিত দণ্ড? তুমিও স্ত্রীলোক, তোমার হৃদয় কি পাষাণ, কখনও বিচলিত হয় নাই? তবে আমি বাঁদী, আমার স্বাধীনতা নাই, সেইজন্য আমার পাপের দণ্ড দিলে। কিন্তু তুমি সিংহাসনোপবিষ্টা রাজদুহিতা, আমা অপেক্ষাও যে ঘোর পাপীয়সী, তাহার কি দণ্ড নাই?" জেলেখার পত্রের এই অংশের ভাষা ও ভাব যেন কারুণ্য এবং আবেগে বিজড়িত। যেন প্রিয় বেগম এরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন, ইহা তাহার ধারণার অতীত। ইহাতে ক্রোধের ভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা মানসিক বৈকল্যে দুই একটি বেদনাসূচক সম্বোধন মাত্র। এই ভয়, ভক্তি ও প্রিয়তমের অমঙ্গলাশঙ্কায় বেগমের নিকট জেলেখা অবনতমুখী, কাতরা ও কৃপাপ্রার্থিনী।

কারাগৃহের অন্ধকারে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী করুণ রোদনের সহিত জেলেখা-জীবনের নীরব প্রেমের অধ্যায় শেষ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জেলেখা দেওয়ানা।

জেলেখা এ অবস্থায় আত্মপ্রেম মুক্তকণ্ঠে নরেন্দ্রের সম্মুখে প্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু জেলেখা যে তাহার প্রতি অনুরাগিনী, ইহা দেওয়ানা সাজিয়া বলিয়াছে। সেইজন্য এই অধ্যায়কে "নীরব প্রেম" শীর্ষক অধ্যায়ের ভিতর আনা যায় না। এই অবস্থাটি উহার জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী। প্রেমিকা প্রেমের আবেগে কতদূর পর্য্যন্ত আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পারে, দেওয়ানা তাতারিণী তাহার একটি উজ্জ্বল ছবি।

জেলেখা কি বলিতেছে শ্রবণ করুন;—

"কি কৌশলে সেই রাত্রে আমি দুর্গ হইতে তোমাকে লইয়া পলায়ন করিলাম, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাহার পরই তুমি সৈনিকবেশে দিল্লী ত্যাগ করিলে, এ অভাগিনীও দেওয়ানা নাম ধারণ করিয়া পুরুষ-বেশে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইল। নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব, এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই, দিবা রাত্রি তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের

ন্যায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব, দিবসে তোমার অমৃত কথা শ্রবণ করিব, রজনীতে সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, কখন কখন দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত তোমার সুপ্ত-কান্তি দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করিব, কেবল এই আশায় আমি তোমার সহিত দিল্লী হইতে সিপ্রাতীরে, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি।" ইত্যাদি। এই গভীর কাতরোক্তি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; তথাপি ইহাতে একটি তর্ক উঠিতে পারে। জেলেখা বলিতেছে—"নরেন্দ্র! তোমার প্রণয়ভাজন হইব এরূপ আশা হৃদয়ে ধারণ করি নাই।"

বোধ হয় জেলেখা স্ত্রীস্বভাবসুলভ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিজের হৃদয় ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। উৎকৃষ্টরূপে সমালোচনা করিয়া দেখিলে সে দেখিতে পাইত যে, নরেন্দ্রের আশায়—নরেন্দ্র-প্রাপ্তির বাসনায় তাহার হৃদয় নাচিত, উঠিত, উত্তেজিত হইত। আবার তাহার অপ্সরা-কণ্ঠ-বিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীতের সুরে, মূর্চ্ছনায়, দমকে দমকে তাহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে নরেন্দ্রকে পাইবার আশা কাতর করুণভাবে ব্যক্ত হইত!

"তোমার নিকটে থাকিব, দিবারাত্রি তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব" ইত্যাদি স্থিতি, দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষাগুলি মিলনাকাঙ্ক্ষার এক একটি সোপান। উচ্চতম শিখরে উঠিবার এক একটি শাখা প্রশাখা।

এই ভাব বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

জেলেখার দেওয়ানা অবস্থাটি তিনটি বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে।

১। দিল্লী—এখানকার সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই।

২। সিপ্রাতীর—যশোবন্ত শিবির।

এইস্থানে নরেন্দ্রের সুমোহন স্বপ্ন স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তিত হইল। ভাগীরথী-কল্লোল, রমণী-কণ্ঠ-বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীত-লহরীতে পরিবর্ত্তিত হইল!

সেই গীত বড় দুঃখের গীত। জেলেখা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—অতএব রহিয়া রহিয়া প্রেমের আবেগে হৃদয়ের আত্ম-কথা সুরে বিবৃত করিতেছে। আজ সে রত্নরাজিভূষিত কেশপাশ লুকাইয়া, রত্নাভরণ-পারিপাট্য দূরে রাখিয়া তাতার-বালক-সাজে সজ্জিত হইয়াছে। যে ব্যর্থ প্রেম করিয়া প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, দেওয়ানা হইয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছে, এ তাহার গান। গান শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আরো আবেশে শুনিলেন, 'সপ্তস্বর মিলিত

সে গান বায়ুতে বাহিত হইয়া নৈশ গগনে উত্থিত হইতেছে ও চারিদিকে আকাশে বিস্তৃত হইতেছে ।'

সপ্তস্বরের আরোহণ অবরোহণে স্বরের গতি ঐরূপই হইয়া থাকে। এই গতি বিভিন্ন করিবার জন্য মূর্চ্ছনা, গমক, স্থিতি, অবস্থিতি ইত্যাদি ভেদে স্বর সঙ্গীত বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী এক একটি রূপ মনশ্চক্ষে আনিয়া দেয়। বস্তুত কবি বড়ই চতুর, বড়ই স্বভাবানুশীলক।

নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা কাতর হৃদয় বুঝিল,—'নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি যথার্থই প্রেমের জন্য দেওয়ানা হইয়াছ? তোমার হৃদয়ে কি কোনো গভীর দুঃখ আছে? তাহা যদি হয় আমাকে বল. আমি তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। মন খুলিয়া আমার নিকট সমস্ত কথা বল।" বালক একদৃষ্টে নরেন্দ্রের দিকে চহিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল' কারণ নরেন্দ্র বলিয়াছেন, তোমার দুঃখের সমদুঃখী হইব। ইহা প্রায় সকলেরই ঘটে যে, যখন আমাদের প্রণয়াস্পদ অন্তরের যাতনা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিতে থাকে, যখন সস্নেহ প্রিয় সম্বোধনে হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দেয়, যখন আদরে কাতরে হৃদয়ের সমবেদনায় প্রণয়-কুসুম-বনে বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গের অস্তিত্ব দেখায়, তখন বিষাদ-কালিমা-মাখা আমাদের হৃদয়গুলি আলোড়িত হইয়া উঠে, হৃদয়ের প্রত্যেক হাবভাব মথিত হয়। কিন্তু পরেই সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকৃত করে। মনে ভয় হয়—বুঝি সে আমার, আমার নয়! জেলেখার সেই অবস্থা। সে হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া কহিল,— "মার্জ্জনা করুন, আমি দেওয়ানা—যখন যাহা মনে আসে তখন তাহাই গান করি।" একবার মনে হয় হৃদয় খুলিয়া, ব্যথা জানাইয়া পদতলে লুটিয়া প্রাণ জুড়াই। পরক্ষণেই সন্দেহ-মিশ্রিত কি এক অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া রসনা চাপিয়া ধরিতে লাগিল। বালক ফকিরী গ্রহণের কারণের একমাত্র উত্তর দিল—"আমি দেওয়ানা।"

এই ঘটনাটির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের বাপীতটে নগেন্দ্রনাথ এবং কুন্দনন্দিনীর উত্তর "না" প্রায় সমতুল। প্রভেদ এই যে, নগেন্দ্র কুন্দের প্রতি আসক্ত।

৩। রাজস্থান—উদয়পুর।

দেওয়ানা নিস্তব্ধে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত। দিল্লী হইতে সিপ্রাতীর, সিপ্রাতীর হইতে রাজস্থান ভ্রমণে তাহার সুখ কি দুঃখ? বোধ হয়, তাহার

সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ, তাহার ক্রন্দনে হাসি, হাসিতে ক্রন্দন। সংসর্গে হৃদয়-ভার কমিত, আবার আকাঙ্ক্ষা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। দেওয়ানা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিত।

উদয়পুরের হ্রদের চিত্রটি অতি মনোরম।—ভাবুক-হৃদয়গ্রাহী ও কবি-কল্পনা-প্রসূত ভাবময়। প্রথমত নৈসর্গিক বর্ণনা অতি স্বাভাবিক। অতএব সুন্দর।

শান্ত সান্ধ্য গগন নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ, পর্ব্বতমালা—নির্ম্মল শব্দশূন্য হ্রদ—তাহার উপর ভাসমানা বাহিত্রী—উপরে ভ্রান্তপ্রণয় নরনারী—একে অপরের পার্শ্বে রহিয়াছে! কখনো বা নিদাঘ-সায়াহ্ন-সমীর দেওয়ানা-হৃদয়-নির্গত সুর-সঙ্গীতের লহরী তুলিতেছে, আর সেই সুমধুর স্বরে নৈশ হ্রদ, পর্ব্বতরাশি ও আকাশমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে।

হৃদয়ের সুমোহন ভাব প্রকাশক মধুরে-বিষাদে-মাখা এ ছবি বড়ই কবিত্ব-ময়। ইহার উপর গ্রন্থকারের আর এক কবিত্ব দেখাইতে চেষ্টা করা যাউক।

হৃদয়ের ভাবানুকরণ দ্বারা জড় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আরো উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ দৃশ্যে সে মাধুর্য্যেরও অভাব নাই।

১। গগন—পর্ব্বতমালা—হ্রদ—প্রকৃতিহৃদয় সব শান্ত, নিস্তব্ধ। প্রণয়ী যুগলের হৃদয়ের প্রত্যেক হাবভাব, হৃদয়ের প্রকৃত ছবি বিভ্রান্ত প্রণয়ে স্থির প্রশান্ত—গম্ভীর।

২। কাল—সন্ধ্যা। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর হৃদয়ে আধো আশা আধো ভয়, আধো আলো আধো আঁধার।

৩। নিস্তব্ধ হ্রদে ভাসমান তরী। প্রশান্ত হৃদয়ে ঈষৎ আবেগময়ী আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ে মৃদু হিল্লোল তুলিতেছে—হৃদয়ে আশার লহরী ছড়াইতেছে!

৪। জেলেখার গীতে হ্রদ, পর্ব্বতরাশি, আকাশমণ্ডল ভাসিয়া গেল! তাতারিণীর অধিকতর আবেগ (কারণ নরেন্দ্র নিকটে) হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিল!

এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি। জেলেখা বলিয়াছে,—"নরেন্দ্র, ভালবাসিয়াছ। যে হিন্দুরমণী তোমার প্রণয়ের পাত্রী, তাহাকেও আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তুমি প্রেমের জন্য দেওয়ানা হও নাই।"

ইহাতে প্রণয়িনী আত্ম-প্রেমের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিতেছে। নরেন্দ্রের শৈশবের অকৃত্রিম স্নেহের সহিত, বাল্যের বাল্যক্রীড়ার সহিত,

প্রথম জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গের সহিত যৌবনের মধুর, মধুরতম পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত বর্দ্ধিত প্রণয়-বীজ, দাহকারী প্রণয়-বীজ—যে তাহার হৃদয়ের এক একটি পঞ্জর ভাঙিয়াছে ও ভাঙিতেছে, তাহার সমস্ত না হউক কতকাংশ জেলেখা জানিত—তথাপি বলিতেছে,—"তুমি কখনও ভালবাসার জন্য দেওয়ানা হও নাই।"

জীবনে এমন অনেক ঘটনা উপস্থিত হয় যাহাতে মনে হয় যে, আমার ন্যায় হতভাগা পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যন্ত্রণার প্রবল আঘাতে আমার ন্যায় আর কাহারো হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই। আমার যাহা হইয়াছে তাহা যেন শীর্ষস্থানীয়, অতুলনীয়। অথচ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখি যে, বিধাতার রাজ্যে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সাধারণ শোক দুঃখ ও নিরাশ-প্রেম—এই তিন অবস্থায় মানবের হৃদয় এই ভাবে অভিভূত হয়। তাই, জেলেখা নরেন্দ্রের অপেক্ষা আত্ম-প্রণয়ের উৎকর্ষ প্রমাণ করিতে চাহিতেছে।

ইহা তো গেল উভয়ের হৃদয়ের ভাব। আমাদের চক্ষে উভয়ের প্রেমের তারতম্য কিরূপ অনুভূত হয় তাহা দেখা যাউক। অবশ্য, উভয়েই তুল্য প্রেমে প্রেমিক সন্দেহ নাই। নরেন্দ্র-হৃদয় যে জেলেখার তুল্য প্রেমে আলোড়িত, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহার আবেগ সহনাতিশয্যে মৃদু বলিয়া বোধ হয়। জেলেখা তাতার দেশীয়া—প্রেম-চিন্তাকে হৃদয়ে পাতিয়া—হৃদয় দিয়া ঢাকিয়া—অন্তরের অন্তরে আর লুকাইতে পারে না; হৃদয়ের উৎস তাই স্বরে প্রকটিত করে। তাহার প্রেমে যেন অধিকতর মাদকতা বর্ত্তমান।

তাই কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"অভাগা উন্মত্ত বালক! তুই এই বয়সে কি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিস।"

চন্দ্রশেখরের প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম পর্য্যালোচনা করুন। প্রতাপের প্রেম শৈবলিনী অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক, কিন্তু সাধারণ চক্ষে, যাহাদের নিকট গূঢ় তত্ত্ব অবিদিত—শৈবলিনীর অনুরাগ প্রতাপ অপেক্ষা কত অধিক দেখায়!

জগৎসিংহ বলিয়াছেন,—"আমি মরিলে তোমার সখীকে একবার ভিন্ন দুইবার দেখিতে পাইলাম না,—এই জন্য শত্রু বধে খড়্গ তুলিয়াছি।" কিন্তু সাধারণ সৈনিক কে বলিবে যে, জগৎসিংহের হৃদয় প্রণয়-বিক্ষুব্ধ! বস্তুত পুরুষের প্রেম নারী-প্রেম অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন না হইলেও অবস্থা বিশেষে ন্যূন দেখায়।

নরেন্দ্রের বীরত্ব-প্রদর্শনের 'উপায়' আছে, মনোভিনিবেশের বিষয়ান্তর আছে, কার্য্যান্তরে রত হইবার আশু কর্ত্তব্য আছে—যাহা বীরের, পুরুষের বড় আদরের—বড় সাধের—বড় যত্নের, সেই কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত। জেলেখা—কাতরা জেলেখা—অপরিণতবুদ্ধি জেলেখা, জগতের বাধা বিঘ্নের অতি অল্পই তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। আর যাহা হইয়াছে, তাহা শৈশবাবস্থায় হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রেম লইয়া—আর কত সহ্য করিবে সে! সঙ্গীতে হৃদয়-ভার শমিত করিতে চেষ্টা করিল!

সিপ্রাতীরে যশোবন্ত-শিবিরে ও এই স্থানে—এই উদয়পুরের শান্তিপ্রদ হ্রদে—জেলেখার রীতি, পদ্ধতি, হৃদয়ের সুমোহন ভাব, নরেন্দ্রের প্রতি দাসীরূপে সেবা, তাহার উপর সান্ধ্য সমীরে প্রেমাত্মক সঙ্গীত-লহরী—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কে বলিবে যে, জেলেখার প্রণয় প্রেম-মূলক নয়? কে না বলিবে যে তেজ, দর্প, ক্রোধ সমস্ত শমিত হইয়া আসিয়া কেবল মধুর বিষাদে হৃদয় ভরিয়া আছে! কারণ লালসার স্থিতি এত দীর্ঘকালব্যাপী হয় না বা এত ভাবাত্মকও হয় না।

বোধ হয় হেমলতার কথা জানিতে না পারিলে জেলেখা-জীবন এই ভাবে অতিবাহিত হইতে পারিত! সেই মধুরে-বিষাদে—আশায়-নিরাশায়—সুখে-দুঃখে সোহাগের নরেন্দ্রকে দেখিয়া হৃদয় শান্ত করিতে পারিত। হৃদয়োত্থিত আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে বিলীন করিয়া 'মাধবী কঙ্কণে'র বুকে আর এক ছবি আঁকিতে পারিত! ফলকথা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নারী-জীবনে অভাবনীয় ঘটনা ঘটায়। কিন্তু তাহা পরে বলিব।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রতিহিংসা উদ্রেকের কারণ যে হেমলতা সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া ইহা সকলেই জানেন। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

এই অধ্যায়ে জেলেখার উগ্রতার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সে উগ্রতার ভিতরেও যে কত সংযম, কত সাবধানতা বর্ত্তমান তাহাও আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ পর্য্যায়ক্রমে তাহার হৃদয়ের ভাবগুলি দেখা যাউক।

যাহাকে এভাবে হৃদয় দান করিয়াছে তাহার হৃদয় হেমলতায় আকৃষ্ট। তথাপি তাহার চেষ্টা—তখন হেমকে তাহার মন হইতে দূর করিয়া সেই

স্থান অধিকার করা। বোধ হয় তাতারিণী সাধ করিয়া ভাবিত যে, নরেন্দ্রও তাহার প্রেমে আকৃষ্ট। ক্রমে সন্দেহ-সঞ্চারিত গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল— এত দিনের পোষিত প্রেমের মূলে সহসা দুঃসহ আঘাত লাগিল। তথাপি তাহার চেষ্টা, হেমের পরিবর্ত্তে তাহার নরেন্দ্র-হৃদয় অধিকার করা। এ চিত্র অতি স্বাভাবিক, অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। জেলেখা স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা 'মাধবী কঙ্কণে'র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহার সহিত নিম্নলিখিত কথাটি যোগ করিয়া লইবেন,—"নরেন্দ্র দেওয়ানার নিকট শুনিলেন যে, ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে কোনো এক গোস্বামী ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন।"

তাহার পর আমরা গুহা-মধ্যে বীণা-হস্তে ও খড়্গ-হস্তে জেলেখাকে দেখিতে পাই। বস্তুত এই দুইটি ঘটনা—নরেন্দ্রের সম্মুখে স্বপ্নময় সত্য অথবা সত্যময় স্বপ্ন—তাতারিণীর জীবনে, এমন কি মাধবী কঙ্কণের ভিতর সর্ব্বপ্রধান।

১। অবশ্য ইহারা যে হৃদয়-মন্থনকারী নাটকীয় রসোৎপাদনের পরাকাষ্ঠা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাপেক্ষা আরো কোনো অধিকতর আবশ্যক গূঢ়তত্ত্ব ইহার ভিতর নিহিত আছে।

২। জেলেখা-জীবনের শেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবার ইহারা যেন শেষধাপ (climax)। ইহার পর জীবন অন্যদিকে প্রধাবিত হইবে। অপিচ এই ঘটনা দুইটি না ঘটিলে 'মাধবী কঙ্কণে'র ছবিগুলি যেন একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইত।

৩। জেলেখার হৃদয় না পুড়িলে সে নরেন্দ্রের হৃদয় পোড়াইবার চেষ্টা করিত না। প্রত্যাখ্যান না পাইয়া নরেন্দ্রকে যমুনার জলে মাধবী কঙ্কণ ভাসাইতে হইত না। তাহার জীবনের শেষ অধ্যায়ের উজ্জ্বল চিত্রখানি যেন একেবারেই দৃষ্ট হইত না।

৪। এই ঘটনাবলম্বনে হেমলতা-চরিত্রেরও যেন আরো উৎকর্ষ সাধিত হইল। হৃদয়ের বল, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা, প্রিয় নরেন্দ্রের প্রতি ভ্রাতৃসম্বোধন, মহতী উক্তির দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা হেমলতা-চরিত্রও যেন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

৫। এই ঘটনা-সাহায্যে তাতারিণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা, পৈতৃক উগ্রতা, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাইলাম। অথচ উহাদের উপর, প্রণয়ের প্রভুত্বও বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইল। তাহার হস্ত হইতে

ছুরিকা পড়িয়া গেল। এইস্থানে গ্রন্থকারের আর একটি স্বভাবানুশীলনের পরিচয় দিতেছি। "নরেন্দ্রের বোধ হইল যেন, পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখন জেলেখা তাহাপেক্ষা উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।" বাস্তবিক যখন মানব-হৃদয় প্রেমের ক্রীড়াভূমি হয়, তখন শরীর অপেক্ষাকৃত কৃশ হইলেও সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটিয়া উঠে। উজ্জ্বলতর হৃদয়-ভারে দেহ-কান্তি যেন উজ্জ্বলতর আকার ধারণ করে।

জেলেখা-জীবনের তৃতীয় অধ্যায় এই স্থানেই সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের বিষয় দুইটি ;—(indirectly) প্রতিশোধ ও প্রকারান্তরে মৃত্যু। পূর্ব্বে প্রতিশোধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাটি সংক্ষেপে সমালোচনা করা যাউক।

আমরা রাজস্থানের পর দেখি, যে, জেলেখা রুগ্না, শীর্ণা, পাণ্ডুবর্ণা—সমাধি-স্থানে সমাসীনা! মৃত্যুর শ্বেতবর্ণ তাহার শরীরে দেদীপ্যমান ; চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, সমস্ত অবয়ব দুঃখব্যঞ্জক! নিরাশ-কাতর-হৃদয়ে অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি জ্বল জ্বল করিতেছে। গোরস্থানে যে বায়েৎটি লেখা ছিল জেলেখা উহা মর্ম্মস্পর্শী স্বরে গাহিতেছিল।—"বন্ধু আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী ছিলাম। তুমি যদি হতভাগা হও, আমার জন্য একবিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিও।" মন্দ মন্দ যমুনা-বায়ু সেই শীতল স্থানকে আরো সুশীতল করিতেছে। কল্লোলিনী যমুনার সুমধুর কলকল শব্দের সহিত শীতল বায়ু সেই সঙ্গীতকে দূরে—বহুদূরে আকাশের কোলে ছাড়িয়া দিতেছে!

এই স্থানেও সেই জড়-প্রকৃতি ও অন্তর-প্রকৃতির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

প্রথম দৃশ্য—একটি পুরাতন কবর-স্থান। প্রস্তর স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষলতাদি সেই কবরের উপর জন্মিয়াছে।

১ম ভাব—জেলেখা-হৃদয় মানসিক ও তজ্জনিত শারীরিক তাপে তাপিত, জীর্ণ, চূর্ণ, বিদীর্ণ। মানসিক দুশ্চিন্তায় নানা গতি, নানা আবেগ হৃদয়ের পরতে পরতে প্রবিষ্ট।

দ্বিতীয় দৃশ্য—স্থান নিস্তব্ধ ; কেবল বিশাল তমাল বৃক্ষের উপর হইতে দুই একটি পক্ষী দিনের তাপে ক্লিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিতেছে।

২য় ভাব—হৃদয়ের সবই গিয়াছে। আশা গিয়াছে, ভরসা ফুরাইয়াছে।

বাকী আছে,—এখনো চিন্তাস্রোতের মধ্য দিয়া ক্ষীণ জীবনের অসহনীয় যাতনার মর্ম্মস্পর্শী উক্তি,—"বন্ধু, আমার নাম জানিবার আবশ্যক কি? আমি জগতে অভাগা, অসুখী।"

এ সুন্দর ছবি, কাতর ব্যথিত তাপিত হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী ছবি, সমালোচনার বিকৃত রঙে কদর্য্য করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করি, যখন হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন শেষ করাই ভালো।

এক্ষণে তাহার মানসিক বৈকল্য স্থূলভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাউক।

যে ভাবে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি শতধা ছিন্ন হইয়া যায়; চক্ষের জল, বক্ষের শোণিত শুকাইয়া যায়; বাকী থাকে প্রেমনয়নে উদাস দৃষ্টি, আর মর্ম্মস্পর্শী গভীর দীর্ঘশ্বাস; স্মরণে থাকে অতীতের স্মৃতি অর্থাৎ 'ছিল কি আর হইল কি' এই দুইয়ের তুলনা! জেলেখা-হৃদয় ঠিক সেই ভাবে পূর্ণ। কেন না, তাহার ইহজন্মের আশা একেবারে ফুরাইয়াছে। মানবজীবনের এই অবস্থাটি crisis.

আমাদের বিশ্বাস, জেলেখা আর কিছুদিন নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ না পাইলে আত্মপ্রাণ উচ্চতম, মধুরতম, গভীরতম পাত্র, ভগবদ্‌-পাদপদ্মে স্বতই সমর্পণ করিতে পারিত। কেন না, তাহার হৃদয় গঠিত হইয়া আসিতেছিল। সংসারের অবিরত জ্বালা যন্ত্রণা, প্রেমের প্রতিদানাভাব, স্বার্থের নশ্বরতা প্রভৃতি অবিনশ্বর ঐহিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে কঠিনীভূত মানবহৃদয় স্বতই পারমার্থিক চিন্তায় ধাবিত হয়।

কিন্তু যখন প্রণয়-পাত্রের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, তখনো জেলেখা-হৃদয়ে প্রেম-মিলনাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাই জেলেখা বলিতেছে, "নিষ্ঠুর নরেন্দ্র, (পরজগতে) এই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের ভাব তোমাকে দেখাইব। নরেন্দ্র, তখন তুমি আমাকে ভালবাসিবে, নতুবা এই ছুরিকা দ্বারা ওই তোমার পাষাণ হৃদয় চূর্ণ করিব।"

তাই জেলেখার হৃদয়-গতি বিভিন্ন পথাবলম্বী হইয়া প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইল। তাই জেলেখা এত দিনে আত্মহত্যা করিয়া তাহার জীবনের সুমোহন ইতিহাসের সারাংশমূলক বিদ্যাপতির দুইটি কবিতা আমাদের স্মৃতি-পটে অঙ্কিত করিয়া দিল।—

১

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল
মনে কিছু না গণনু ও রসে ভেল;

কুলজ-রীতি ছোড়নু যছু লাগি
সো অব বিছুরিল হামারি অভাগী।

২

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা,
বরকে জীবন, কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা।
ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহিঁ ধাই
তখনক লঘু গুরু কুছ না বিচারিনু
অব পাছু তরইতে (?) চাই—
মধুসম বচন প্রেমসম মাননু
পহিলহি জানন ন ভেলা,
আপন চতুর পণ পরহাতে সোঁপিনু
হৃদি সেঁ গরব দূরে গেলা॥

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সাধুর কার্য্য।

—:*:*:—

সমুদ্রের লোনা জল করিয়া গ্রহণ
সুপেয় পানীয় রবি করেন অর্পণ;
নিশাকর প্রখর রবির কর ল'য়ে,
না জানি আপনি কত দুঃখ ক্লেশ স'য়ে,
সুশীতল সুধামাখা কর-বিতরণে
তাপতপ্ত ধরারে তোষেন সযতনে!
বৈদ্য সদ্যঃ প্রাণ-ঘাতী কালকূট বিষে
ঔষধ করেন সৃষ্টি ব্যাধির বিনাশে।
সাধু সহি অপরের তিক্ত ব্যবহার,
করিতে বিরত নহে পর উপকার।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা,
ফাল্গুন, ১৩১৯।

পুরস্কার।

যে অর্থ চাহিয়াছিল তাহার কাজ হইয়া গেল, সে প্রাপ্য অর্থ হিসাব করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, তাহার এখন বিশ্রাম; লোকে বলিল সে খুব বুদ্ধিমান, সেও ভাবিল কথাটা সত্য! যে সম্মান চাহিয়াছিল সে সম্মান পাইল, সেও হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল, লোকে ধন্য ধন্য বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল, সেও ভাবিল তাই বুঝি সত্য, আমি বুঝি সত্যই ধন্যবাদের পাত্র, তাহার আর অহঙ্কারের সীমা রহিল না। পৃথিবীর ফুল চন্দনের পূজা ইহারা উভয়েই পাইল, বেশ সন্তোষে তাহারা দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এ আর কয় দিন? কাল পুরুষ আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন, তাহাদের উভয়কে ডাকিলেন। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, কালপুরুষের কথা তাহাদের মনে ছিল না। কালপুরুষের ডাক শুনিয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিল, গৌরবের হর্ষ কলরোল ও আনন্দের বীণাধ্বনি হঠাৎ থামিয়া গেল—সংসারের যে সব লোক মাটির ফুল চন্দন দিয়া তাঁহাদের পূজা করিতেছিল তাহারা তাহাদের পানে চাহিল, তাহাদের ম্লানস্বরে বলিল, এ কি আজ আর তোমরা আমার প্রশংসা করনা কেন? তাহারা এই কথা শুনিয়াও শুনিল না, উপহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কালপুরুষ ডাকিয়া বলিলেন আর বিলম্ব নাই তোমাদের এইবার উঠিতে হইবে! তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল আমরা এই নূতন রাজমুকুট প্রস্তত করিয়াছি এখনও তাহা মাথায় উঠে নাই, তুমি একটু দাঁড়াও। কালপুরুষ আসিয়া বলিল চল চল আর সময় নাই, তোমরা কি জাননা যে আমার ডাক আসিলে মুহূর্ত্তমাত্রও অপেক্ষা নাই? তাহারা

তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, সে কি, সে কথা তো আপনি আমাদের বলেন নাই? কালপুরুষ বলিলেন আমি প্রতিদিন সহস্রবার আসিতেছি, তোমাদের সম্মুখে আমি আপনার কার্য্য করিতেছি, ইহাতেও তোমরা আমার কার্য্য পদ্ধতি বুঝিতে পার নাই—হায় মূর্খ, পলে পলে আসিয়া আমি তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া যাইতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতে পাও নাই? আমি কি তোমাদের জন্য কম পরিশ্রম করিয়াছি? প্রথমে আমি বাহির হইতে ডাকিতেছিলাম তখন তোমাদের স্তুতি গায়কেরা পাছে আমার ডাক তোমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, এই ভয়ে যেন আরও জোরে জোরে তোমাদের বন্দনা করিতে লাগিল। তোমাদের কি মনে নাই, তখন আমাকে বাধ্য হইয়া তোমাদের নিকটে আসিতে হইল, তোমাদের প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, আমার ডাক তোমাদের শুনাইবার জন্য আমি তোমাদের প্রিয়তম বস্তু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিলাম? তখন ত তোমরা আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলে, প্রভু আর না, এইবার তোমার ডাক শুনিয়াছি, এইবার তোমায় চিনিতে পারিয়াছি, এখন হইতে সাবধান হইয়া চলিব, আমাদের যখন তুমি ডাক দিবে তখন আর অন্যদিকে চাহিব না, শুনিবামাত্র হাসিতে হাসিতে তোমার সঙ্গে যাইব। সে বুঝি তোমাদের সাময়িক পরিবর্ত্তন মাত্র? তাহার পর বুঝি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ? আর উপায় নাই এখন এই সব মাটির রাজমুকুট ও খেলা ঘরের ফুল চন্দন ফেলিয়া চলিয়া এস, আমার আর সময় নাই আমার এই সব ভৃত্য তোমাদের লইয়া যাইবে। তাহারা কি যাইতে চায়? পৃথিবীর ধূলামাটি ছাড়া তাহারা আর কিছু দেখে নাই, আর কিছু ভাবে নাই, কিছু দিন খাটিয়া যাহা পুরস্কার পাইয়া ছিল, দুই হাতে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিল দাঁত দিয়া কাঁমড়াইয়া ধরিল। কালপুরুষের দূতেরা আর সময় নাই দেখিয়া ও তাহাদের প্রভু আদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া জোর করিয়া তাহাদের টানিয়া লইল, তাহারা উলঙ্গ হইয়া কষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। ভয়ানক সে দেশ—চারিদিকে অন্ধকার, পথে কণ্টক, অসহ্য সন্তাপ! এই যাতনার আর শেষ নাই!

এই পুরস্কার প্রাপ্তির মাটির দেশে একজন দরিদ্র লোক কিছুই চাহে নাই, কর্ম্মের উন্মাদনায় সে পুরস্কারের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। গ্রীষ্মকাল, ধূলা উড়িতেছে, বাতাসের সঙ্গে আগুন চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, সকলেই কাজ সারিয়া কেহ গাছতলায় কেহ বা প্রসাদে বা

হর্ম্ম্যে আপন আপন শক্তি অনুসারে সকলেই বিশ্রামলাভ করিতেছে, কেহ একেবারে ঘুমাইতেছে, কেহ বা অর্দ্ধনিদ্রিত, যাহারা জাগিয়া আছে তাহারাও আরাম করিতেছে, এমন কি গরু বাছুরগুলি পর্য্যন্ত গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছে; কিন্তু এ বেচারার আর বিশ্রাম নাই, কর্ম্মের উন্মাদনায় সে বিশ্রামের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, পুরস্কারের বিষয় ভাবিবার তাহার সময় পর্য্যন্ত নাই। সংসারে কে কাহার খবর লয়? এ ব্যক্তি খাটিতেছে তাহা অনেকেই জানে না, দু একজন দয়া করিয়া জানালা খুলিয়া পথের পানে চাহিয়া দেখিল, আগুণবৃষ্টি মাথায় লইয়া ঘর্ম্মসিক্ত শরীরে ধূলায় বসিয়া লোকটি এখনও খাটিতেছে। তাহারা ভাবিল লোকটি দুরদৃষ্ট, বেচারা এখনও বিশ্রামের উপায় করিতে পারে নাই, তাহার বুদ্ধি কম, তাহার শক্তি কম, কি করে তাই এই দ্বিপ্রহরে কষ্ট করিয়া খাটিতেছে, বেচারা খাইতে পায় না! আহা সে বড় হতভাগ্য! এই কথা রাষ্ট্র হইতেছে, অনেকেই বলিতেছে লোকটি মূর্খ, শক্তিহীন, হতভাগ্য!

এমনি করিয়া সে খাটিতেছে। যখন নিশীথ কাল, সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন, কেবল ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে তখনও তাহার বিশ্রাম নাই, সে বিশ্রামের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, পুরস্কারের কথা তাহার একেবারেই মনে নাই। রাত্রিকালেও সে ঘুমায় নাই এই কথা যখন রাষ্ট্র হইল, তখন তাহার জীবনের রহস্য কেহই বুঝিতে পারিল না, যাহারা সংসারের বুদ্ধিমান লোক, সব বিষয় বুঝিতে পারে বলিয়া যাহাদের খ্যাতি আছে, তাহারা বলিল বোধ হয় সে দস্যু তস্করের সহযোগী, সে রাতারাতি বড়লোক হইবে বলিয়া এত পরিশ্রম করিতেছে!

যে লোকটি খাটিতেছে, তাহার প্রতি দেবতাদের দৃষ্টি পড়িল। এমনি করিয়াই তো দিনরাত্রি চলিয়া যাইতেছে, অনেক দিন চলিয়া গেল, তাঁহারা আসিয়া তাহাকে বলিলেন আর তোমাকে খাটিতে হইবে না, তুমি অর্থ ও মান চাও নাই, তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহা না চাহিয়া তুমি বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য করিয়াছ, তবে আর তোমায় খাটিতে হইবে না, আমরা স্বর্গের দেবতা, আমরা তোমাকে রাজ্য দিতেছি, ঐশ্বর্য্য দিতেছি, মান দিতেছি, সম্ভ্রম দিতেছি! সে ব্যক্তি অবাক হইয়া বলিল, আমার কষ্ট হইতেছে এ কথা বলেন কেন? কৈ আমার তো কখনই কষ্ট হয় নাই? আর আপনারা কি সব পুরস্কারের কথা বলিতেছেন? আমিত পুরস্কার চাই নাই, এই গ্রীষ্মের রৌদ্র, আর

বর্ষার জলধারা, এই পথের ধূলা, ইহারা আমার বন্ধু, আমি এই পরিশ্রমেই পরমানন্দ পাইয়াছি, আপনারা কি সেই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? দেবতারা অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহাদের মনে সম্ভ্রমের উদয় হইল তাঁহারা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন—তাহার কিন্তু সেবায় দৃষ্টি নাই সে আপন মনে পূর্ব্বের মত কাজই করিয়া যাইতেছে!

কালপুরুষ দূর হইতে তাহার দিকে চাহিলেন, দূতগণকে বলিলেন দেখ, এ দিকে আমার রাজ্য নহে, ইহা দেবরাজ্য এ দিকে তোমরা যাইও না। কেবল যাহাদিগকে অন্ধকার ও কণ্টকের মধ্য দিয়া লইয়া যাইবে তাহাদিগকে এইখানে আসিয়া একটু বিশ্রাম ও শান্তি দান করিও। দূতগণকে এই উপদেশ দিয়া কালপুরুষ চলিয়া গেলেন।

সংসারে হাহাকার উঠিয়াছে, যাঁহারা বাড়ি করিয়া আরাম করিতেছিল, ভাবিতেছিল চিরদিনই এইখানে থাকিব, তাহাদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহারা সিংহাসন করিয়াছিল তাহাদের সিংহাসন অন্যলোকে কাড়িয়া লইয়াছে, যাহারা রাজমুকুট গড়িয়াছিল তাহাদের রাজমুকুট মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, আর তাহা কুড়াইয়া লইবার শক্তি নাই। সব ফুরাইয়া গেল—সংসারে হাহাকার পড়িয়াছে। কালপুরুষের দূতেরা সব বিশ্রামকারীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, যে লোকটি খাটিতেছে তাহার কাছে আসিয়া এই কষ্টপ্রাপ্ত বিশ্রামকারীর দল কিছুক্ষণ খুব আরাম পাইতেছে! তাহারা আরাম পাইতেছে বটে কিন্তু সেই লোকটির পানে চাহিতে তাহাদের লজ্জা হইতেছে, ভাবিতেছে এ লোকটি এত ভাল লোক এ ব্যক্তি খাটিয়া খাটিয়া এই দুর্গম যন্ত্রণাপূর্ণ ভীষণ পথে আমাদের জন্য এই শান্তিময় আনন্দনিকেতন নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই ব্যক্তি এত দিন এইজন্যই খাটিতেছিল, আমাদের জন্যই সে এত পরিশ্রম করিতেছিল, হায় হায় এ ব্যক্তিকে তো কালপুরুষ আক্রমণ করে নাই, হায় হায় এ ব্যক্তিকে যদি সময় থাকিতে বন্ধু বলিয়া ধরিতে পারিতাম, এ ব্যক্তিকে যদি চিনিতে পারিয়া ইহার কার্য্যে একটু একটু সাহায্য করিতাম, তাহা হইলে এ দুর্দ্দিনে আর অনুতাপ করিতে হইত না! তাহারা এইরূপ ভাবিতেছে দূতেরা আসিয়া বলিল আর সময় নাই, তোমাদের বিশ্রাম শেষ হইয়াছে—আবার চল। তাহারা পথে ছুটিল—ভাবিতে লাগিল করিয়াছি কি? বিশ্রামের ও আরামভোগের নামে তীব্র যাতনা ও উৎকট পরিশ্রমের বীজ বপন করিয়াছিলাম—আজ সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত

হইয়াছে—আর ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমানের মত আরাম না চাওয়ায় পরিশ্রমই তাহার কাছে আরাম হইয়া গিয়াছে।

যে ব্যক্তি খাটিতেছিল সে এখনও খাটিতেছে—তাহার শ্রমের ফলভোগী হইবার জন্য সংসারের অনেক চতুর ব্যক্তি তাহার কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। সে ব্যক্তির তাহাতেই আনন্দ, নিজের শ্রম পরের বলিয়া প্রচার হইতেছে তাহাতে তাহার আপত্তি নাই বরং আনন্দ! তাহার সমস্তটাই আনন্দ, তাহার গায়ের ধূলা পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়া গিয়াছে। সে আপন আনন্দে কাজ করিতেছে, আনন্দময় পুরুষ আসিয়া তাহার প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যে সব চতুর লোক পরের কার্য্য নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সংসারে কয়েকদিন তাহাদের ভাগ্যে বিশ্রাম ও আরাম ঘটিয়াছিল কিন্তু কালপুরুষের রোষদীপ্ত কটাক্ষের নিকট সমস্ত কৃত্রিমতা, সমস্ত আত্মরক্ষার চেষ্টা মুহূর্ত্তমধ্যে ধ্বংস হইয়া গেল। কেবল এই শ্রমশীল ব্যক্তির দিকে কালপুরুষ গেলেন না, তিনি তাঁহার দূতদিগকে বলিলেন এ ব্যক্তি অপ্রাকৃতধাম বৈকুণ্ঠ রচনা করিয়াছে, নিজের জন্য নহে, সকলের জন্য, অনন্তকালের মানববৃন্দের জন্য—যাহারা তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে, কষ্ট দিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার বৈকুণ্ঠের দ্বার তাহাদের জন্যও নিত্য উন্মুক্ত।

শ্রীপঞ্চমী উৎসব।

বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি তাং।

(মহাকালী পাঠশালায় সরস্বতী-পূজা)

শীত ঋতুর ঘোর কুজ্ঝটিকা অপনোদনের কালে,—যখন সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছেন, যখন বসন্তের প্রথম নীলাভ গগনপটকে শ্যামল স্নিগ্ধ রূপে মণ্ডিত করিতেছে, যখন নববিশলয়-বিকাশে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকল নবজীবনের সূচনা করিতেছে, যখন হৈমজাড্য পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমরকুল গুণ্ গুণ্ গুঞ্জনে প্রথম বসন্ত কুসুমের মধু আহরণে ব্যস্ত হইয়াছে, সেই সময়ে, বসন্তের সেই প্রথম শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বঙ্গবাসী আর্য্য

সন্তানগণ সরস্বতী পূজা করিয়া থাকেন। তাই আজ মহাকালী পাঠশালায় ভারতের অনাদ্য।বিদ্যা ভগবতী ভারতীর মহাপূজা মহোৎসব। এই আর্য্য ভূমিতে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে সরস্বতী দেবীর এইরূপেই পূজা হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, আজ বালক বালিকাগণের আনন্দ কোলাহল পরিশ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকাল হইতে বালকগণ দলে দলে যবশীর্ষ, আম্র-মুকুল ও পুষ্প দুর্ব্বাদি সংগ্রহের জন্য পল্লীতে পল্লীতে পরি-ভ্রমণ করিতেছে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠী আজ ভগবতী বীণা পুস্তক-ধারিণী সরস্বতী মাতার আবির্ভাবে পবিত্র! যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি সরস্বতী প্রতিমা আনয়ন করিয়া আজ মায়ের পূজা করিবেন, আর যাঁহার সে ক্ষমতা নাই, তিনি পুস্তক মস্যাধার লেখনী প্রভৃতি পূজা করিয়াই আনন্দ লাভ করিবেন।

ভারতের অন্য প্রদেশের হিন্দুগণ এই শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মদনোৎসবের সূচনা করেন। আমাদের স্বর্গীয়া তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বলিতেন আর্য্যাবর্ত্তে এই দিবস হইতে দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত "হোলির" উৎসব চলিয়া থাকে। বৌদ্ধ প্রাধান্যকালে এই 'হোলি' উৎসবকেই মদনোৎসব বলা হইত। সে উৎসবটী কন্দর্প চতুর্দ্দশী বা মধু পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চলিত। আর্য্যাবর্ত্তে সে দীর্ঘকালের সঙ্কোচ করিয়া দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এখন "হোলি" উৎসব চলিয়া থাকে। পরন্তু তন্ত্রপ্রধান দেশে এই মদনোৎসবের সূচনা সারদা বন্দনায় হইয়া থাকে। কেন এরূপ হয়, তাহাই আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী, আজ বহুদিনের কথা, যখন মহাকালী পাঠশালা স্থাপন হয়, সেই সময়ে দ্বার বঙ্গেশ্বর স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর প্রমুখ অনেকগুলি রাজন্য-বর্গের সম্মুখে এই বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তদীয় শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কয়েকটী বিশেষ বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা অধুনা মদন বলিলে যাহা বুঝি, পুরাকালের হিন্দুগণ কিন্তু তাহা বুঝিতেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে স্ত্রীত্ব পুংস্ত এই দুই শক্তিই স্বতন্ত্রভাবে নিত্য বিদ্যমান আছে। স্ত্রী শক্তি ও পুং শক্তির সংযোগে নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে হইতে, বলা চলে যে, এই দুই শক্তির সংযোগে সৃষ্টির বিস্তার বা বিসর্পন ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, আর যাহা কিছু থাকিবে—সে সকলই

নিত্য, সনাতন। ব্রহ্মশক্তি-প্রভাবে প্রজাপতির চেষ্টায় সে সকলের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়া থাকে, শিব শক্তির প্রভাবে সে সকলের বিনাশ বা বিস্তারের সঙ্কোচ বা সংহরণ হইয়া থাকে, আর বৈষ্ণবী শক্তিতে বিকাশ বা সঙ্কোচের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া বিষ্ণু সৃষ্টি রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই হইল ঈশ্বরের ত্রিশক্তির ব্যঞ্জনা মাত্র। আছে সব, থাকিবে সব, থাকেও সব, পরন্তু যাহা আছে বা থাকিবে, তাহার ব্যঞ্জনায় সৃষ্টি, সংহরণে প্রলয় এবং সৃষ্টিও সংহারের সামঞ্জস্যে স্থিতি। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের তিন ভাবের দ্যোতক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তিময়—শক্তিপূর্ণ, শক্তির লীলাতেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে। তবে জড়শক্তি ও ঐশীশক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, জড়শক্তি কেবল গতি ও ক্রিয়া মাত্র; ক্রিয়া সমাপ্তি ও ফল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তির আকারান্তর হয়—বিকৃতি ঘটে। আর ঐশী শক্তি আত্মজ্ঞান পূর্ণ; অক্ষয় অমর ও অজর। জড়শক্তির ক্রিয়া নৈমিত্তিক, ঐশী শক্তির ক্রিয়া নিত্য ও অব্যাহত।

শ্রুতি অর্থাৎ বেদের ব্রহ্মবাণীতে শ্রবণ করিয়াছি যে, এক আমি বহু হইব। যে শক্তির প্রেরণায় ঈশ্বরে এমন ইচ্ছার স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ভারতী শক্তি তাহাই বাণী, বিদ্যা, সরস্বতী। এই শক্তিময়ীর প্রভাবেই সৃষ্টির বিকাশ, একে বহুত্বের ভাণ, অহং মমেতির উদ্ভব। সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে আব্রহ্ম স্তম্বপর্যন্ত সমস্তই চিদানন্দময়ের মধ্যে সংহৃত ও সম্পুটিত ছিল। তখন বিকাশ ছিল না, বিস্তার ছিল না, জ্যোতিঃ ছিল না, গতি ছিল না, সকলই স্তম্ভিত, কেন্দ্রীকৃত, অতি সুক্ষ্মভাবাপন্ন ছিল। আর এই সকলের উপরে একটা অজ্ঞেয়তার অন্ধকার ও জড়তা বিরাজ করিতেছিল। বাঙ্মনের অগোচর—সে অবস্থা বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে; তবে সেই অলৌকিক প্রতিভাশালিনী, পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনা, তপস্বিনী মাতাজী মহাকালী বলিতেন, শীত ঋতুতে সৃষ্টির সর্ব্বস্ব যেমন সম্মূঢ় হইয়া থাকে, তেমনই সম্মূঢ় অবস্থায় সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বস্ব নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু ও অচল ক্লীব ব্রহ্মশক্তিতে নিহিত ছিল। সে অন্ধকারে প্রথমে শ্বেতাম্বরা সারদার উদ্ভব হয়। উষার সঙ্গে তাঁহার বিকাশ, মুদিতার বিলোলবিস্তারে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গায়ত্রী, সাবিত্রী, ব্রহ্মযোনিস্বরূপিণী সরস্বতী, অজ্ঞেয় অন্ধকার হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া তিনি শ্বেতাঙ্গী শ্বেতাম্বরা, শ্বেত পদ্মাসনা, রূপের জ্যোতির সপ্তবর্ণ-সমন্বিতা শ্বেতাভাময়ী মনোমোহিনী। ইনিই প্রথম বিকাশ;

কিন্তু বিকাশে ক্ষয় অপচয় অছে, উদয়াস্ত আছে, যাহাতে উপচয় অপচয়ের উদয়াস্তের পারম্পর্য্য অনন্ত ও অক্ষয় হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে ধাতার বিধান অনুসারে দেবী সপ্তস্বরা। রূপে তিনি সপ্তবর্ণা, গুণে তিনি সপ্তস্বরা বাগ্বাদিণী। বিকাশের সঙ্গে আহ্বান আছে, অনুরাগরক্তিমের সঙ্গে বসন্তের পঞ্চম স্বর আছে, সৃষ্টির এই বিকাশ ও আহ্বানকে তন্ত্রে মদন, কন্দর্প, মন্মথ, মার প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্বের সমবায়ে সৃষ্টির বিকাশ। এ সমবায়. বাসনায়, ভাগবতী ইচ্ছায় আর "একোঽহং বহু স্যাম্" এই ঐশ্বরীয় আকাঙ্খায় ঘটে। এই তিন প্রকার ইচ্ছার সহিত পুংস্তের নূতন অবস্থান আছে, তাহা না হইলে অনন্ত ইচ্ছা-পারম্পর্য্যের বিস্তার সম্ভবপর হয় না। প্রথমে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড অবস্থান মাত্র—তিনি নিত্য, সনাতন, অব্যয় ও অনন্ত। ব্রহ্মের এই ক্লীব অবস্থা স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্বের সম্মূঢ় ও নিষ্ক্রিয় ভাবদ্বারা ঘটিয়া থাকে। তৎপরে অহং জ্ঞানের উদয় হয়—তৎসৎ পদার্থের অনুভূতি জন্মে। এই অনুভূতির প্রভাবে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব পৃথক হইয়া যায়। তখন "তপ! তপ। তপ!" এই আদেশ বাণী অনুসারে শক্তির ক্রিয়া হয়, স্বতন্ত্রীকৃত দুইশক্তি আবার সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে "একোঽহং বহু স্যাম্" এই ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। এই ইচ্ছাই সরস্বতী। এই স্ত্রীত্ব শক্তিময়ী বাঞ্ছা কল্পলতিকা স্বরূপিণী দেবী ভারতী কন্দর্পরূপী পুংস্ত্বের অবস্থানে আলম্বনে সর্ব্বদিকবিহারিণী হইয়া থাকেন। সেইজন্য শ্রীপঞ্চমীর দিনে মদনোৎসবের সূচনা। তাই আমাদের স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী মহাকালী পাঠশালায় সরস্বতী পূজার এত মহাসমারোহে উৎসব করিতেন। তিনি বলিতেন,—যতদিন সৃষ্টির নববিকাশ নিত্য নিত্য ঘটিতে থাকে, ততদিন সাধক কামের আরাধনা করিয়া থাকেন। নূতন সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ মধুমাসের শেষে কন্দর্প চতুর্দ্দশীর দিন ঘটে। সেই দিবস বাহ্য প্রকৃতি পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হয়। কিন্তু অধুনাতন দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে আর্য্যাবর্ত্তে দোল পূর্ণিমার দিনে বসন্ত ঋতুর পূর্ণাবির্ভাব হয় বলিয়াই ঐ দিবসেই মদন উৎসবের সমাপন করা হয়।

সৃষ্টির মূলে "অহং মমেতি" জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রথমে আমি আছি—এই অনুভূতি হইবে, সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতি বিকাশ, উষারাগরক্তিম কপোলা দিগ্‌বালাগণ দেখা দিবেন—তাঁহাদের লাস্য লীলা দেখিয়া আমি আর তুমি, এই দ্বৈতভাবের উদয় হইবে। দ্বৈত ভাব উদয় না হইলে সৃষ্টি

সম্ভবপর হয় না। তুমি আর আমি আছি, এই জ্ঞান ফুটিলেই তোমায় আমায় এক হইবার বাসনা মনোমধ্যে জাগ্রত হইবে। ব্রহ্মচ্যুতি জন্য জীবের যে প্রকৃতিগত বিরহ, তাহা বহ্নিজ্বালার ন্যায় শতমুখে বিকশিত হইবে সেই বিরহ হইতেই সৃষ্টির বিস্তার—এক দুই হইতে অনন্ত কোটীর বিকাশ। এই নিমিত্তই সরস্বতী জ্ঞানদা, বরদা ও সারদা, এই হেতু তাঁহাকে তন্ত্রে বলিয়াছেন—"ঐঙ্কার বীজাক্ষরী"।

ভাই ভারতবাসী হিন্দুসন্তান, আমরা এখন এই শুভ অবসরে সুপ্রভাতে পূর্ণউৎসাহে সমুৎসাহিত হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বপ্রয়োজক, সর্ব্বশক্তিমান জগৎ-পাতার অভয় পাদপদ্মে আমাদের সমস্ত কার্য্যের ফল সমর্পণ করিয়া বিশাল কর্ত্তব্যের ভার শিরে লইয়া এই নবীন শুভলগ্নে একবার মনঃপ্রাণ খুলিয়া জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশময়ী মা সারদার চরণপ্রান্তে অবতীর্ণ হইয়া সকলে সমবেত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হই এবং প্রাণ খুলিয়া ইচ্ছাময়ী মা বীণাপানীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার স্তুতি করি আর আমাদের সেই অতীত উপদেশবাণী বেদও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"হে বন্ধুগণ একত্র মিলিত হও সকলেই একবাক্য হও সকলেই একমন হইয়া কর্ত্তব্য পালন কর। সমান উদ্দেশ্য, সমান একতায় এবং সমান হইয়া সমান জ্ঞানলাভ কর! তোমরা সকলেই এক সমান মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কর। সমপ্রাণে সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা সমানভাবে সকলকে সমান ফলদান করিবে। সুতরাং, তোমাদের সকলের সমভাব পরস্পর ঘনিষ্ট হইয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ সকলে এক মনপ্রাণ এবং সর্ব্ববিষয়ে একমত হইয়া একই উদ্দেশে কার্য্য কর।"

যথা :—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রস্বমিতি সমানো
সমানং মনসস্তহ চিত্তমৈষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়বঃ।
সমানীচ আকুতি সম্বমানা হৃদয়াণি চঃ।
সমানমস্ত বৈ মনো চ খাবস স্থ সহাসতি॥"

(ঋগ্বেদ)

এস মা! হ্রী মেধা, চিন্তাধীরূপিণী—এস তুমি তোমার শ্বেতাঞ্চল বিস্তীর্ণ

করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। মা আজ তোমাকে বিদ্যারূপে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহে এস। তোমার যে প্রভাবে বেদের মহাবাক্য সকল উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে বেদবেদাঙ্গ চতুঃষষ্টি কলার সৃষ্টি হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে দেবর্ষি নারদের বীণার সপ্তস্বরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে দেবাদিদেব বিশ্বম্ভরের ডমরুতে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে লবকুশের মুখে রামায়ণ গীত বাহির হইয়াছিল—মা! সেই বুদ্ধি, সেই চিত্ত, সেই মেধা আমাদের দাও। পুনরায় তোমার সপ্তস্বরের ঝঙ্কারে ছয় রাগের বিকাশ হইবে, তোমার সপ্তবর্ণের বিকাশে জগদ্রূপের বিস্তার ঘটিবে—তুমি জ্ঞানদা শুভ্ররূপিণী। যাহাতে "অহং মমেতি" জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, যাহাতে সকলের অনুভূতি ঘটে, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা আবার কর। মা! তেমনই কৃপাদৃষ্টি কর! মা! তুমি এই মহামোহ বিমূঢ় প্রদেশে জ্ঞান দাও, বিদ্যা দাও ও সুমতি প্রদান কর—সংযম, সন্ন্যাস সাধনা ও ব্রত দাও! মা! আমাদের সন্তানদিগকে তপঃ সিদ্ধ তেজঃ প্রভাব দাও! আমাদের বালকগণকে মেধা, বুদ্ধি, বালিকাগণকে পরিচর্য্যা সামর্থ্য দাও! আমাদের উদারতা, সত্যপ্রিয়তা, কর্ম্মশক্তি, ত্যাগবুদ্ধি, স্বধর্ম্মবুদ্ধি আর বিনয় বিনম্রভাব প্রদান কর। ইহাই আমাদের সকলের একান্ত প্রার্থনা।

জ্ঞানের বিকাশের সহিত হৃদয়ের অন্ধকার কুসংস্কার নষ্ট হয়। সেইজন্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী, কোটী পূর্ণেন্দুশোভাশালিনী রত্নাভরণভূষিতা।

একইমাত্র পূর্ণচন্দ্রের বিমল প্রভায় জগৎ স্নিগ্ধ ও আলোকিত হয়, আর যে ভাগ্যবানের হৃদয়মন্দির এই কোটী পূর্ণেন্দুশোভাশালিনী জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভায় আলোকিত হয়, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে কি কখনও অজ্ঞানান্ধকার থাকিতে পারে?

আমরা অজ্ঞান, তাই প্রকৃত বিদ্যার সাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিদ্যার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, জ্ঞানকরী বিদ্যার পরিবর্ত্তে অর্থকরী বিদ্যার আলোচনা করিতেছি। বিদ্যাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছি; সুতরাং সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছিনা।

অর্থোপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতেছি বলিয়া আমাদের জ্ঞানলাভ হইতেছে না। যে দেবতার তপস্যা করিতেছি; কায়মনো-

বাক্যে তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার সপত্নীর সেবায় প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করাতে "ইতো-ভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইতেছি! আমরা বিদ্যালয়ে গমন করি বিদ্যালাভের জন্য, পুত্রসন্তানদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে বলি—কেবল তাহাদের বিবাহে অর্থ প্রাপ্তির আশায় এবং তাহাদিগের দাসত্বের দ্বার অর্গল মুক্ত করিবার নিমিত্ত। মা সরস্বতীর অপর একটী নাম ভাষা, আমরা সরস্বতী দেবীর পূজা করি সত্য কিন্তু ভাষা শিক্ষা করাই যে সরস্বতীর আরাধনা, সে কথা বিস্মৃত হই। ইহা অপেক্ষা আমাদিগের বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া মহাকালী পাঠশালাটী স্থাপন করতঃ প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশের মঙ্গল বিধান করিয়াগিয়াছেন। তদীয় প্রণালী অনুযায়ী জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে দেশে প্রভূত কল্যাণ হইতেছে এবং সেইজন্য তিনি বাঙ্গালায় চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

আমরা দেবী বাগ্বাদিনীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াও অন্যমনস্ক হইতেছি। সেইজন্যই আমাদের তপস্যার সহস্র প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। দেবতা-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াও দাসত্ব শৃঙ্খলের ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে আমাদিগের ভীত বা বিচলিত হইতে হয়। যিনি দেবতার সাধনায় প্রবৃত্ত, আবার যে সে দেবতা নয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সাধনায় প্রবৃত্ত, তাঁহার আবার ভয় কোথায়? কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে দেবী জ্ঞানদার সেবা করি নাই বলিয়াই আমাদিগকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

আমরা তপোভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আমাদের এই অধঃপতিত বঙ্গভূমির যে রত্নটী কাল সাগরের অতল জলে হারাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ আর একটী রত্ন পাইতেছি না। জননী বাগীশ্বরীর বরপুত্র বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতির কথা ছাড়িয়া দিই, বঙ্গদেশের গৌরব স্বরূপ সেই রঘুনন্দন, কৃষ্ণনাথ, জগন্নাথ, বাসুদেবকে আজ বঙ্গের কোন গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা এমনই হতভাগ্য যে, আমাদের মধ্য হইতে যেরূপ গুণবান বা বিদ্বানগণ যাইতেছেন, সেরূপ আর আগমন করিতেছেন না! আমরা স্বাস্থ্যশক্তি, সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া সরস্বতীর পূজা করিতেছি সত্য; কিন্তু পূজায় তন্ময় হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের সমস্তই বিফল হইতেছে।

হে কমলদলবিহারিণি, শ্বেত মরালবাহিনি, বিনা পুস্তকধারিণি বিদ্যাদায়িনী দেবি! আজ তোমার আগমন প্রতীক্ষায় সহকার শাখার চ্যুত মুকুল মুঞ্জরিত হইয়াছে, যবশীর্ষে শস্য দেখা দিয়াছে, শরবনে লেখনী প্রস্তুত হইয়াছে, আর স্বচ্ছগগন শ্যামাঙ্গে শারদে! তোমার স্তুতি গাথা ফুটাইতে তারকার হীরক-মালা চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ঐ দ্বিরেফ গুন্ গুন্ গুঞ্জনে তোমায় আবাহন করিতেছে, ঐ কোকিলকণ্ঠপঞ্চম স্বরে তোমার স্তুতি গীত হইতেছে। আজ দেশের সরল সাধু বালকগণ এবং সুকোমল মতি পবিত্রচেতা সরলা বালিকাগণ হৃদয় দ্বার খুলিয়া তোমার ভাব গ্রহণের আশায় দাঁড়াইয়া আছে।

এস মা! কাতর প্রাণে তোমায় ডাকিতেছি। তুমি আজ এই শুভ শ্রীপঞ্চমীতে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল প্রভা বিকীর্ণ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তোমা হারা হই নাই, সরস্বতী প্রবাহ অন্তঃসলিলা হইলেও নিত্য বিদ্যমান, প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গা যমুনার পার্শ্বে ভক্তের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট।

মা! তুমি না থাকিলে কি আজ এমন দিব্য ভাবের বিকাশ সম্ভব হয়? তুমি না থাকিলে কি আজ আমাদের কুমারীবৃন্দ এরূপভাবে জাতীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হয়? তুমি না থাকিলে কি এই ধ্যান সামর্থ্য বিকাশ পায়? আজ, মা—নিশ্চয়ই তুমি ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান আছ। আমাদের করজোড়ে প্রার্থনা—তুমি ব্যক্ত হও! স্বয়ম্প্রকাশ তুমি, আমাদের হৃদয়মন্দিরে বিশ্বরূপ বিকাশ কর। আমাদের সদা চঞ্চল চিত্ত মধুকরকে তোমার পদারবিন্দে অবিচলিত করিয়া রাখ। জননি! তোমার কৃপাকণালাভে এককালে বঙ্গ-দেশের গৌরব দেশদেশান্তরে কীর্ত্তিত হইয়াছিল, মিথিলা, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লীর বিজয় গান লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে পরিশ্রুত হইয়াছিল; আজ সেই কৃপাবারি বিতরণ কর।

মা! আমরা যেন তোমার অনুগ্রহলাভে চরিতার্থ হইয়া তোমার গুণগানে বিভোর হইয়া আবার তোমার পূজা করিতে পারি। আবার যেন পূর্ব্বের ন্যায় তন্ময় হইয়া বলিতে পারি—"বিনাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

মহাকালী পাঠশালায় এ বৎসরে মায়ের পূজায় কিছু বিশেষত্ব হইয়াছে। মহাকালী পাঠশালায় পীতবসন পরিহিতা সুস্নাতা চন্দনচর্চ্চিতা কুমারীবৃন্দের মুখে পবিত্র স্বরে স্তোত্রাদি পাঠ শ্রবণে মা বড়ই প্রসন্না হইয়াছেন। তাই

মহাকালী পাঠশালার কুমারীগণের বসন্তোৎসব দর্শন করিবার অভিলাষে এবারে বহুসংখ্যক দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুর আমাদের একটী কন্যা এখন মহাকালী পাঠশালায় প্রধানা ছাত্রী শ্রীমতী মৈথিলী রাণী দেবীকে সংস্কৃত রঘুবংশের কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া সম্যকরূপে তাহার উত্তরে পরম প্রীত হইয়া বাঙ্গালীর মেয়ের নাম মৈথিলী রাণী রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি মৈথিলী রাণী যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা তাহা পূর্ব্বে বুঝিতেই পারেন নাই; এস্থলে সেই রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে হইল। স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী আমদের প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিতেন; তিনিই উহার মৈথিলী নামকরণ করিয়া দ্বারবঙ্গেশ্বরের স্মৃতি রক্ষার্থ ও মহারাজার সহিত আমাদের ও পাঠশালার চিরসম্পর্ক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাই মহারাজা রামেশ্বর সিং বাহাদুর আজ পর্য্যন্ত মহাকালী পাঠশালার সভাপতি। পাঠশালার সহকারী সভাপতি ও ট্রাষ্টি বহুবাজারের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ছয় সাত শত কুমারীবৃন্দকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্ত করেন।

প্রথমতঃ পাঠশালার দ্বারদেশে প্রবেশ করিবা মাত্র অপার আনন্দ লাভ হইল। নানাপ্রকার বাদ্য গভীর নিক্কণে নিনাদিত হইতেছিল। পাঠশালার প্রাঙ্গনে সুকুমার মতি বালিকাবৃন্দ আনন্দের সহিত বেদ মন্ত্র সুমধুর স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে মঙ্গলাচরণ করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকেই কুমারীগণে পরিপূর্ণ; যে দিকে দৃষ্টিপাত হয় সেই স্থানেই অল্পবয়স্কা বালিকাগুলি নানাবিধ সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সাক্ষাৎ শ্রুতি স্বরূপিনীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন। কি মনোহর দৃশ্য! দ্বারে দ্বারে সুগন্ধি পুষ্পমালা সুশোভিত এবং সশীষ নারিকেল ও আম্রপল্লব সকল, মনোহর মঙ্গল ঘট সকল বারি পরিপূর্ণ। কোন স্থানে নহবৎ বাদ্যকরগণ আপন আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কোথায় বা ছোট ছোট শিশু ও কুমারীবৃন্দ সমবেত হইয়া সুমধুর স্বরে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিতেছেন। পাঠশালার সকলেই আনন্দিত, সকলেরই মুখমণ্ডল আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

ক্রমে উপরে উঠিয়া দ্বিতল সম্মুখের হল গৃহের মধ্যে পুষ্প পতাকাশোভিত মঞ্চোপরি সুবর্ণখচিত সিংহাসনোপরি সুচারুভূষণে বিভূষিতা অষ্টধাতু নির্ম্মিতা চতুর্ভূজা সরস্বতী মূর্ত্তি বিরাজিতা। মায়ের সম্মুখে রজত নির্ম্মিত ঘট তদুপরি সপল্লব নারিকেল, বনজ পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তিরসের আবির্ভাব করিয়া

দিতেছে। গৃহ মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টা, কোশাকুশি প্রভৃতি যাবতীয় পূজার দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। ধূপাধারে ধূপ ধুনা অগ্নি সহযোগে মধুর গন্ধ বিকীরণ করিয়া সেই স্থান আমোদিত করিতেছে। নানাবিধ স্থলজ জলজ পুষ্পরাশি, পুষ্পাধারে অবস্থান করিয়া জননীর অভয়চরণে স্থান লাভ করিবার অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতেছে। দেবীর দক্ষিণপার্শ্বে মহাকালী পাঠশালা ও দেবীর স্থাপয়িত্রী স্বর্গীয়া তপস্বিনী মহারাণীর তৈলচিত্র পটপুষ্পমাল্যে সজ্জিত। তদীয় প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার যাবতীয় কীর্ত্তিকলাপ স্মৃতিপথে উদয় হইল। তদীয় বিজয় পতাকা মহাকালী পাঠশালার কার্য্যকলাপ যাহাতে পুনরায় তাঁহার সময়ের ন্যায় সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তজ্জন্য সভ্যগণ বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন। আমাদের সকলের সমবেত যত্নে এবারে পাঠশালায় পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় শোভা বর্দ্ধন হইয়াছিল। সেই সুবৃহৎ দ্বিতল গৃহের উত্তর পার্শ্বে কাশীনিবাসী বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সামবেদ গান করেন, তৎপশ্চাতে দক্ষিণপার্শ্বে সুকুমারমতি কুমারীবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কর্ত্তৃপক্ষমণ্ডলী গললগ্নী-কৃতবাসে অবস্থান করেন। সম্মুখে সুচারু আসন প্রসারিত ছিল তদুপরি এক দেবযুক্তকলেবর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তিভরে আচমন পূজায় প্রবৃত্ত হন। এই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়।

মধ্যাহ্নে কুমারীভোজন—এটী হিন্দুমাত্রেরই দেখিবার যোগ্য, প্রায় সাতশত কুমারী একত্রে ভোজন! এরূপ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বিস্তারিত বলিতে পারেন। আমাদের মৈথিলীরাণী স্বয়ং মাতাজীর মত পরিবেশন করেন। ইহার এই কার্য্যটীতে দর্শকবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে-ছিলেন যে মাতাজী তাহার কীর্ত্তি রাখিবার জন্য এই বীজটী এখানে বপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা বঙ্গে এক নূতন দৃশ্য। এই ক্ষুদ্র বালিকাটীর ঐকান্তিক, যত্ন ও পরিশ্রম দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। যাহা হউক অধিক কি লিখিব, এরূপ দৃশ্য লিখিয়াও শেষ করা যায় না—বলিয়াও শেষ করা যায় না।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

ধ্যানে।

—ঃ*ঃ—

১

নয়ন মুদিয়া দেখি অভিরাম আলোক-প্রবাহ
প্লাবিয়া বিরাট্ শূন্য খর গতি বহে অহরহঃ;
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র কোটি বিশ্ব বিম্ব-বিন্দু প্রায়
ক্ষণে ফুটে, ক্ষণে টুটে, তার মাঝে ক্ষণে ডুবে যায়।

২

সেই জ্যোতিঃ স্রোত হতে মূর্ত্তি এক প্রকাশিছে ধীরে
স্থাপিয়া চরণ পদ্ম জ্যোতির্ম্ময় হেমপদ্ম পরে,
বহ্নি নিভ দেহ কান্তি, চতুর্ম্মুখ জ্ঞান প্রভাময়
উচ্চারিছে বেদগান—মহাশূন্যে সেই গান লয়।

৩

তারপর এক মূর্ত্তি,—নীল অঙ্গ পীতকটি-বাস,
চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পাইছে প্রকাশ,
প্রেমের অমৃত মূর্ত্তি, মধুহাস্যে প্রফুল্ল আনন,
বিকিরিছে প্রেম জ্যোতিঃ নীল শান্ত প্রসন্ন নয়ন।

৪

মন্দীভূত হ'য়ে আসে জ্যোতিঃ স্রোত মহা ব্যোম পথে—
বাহিরিছে বর মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তার মধ্য হ'তে
শুভ্রবপু ভস্মময়; ব্যাঘ্র চর্ম্ম শোভে কটিতটে,
অঙ্গ বেড়ি কালনাগ মুহুর্ম্মুহু গরজিয়া উঠে,
নীলকণ্ঠে অস্থিমালা, করে পান-পাত্র নৃ-কপাল
ধুস্তুরকুসুম কর্ণে, বামকরে ত্রিশূল করাল,
অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি নাসা-অগ্রে রহিয়াছে স্থির,
শত বিশ্ব পদতলে চাহি' আছে নত করি শির,
কপর্দ্দ দুলিছে শিরে রুদ্রতালে আলোড়িয়া ব্যোম্,
বৈরাগ্যের মহামূর্ত্তি উচ্চরিছে 'ওম্ ওম্ ওম্!'

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

গঙ্গা।

—:*:—

চির ধ্যানরত মহাযোগী ওই
তুহিন্ শুভ্র শিরে
কতকাল হতে ধ্যানেতে নিরত
(তবু) একটু চাহেনি ফিরে।
অতীতের এক বিস্মৃত দিনে
(তার) ধ্যানের মহান্ জ্যোতিঃ
উঠিল জ্বলিয়া প্রশান্ত কিরণে
হেরিতে প্রকৃতি-পতি।
পাষাণ তাহার দুইটি নয়ন
প্রেমে হ'ল ছল ছল,
আবেগ তাহার ধরেনা বুকেতে
হৃদি তার টলমল।
প্রেমের সেই বিমল উচ্ছ্বাস
ছুটিল বারিধি-মুখে,
মিশিতে ছুটিল প্রেমের অতলে
অশ্রু সে মহা সুখে।
যে পথ বাহিয়া চলিল সেই
প্রেমের প্রথম নীর,
প্রেমের মধুর চির-বসন্তে
প্লাবিত হ'ল সে তীর,
সে দিন পর আজ অনেক বছর
গিয়াছে অতীতে মিশি,
তবুও সেই প্রেমের কিরণে
ভরপূর দশদিশি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ব্যাস-নারদ সংবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রথম কথা ব্যাস-নারদ সংবাদ। এই খানেই শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তি। এই ভিত্তিটুকু সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। মানবীয় সাধনার, সমস্ত বিভাগ গুলি আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ভিত্তিটুকু উপলব্ধি করিতে পারিলে আমাদের পুরোদেশে এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া যাইবে এবং বিশ্বরহস্যের এক অতি সুন্দর মীমাংসায় উপস্থিত হইয়া আমরা শান্তি ও বল পাইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মহাভারতের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ আছে। মহাভারতে দ্বাপরের যুগধর্ম্ম প্রধানতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে, আর শ্রীভাগবতে কলির যুগধর্ম্ম কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দ্বাপর যুগের সভ্যতার অবসান আর এই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধেই ভগবদ্গীতার ঘোষণা। এই ভগবদ্গীতা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই উভয় গ্রন্থের যোগসূত্র। একদিকে এই গীতা গ্রন্থে মহাভারতীয় সাধনার যাহা সার শস্য তাহা সংগৃহীত হইয়াছে আর একদিকে শ্রীমদ্ভাগবতের যাহা শক্তি ও বীজ তাহাও এই ভগবদ্গীতার মধ্যে আছে। মহাভারতে কিছু অপূর্ণতা আছে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ব্যাস-নারদ সংবাদের ইহাই প্রথম কথা, কিন্তু ইহার আরও গভীরতর অর্থ আছে এই প্রবন্ধে তাহাই নিরূপণ করা যাইতেছে।

দ্বাপর যুগ প্রবৃত্ত হইলে পরাশর ঋষির ঔরষে ও বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ব্যাসদেব ভগবানের সপ্তদশ অবতার।

> "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
> চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥"
>
> ১।৩—২০॥

সপ্তদশ অবতারে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস নামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং লোক সকলের বুদ্ধি অল্প দেখিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ বেদরূপ বৃক্ষের বহুবিধ শাখা বিস্তার করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ দ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং স্বয়ং।
কোহন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ।"

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে এমন কে আছেন যিনি মহাভারত প্রকাশ করিতে সক্ষম।

নারায়ণোপাখ্যানে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে অপান্তরতমা নামক একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বৈপায়ন হইয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীমৎ পূজ্যপাদ রূপগোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্রীলঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রূয়তে হপান্তরতমা দ্বৈপায়নত্বমগাদিতি
কিং সাযুজ্যং গতঃ সোহত্র বিষ্ণ্বংশ সোহপি বা ভবেৎ।
তস্মাদাবেশ এবায়মিতি কেচিদ্ বদন্তি চ।"

এই অংশের অর্থ এই যে অপান্তরতমা ঋষির এই দ্বৈপায়নত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। হয়ত এই অপান্তরতমা ঋষি দ্বৈপায়ন ব্যাসে সাযুজ্য লাভ করেন, অথবা অপান্তরতমাই হয়ত বিষ্ণুর অংশ। এই জন্য অনেকের মতে দ্বৈপায়ন আবেশ অবতার।

ব্যাসদেবের মহিমা ও তাঁহার অবতীর্ণ হইবার হেতু নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীমৎ পূজ্যপাদ জীবগোস্বামী মহাশয় তাঁহার তত্ত্ব সন্দর্ভে স্কন্দ পুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়াছেন—

"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতে যুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিত্তদন্যথাজাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরে হখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্ জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাংগতে।
সঙ্কীর্ণ বুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণ মনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদাহুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্" ইতি॥

জ্ঞান সত্য যুগে নারায়ণ হইতে বিনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল অর্থাৎ সত্যযুগে মানবের সহিত সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল—ত্রেতাযুগে এই জ্ঞানের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়। দ্বাপর যুগে গৌতম ঋষির অভিশাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হয়। ফলে ব্রহ্মা রুদ্র আদি দেবতাগণ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি হইয়া পড়েন তখন তাঁহারা

শরণাগত পালক বিকাররহিত নারায়ণের শরণ গ্রহণ করেন। পুরুষোত্তম ভগবান তাঁহাদের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া উৎসন্ন বেদের উদ্ধার সাধন করেন।

গৌতম ঋষির এই অভিশাপের বিবরণ বরাহ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গৌতম ঋষির কখনও ধান্যের অভাব ছিল না, সকল সময়েই তাঁহার প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত। এক সময়ে দেশে খুব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। গৌতম ঋষির ধান্যের অভাব নাই, তিনি এই ধান্যের সাহায্যে প্রতিদিন অসংখ্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নলাভের জন্য ব্রাহ্মণেরা গৌতম ঋষির নিকট ছিলেন। দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেল, সুভিক্ষের দিন আসিল, ব্রাহ্মণেরা স্থানান্তরে যাইবার জন্য গৌতমের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গৌতম ঋষি তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই যাইতে দিলেন না। ব্রাহ্মণেরা কোনরূপে সেখান হইতে যাইতে না পাইয়া এক কৌশল করিলেন। তাঁহারা মায়ার দ্বারা একটি গাভী নির্ম্মাণ করিয়া এমন ভাবে পথে রাখিয়া দিলেন, যে গৌতম ঋষির পায়ে লাগিয়া তাহা পড়িয়া যায়। ফলে তাহাই হইল, গৌতম ঋষির পাদস্পর্শে সেই গাভীটি পড়িয়া গেল, দুষ্ট ব্রাহ্মণগণ রাষ্ট্র করিলেন যে গৌতম গোহত্যা করিয়াছে ও এই ব্যপদেশে তাঁহার আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন। গৌতম ঋষি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণদিগের এই চাতুরী বুঝিতে পারিলেন ও অভিশাপ দিলেন যে "সকলের জ্ঞান লোপ হউক" এই অভিশাপের ফলে জ্ঞান লুপ্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত অভিশাপের মর্ম্ম অত্যন্ত গভীর। নারায়ণ হইতেই জ্ঞান বিনিস্পন্ন হয়। নারায়ণ সূত্রান্তর্য্যামী বিরাট। বিশ্বের মধ্যে যে পরিপূর্ণ একত্ব আছে তাহারই উপর জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। যেমন আকাশ মুক্ত ও অনন্ত, জ্ঞানও তেমনি! আমরা খণ্ডতার মধ্যে বাস করিতেছি, অবিদ্যা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত অহঙ্কারের কূপের মধ্যে আমাদের বাস, জ্ঞান আমাদিগকে এই খণ্ডতার বাহিরে বিশ্বজনীন একত্বের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। জ্ঞানই শক্তি, কিন্তু এই শক্তি আমাদের বিচ্ছিন্নতা বা বিরোধ বাড়াইবার শক্তি নহে, মৈত্রী ও একতার প্রতিষ্ঠা করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই জন্য ভবিষ্যৎ পুরাণে ব্যাসবাক্য আছে যে—

"জ্ঞানং সংপ্রাপ্য সংসারে যঃ পরেভ্যো ন যচ্ছতি।
জ্ঞানরূপী হরিস্তস্মৈ প্রসন্ন ইব নেক্ষতে॥"

সংসারে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যিনি অপরকে তাহা প্রদান না করেন, জ্ঞানরূপী হরি তাহার উপর প্রসন্ন হন না।

আত্মপুষ্টির জন্য বা বিরোধ করিবার জন্য জ্ঞান জগৎকে দেওয়া হয় নাই বটে কিন্তু অজ্ঞান ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব এই জ্ঞানকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। যেটুকু জ্ঞানলাভ করে সেটুকু নিজের স্বার্থসাধনে ও পরের অনিষ্টে প্রয়োগ করে। মানবজাতির ইতিহাসে সকল যুগেই এইরূপ হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সন্দর্ভ লেখক স্মাইলস, এক জায়গায় বলিয়াছেন "Knowledge is power, but so also is fanaticism, despotism and ambition". জ্ঞান শক্তি বটে, কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা, যথেচ্ছাচারিতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা ও শক্তি। তাঁহার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে জ্ঞান শক্তি বটে সত্য, কিন্তু এই শক্তির সাহায্যে যেমন ভাল হইতে পারে আবার তেমনি মন্দও হইতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা মানব যখন স্বার্থসিদ্ধি করে, বা বিশ্বহিতের জন্য জ্ঞান প্রয়োগ না করিয়া তদ্দ্বারা অপরকে নষ্ট করিতে প্রয়াস পায়, সেই সময়েই অজ্ঞানতার যুগ আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময়ের বিশ্বসভ্যতার গতি যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন তাঁহারা এই কথাটি মনে রাখিলে অনেক উপকার পাইবেন। এই প্রকারে অজ্ঞানতার যুগ আরম্ভ হইলে মহাপুরুষের বা অবতারের আবির্ভাব হয়। এই প্রকারে যেমন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, সেই প্রকার অজ্ঞানতার পর জ্ঞান, আবার জ্ঞানের পর অজ্ঞান, চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা হইতেই এই সত্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুরাণে তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। হিরণ্যকশিপুর সময় বা রাবণের সময় বা কংশ শিশুপাল ও দুর্য্যোধনাদির সময় জ্ঞানের এই অপব্যবহার হইয়াছিল, সেই সময়েই অবতারের আবির্ভাব।

যাহা হউক ব্যাসদেব যে দেশের এক বিশেষ দুঃসময়ে আসিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। একদিন জ্ঞানখলতায় দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল, কতকগুলি লোক জ্ঞানবান হইয়া অপর সকলের উপর চাতুরী করিয়া অত্যাচার করিতেছিল এবং স্বার্থসাধন করিতেছিল এই সময়ে বেদব্যাসের বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের আবির্ভাব।

ইউরোপের ইতিহাসে সক্রেতিসের আগমন কাল আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পূর্ব্বোদ্ধৃত স্কন্দ পুরাণের বচনে ব্যাসদেবের

আগমন কালের যে বর্ণনা করা হইয়াছে সক্রেতিসের সময় ঠিক তাহার অনুরূপ। সক্রেতিস্, এর পূর্ব্বে গ্রীসদেশে সফিষ্টগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সফিষ্টদের নাম অনুসারে সফিষ্ট্রী (Sophistry) শব্দের উদ্ভব। কোনও সত্যে বিশ্বাস না করা এবং যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে যাহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে বলিবে তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারার যে শক্তি তাহাকে 'সফিষ্ট্রী' বলে। এই অবস্থাতেই মানব কর্ত্তৃক জ্ঞানের চরম অপমান সাধিত হয়। অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছি, তর্ক করিবার, বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু নিজে কোনও সত্যে বিশ্বাস করি না। দরকার হইলে দিন কে রাত্রি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি, রাত্রিকে দিন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি। স্বার্থসাধনের জন্য এই প্রমাণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করাই যে দেশে বা যে যুগে জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্য সেই দেশে অজ্ঞানতার আগমন অবশ্যম্ভাবী। বরাহ পুরাণের যে আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহাতে গৌতমের অতিথি ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের কিরূপ প্রয়োগ করিলেন, জ্ঞানের নিকট শক্তি লাভ করিয়া সেই শক্তি কিরূপ কার্য্যে প্রয়োগ করিলেন, তাহা দেখা গেল। এইরূপ অবস্থাতেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। এই অজ্ঞানতার দিনেই বেদব্যাসের আবির্ভাব। এই বেদব্যাস যাহা করিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মতে তাহা তিনটি স্তরে বিভক্ত। এই তিনটি বিভাগের নাম বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ। এই তিনটি স্তর বস্তুতঃ ভিন্ন নহে—একই পরিপূর্ণ জ্ঞানের তিনটি প্রকাশ (Aspects) মাত্র। এই মত বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়—

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো।
যজুর্ব্বেদঃ সমাবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥" (মৈত্রীঃ—উ)

এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ।

পুরাণ সকল আধুনিক বা পরবর্ত্তী কালের রচনা, পৌরাণিক ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের অবনত অবস্থা এই একটা মত আজকাল দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে কিন্তু এই মত প্রাচীন মত নহে। মহাভারতে এবং মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে "ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েদিতি" অর্থাৎ বেদের অর্থ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া লইতে হইবে। "পূরণাৎ পুরাণম্" ইহাই প্রাচীন মত—অর্থাৎ বেদের পুরণ করে বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। এই জন্য পুরাণও বেদ তুল্য। পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার এই কারণ দিয়াছেন

যে বেদের পূরণ বেদের দ্বারাই হইবে। স্বর্ণবলয়ের পূরণ কখনও সীসার দ্বারা হইতে পারে না। পুরাণের সহিত বেদের সম্বন্ধ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী বলেন "বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক-পদ-কদম্বস্যা-পৌরুষেয়ত্বাদভেদেঽপি স্বরক্রমভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে।" বিশিষ্টরূপে একার্থ প্রতিপাদক পদসমূহের অপৌরুষেয়তা নিবন্ধন বেদ ও পুরাণ অভেদ—অর্থাৎ উভয়েরই পদ অপৌরুষেয় ও একার্থবোধক, প্রভেদ এই যে বেদ স্বরভেদে উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে, পুরাণে তাহা নাই। ইতিহাস ও পুরাণকে প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ পঞ্চম বেদ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইতিহাস ও পুরাণকে যে কেন পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে নিম্নরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিং স্তেনযজ্ঞমকল্পয়ৎ॥
আধর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
ঔদগাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যাথর্ব্বভিঃ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে ইতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥"

"পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন, ঋষি ঐ একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। চারিজন ঋত্বিক দ্বারা যে চাতুর্হোত্র যজ্ঞ করিতে হইবে, সেই চাতুর্হোত্র যজ্ঞ সুন্দর রূপে সাধন করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। বেদী নির্ম্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞের শরীর, এই কার্য্যের নাম অধ্বর ক্রিয়া, এই কার্য্য যিনি করিবেন তাঁহার নাম অধ্বর্য্য, এই অধ্বর্য্যর ক্রিয়া যজুর্ব্বেদীগণের দ্বারা সাধিত হইবে। বেদীতে হোম আদি হোতৃ-ক্রিয়া ঋগ্বেদ বিভাগে, হোমের সময় বিষ্ণু স্মরণাদি ক্রিয়ার বা উদ্গান ক্রিয়া সামবেদ বিভাগে আর ত্রুটি সংসোধন ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি ব্রহ্মার ব্রহ্মক্রিয়া অথর্ব্ববেদ বিভাগের দ্বারা সাধিত হইল। আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা প্রভৃতির দ্বারা পুরাণার্থ-বিসারদ পুরাণ সংগ্রহ করিলেন।

বেদ, মহাভারত ও পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া বেদব্যাসের মহাসাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে বেদ বিভাগ করার পর ব্যাসদেব ইতিহাসও পুরাণ রচনা করিলেন। বেদব্যাস

সাধারণ হিতজনক কর্ম্মদ্বারা জীবদিগের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও বেদব্যাসের হৃদয়ে বিশিষ্টরূপ তুষ্টি জন্মিল না। এই অবস্থায় তিনি একদিন অতিশয় অপ্রসন্ন মনে সরস্বতী নদীর তীরে নির্জ্জন স্থানে শুচি হইয়া অবস্থিতি করতঃ মনের এই অপ্রসন্নতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন আমার মনে এরূপ অপ্রসন্নতার উদয় হইতেছে কেন? আমি আজীবন ব্রতপরায়ণ হইয়া বেদ, অগ্নি ও গুরু ইহাদের যথোচিত পূজা করিয়াছি এবং অকপটে তাঁহাদিগের অনুশাসন গ্রহণ করিয়াছি—মহাভারতের মধ্য দিয়া যাহা বেদের অর্থ তাহাও সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছি—স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি সকলে যাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি—অথচ আমার মনে শান্তির উদয় হইতেছে না কেন? আত্মা সচ্চিদানন্দে পূর্ণ—ইহাই তত্ত্ব, এই তত্ত্ব আমি জানি এবং প্রচার করি অথচ আমি বড়ই হীনতা অনুভব করিতেছি। নিবিষ্টচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যাসদেবের মনে হইল যে আমি ভাগবত ধর্ম্ম বহুলরূপে প্রচার করি নাই, বোধ হয় সেই জন্যই আমার এই অপূর্ণতার ভাব মনের মধ্যে জাগ্রত হইতেছে। এই ভাগবত ধর্ম্ম পরমহংসগণের প্রিয়—এই ধর্ম্ম ভগবানেরও প্রিয়—এই ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার জন্যই আমার চিত্তে এই অসন্তোষ জন্মিয়াছে। ব্যাসদেব এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার আশ্রমে সহসা দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের সহিত দেবর্ষি নারদের এই মিলনই শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তি সুতরাং ভাগবত ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই মিলনের রহস্যটি চিত্তে উপলব্ধি করিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

> "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
> স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাং॥

প্রকৃষ্টরূপ বাক্যদ্বারা বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা, বা বহু গ্রন্থপাঠের দ্বারা আত্মাকে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইতে হইলে এ সকল ব্যতীত আর একটি বস্তুর প্রয়োজন সেটি সেই আত্মার (পরমাত্মার বা ভগবানের বরনীয়তা বা করুণা (Election)। এই বিশিষ্ট করুণার সাহায্যেই মানবের আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে।

শ্রুতি বাক্যের মধ্যে এমন একটি তত্ত্ব নিহিত আছে যাহা ধর্ম্মপিপাসু মানব মাত্রেরই চিন্তা করা প্রয়োজন। মানবের সাধনার যে মূল্য ও প্রয়োজন আছে তাহা নিশ্চয়, কিন্তু পরমার্থ লাভের পক্ষে সেই সাধনাই যথেষ্ট নহে। মানবীয় শক্তি তাহা যতই উন্নত ও যতই উচ্চ হউক না কেন আমাদের জীবন সমস্যার যাহা শেষ মীমাংসা তাহা সাধন করিতে হইলে এই সাধনার সহিত ভগবানের করুণার যোগ হওয়া চাই। পূর্ব্বে যে শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইল তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে মানবীয় সাধনার বুঝি কিছুই মূল্য নাই। পাছে কেহ এরূপ মনে করেন বলিয়াই শ্রুতি ঠিক তাহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলিলেন, যে সত্য বটে মানব-জীবনের শেষে সফলতা সেই করুণার দ্বারাই হইবে কিন্তু সেই করুণা পাইবার জন্য মানবকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সে প্রস্তুত হওয়া কেমন, শ্রুতি পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রের ঠিক পরেই সে কথা বলিয়াছেন—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

যে বৃত্তি বা শক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার নাম প্রজ্ঞান। দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে শান্ত, সমাহিত ও ধীর না হইলে এই প্রজ্ঞান ক্রিয়াশীল হয় না সুতরাং অশান্ত, অসমাহিত ও অধীর ব্যক্তি তাঁহাকে পায় না। ইহার অর্থ এই যে আমরা শান্ত সমাহিত ও ধীর হইয়া আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিব, এই পর্য্যন্তই আমাদের অধিকার কিন্তু শেষ সফলতা ভগবানের করুণার দ্বারাই হইবে।

পূর্ব্বে মানবজীবনের যে চরম সফলতার কথা বলা হইল ভক্তিশাস্ত্রের এইখানেই ভিত্তি। এই ভিত্তিটুকু ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক তত্ত্বই বেশ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সম্প্রদায় পণ্ডিত এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে ঈশ্বর যদ্যপি না থাকেন তাহা হইলেও সমাজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরবাদ প্রয়োজন। সেইরূপ ধর্ম্ম জিনিষটা সত্য না হইলেও সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন। এই মত হইতে আর এক চেষ্টা হইয়াছে। মানুষ একত্র হইয়া ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত লোক আছেন, কেহ কবি, কেহ দার্শনিক, কেহ ঐতি-হাসিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ সাহিত্যিক বা সমাজ তত্ত্ববিৎ, মনে করুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া কি করিয়া সমাজের কল্যাণ হইতে পারে

ইত্যাকার চিন্তা ও আলোচনা করিয়া একটি ধৰ্ম্ম রচনা করিলাম। এখন কথা এই যে এই ধৰ্ম্ম দ্বারা কি মানবজীবনের আধ্যাত্মিক পিপাসার নিবৃত্তি হইবে? ইহার উত্তর 'তাহা হইবে না, হইতে পারে না'।

ধৰ্ম্ম বলিতে আমাদের কেবলমাত্র হিসাব করিয়া আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া চলা বুঝায় না, ইহার সহিত হাত বাড়াইয়া টানিয়া লওয়া চাই নতুবা ধৰ্ম্ম হয় না। পূর্ণাঙ্গ ধৰ্ম্ম বলিতে মানবীয় সাধনাও ভগবানের করুণা এই উভয়ের সংযোগ বুঝায়। মানুষ ভগবানের জন্য আকুল, এই আকুলতা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ। জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক মানব অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতায়, অসত্য হইতে সত্যে, বন্ধন হইতে মুক্তিতে যাইবার জন্য ছটফট্ করিতেছে। মানুষের যাহা কিছু চেষ্টা চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা চরম বিশ্লেষণে দেখা যাইবে সমস্তই এই মৌলিক চেষ্টার বিশেষ বিশেষ বিকাশমাত্র। ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিলে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মৰ্ম্ম অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে মানুষ ভগবানকে পাইবার জন্য যত ব্যাকুল, ভগবান মানুষকে কৃপা করিবার জন্য তদপেক্ষা অনন্তকোটিগুণে আকুল। সমস্ত বিশ্বের মৰ্ম্মস্থলে ভগবানের এই আকুলতা নিত্য স্পন্দিত হইতেছে, এই স্পন্দনে আমরা সাড়া দিতে পারি না, এই জন্যই আমাদের দুঃখ ও দুর্দ্দশা। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যে সাধনার পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে সেই পথ অবলম্বন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর হইলে পর আমরা সেই স্পন্দনে সাড়া দিতে পারিব। ব্যাস নারদ সংবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই। আর নারদ তাঁহার পূৰ্ব্বজন্মের যে ইতিহাস ব্যাসদেবের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও এই সাধনপথ স্তরেস্তরে বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবকে মানবীর সাধনায় পরিপূর্ণ বিকাশরূপে স্থাপনা করা হইয়াছে। এই বিকাশ অনুকূল ও প্রতিকূলভেদে দ্বিবিধ। ব্যাসদেব অনুকূল বিকাশ আর হিরণ্যকশিপু প্রতিকূল বিকাশ সে কথা পরে বর্ণনা করা হইবে।

ব্যাস নারদ সংবাদের তাৎপর্য্য মানবীয় অনুকূল সাধনার সহিত ভগবানের বিশেষ করুণার সংযোগ। এই ভাবটি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কত প্রকারে যে কত স্থানে বলা হইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে একস্থলে অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে—যশোদা

কৃষ্ণকে বন্ধন করিবেন। দুষ্ট ছেলে পাড়ায় কেবল দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ায়, পাড়ার লোকেরা সব আসিয়া অনুযোগ করিতেছে যশোদা জননীর বড়ই রাগ হইয়াছে। আজ দড়ি দিয়া তিনি কৃষ্ণকে বন্ধন করিবেন। একটি উদূখল আনা হইয়াছে বালক কাঁদিতেছে তাহার চোখের জলে কাজল ভাসিয়া ইন্দ্র-নীলমণিশ্যাম অঙ্গকান্তি এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। উদূখল বেষ্টন করিয়া দড়ি ঘুরাইয়া দড়িতে গ্রন্থি দিতে গিয়াছেন, দড়ি দুই অঙ্গুলি কম হইল। সেই দড়ির সহিত নূতন দড়ি সংযোগ করা হইল, তবুও সেই দুই অঙ্গুল কম হইল। এই প্রকারে নন্দরাজার বাড়ীতে যত দড়ি ছিল সমস্ত দড়ি একত্র করা হইল, তবু সেই দুই অঙ্গুলি কম। বাড়ীতে আর দড়ি নাই, পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গেল, গোপীরা সকলে নিজ নিজ বাড়ী হইতে দড়ি লইয়া আসিল, তবু সেই দুই অঙ্গুল কম। দড়িতে কুলাইল না, তখন দড়ির সহিত কাপড় বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তবু দুই অঙ্গুলি কম। তিন অঙ্গুলি নহে চারি অঙ্গুলি নহে, প্রত্যেক বারেই দুই অঙ্গুলি কম। এই দুই অঙ্গুলির নাম প্রেমব্যাকুলতাপূর্ণ-সাধনক্লান্তি ও বিশেষ করুণা। যশোদা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন আর পারেন না—এই সময়ে—

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্ত কবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীত স্ববন্ধনে॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তাঁহার মাতার শরীর দিয়া দর-দর ধারে ঘর্ম্ম ঝরিতেছে, মাথার চুলে ফুলের মালা ছিল, তাহা খসিয়া গিয়াছে—আহা তাঁহার মা, তাঁহার বড় পরিশ্রম হইয়াছে এই ভাবিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক বাঁধনে ধরা দিলেন।

বাৎসল্য রসের নিকট এই ভাবটি কিরূপ তাহা বর্ণিত হইল। মধুর ভাবের নিকট এই ভাবের প্রকাশ বাসক-সজ্জা অবস্থায়।

"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসক সজ্জিকা॥"

উজ্জ্বল নীলমণি

"প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি
গৃহ শয্যা মাল্য তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি নানা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ॥"

ভক্তমাল।

গীতগোবিন্দ গ্রন্থে এই ভাবের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে তাহা নায়ক পক্ষে হইলেও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥"

পাখিটি উড়িলে অথবা পাতাটি পড়িলেও তুমি আসিতেছ মনে করিয়া শয্যা রচনা করিতেছেন এবং চকিত নয়নে তোমার আগমন পথ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই অবস্থা ভক্তি সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বৈষ্ণব সাধনায় ভাব ভক্তির উদয়ে যে নব প্রীত্যঙ্কুরের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই বাসকসজ্জা বা উৎকণ্ঠিতাভাবের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই নব প্রীত্যঙ্কুর এই—

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্ গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে প্রীতি। ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধতার নাম ক্ষান্তি। ভজনাঙ্গ ব্যতীত অন্য বৈষয়িক বিষয়ে কালযাপন না করার নাম অব্যর্থকালত্ব। বিষয়ে অরুচির নাম বিরক্তি। নিজের উৎকর্ষসত্ত্বেও যে অমানিত্ব তাহার নাম মানশূন্যতা। দৃঢ়তর ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভাবনার নাম আশাবন্ধ। স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্য যে গুরুতর লোভ তাহার নাম সমুৎকণ্ঠা। সর্ব্বদা নামগানের যে অভিলাষ তাহারই নাম নামগানে সদা রুচি। শ্রীভগবানের গুণ বর্ণনে আসক্তিকেই ভগবদ্ গুণাখ্যানে আসক্তি বলা যায়। আর শ্রীভগবানের ধাম যে শ্রীবৃন্দাবন তাহাতে বাসের অভিলাষই তৎ বসতিস্থলে প্রীতি। যখন ঐ সকল প্রীত্যঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হইয়াছেন ইহাই জানিতে হইবে।

অবশ্য জ্ঞানযোগ সাধনায় পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থার সহিত মমুক্ষুত্বের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন

"মুমুক্ষুপ্রভৃতিষু যদি ভাবচিহ্নং দৃশ্যতে তদা ভাববিম্ব এব নতু ভাবঃ। অজ্ঞজনেষু ভাবচ্ছায়া॥" অর্থাৎ মুক্তিকামী ব্যক্তিতে ভাবচিহ্ন দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহা ভাববিম্ব, ঠিক ভাব নহে। অজ্ঞজনে ভাবের ছায়া পতিত হয়।

নারদ ভগবানের করুণার একটি বিশিষ্ট প্রণালী। নারদের মধ্যদিয়া ভগবানের করুণা সর্ব্বদাই জগতে বহিয়া আসিতেছে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির জীবন ইহার প্রমাণ। গুরুপ্রণালীতেও দেখিতে পাওয়া যায় পরব্যোমপতি নারায়ণের পর ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পর নারদ তাহার পর ব্যাসদেব। ব্যাসদেব হইতে এই গুরুপ্রণালী পর পর আমাদের যুগ পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছে।

সত্য সত্য অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই পথের সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। এই প্রত্যক্ষবাদের যুগে আমরা খুব গর্ব্ব করিয়া মনে করিয়া থাকি যে এই বিশ্বের যাহা কিছু উন্নতি সমস্তই আমাদের চেষ্টায় সাধিত হইতেছে। কিন্তু এ কথাটি একেবারেই মিথ্যা। এই দৃশ্যমান বিশ্ব সমস্ত বিশ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণ এখনও রহিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সাহায্য করিবার জন্য ব্যাকুল; এ যুগেও অনেক লোক সেই সমস্ত অদৃশ্য ও সূক্ষ্মশরীরি মহাপুরুষগণের কৃপায় অধ্যাত্ম রাজ্যে অগ্রসর হইবার পথ প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের হস্ত নিরন্তর করুণার ব্যাকুল আবেগে জগতের প্রতি প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, সংসার পথে ক্লান্ত, পথভ্রান্ত ও ধূলি ধুসরিত দেহ এই মানবকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল। কেবল যে আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্যই তাঁহারা সাহায্য করিতেছেন তাহা নহে, নানা বিপদ হইতেও আমরা তাঁহাদের কৃপায় রক্ষা পাইতেছি। এ বিষয়ে দু একটি সকলের পরিচিত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া একজন লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত মানবীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান যাহা কিছু করিতে পারে তাহা করিয়া আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন সময়ে স্বপ্নযোগে এক ঔষধ পাওয়া গেল, সেই ঔষধে রোগ সারিয়া গেল। দেবতার দ্বারে হত্যা দিয়া কত উৎকট ব্যাধি সারিয়া যাইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। মূর্চ্ছা রোগের রোগী অনেক সময়েই ঔষধ পায়। এই সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিয়া যাহারা উড়াইয়া দেন তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। একালে ভোগের বস্তু খুব বাড়িয়াগিয়াছে, মানুষের উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা খুব

বেশী এই জন্য ধীর ভাবে কোনও অন্তর্জাগতিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধানের সময় মানুষের খুবই অল্প অথচ অহঙ্কারও খুব বেশী। সত্য অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টাও করিব না অথচ সহজ বুদ্ধিতে বিনা চেষ্টায় যাহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারা না যায় এবং যাহা জানিবার জন্য আমি এক দিনও চেষ্টা করি নাই তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিব। এই যে মনের অবস্থা ইহা বড়ই শোচনীয় এবং এরূপ অবস্থায় অধ্যাত্মসাধনা একেবারে অসম্ভব এবং এরূপ অবস্থার লোকের পক্ষে কেবল ভাগবত কেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সূক্ষ্মশরীরী জীব রহিয়াছেন তাহারা মানবকে সাহায্য করিতেছেন, এ বিষয় আজকাল ইউরোপেও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অন্তর্জাগতিক রহস্যালোচনার জন্য ইংলণ্ডে যে সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, (Psychical Research Society) সেই সভার কার্য্য বিবরণীতে এই প্রকারের ঘটনা অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ঘটনার সত্যাসত্য বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্ধারণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করা যায় না। শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার সাহেব Invisible Helpers নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেও সূক্ষ্ম জগতবাসী এই সমস্ত জীবের মানবকে সাহায্য করার কথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। * এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠে আমরা এইরূপ মতে উপস্থিত না হইয়া পারি না যে এই যে জগতের বা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইতেছে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ যে মানবীয় শক্তি কেবল তাহার দ্বারাই হইতেছে না, মানবীয় চেষ্টা সর্ব্বদাই ভগবানের করুণার নিকট সহায়তা লাভ করিতেছে। এই যে করুণা এ কেবল মুখের কথা মাত্র নহে একটি সুন্দর চিন্তা বা কবির কল্পনা মাত্র নহে, এই করুণার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে। লোক লোকান্তরবাসী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ এই করুণার বিশিষ্ট প্রণালী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি প্রভৃতিও আপন আপন অভিব্যক্তি অনুসারে অল্প বিস্তর পরিমাণে এই করুণা প্রবাহ মানব জগতে আনয়ন করিতে সাহায্য করিতেছেন। নারদ এই প্রকারের একটি বিশিষ্ট প্রণালী। ভারতবর্ষীয় ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে নারদকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রণালী বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইল যে অদৃশ্যসহায় বা দেবযোনীগণ মানবের শুভাশুভ দেখিতেছেন এবং অনেক সময়ে মানবকে বিশেষভাবে সাহায্যও করিতেছেন।

---

* এই গ্রন্থখনি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক 'অদৃশ্য সহায়' নামে বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া প্রাচীন গুরুপ্রণালী এখনও রহিয়াছে। অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রসর হইবার সুনির্দ্দিষ্ট পথ আছে। সেই পথে মহাপুরুষগণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা উপযুক্ত পাত্র তাঁহারা এখনও সেই মহাপুরুষগণের করুণা লাভ করিতেছেন। আমরা যদি সত্য সত্যই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চাই তাহা হইলে কতকগুলি বই পড়িয়া খুব ভাল ভাল যুক্তি তর্ক সংগ্রহ করিয়া রাখিলেই কার্য্য শেষ হইবে না, এই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভের জন্য এই সনাতন সাধন পথের পথিক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এই পথ এখনও রহিয়াছে, এই সংশয়বাদের দিনে এই জড়বাদ ও ইহ-সর্ব্বস্ববাদের দিনে মানবের নিকট এ কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করা দরকার। এ কথা ঘোষিত না হইলে অথবা এই পথের সত্যতা উপলব্ধি না করিলে ধর্ম্ম কেবল মুখের কথাতেই থাকিয়া যাইবে, জীবনের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। অবশ্য এস্থলে একটি কথা বলা দরকার। জগতে এমন অনেক ভাল লোক আছেন যাঁহারা এই পথের বিষয় জানেন না, কখনও সে বিষয়ে চিন্তাও করেন নাই এমন কি কেহ যদি তাঁহাদিগকে সেই পথের কথা বলেন তাহা হইলে তাঁহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এই সমস্ত লোক অজ্ঞাতসারে এই সাধন পথে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, পরার্থপরতা, সংযম, প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের অনুশীলন দ্বারা এই পথে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাঁহারা সেই সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী। এই সমস্ত লোক এ জন্মে নাস্তিক বা জড়বাদী আখ্যায় আখ্যাত হইতেছেন, আর অনেক লোক ধর্ম্ম, ধর্ম্মসাধন-পথ, সদ্‌গুরু প্রভৃতি বড় বড় কথা লইয়া অনেক গোলোযোগ করিতেছেন কিন্তু এই সমস্ত সদ্‌গুণের অনুশীলন করিতেছেন। ইহাতে ফল এই হইবে যে এজন্মে যিনি মতে নাস্তিক বা জড়বাদী, কিন্তু জীবনে পরার্থপর ও সংযত তাঁহারা পরজন্মে সাধনার পথ পাইয়া সদ্‌গুরু পাইয়া পরমার্থের অভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িবেন আর যাঁহারা বড় বড় কথা লইয়া কেবল অহঙ্কার করিতেছেন তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন।

যাহা হউক শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রারম্ভে এই পথের সত্যতা ও মানবের মঙ্গল কার্য্যে ভগবৎ শক্তির নিত্য হস্তক্ষেপ (Divine Interference) এবং মানবের প্রকৃত মঙ্গল এই হস্তক্ষেপের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাঁহারা এই সমস্ত কথাগুলি স্বীকার করিতে পারেন না তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের দ্বারা উপকৃত হইবেন

না। তাঁহাদের সন্দেহই বাড়িয়া যাইবে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে অনেক লোকের নিকট এই ভাগবত শাস্ত্র কেন উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্ম-শাস্ত্র দুরূহ ও অবোধ্য বলিয়া প্রতীত হয় তাহার কারণ এই যে তাঁহারা এই প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। আজকাল মানব-জাতির সৌভাগ্য বসতঃ জগতে একটি অতি নূতন ঘটনা ঘটিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্রের মর্ম্মনিরূপণ করিয়া তাহার সাহায্যে লাভবান হইতে চাহেন তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এ ঘটনাটি এই যে বিজ্ঞানের উন্নতি খুব দ্রুত বেগে চলিতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞানমার্জ্জিতবুদ্ধি মানবগণের অবিশ্বাসের বা উপহাসের বিষয় ছিল এখন তাহা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণীকৃত হইতেছে। ফলে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যে বিরোধ ও বৈষম্য তাহা মিটিয়া যাইতেছে এখন বিজ্ঞানই ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। ইহা হইতে মনে হয় যে জগতে এক নূতন যুগ আসিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়া একটি বিশেষ রূপ অধিকার লাভ করা দরকার। তদ্ব্যতীত ভাগবতশাস্ত্র বুঝিতেই পারা যায় না। ব্যাপারটা এইরূপ মনে করুন একজন খুব ভাল গায়ক আসিয়াছে, তাহার ন্যায় কলাবিৎ (কালোয়াত) আর নাই। আমি তাহার গান শুনিবার জন্য গমন করিলাম। আমার সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নাই। না জানি তাল ও রাগ রাগিণী, এমন কি গান শুনিবার যে কাণ, যাহাকে ইংরাজীতে Musical ear বলে তাহা পর্য্যন্ত আমার নাই। আমি বসিয়া বসিয়া গান শুনিলাম। মনে হইল পথে যে বালকেরা যথেচ্ছ চীৎকার করে তাহার সহিত এই কলাবিতের প্রভেদ কি? সুতরাং কাণ থাকিলেই গান শোনা যায় না আবার চোখ থাকিলেই নাচ ও দেখা যায় না। নাচ যে নাচ বা তাহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য বা নিপুণতা আছে ইহা বুঝিতে হইলে কেবল চোথ থাকিলেই হইবে না নৃত্য কলার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এক কথায় "রসিক" ও "ভাবুক" হইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে—

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

এই সংসারে যাঁহারা রসিক ও ভাবুক ভাগবত শাস্ত্র তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন এই ভাগবত রস লয় পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পান কর।

ভাগবতরস পান করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। এই "পান কর" পদটির অর্থও অতি গভীর ও ইহার সহিত অনেক ব্যঞ্জনা (Suggestiveness) যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ভাললোকে পথের ধারে জলছত্র দেয়, তাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া ডাকে "জল খাইয়া যাও" "জল খাইয়া যাও" পথে অনেক লোক চলিয়া যাইতেছে। কেহ মোটর গাড়ীতে, কেহ জুরিতে যাইতেছে, কেহ পান খাইয়া আরাম করিতে করিতে যাইতেছে! এই জল-ছত্রের ডাক পথের ধারে নিনাদিত হইতেছে বটে কিন্তু এই ডাক সকলের জন্য নহে। যাহার পিপাসা পাইয়াছে তাহারই জন্য। তেমনি এই ভাগবত শাস্ত্রের যে নিমন্ত্রণ ইহাও সকলের জন্য নহে—রসিক ও ভাবুকের জন্য। সংসার পথে পর্য্যটন করিতে করিতে যাঁহারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পিপাসায় কাতর হইয়াছেন ভাগবত তাঁহাদেরই পিপাসার জল।

মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় জীবনের মূল্য কি? তাহা হইলে সকলে কিছু একই রূপ উত্তর দিবেনা। সকলেই একই জিনিষ চাহেনা একই বস্তু পাইলে সকলে তুষ্ট হয়না। অধিকার ভেদ বা রুচি ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ চায় ভুক্তি, কেহ চায় সিদ্ধি, কেই চায় মুক্তি কেহ চায় ভক্তি, বেদে সকল রকম অধিকারীরই স্থান আছে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে বেদকে কল্পতরু বলা হইয়াছে।

একটি বিশিষ্ট অধিকার লাভ করার পরে মানুষ ভাগবত শাস্ত্রে আকৃষ্ট হয় এবং এই শাস্ত্রের দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন বেদান্ত শাস্ত্রের সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে একটির নাম "মুমুক্ষত্ব" বা মুক্তি পাইবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার পরই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। মুক্তি পাইবার ইচ্ছা নাই অথচ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করি বা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করি তাহা হইলে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর যুক্তি পাইব বটে অনেক কথা শিখিব বটে এবং হয়ত সাংসারিক বিষয়ে অনেক চাতুরীও শিখিব বটে কিন্তু বেদান্তের যাহা অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধি হইবে না। ঈশপের যে অতি সুন্দর একটি গল্প আছে এখানে তাহাই মনে পড়িয়া যায়।

কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। বড়ই ক্লান্ত হইয়া কাঠের বোঝা সম্মুখে রাখিয়া কাতরস্বরে বলিতেছে "আর পারিনা, যমরাজ তুমি আসিয়া এই কঠোর জীবন সংগ্রামে আমায় অব্যাহতি দাও" যমরাজের বোধ হয় তখন কোন কাজ ছিলনা। তিনি কাঠুরিয়ার এই কথা শুনিয়া একেবারে তাহার

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সে ব্যক্তি যমকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। যম বলিলেন "তুমি আমায় ডাকিতেছ ও নিস্কৃতি চাহিতেছ। তবে এস।" কাঠুরিয়া বলিল "না মহাশয় আমি যাইব না, আপনি যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন তবে আমার কাঠের বোঝাটি মাথায় তুলিয়া দিন।" এই গল্পটি বালক বালিকাদিগকে পড়ান হয় বটে কিন্তু ইহার অর্থ অতীব গভীর। আজ কাল সকলেই বলে "মুক্তি হইবে কি প্রকারে?" প্রশ্নটি ভাল। কিন্তু ইহার উত্তরে প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করিতে হয় "তুমি মুক্তি চাও কেন? তোমার কি অসুবিধা হইতেছে?" সে ব্যক্তি অধিকাংশ স্থলেই তাহার উত্তর দিতে পারিবেনা। জগতে যে আমরা বদ্ধ, ইহাই বা কয়জন লোকে উপলব্ধি করিতে পারে? খাইয়া পড়িয়া হাসিয়া বেড়াইয়া বেশ দিন কাটিয়া যাইতেছে, কখন কখন স্বাস্থ্যের বা অর্থের অভাব হয়, নতুবা দিন ত বেশ চলিয়া যাইতেছে।

ঋষিরা যে বলিয়াছেন সংসার দুঃখময় ও পরিবর্ত্তনশীল, মানব ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে, এ কথা কয়জন লোকে ঠিক হৃদয়ের দ্বারা বুঝিতে পারে। এ কথা যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তিনি পরম ভাগ্যবান, তিনি অধ্যাত্মজীবনের পথে এইবার অগ্রসর হইবেন। সাধারণতঃ মানুষ যমকে ডাকে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নহে কাঠের বোঝা তুলাইয়া লইবার জন্য। জগতে ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা করি বলিয়া পরিচিত হওয়ায় লাভ আছে সুবিধা আছে, সুলভে এত বড় একটা কীর্ত্তি যদি লাভ করিতে পারি ছাড়ি কেন? অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম্মালোচনার ইহাই প্রেরণা। কিন্তু বেদান্তে বলিতেছেন মুমুক্ষু হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে। ভাগবত বলিতেছেন রসিক ও ভাবুক হইয়া ভাগবত রস পান করিবে। এই যে অধিকারী নির্ণয় ইহা হিন্দুশাস্ত্রের একটি বিশিষ্টতা। কেবল হিন্দুশাস্ত্রেরই বা কেন সকল শাস্ত্রেই এই এক কথা। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন যাহারা সংসারে গুরুভারাক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত তাহারা আমাকে অনুসরণ করে। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, কারণ অন্য লোকে বেশ সুখে আছে; "আশাপাশৈঃশতৈর্ব্বদ্ধা" তাহাদের ঈশাকে অনুসরণ করার মোটেই প্রয়োজন নাই, তাহাদের পিপাসাই নাই তাহারা জল লইয়া কি করিবে।

ব্যাস-নারদ সংবাদের সমস্ত কথা বলা হইল না। এই-টুকু কেবল বলা হইল, যে এই ব্যাস-নারদ সংবাদ ভাগবত শাস্ত্রের ভিত্তিমূলে অবস্থিত। ভগবান কেবলমাত্র একটি কল্পনা নহেন, তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল তাঁহার করুণা

জগতের দিকে অজস্র ধারায় বহিয়া আসিতেছে—তাঁহার এই করুণাধারা জগতে আসিতেছে বলিয়াই মানবের যত কিছু আশা, এই আশায় বুক বাঁধিয়াই মানব সফল, এইটুকু ভাগবত যেন স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন। অবশ্য এটুকু যাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহাদের সহিত যে আমাদের আলোচনা শেষ হইল তাহা নহে তবে তাঁহাদিগকে ভাগবতের মধ্যে না আনিয়া এই কথাগুলি স্বীকার করার যোগ্য কি না এই লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদরূপ কল্পতরুর ফল বলা হইয়াছে। সুতরাং ভাগবত-শাস্ত্রের পশ্চাতে হিন্দু জাতির বহু বহু যুগের সাধনার দ্বারা লব্ধ অনেক তত্ত্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সেই তত্ত্বগুলির সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় ব্যতিরেকে ভাগবত শাস্ত্র উপলব্ধি করা কঠিন। যেমন জ্যামিতি শাস্ত্রের প্রথম পুস্তকের ৪৭এর প্রতিজ্ঞা পড়িতেছি—এই সাতচল্লিশের প্রতিজ্ঞায় ৩৫এর প্রতিজ্ঞা ২৯এর প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির ফল স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলির ফল যাহারা সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন তাঁহারাই ৪৭ প্রতিজ্ঞার আলোচনার অধিকারী অন্যে নহে। এখন এই ৪৭এর প্রতিজ্ঞায় বলিতেছি যে একই ভূমির উপর ও একই সমান্তর সরল রেখার মধ্যে যে দুইটি সমান্তর চতুষ্কোণী ক্ষেত্র থাকে তাহাদের আয়তন সমান। এই কথা বলিবা মাত্রই একজন লোক যদি তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর ৪৭এর প্রতিজ্ঞার মধ্যে অগ্রসর হইতে না দিয়া সে পৃষ্ঠা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ৩৫এর প্রতিজ্ঞায় লইয়া আসিতে হইবে। ৩৫এর প্রতিজ্ঞায় যদি প্রমাণের সময় সন্দেহ হয় তাহা হইলে হয়ত আরও গোড়ার প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। ভাগবতশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাই। আজকাল আবার এই প্রকারের প্রাথমিক বিষয় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে কারণ আমাদের প্রাচীন সংস্কারও ধারণা হইতে আমরা অনেক পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছি এবং এই সমস্ত সংস্কারের স্থান অন্যরূপ সংস্কারের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দার্শনিক ভিত্তি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতে অবলম্বিত বিশিষ্ট চিন্তা পদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপনার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রথম সন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

"যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজ ভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ ॥"

যিনি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজনে একান্তভাবে অভিলাষবান অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবা ব্যতীত অন্য কিছুতে অনুমাত্রও অভিলাষী নহেন—যিনি অনায়াসেই হৃদয়ের সহিত অকপটে বলিতে পারেন—

"ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গভোগং ফলং চিরম্।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা তৎপাদসেবনং বিনা ॥
গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং সমং ফলম্।
কিন্তুতে চরণাম্ভোজে সন্ততং রতিরস্তু মে ॥"

ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, বা চিরকাল স্বর্গভোগ এ সমস্তে আমার অনুমাত্রও বাঞ্ছা নাই। তোমার চরণসেবা ব্যতীত আমি কিছুই চাহি না। গোলোকে বা পাতালে সর্ব্বত্রই বাস সমান, যেখানে হয় সেইখানেই আমি থাকিতে পারি, কোনই আপত্তি নাই। কেবল তোমার চরণপদ্মে নিরন্তর আমার রতি রহুক ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় বলিতেছেন যিনি শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবনের একান্ত অভিলাষী তিনিই এই গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিবেন, অপরে যেন এই গ্রন্থ দর্শন না করেন, এ বিষয়ে শপথ অর্পিত হইল।

সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা তাঁহার এই শপথ দেওয়ার অর্থ বুঝিতে পারিব না। আমরা বলি জ্ঞানের রাজ্যে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, সকলেই সকল জ্ঞানে অধিকারী হউক। কিন্তু প্রশ্ন এই ইহা কি হয়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার গোপ্য তত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"এ সকল গুহ্য কথা বলিতেই ভয়।
পাছে অরসিকে শুনি অনর্থ করয় ॥"

শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্ম ভজনের অভিলাষী হওয়া বড় কম কথা নহে। যিনি পরদেবতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম শ্লোকে যাঁহার স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার স্বরূপ লক্ষণে, 'পরমার্থ সত্য' এই কথা বলিয়াছেন, মানবের অধিকার ভেদে তাঁহার প্রকাশের তারতম্য আছে। কৃষ্ণরূপ বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মতে তাঁহার স্বরূপ বিশিষ্ট অধিকার ব্যতীত কৃষ্ণ উপাসনায় প্রবৃত্তি হয় না বা পরদেবতাকে কৃষ্ণরূপে ধারণ করা যায় না। কৃষ্ণরূপে জীবে যাহাতে তাঁহাকে ধারণা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করাই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের

উদ্দেশ্য। আমরা এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব—চৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর, নব কিশোর নটবর,
নর লীলার হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, শুদ্ধ সত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে
এইরূপ রতন, ভক্ত জনের গূঢ় ধন
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে।"

অন্যত্র বলিয়াছেন,

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিত কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,

"অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে।"

কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এই কৃষ্ণ তত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্তিই জীবের চরম অধিকার। এই অধিকার লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তি কি তাহা জানা দরকার এই জন্য ব্যাস-নারদ সংবাদ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

চাষার চিন্তা।
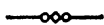
উপক্রমণিকা।

মহাশয়!

আপনারা আমাকে চিনেন কি? আমার নাম শ্রীনদের চাঁদ মণ্ডল। আমাকে যে যাচিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না "তোমার নাম কি" তাহা জানি।

চীৎকার করিয়া নিজের পরিচয় নিজে না দিলে, কেহ কাহারও কথা জিজ্ঞাসা করে না। নিজে যেচে নিজের পরিচয় দেওয়া, নিজের কথা নিজে বলা, আজকাল কার নিয়ম। "ওগো আমায় দেখ গো" এ কথা আজকাল সকলে বলিতেছে। বড় বড় বাড়ীতে বাড়ীর কর্ত্তা নিজের নাম ছাপাইয়া রাখিয়াছেন দেখিয়াছি। খবরের কাগজের অতি অল্প স্থানেই খবর থাকে, অন্যান্য স্থানের মেলা হিজি-বিজি লেখা বলে—"আমায় দেখ গো," ওইযে একটি বাবু বেশ টেরিটি কেটে—শাল গায়ে দিয়ে বেড়াইতেছেন উনিও বলিতেছেন "আমায় দেখ গো," আর ঐ যে লেখক মণ্ডলী কাগজে লিখিতেছেন বই ছাপাইতেছেন উহাঁরাও বলিতেছেন "আমায় দেখ গো"।

সুতরাং আমিও যদি ঐ দলের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলি "আমায় দেখ গো" তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ কিছুই হইবে না। তাই আমি "আমাদিগকে দেখ গো" বলিবার জন্য আসিয়াছি। তবে একটু তফাৎ আছে। সকলে বলে "আমায় দেখ গো" তাহাদিগকে দেখিবার জন্য, তাহাদের বাহাদুরী দেখিবার জন্য। আর আমি বলিতেছি—"আমাদিগকে দেখ গো" সাধারণের করুণা উদ্রেকের জন্য। সকলে দেখায় আপনার অট্টালিকা, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, মান আর আমি দেখাইতে চাহি আমার দীনতা, ভাঙ্গা কুঁড়ে ও কষ্ট।

কিন্তু এ সব কথা বলিবার আগে আমার সমগ্র পরিচয়টা দিই। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু স্থির হইয়া শুনুন। আপনাদের অবসর কম কিন্তু কাজ করিতে করিতে একবার কাণটা এদিকে দিলে, আমার কিছু উপকার করা হয়। আপনাদের করুণা আছে, দয়া আছে তাহা জানি। দয়া করিতে চান তাহাও জানি। কিন্তু কোন্ বিষয়ে আমাদের কি পরিমান উপকার করিতে পারেন, আমাদের প্রকৃত অভাব কি অভিযোগ কি, তাহা আপনারা

জানেন না সেইজন্য কাতরস্বরে সকলের নিকট প্রার্থনা, একটু স্থির হইয়া আমার কথা দুইটা শুনুন।

আমি চাষার ছেলে। চাষার ঘরে জন্মাইয়া আজন্ম খাটিতেই প্রাণটা গিয়াছে। সুতরাং লেখাপড়া কিছুই শেখা হয় নাই। গ্রামের দাদা মহাশয়ের পাঠশালে গণেশাগুড়ি হইতে শুভঙ্করের অস্থায়ী পঞ্চক অবধি শেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ কালকার বাবু ভাইদের ছেলে-পিলের মত লেখা-পড়াও শেখা হয় নাই। আমি কেবল নিজের চেষ্টায় সামান্য ২।৪ খানি কেতাব পড়িয়াছি মাত্র। সুতরাং আমি যে, মূর্খ একথা সকলেই বুঝিয়া থাকিবেন। আমার বয়স এখন প্রায় ৫০ বৎসর। অল্প বয়সে আমার পিতা আমার বিবাহ দেন। সংসারে আমার পোষ্য অনেকগুলি। ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিতে হইয়াছে। কিন্তু আয় আমার অত্যন্ত কম। অতি কষ্টে কায় ক্লেশে দিন গুজরান হয়, বিবাহাদি নানা কারণে দেনা হইয়া পড়িয়াছে।

(মহাশয়! ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। ছোটলোকের ছোটকথা আপনাদিগকে শুনিতেই হইবে)।

ফলতঃ আমার অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সংসার আমার পক্ষে অচল হইয়াছে। আমার মরণ হইলে খোলসা পাই। লোকে কিন্তু আমাদিগকে সুখী মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সুখী নহি। রাজা, মহাজন, নেতা প্রতিপালক সকলেই আমাদের সুখের অন্তরায়। আপনারা আমাদিগকে সুখ দিতে পারেন নাকি? আপনারা আমাদের দুঃখ কি তাহা জানিতে পারেন না। কেহ কখন জানিতে চেষ্টাও করেন না। আমাদের কথা আপনারা ভাবেন না। আমাদের সঙ্গে আপনাদের সহানুভূতি নাই। আপনাদিগের নিকট আমরা তুচ্ছ, হেয়, ঘৃণ্য। চাষা শব্দটা আপনাদের নিকট একটা গালি মাত্র। যেন চাষা হওয়া একটা বড় অপরাধ।

আপনাদের মনের ভাব যখন এমন তখন আপনাদের নিকট আমার এ রোদন অরণ্যে রোদন হইবে নাত? আপনারা কি আমার এই কদক্ষর সম্বলিত লেখাটা শুনিবেন? বোধ হয় অনেকেই শুনিবেন না। যাহারা শুনিবেন তাঁহারাও শুনিবেন আর গালি দিবেন।

আমার কিন্তু এ সকল ভাবিলে চলিতেছে না যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন ভাবিলে কি হইবে? একটা কথা বলিয়া রাখি। আমার লেখাতে চিন্তার গভীরতা নাই শৃঙ্খলা নাই। আমার চিন্তা অমার্জ্জিত, অদূরগামী

এ সকল ত্রুটি সত্বেও মনের কথা লিখিলাম। সুবিজ্ঞ জন ইহা শুনিয়া বঙ্গীয় চাষার অবস্থা ভাবিবেন এবং আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবার ও অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করিবেন এই ভরসা।

হিন্দুর ঘরে জন্ম লইয়া সমাজের কথা আমরা ভুলিতে পারি না। হিন্দুর ধর্ম্মে আস্থা দেশ বিখ্যাত। শয়ন ভোজন উপবেশন প্রভৃতি যাহা কিছু করি ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধা আছি। সমাজ আমাদিগকে ওতঃপ্রোতভাবে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

আমার মনে হয় কি যে আমাদিগকে লইয়াই সমাজ। সমাজের শক্তি আমরাই। কেবল সমাজ কেন? আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র-শক্তির সমষ্টি লইয়া এই বিশাল মানব জাতির মানবত্ব পরিস্ফুট হইতেছে। ঐ যে রাজা রাজত্ব করিতেছেন, ঐ যে ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছেন ঐ যে উকিল ওকালতি করিতেছেন, যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সকল গুলিই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আমাদেরই শক্তি সামর্থ্য ও অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আছি বলিয়া উহারা আছে। আমরা না থাকিলে উহারা থাকিত না। কিন্তু উহাদের এমনই ব্যবহার যে যেন উহারা মনে করে যে, উহাদের একটা নিজের স্বাতন্ত্র্য আছে। উহারা এত বড় একটা সত্যকে, এত বড় একটা পদার্থকে সর্ব্বদাই যেন উপেক্ষা করে; আমাদিগকে যেন উহারা দেখিতেই পায় না। তাহার ফলে হয় কি? উহারা যে কাজ করে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি ও পরিসমাপ্তি দেখিতে পায় না!

আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়, নেতা, ধর্ম্ম-প্রচারক, সাহিত্যিক যাহাকেই দেখি, যাঁহারই কথা শুনি সকলেই বলিতেছেন যে তাঁহারা একটা ধ্রুব সত্যের দিকে যাইতেছেন। কিন্তু সেই সত্যটা প্রকৃতই ধ্রুব না খেয়াল? ধ্রুব বিষয়ের লক্ষণ কি এইরূপ? তাহা কি মধ্যস্থানে ভাঙ্গিয়া যায়? নষ্ট হইয়া যায়? ধ্রুব যাহা তাহা চিরকাল অটুট থাকিবে। বিশ্ব ধ্বংশ হইবে, ধ্রুব সত্যের ধ্বংশ নাই। তাই বলি তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যের ধ্রুবত্ব লইয়া আমাদের বড় সন্দেহ হয়।

তাঁহাদের উপর আমাদের অবিশ্বাসও কম নহে। তাঁহাদের চাল চলন হাব ভাব সবই আমরা সন্দেহের চক্ষুতে দেখি, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে হৃদয়ের অভাব দেখি, সদিচ্ছার অভাব দেখি। পরন্তু আমরা দেখি যে এই বক্তৃতার পশ্চাতে এই ছুটো ছুটির পশ্চাতে, এই তথাকথিত কার্য্য

তৎপরতার পশ্চাতে, যেন কি একটা জিনিষ রহিয়াছে যাহার ফলে এই বক্তৃতা, এই ছুটোছুটি, এই কার্য্য তৎপরতা বেশ জমিয়া উঠিতেছেনা। বঙ্গের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস পড়িলে কি দেখিতে পাই? কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন কি? বঙ্গের একটি এমন মহাপ্রাণকে যিনি পৃথিবীর আর আর সকল পরিত্যাগ করিয়া একটী বিরাট বিশাল ধ্রুব সত্যের আশ্রয় লইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য পাগল হইয়াছেন, ধর্ম্ম, জাতীয় উন্নতি, শিক্ষা, যে বিষয় লইয়াই দেখুন, বঙ্গমন কেবল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াইতেছে। এখানে একবার হাত দিয়াছে, সেটা ২।৪ বার নাড়িয়াছে আর বলিয়াছে এমন আর হয় না। কিছুদিন পরে সেটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা লইয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্ম্মমত লইয়া এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এই বাঙ্গালীর নিকট এককালে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের আদর ছিল। পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর বাড়িয়াছিল আজকাল থিওসপি আসিয়া পড়িয়াছে। পরে কি হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু মজা এই, যখন যেটাই হাতে পড়িয়াছে তখন সেইটীকেই বলিয়াছে এমন আর হয় না।

আমার চিন্তা ক্ষুদ্র চাষার চিন্তা। সুতরাং এই চিন্তার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না এই ক্ষুদ্র চিন্তায় দুটো ক্ষুদ্র কথা বলিতে ইচ্ছা করে।

আমার মনে হয় কি যে পৃথিবীর সকল কার্য্যে, সকল বিষয়ে এক অনন্ত অভ্রান্ত সত্যের কতক অংশ নিহিত আছে। তবে বাঙ্গালীর মধ্যে সহৃদয় কর্ম্মীর অভাবে, তাঁহাদের হৃদয়ের উদারতার অভাবে এবং বাঙ্গালী প্রকৃত কর্ম্মপথ না জানায় সেই অভ্রান্ত সত্যের উন্মেষ দূরে থাকুক ভ্রান্তি ও অহঙ্কার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।

আর ঠিকই যদি হয় তাঁহাদের এই কর্ম্মপথ, সত্যই যদি হয় তাঁহাদের সহৃদয়তা, উচ্চই যদি হয় তাঁহাদের কর্ম্ম-কুশলতা, তাহাতে আমাদের কি? আমরা তাঁহাদের এই চেষ্টার সঙ্গে যোগ দিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমরা বুঝিতে পারি না ইহাতে জগতের কোন্ বিপুল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। যদি জগতের সকল কার্য্য এক অজ্ঞাত অচ্ছেদ্য নিয়মে সাধিত হয়, যদি সময় নিজের অভাব নিজেই পূরণ করিয়া লয়, যদি সমাজ ও মানব চরিত্র নিজের অভাব মত নিজেই গঠিত হয় তাহা হইলে আমরা নাই বা করিলাম তাঁহাদের উপদিষ্ট কার্য্য সকল, নাই বা মাতিলাম তাঁহাদের সঙ্গে। যদি তাঁহাদের কার্য্যে কিছু চিরন্তন সত্যের ছায়া থাকে, আমাদের কার্য্যে কি তাহা থাকিবে না?

আমরা ধর্ম্ম জানি না, বক্তৃতা জানি না, কথকতা জানি না, বিজ্ঞান ও সাহিত্য জানি না, জানি না তাঁহাদের বেন্থাম্ ও মিল্‌কে, জানি না ঈশ্বর, বেদ ও পুরাণে, জানি কেবল আমাদের বাপ দাদা, আমাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ যাহা করিয়াগিয়াছেন। আমরা কিছু ভাবি না ভাবিতে চেষ্টাও করি না।

আমরা জানি দুর্গা কালিকার পূজা করিতে হয়। হরি হরি বলে ডাকতে হয়, বামুন এলে প্রণাম করিতে হয়, গরীব দুঃখীকে সেবা যত্ন করিতে হয়, বর্ষা এলেই চাষ করিতে হয়, ক্ষুধা পেলেই খেতে হয়। যদি তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু মিলে তাহা হইলে আমরা আমাদের অভীষ্ট কি তাহা না জানিয়াও কি পাইব না? অনন্তের নিকট হইতে ৫ ও ৫০০ যখন সমদূরবর্ত্তী তখন আমরা আর তাঁহারা বিশেষ তফাৎ কি? যদি সমদর্শী কেহ তাঁহাদের ও আমাদের নিয়ন্তা থাকেন, তবে তাঁহাদের ও আমাদের স্থান তিনি কোথাও স্থির রাখিয়াছেন। পরন্তু ঈশ্বরের নিকট বেশী আমরা।

তাঁহারা দূরে। এই দূরত্ব তাঁহাদের যত বেশী বেশী বলিয়া মনে হয় ততই তাঁহারা ঈশ্বর ও তাঁহাদের মধ্যে সম্বন্ধরজ্জু পাকের পর পাক দিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সদাই ভয় কখন বা তাঁহারা দড়ি ছিঁড়ে সরে পড়েন। সেই জন্য তাঁহাদের মুখে যত ধর্ম্ম ধর্ম্ম শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের মুখে তত নহে।

আমরা আমাদের জাতির আচার ব্যবহার রীতিনীতি লইয়া যে সুখে আছি তাহার অপেক্ষা অধিক সুখ চাহিনা। আমাদের মধ্যে হিংসা নাই—ঘৃণা নাই, গর্ব্ব নাই। তাঁহারা গর্ব্বে কাহাকেও গরীব, কাহাকে বড় লোক ভাবেন। কাহাকেও মূর্খ, কাহাকে জ্ঞানী ভাবেন। তাঁহাদের চক্ষুতে উচ্চ নীচ বড় ছোট আছে, আর আমাদের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি বিহীন চক্ষুতে সব সমান। আমরা নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিয়া আসি মাত্র। এই বিশাল দেহ হিন্দু সমাজ, আমাদিগকে স্থান দিয়া আমাদিগকে বুকে রাখিয়া এতদিন সমভাবে চলিতেছে। কত সাম্রাজ্য, কত সমাজ, কত ধর্ম্মমত ধ্বংশ হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের ধ্বংশ নাই। ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম, সকলকেই আপনার করিয়া লইতে জানে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ হয়ত বলিবেন, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ যেরূপভাবে চলিতেছে এরূপভাবে চলিলে আর থাকিবে না। কেন? তখন কি ছিল? এখন কি নাই?

এই শিক্ষিত সমাজ লইয়াই আমাদের যত গোল। তাঁহারা যদি তাঁহাদের

শিক্ষাটীকে বেশ মাৰ্জ্জিত করিয়া একটী মত ও পথ স্থির করিয়া আমাদের নিকট আসেন ত ভাল হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাম্যবাদ দেখিয়া মনে হয় তাহারা কি মূর্খ। মনে ইহাদের সাম্য একবারে নাই। তাঁহারা হয়তো পিতা ও পুত্রকে সাম্যবাদের দোহাই দিয়া এক করিতে চেষ্টা করিবেন কিন্তু যশের বেলায় ইহারা অসম, টাকার বেলায় ইহারা অসম।

তাই বলি হে শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ! হে কৰ্ম্মকুশল মহারথী বৃন্দ! হে নেতৃ-বৃন্দ! এই ক্ষুদ্রদের দিকে তাকাইয়া একটুকু সংযত হউন। আমরা শিখিতে চাহি। আমাদিগকে শিক্ষা দেন। (অত অংবং বুঝিতে পারি না) আপনারা কৰ্ম্ম করিয়া আমাদিগকে কৰ্ম্ম শিক্ষা দেন। আর আমাদিগকে ভালবাসুন। সুধু মুখে নহে, মনে। গুরু শিষ্যের মধ্যে ঘৃণা থাকিলে শিক্ষা অসম্ভব।

আজকাল একটা কথা শুনিতে পাই। কথাটী এই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি, সমস্ত সমাজ, সমস্ত সম্প্রদায় এত বেগে অগ্রসর হইতেছে যে, আমরা যদি তাহাদের সহিত আমাদের পদ সমভাবে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারি তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত পিছাইয়া পড়িব। এত পিছাইয়া পড়িব যে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো জগতের চক্ষুতে আমাদের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইবে না। কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অগ্রসর হইতেছে কোন দিকে? জ্ঞানের দিকে? উন্নতির দিকে? জগতের জ্ঞানমার্গ—কৰ্ম্মমার্গ—সবই কি চক্রাকার নহে? পথ অজ্ঞানতা হইতে অনন্ত জ্ঞানতা পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং তথা হইতে পুনরায় অজ্ঞানতাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই মার্গ চক্রে ভ্রমণ করিবার আকাঙ্ক্ষা কি আকাঙ্ক্ষার বস্তু। আমার ত মনে হয় যে এই চক্রের বাহিরে এই চক্রনেমির উপরে যে স্থান সেই স্থান বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এই জগতের যে বৰ্ত্তমান উন্নতি তাহাতে আমার সহানুভূতি নাই হিন্দুর শিক্ষা, আমার জাতীয় শিক্ষা, স্বভাবের শিক্ষা আমাকে এই চক্রনেমির উপরে আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। তবে এ বিষয়ে একটী কথা আছে। হিন্দুর শিক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়ের, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয়ের, কিন্তু স্থূল বিষয়ের শিক্ষা না হইলে সূক্ষ্ম বিষয়ের শিক্ষার উপায় নাই। সুতরাং স্থূল শিক্ষা আদৌ গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু স্থূল বিষয় শিক্ষার স্থান পাই না।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এক কুটুম্ব বাড়ী যাওয়ার দরকার হয়। ষ্টেশন হইতে—বাড়ী—৮।৯ ক্রোশ। এই সমস্ত রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া ভোরে ষ্টেশনে পৌছিলাম। আসিয়াই দেখিলাম গাড়ী আগত-

প্রায়। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলাম। দেখিলাম অধিকাংশ গাড়ী পরিপূর্ণ। একটি গাড়ীতে অপেক্ষাকৃত ভিড় কম দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলাম। কিন্তু কুঠারীর মধ্যস্থ জন কয়েক বালক গাড়ীর দরজা চাপিয়া ধরিয়া থাকিল। আমার দীন বেশ দেখিয়া তাহারা ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিল। একে রাত্রি জাগরণ তাহাতে আবার পথশ্রান্ত। তাহাদের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া পার্শ্বের কুঠারীতে উঠিলাম। অতি কষ্টে একটু স্থান করিয়া বসিয়া পড়িলাম; এবং ঔৎসুক্য সহকারে পার্শ্বের কুঠারী পানে তাকাইয়া দেখিলাম।

দেখিলাম কয়েকটী বালক, একটিও ১৫ বৎসরের অধিক নহে, সবগুলিই স্কুলের পড়ো, বেশ পোষাক করিয়া বসিয়া, ভোর হইতেই পান চিবাইতেছে, সিগারেট টানিতেছে এবং টপ্পা গাহিতেছে। শুনিলাম ষ্টেশনের নিকট একস্থানে খেমটা নাচ হইয়াছে। সেই নাচ দেখিতে (দেখিতে না শুনিতে) ইহারা পরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে আসিয়াছে। এখন নাচ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের গান, গল্প, হাব ভাব দেখিয়া আমার বড়ই লজ্জা হইতে ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মস্তিস্ক আলোড়িত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম ইহারা কি পাশবভাবে পরিপূর্ণ। আমি ক্লান্ত, নিদ্রাতুর পথিক, আমার অবস্থা ইহারা ভাবিল না। তা মরুকগে, আমার অবস্থা না হয় নাই ভাবিল। ইহাদের কি হইতেছে? ইহারা কি বিদ্যালয়ে ইহাই শিক্ষা করিতেছে। এই যদি শিক্ষা হয় তবে সে শিক্ষাকে নমস্কার। এই তো আধুনিক শিক্ষা! এই শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য নাই, নৈতিক উন্নতি নাই। ইহারা অর্থের জন্য শিক্ষা করিতেছে, শিক্ষার জন্য শিক্ষা করে না। ইহারাই আবার একদিন শিক্ষকতা করিবে। ইহারা উকিল হইয়া বক্তৃতাবাজ হইবে। তাহা হইবে না ত আর কি হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছি যে, ইহারা যেন উকিল হয়, বক্তৃতাবাজ হয়, ধর্ম্ম প্রচারক হয়।

সেইদিন তাহাদের তাৎকালিক ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে আমার একটি কথা মনে পড়িল। এক গ্রামে কতকগুলি কৃষক পরিবারের বাস। সেই গ্রামের দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। গ্রামের মধ্য হইতে দেখিলে মনে হয় যে, দূরে কতকগুলি পাথরের উপর একটি মানুষ বসিয়া আছে। গ্রামস্থ লোকের বিশ্বাস ছিল যে সেই প্রস্তরময় নরমূর্ত্তি সেই দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা। তাহাদের ধারণা ছিল যে, ইহার পর সেই দেশে

একজন মানব ঠিক ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির মত আকৃতি লইয়া জন্মাইবে। তাহার দ্বারা তাহাদের দুঃখ দুরদৃষ্ট দূর হইবে। এক কৃষক-বালক অতি শৈশবে বৃদ্ধ পিতামহের ক্রোড়ে বসিয়া ঐ কথা শুনে। সেই অবধি বালক বিস্মিত-নেত্রে উৎসুকভাবে প্রস্তরমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। বালক যৌবনে পদার্পণ করিল। দিন কাটিয়া যাইল, কিন্তু প্রস্তরনর আসিল না। কত উদ্বেগ, কত অশান্তি বালকের হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল। অবশেষে একদিন সেই বালক দেখিল যে, দেশে মহা হুলুস্থুল ধুম-ধাম পড়িয়া গিয়াছে। দেশে তখন রাজ সেনাপতি আসিয়া ছিল। লোকে বলিতেছিল প্রস্তরনর আসিয়াছেন। বালক কৌতূহলী হইয়া দেখিতে গেল, কিন্তু বড় দুঃখে ফিরিয়া আসিল। দেখিল প্রস্তরনর আসে নাই। এইরূপে রাজমন্ত্রী, যুবরাজ ও রাজা আসিলেন; কিন্তু বালকের আশা পুরিল না। প্রত্যেক বারই বালক প্রস্তরনরের আগমন-বার্ত্তা শুনে, প্রত্যেক বারই হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

এদিকে বালক যৌবন ছাড়াইয়া প্রৌঢ়ত্ব ও পরে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। কত লোক, কত রথী, কত দিগ্‌গজ তাহার নিকটে আসে, তাহার নিকট কত শিক্ষা, কত রাজনীতি, কত সমাজনীতি শিখিয়া যায়, আর জানিয়া যায় প্রস্তরনর আসিয়াছে কি না? কিন্তু প্রস্তরনর আসিল না। অবশেষে বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। দেশে লোকে বুঝিল একটি ইন্দ্র পতন হইয়াছে। সকলের মুখে বিষাদ চিহ্ন। সকলেই বলিতে লাগিল প্রস্তরনর আসিয়াছিল চলিয়া গিয়াছে। সেই তরল মতি বালক যে একদিন একটি সুমধুর প্রভাতে স্বভাবের সেই বিরাট বিপুল দৃশ্যটি তন্ময় চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সংসারের, সমাজের, মানব চিত্তের, অন্য কোনও বিষয় না শিখিয়া সেই চির করুণ প্রকৃতি সুন্দরীর নিকট শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই বাস্তবিকই প্রস্তরনরের উপযুক্ত ব্যক্তি। প্রস্তরনরের বিশাল ললাটে যাহা লেখা ছিল, প্রস্তরনরের বৃহৎ ভীষণ চক্ষু যাহা প্রকাশ করিতেছিল সেই বালক সেই সমস্তই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। এবং অনেককে দিয়া গিয়াছিল। রাজা ও মহারাজা তাহার তুলনায় নগণ্য।

এই তো শিক্ষা! এ শিক্ষায় আমি আমার পুত্র-কন্যাগণকে দিতে চাহি। কেতাব পড়ে কিছুই হয় না। বিদ্যালয়ে গিয়ে কিছু হয় না। কেবল স্বাস্থ্য খারাপ হয় মাত্র। যাহারা চাকুরী চায়, যাহারা শূন্যগর্ভ কথার মালা গাঁথিয়া

নাম এবং অর্থ চায়, তাহারা সে শিক্ষালাভ করিবে—আমরা নহি। সে শিক্ষা বড় ব্যয়সাধ্য। সে সাধ্যও আমার নাই। সেই জন্য আমি আমার কন্যাদিগকে সর্ব্বদা গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রাখি, এবং পুত্রদিগকে চাষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা সুন্দর সবল দেহ প্রাপ্ত হইবে। স্বভাবের শীত, উষ্ণ জল হাওয়াতে সহিষ্ণু হইবে।

প্রখর রৌদ্রে বটগাছের নিম্নে বসিয়া পাঁচনি হস্তে "তারে নারে" গাহিবে আর মধ্যে মধ্যে "গরুতে ধান খেলেরে" বলে হাঁক দিবে। তাহাতে যে সুখ, বার্ক মেকলের বক্তৃতারাশিতে কি সে সুখ আছে? সুতরাং আমি ছেলেদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইব না। তাহারা সূর্য্যোদয়ের মহা গরীয়ান দৃশ্য, শস্যশীর্ষের সহিত বায়ুহিল্লোলের কৌতুক-ক্রীড়া ও পাখীর আনন্দ কাকলী প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষার মত শিক্ষা লাভ করিবে। আর অন্তঃপুরে থাকিয়া মেয়েরা শিখিবে স্নেহ, ভক্তি, প্রেম আর ভালবাসা।

তাই বলিয়া কি ছেলেরা পুঁথিগত বিদ্যা শিখিবে না! তাহা শিখিতে হইবে। সংসারে থাকিতে হইলে অন্ততঃ কিছু শিখিতে হইবে। জমিদারের রসিদটি দেখিতে শেখা চাই। সামান্য অঙ্ক শেখা দরকার। কিন্তু সে শিক্ষা বড় ব্যয়সাধ্য। সেই শিক্ষার যদি কোন উপায় করিয়া দেন তাহা হইলে আমি ভগবানের নিকটে আপনাদের মঙ্গল কামনা করিব। আর যদি উচ্চ শিক্ষা দেওয়াই দরকার বিবেচনা করেন তাহা হইলে এমন শিক্ষা দেন যাহাতে আত্মসংযম ও অহঙ্কারপরিশূন্যতা আসে। অল্প বয়সে জ্যেঠা হওয়া অপেক্ষা মুর্খতা অনেক ভাল। এমন শিক্ষা দিউন যে শিক্ষা পাইলে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে; এমন শিক্ষা দিবেন যে শিক্ষাতে ইহকালে সুখ ও পরকালে নির্ব্বাণ পাওয়া যায়। এমন শিক্ষা দেন যে শিক্ষার ফলে দেশে আবার ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তি জাগিয়া উঠে; এবং দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। বড় বড় কথা অপেক্ষা ছোট ছোট কাজ অনেক ভাল।

শ্রীনদের চাঁদ মণ্ডল।
সাকিম হাণ্ডিয়া।

ব্যাকুলতা।

(গল্প)

এক রাজা একবার আপন পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ ক'রে শেষ জীবন ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত ক'রতে মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক মনোরম তপোবন প্রস্তুত করেন, এবং নিজের গুরুদেবের সঙ্গে সেখানে প্রত্যহ বৈকাল বেলায় ঈশ্বরের আরাধনা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রতেন।

এই ভাবে অনেক দিন কেটে গেল। দিন দিন ধর্ম্ম প্রসঙ্গে এবং ঈশ্বরের আরাধনায় রাজার রাজ্য ধন আত্মীয় স্বজনের প্রতি মায়া অনেক পরিমাণে শিথিল হ'য়ে পড়ল।

রাজার ধারণা ছিল যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়। কিন্তু তিনি দেখলেন যে এত দিন পর্য্যন্ত শাস্ত্র চর্চ্চা ক'রলেও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হ'ল না। ক্রমে নিজের মানসিক দুর্ব্বলতার কথা বার বার স্মরণ ক'রতে ক'রতে তার মনে অশান্তি উপস্থিত হ'ল—সমস্ত শুভ উদ্যম ব্যর্থ হ'তে চল্‌ল।

এই সময় একদিন তাঁর গুরুদেব সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন ক'রে বসে আছেন এমন সময় রাজা তাঁর কাছে বিষণ্ণ চিত্তে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজন, আজ তোমায় এত দুঃখিত দেখি কেন? তোমার ত দুঃখের কোন কারণ নাই। তুমি রাজ্যের গুরুভার সুযোগ্য পুত্রের হাতে অর্পণ ক'রে আনন্দময়ের চিন্তায় দিন অতিবাহিত ক'রছ। তুমি এত বিষণ্ণ কেন?" এই কথা শুনে রাজা বল্‌লেন, "গুরুদেব আমার প্রতি আপনার কৃপা অসীম, তজ্জন্য আমার কোন দুঃখের কারণ না থাকবারই সম্ভাবনা। কিন্তু কয়েক দিন হ'তে একটী প্রশ্ন মনে উদিত হ'য়ে, আমার মনকে ব্যথিত ক'রে তুলেছে। দেখুন রাজা পরীক্ষিত সাত দিন ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রেছিলেন, তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি ক'রে স্বর্গীয় শান্তি লাভ ক'রেছিলেন। কিন্তু আমি এতদিন পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ ক'রেছি কই আমার মনের মালিন্য ত দূরে গেল না?"

গুরুদেব বল্লেন, "মহারাজ, তোমার প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। আমি

একমাস পরে এর প্রকৃত উত্তর দেব।” কিন্তু তিনি একমাস পরে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পার্‌লেন না। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হ’য়ে বল্লেন, “আপনাকে আর তিন দিনের সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চাই—অপারগ হলে আপনাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ’তে হবে।”

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হয়ে পড়লেন এবং ব্যাকুল চিত্তে, বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ ক’রতে বাড়ী গেলেন। কেহই তাঁর প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারলেন না।

এই ব্রাহ্মণের এক বিধবা কন্যা ছিল। এই কন্যাটী অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী ছিলেন। তিনি পিতার দুরবস্থার কারণ জান্‌তে পেরে পিতাকে বললেন, “বাবা, এর জন্য কেন আপনি অকারণ ভাব্‌ছেন। আমিই এর প্রকৃত উত্তর রাজাকে দেব।”

নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ আপনার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজার নিকট গেলেন।

ব্রাহ্মণকন্যা সেখানে গিয়ে রাজাকে এবং তাঁর পিতাকে বল্লেন, “আপনারা কৃপা ক’রে আমি যা বলি তাই করুন। আমার কথা মত কাজ করলেই আমি আপনার প্রশ্নের সদুত্তর দেব।” এই কথা শুনে তাঁরা উভয়েই কৌতূহলাবিষ্ট হ’য়ে এই কন্যার অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হ’লেন। তখন কন্যা বল্‌লেন, “আমি আপনাদের দুজনকেই সম্মুখস্থ বৃক্ষের দুই শাখায় বন্ধন ক’রব, আমার অপরাধ নেবেন না।” তারপর ব্রাহ্মণকন্যা উভয়কেই বৃক্ষশাখায় বন্ধন করলেন এবং রাজাকে একখানি তরবারি দিয়ে বল্লেন, “আপনি নিজে আপনার বন্ধন ছেদন ক’রে মুক্ত হ’ন।” রাজা বল্লেন, “তা কি ক’রে হবে? আমিই বদ্ধ; আমি কি ক’রে আমাকে মুক্ত করব?” তখন ঐ কন্যাটী আবার তাঁর পিতাকে সেই তরবারি খানি দিয়ে তদ্দ্বারা রাজার বন্ধন মুক্ত ক’রতে বল্‌লেন। তখন ঐ রাজগুরু বল্‌লেন, “আমি যে নিজেই বদ্ধ। আমাকে কে মুক্ত ক’রবে তারই ঠিকানা নেই, আমি কি ক’রে রাজার বন্ধন মুক্ত ক’রব।

তখন সেই বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা যুক্তকরে বল্‌লেন, “দেখুন আপনারা উভয়েই সংসারজালে বদ্ধ। যে সংসারজালে বদ্ধ তার কাণে কি ক’রে মুক্তির বার্ত্তা পৌঁছিবে। কি উপায়ে আপনারা উভয়ে সংসারে আসক্ত হয়ে একে অপরকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবেন। রাজা পরীক্ষিত যে সাত দিন মাত্র ভাগবত শুনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক’রেছিলেন, তিনি ত কোন সংসারাসক্ত ব্যক্তির নিকট সংসার

কারাগারের বাইরে যাবার চাবি খুঁজতে যাননি। জীবন্মুক্ত পুরুষ শুকদেবই তাঁকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তিনি অত সহজে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রতে পেরেছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে গেলে তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে। মায়া বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তির নিকট গেলে কি হবে? মরুভূমি পার হ'তে গেলে নৌকার মাঝির কাছে গিয়া কি কোন ফল হয়? রাজন্, আমি আপনার ব্যাকুলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। ধৈর্য্য ধরুন, তিনি আপনিই আপনার অন্তরে এসে প্রকাশিত হবেন। রহস্যময় আপনি ধরা না দিলে কেউ কি আপনি তাকে পেতে পারে। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আশীর্ব্বাদ করি, তিনি আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত হ'ন।

এর পর রাজার ব্যাকুলতা ছিল কিন্তু কোন দিন অধৈর্য্য হননি। এবং অবশেষে ব্যাকুলতার সঙ্গে ধৈর্য্য মিশে গিয়ে তাঁকে অপূর্ব্ব শান্তি দিয়েছিল এবং তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধু ব্যাকুলতা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না তার সঙ্গে ধৈর্য্য বিশ্বাস ও নির্ভর চাই।

শ্রীলীলাগোপাল প্রসাদ।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১২।১, রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

বীরভূমি, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা,
চৈত্র, ১৩১৯

জীবন।

(১)

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি।"—

মুণ্ডকোপনিষৎ। ৩।১।৪।

"য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ, ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি।"—

প্রশ্নোপনিষৎ। ৩।১১।

"And God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul."—Genesis. 2. 7.

"আঁখা জীবা। বিসরে মরূজানা।"— নানক।

"বঁধু! আনের পরাণে, আনের অন্তরে, আমার পরাণ তুমি"—

জ্ঞানদাস।

"ত্বমসি মম জীবনং। ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।"—

জয়দেব। গীতগোবিন্দ। ১০।৪।

জীবন কি?

আমার যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদায়ের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, মূল্যবান ও আদরের সামগ্রীটাই আমার জীবন। সাধারণ সংস্কার এই যে, জীবন কাল সমুদ্রের একটি তরঙ্গ। গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ কালে বলেন,—"শতং জীব।"—জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত কাল মাত্রই

আমার জীবন, ইহাই সাধারণ সংস্কার। অর্থাৎ আমার জন্মকাল ১২৭৫ সাল ৫ই আশ্বিন রাত্রি সাড়ে বারটার সময় হইতে, এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত সময়কেই আমার জীবন বলা যাইতে পারে। এমন কি শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষৎ পর্য্যন্তও বলিয়াছেন,—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ সতং সমাঃ।"—ঈশ। ২। ব্রহ্মযোগে অসমর্থ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াই, ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক।

কালের একস্থান হইতে আর একস্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই জীবন। জড় জীবন,—পশু জীবন,—মনুষ্য জীবন,—কালের ব্যাপ্তি মাত্র। উহা মুহূর্ত্ত,—ক্ষণ,— পল,— দণ্ড,—প্রহর,— দিন,— পক্ষ,— মাস,— বর্ষ,— যুগ,— প্রভৃতির দ্বারা গণনা করা যায়।

জীবন যদি কেবল তাহাই হয়, তবে এত দুঃখ ক্লেশ,—এত রোদন,—এত হা হস্ত,—হা হতোস্মি'—এত চীৎকার বৃথাই বলিয়া মনে হয়। কেবল, কালের বক্ষে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি রেখার জন্য এত ক্লেশ,—এত যাতনা কেন? এই জীবন থাকিলেই বা লাভ কি? না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? জলের দাগের মত,—বালুকার উপর রেখার ন্যায়, কাল-তরঙ্গের এই রেখাটি মুছিয়া গেলেই বা এত রোদন কেন?

মানব জীবন কি প্রকারে উৎপন্ন হয়,—কি প্রকারে আরম্ভ হয় ও কি প্রকারে উন্নতি ও অবনতির পথে গমনাগমন করে, পরীক্ষা করিয়া ক্রমশঃ দেখা যাউক।

জীবের উৎপত্তি।

হিন্দু সাধকগণ সর্ব্বদাই দেহতত্বের গৌরব প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের এই পুণ্যভূমি,—শস্যশ্যামল;—পুণ্যতোয়া-জাহ্নবী-বিধৌত,—অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক-স্মৃতি-বিজড়িত, এবং আরও অপূর্ব্ব-ঐতিহাসিক-সম্ভাবনা-পরিপূর্ণ পবিত্র বঙ্গভূমির উপর দিয়া, সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের কতই প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে! সেই অমৃত-প্লাবনের অবশিষ্টাংশ-রূপ উচ্চ অধ্যাত্ম সাধনের ও জীবনের অনেক গূঢ় কথা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রবচনরূপে উত্তরাধিকার সত্বে চলিয়া আসিয়াছে। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গীতাবলির মধ্যে সেই সব কথা দেহ, ও তত্বের মহিমা, কঙ্কালীভূত হইয়া রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানের সাহায্যে দেখা যাউক যে, দেহতত্ত্বের মধ্যে জীবনের "থি" ধরিতে পারা যায় কি না।

দেহবিজ্ঞান বলেন যে একটি সূক্ষ্ম সূচিকার অগ্রভাগে যে অতীব অল্প পরিমাণ শুক্র থাকিতে পারে, সেই টুকুরই মধ্যে কোটী কোটী, অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে, দেহবিজ্ঞান উহাকে প্রটোপ্লাজম্ বলেন।

প্রকৃতির অদ্ভুত কৌশলে স্ত্রী ও পুরুষ জীবের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি অপূর্ব্ব ও অদৃশ্য টান রহিয়াছে। প্লেটোর সিম্পোসিয়ামে উহাকেই মহাত্মা সক্রেটাস্ প্রেম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রেম বা উহার নিকৃষ্ট সংস্করণ কামের টানে স্ত্রী ও পুরুষ দুই একত্র হইয়া, রতি ক্রীড়া হয়। এই রতি ক্রীড়ার মধ্যে, দুইটি দেহ, মন ও প্রাণ একীভূত হইলে, জীবের অত্যন্ত ও ক্ষণিক সুখানুভূতি হয়। ঐ সুখানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, পিতৃদেহ হইতে মাতৃদেহের অন্তরস্থ জরায়ুর মধ্যে শুক্রকণা সঞ্চারিত হয়। এবং এই কণাস্থিত একটি মাত্র জীবাণু মাতৃ-জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, রহিয়া যায়। এবং প্রকৃতির অতুলনীয় কৌশলে, ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া, প্রথমে লালা, তৎপরে মাংসপিণ্ড,—তৎপরে জীব বা নরনারী আকারে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ গতিশীল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন হইতে থাকে। অত্যন্ত সুখানুভূতির ভিতর দিয়া জীবের জন্ম হয়! "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসং-বিশন্তীতি।"—তৈত্তিরীয়ো-পনিষৎ। ৩।৬। আনন্দ হইতে জীবের সৃষ্টি,—জন্মিয়া আনন্দেই জীবন ধারণ করে, এবং মরণকালে আনন্দেই প্রত্যাগমন ও প্রবেশ করে।

পক্ষীর ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দেখিলেও, সেই একই প্রকার ক্রমবিকাশ তত্ত্বই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই প্রকারেই—মানবেরও জন্ম হয়। যতগুলি জীবাণু জরায়ুর মধ্যে জীবন্ত থাকিয়া যায়, ততগুলিই সন্তান আকার ধারণ করে।

ঐ জীবাণু নয় মাস দশ দিন জরায়ুর মধ্যে থাকিয়া, পরে পূর্ণাবয়ব শিশু হইলেই জরায়ুর মধ্য হইতে বহির্গত ও ভূমিষ্ঠ হয়। দেহবিজ্ঞান বলেন যে, মানব এই প্রকারেই জীবন লাভ করে। এই সমুদয় তত্ত্ব অতি বিস্ময়কর। এই অণু হইতেও সূক্ষ্মতর জীবাণু হইতে, মানবের জন্ম বলিয়াই কি, জড়ভাবাপন্ন মানবের এতই অহঙ্কার? কারণ, মূল নীচ হইলেই, দম্ভ অহঙ্কার অধিক হয়।

দেহ-বিজ্ঞান জীবনের সাধারণ সংস্কারকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে। সাধারণ মানবের হিসাবে ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত্ত হইতেই জীবন গণনা

হইতে থাকে। ইহা ত স্পষ্টই ভুল। কারণ ১২৭৫ সাল ৫ই আশ্বিন বলিলে ত আমার জীবন বা পরমায়ুর ঠিক গণনা হইল না। তাহার দশমাস পূর্ব্ব হইতেই মানবজীবনের আরম্ভ বলিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও আমি পিতৃশোণিতে ও তাহার পূর্ব্বে পিতামহ-দেহে লীলা করিয়াছি। পিতামহাদির দেহে পিতৃআত্মারূপে, তৎপূর্ব্বে প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীর দেহে,—পিতামহ আত্মা-রূপে আমি ছিলাম। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রকার ক্রমে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমি আছি।

সেই এক অদ্ভুত, অদৃষ্ট, অদৃশ্য শক্তির হস্ত, অপূর্ব্ব কৌশলে প্রতি ঘটে ঘটে, এই সমুদয় অনন্ত জীব-লীলা অভিনয় করিতেছেন। অতি সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ ও তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বুদ্ধির সাহায্যে, এই সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই জন্যই, বুঝি, জনশ্রুতি আছে যে, যোগেশ্বর মহাদেব শ্মশানে মশানে শবদেহ-তত্ত্বের অনুসন্ধানে ফিরিতেন। সেইজন্যই বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা শবদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্য লইয়া এতই ব্যস্ত। এই দেহতত্ত্বের বিজ্ঞান এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। নিত্য নব নব বিস্ময়কর দেহ তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বদেশ হইতে ইহার যে জ্যোতি পশ্চিমে গিয়াছে, তাহারি প্রতিবিম্বিত রাগ অন্ধকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পুনর্ব্বার পূর্ব্বদেশে প্রেরণ করিতেছেন। একটি সূচিকার অগ্রভাগে যে শুক্র, যে শোণিত থাকে, তাহাতে যখন কোটী কোটী জীবের জীবন রহিয়াছে,—তখন এক বিন্দুর মধ্য দিয়া কত অসংখ্য মানবের জন্ম হইতে পারে। এক বিন্দু শুক্র হইতেই একটি প্রকাণ্ড দেশের সমুদয় লোক সমূহের সৃষ্টি হইতে পারে। সেই জন্যই, বুঝি, তন্ত্রের শিব বাক্য মধ্যে বিন্দু ধারণের এত উপদেশ ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। বিন্দুর মধ্যে অনন্ত শক্তি-সিন্ধু রহিয়াছে। সেই জন্যই, ব্রহ্মচর্য্য এত গুণের এবং উপনিষদ শুক্রকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

জীবের ইচ্ছা ও চেষ্টাতে সন্তানের জীবন উৎপন্ন বা রক্ষা হয় না। সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতির ইচ্ছা কৌশলে জীবাণু সন্তানাকার ধারণ করে। প্রকৃতি নরনারী হৃদয়ে সন্তানলাভের ইচ্ছাকে,—সন্তানের প্রতি স্নেহকে, কতই প্রবল করিয়া দিয়াছেন। তাই সন্তান না হইলে, নরনারীর দেহ ধারণের সার্থকতা হয় না বলিয়াই বন্ধ্যা ও পুত্রহীনার এত আপশোষ, এত সন্তান কামনা। সন্তান-কামনা নরনারীর একটি প্রকৃতি-দত্ত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দ্বারা, এই প্রকার কৌশলেই, প্রকৃতি জীবপ্রবাহ রক্ষা করিতেছেন এবং তজ্জন্য স্ত্রী ও

পুরুষ জীবের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এতটা নিগূঢ় টান। স্ত্রী ও পুরুষ নিজের বা পরস্পরের সুখের জন্য লালায়িত। চতুরা প্রকৃতি, কিন্তু, আড়ালে দাঁড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে, কত সেয়ানামি করিয়া, নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন; কেহ তাহা বুঝিতে বা ধরিতে পারে না!

এক বিন্দু শুক্র মধ্যে, কোটী কোটী মানব, কোটী কোটী দিল্লীশ্বর, কোটী কোটী কালিদাস, সেক্সপীয়ার, হোমার বাল্মিকী;—কোটী কোটী বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, চৈতন্য থাকিতে পারেন। অদ্য, যে জড়কণা আমার চরণতলে লুণ্ঠিত, কল্য, সে এক বুদ্ধ হৃদয়ে বা সম্রাটের শিরোভাগে শোভা পাইতে পারে, সে দিন যে জড়কণা নেপোলিয়ান্ বাদসাহের মস্তিষ্কের ভিতর ছিল, অদ্য সে আমার চরণতল চুম্বনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের বলে দেখিতেছি; যে, প্রত্যেক অণু সজীব,—প্রত্যেক স্থাণু জীবন্ত,—প্রত্যেক অচল ঘন গহন ধ্যানমগ্ন।

প্রত্যেক অণু পরমাণুর জীবনের ইতিহাস অখণ্ড। প্রত্যেক অণুর সহিত এই বিশাল বিশ্বের কুটুম্বিতা,—ঘনিষ্ঠতা,—আত্মীয়তা! প্রত্যেক অণুর জীবন বিবর্ত্তন এক একটি অতীব বিস্ময়কর অনন্ত কাব্য,—মহাকাব্য! কে তাহা পাঠ করিতেছে? কে তাহা দেখিতেছে? কোন্ নিত্য জাগ্রত, অনলস চক্ষু উহা পর্য্যালোচনা করিতেছেন?

কে জড়কণাকে অচেতন বলে? উহা অচেতন নহে,—সচেতন—চিৎঘন,—ধ্যান-পরায়ণ! আমরা উহার ভাষা জানি না, বুঝি না, তাই উহাকে অকারণ, অজ্ঞতা বশতঃ অচেতন বলিয়া অবজ্ঞা করি।

আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও শক্তির সীমা দেখিতে পাই না। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, প্রত্যেক পরমাণুর জীবনে একটি অপূর্ব্ব, অনন্ত, অখণ্ড নাটকের অভিনয় মুদ্রিত রহিয়াছে। তত্ত্বদর্শী, বৈজ্ঞানিক—ঐতিহাসিক ও কবি তাহা পাঠ কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

৪।৩।১২। শিমলা, কলিকাতা।

ভাগবত ধর্ম্ম।

ব্যাস নারদ সংবাদ আলোচনায় অধ্যাত্মসাধনার পথের কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে প্রাচীন ও জীবন্মুক্ত গুরু সম্প্রদায় এখনও রহিয়াছেন। এ যুগেও তাঁহারা শিষ্য গ্রহণ করিতেছেন এবং অনেক উপযুক্ত লোক এখনও এই পথে প্রবেশ করিয়া পরমার্থ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই কথাটি যে কেবল হিন্দুশাস্ত্রের কথা তাহা নহে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই পথের, এই গুরু সম্প্রদায়ের ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভের প্রসঙ্গ আছে। প্রাচীন কাল হইতে সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যখন এই পথের কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন এ বিষয়ে আমাদের একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা উচিত।

এই পথের নাম দীক্ষার পথ। মানবকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে এই পথ আশ্রয় করিতে হইবে। রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই পথ তিনটি স্তরে বিভক্ত পরিদৃষ্ট হয় (১) The Path of Purification or Purgation (শুদ্ধি) (২) Illumination (আলোকপ্রাপ্তি) (৩) The Path of union with Divinity (ঈশ্বরের সহিত মিলন) মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সুফীদিগের মধ্যে এই পথের কথার বিশেষ প্রচার আছে। তাঁহারা বলেন পথ (The Way), সত্য (The Truth) ও জীবন (The Life) হিন্দু ধর্ম্ম ও তাহার শাখা বৌদ্ধধর্ম্মে এই পথের কথা আরও সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে মানবের স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব যত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে এমন আর অন্য কোথায়ও হয় নাই। যে নামে যে সম্প্রদায় এই পথের কথা বলুন না কেন, পথ একই। সকলকেই এক পথের পথিক হইতে হয়।

খৃষ্টীয় সাধনা শাস্ত্র অনুসারে শুদ্ধির পথই প্রথম। এই পথে কতকগুলি সদ্‌গুণের অনুশীলন প্রয়োজন। আলোক প্রাপ্তির পথকে পবিত্রতার পথও বলা হইয়া থাকে (The Path of Holiness.) এই পথ চারিটি স্তরে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তরে আরোহণ করিতে একটি একটি বিশেষ দীক্ষার প্রয়োজন। খৃষ্টান ধর্ম্মে Birth, Baptism, Transfiguration ও Passion এই চারিটি তাহাদের নাম। তৃতীয় পথ মুক্তি, নির্ব্বাণ বা পরাভক্তির পথ।

জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া মানব ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া, কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিতে করিতে এই পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এইবার আমরা নারদের সহিত ব্যাসদেবের যে কথোপকথন হয় তাহা আলোচনা করিলে পর ভাগবত ধর্ম্মের যাহা বিশেষত্ব তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

নারদ ব্যাসদেবকে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিলেন তুমি তোমার গ্রন্থাদিতে ধর্ম্ম ও অর্থাদির যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছ বাসুদেব ভগবানের মহিমা সেরূপ বর্ণনা কর নাই। অবশ্য বর্ণনা যে একেবারে কর নাই তাহা নহে কিন্তু প্রধান ভাবে কর নাই।

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি
যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
নৈস্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাব বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্য কারণং॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এ কয়টি অতি প্রসিদ্ধ শ্লোকের অর্থ নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে এ যুগের চিন্তা পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে কয়েকটি কথা আলোচনা করা উচিত। এই কয়েকটি কথা আলোচনা না করিলে হয় ভাগবত ধর্ম্মকে অশিক্ষিত ব্যক্তির আশ্রয়নীয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে, নতুবা বর্ত্তমান কালের জ্ঞান বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা কিন্তু এই উভয় ভাবকেই এক পরম সমন্বয়ে আনিতে পারা যায় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। এবং এই সমন্বয়ই প্রকৃত ভাগবত ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম সে কথাও উল্লেখ করিয়াছি।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ মানব চিন্তার ইতিহাসকে তিনটি

প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদের নাম—The Theological Age, The Metaphysical Age, The Positive Age. প্রথম যুগ ধর্ম্মের যুগ, দ্বিতীয় যুগ দর্শনের যুগ আর তৃতীয় যুগ বিজ্ঞানের বা প্রত্যক্ষবাদের যুগ। কোঁৎএর এই সুচিন্তিত গভীর কথাগুলি আমাদিগকে নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম শাস্ত্রের যুগ বলিতে তিনি মানবীয় চিন্তার সেই যুগ বা সেই স্তর বুঝেন, যে যুগে মানুষ কোন কার্য্যের কারণ নিরূপণ করিতে গেলে সমস্ত ঘটনাই কোন দেবতার ইচ্ছার দোহাই দিয়া ব্যাখ্যা করে, সেই যুগের নাম ধর্ম্ম শাস্ত্রের যুগ। বজ্রপাত হইতেছে, বিদ্যুৎ হইতেছে, ইহার কারণ কি? প্রথম যুগে মানুষ বলিল কোন শক্তিশালী লোক, যাহার ইচ্ছা আমাদের মত স্বাধীন সে খেলা করিয়াই হউক আর রাগ করিয়াই হউক অস্ত্রক্ষেপ করিতেছে। দ্বিতীয় যুগে বা দার্শনিক যুগে উত্তর করিল মেঘের ধর্ম্ম এই। আর বৈজ্ঞানিক যুগে, যাহার অন্যথা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না এবং যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী এই প্রকারের কারণ নির্ণয় করিয়া বলিল যে মেঘে এই প্রকারে বিদ্যুৎশক্তির সামঞ্জস্য বিহিত হয় এই সামঞ্জস্য বিধানেই বজ্র ও বিদ্যুতের উৎপত্তি।

'কোঁৎ'এর এই মত বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ববাদী সম্মত, তিনি যাহা বলিয়াছেন—তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে সমস্ত কার্য্যে ঐশশক্তি বা ঐ প্রকারের কোনও উন্নততর শক্তির দোহাই দেওয়া অপেক্ষাকৃত অবনত যুগের লক্ষণ। সুতরাং ভাগবত ধর্ম্মের ঠিক মর্ম্ম না বুঝিয়া যদ্যপি কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলির অর্থ বলেন তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের সাধনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইবে না।

কোঁৎ (Comte) যে বিভাগ করিয়াছেন, সেই বিভাগ তিনি যতদূর আলোচনা করিয়াছেন ততদূর সত্য। কিন্তু মানব সভ্যতার এইখানেই শেষ নহে। ঐ যে বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষবাদের যুগ, ঐ যুগের পর আবার ঈশ্বরবাদের যুগ ফিরিয়া আসে। প্রথম যুগের ঈশ্বরবাদ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য-সম্পন্ন নহে, কিন্তু এই যে দ্বিতীয় যুগের ঈশ্বরবাদ ইহা বৈজ্ঞানিক যুগের শেষ সফলতা। শ্রীমদ্ভাগবতের ঈশ্বরবাদ এই দ্বিতীয় যুগের ঈশ্বরবাদ, এই কথাটি এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখিলাম—পরে ইহা আলোচনা করা যাইবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হইতেছে এই কথা মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞানের পর

বলিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরস্ত করে না, পরন্তু উৎসাহিত করে কারণ প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ঈশ্বরবাদকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে ও উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশ করে। সুতরাং ভাগবত ধর্ম্মের যে ঈশ্বরবাদ বিজ্ঞানের উন্নতি বা মানবীয় সাধনার সহিত তাহার কোন বিরোধ নাই। এ কথাটি বলা প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞানের চর্চ্চার প্রথম যুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে, সেই বিরোধ এখনও চলিতেছে। যদি কখনও বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের এই বিরোধ অবসান হয় তাহা হইলে তাহা এই ভাগবত ধর্ম্ম বা বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারাই হইবে। আমাদের দেশে একদল প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ও সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন লোক আছেন, যাঁহারা ভক্তিমূলক ধর্ম্ম প্রচারের তত পক্ষপাতী নহেন। এই সমস্ত লোকের সরলতা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই, তাঁহারা মনে করেন ভক্তি-মূলক ধর্ম্মের প্রচার হইলে পর আমাদের দেশের জাতীয় জীবনে শিল্প বিজ্ঞান ইত্যাদির অনুশীলনের অভিমুখে যে একটা চেষ্টাশীলতা জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহার গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িবে। ভাগবত ধর্ম্মে যে ধর্ম্মের আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার বীজ আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই। ভাগবত ধর্ম্ম এই বেদান্ত ধর্ম্মেরই বিকশিত অবস্থা, এই ধর্ম্মে কিরূপ মহা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। এই উপাসনাই উচ্চতম অধিকারের উপাসনা। উপনিষদের এই আনন্দ-ব্রহ্মের উপাসনাই বৃন্দাবনে নন্দনন্দনের উপাসনা। উপনিষদে যাহার বীজ আছে ভাগবতে তাহা বৃক্ষ হইয়াছে।

বরুণের পুত্রের নাম ভৃগু। ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে বিশিষ্ট চিন্তনপ্রণালী, তাহা বলিয়া দিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান তো আর কেহ কাহাকেও দিতে পারেন না, যিনি গুরু তিনি ধ্যান ধারণার প্রণালী বা বীজমন্ত্র দিতে পারেন। কিন্তু শিষ্যকে তপস্যা দ্বারাই সেই বীজকে বৃক্ষ করিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

বরুণ বলিলেন যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মায়, জন্মের পর যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে শেষে আবার যাঁহাতে লয় পায়, চিন্তা কর, তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু কিছুদিন তপস্যা করিয়া তাঁহার পিতার নিকট আসিলেন

বলিলেন অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্নের সহিত পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি সব মিলিয়া যাইতেছে। বরুণ কিছুই বলিলেন না, আমরা হইলে হয়ত ভৃগুর সহিত তর্ক করিতাম, তাহাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম যে তাহার এই মত ভুল, কিন্তু একজনের মত ভুল ইহা যদি তাহাকে তর্ক বা যুক্তি-দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই কি সে তাহার মত ছাড়িয়া উন্নততর মত গ্রহণ করিতে পারে? বরুণ এ তত্ত্ব বুঝিতেন এবং তিনি আরও বুঝিতেন যে যিনি যে মতেই থাকুন, সেই মতের যেটুকু ভাল সেটুকু লইয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেওয়াই তাহার যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করা। এই প্রকারে নিজের যাহা সাধুমত তাহা লইয়া চিন্তা করা ও কার্য্য করার নামই তপস্যা। বরুণ ভৃগুকে অন্য কিছু না বলিয়া তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। ভৃগু আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কিছুদিন তপস্যার পর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতাকে বলিলেন প্রাণই ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্মের সমস্ত লক্ষণ প্রাণে রহিয়াছে। বরুণ ভৃগুকে অন্যকিছু না বলিয়া বলিলেন তপস্যা কর। আবার ভৃগু তপস্যা করিলেন, তপস্যার পর তাঁহার পিতাকে বলিলেন মনই ব্রহ্ম। তাঁহার পিতা আবার তপস্যা করিতে বলিলেন, পুনরায় তপস্যা করিয়া আসিয়া বলিলেন বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই ব্রহ্ম। এবারেও বরুণ তপস্যা করিতে বলিলেন। পুত্র তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

এই আনন্দ ব্রহ্মের উপাসনাই ভৃগুবারুণী বিদ্যার শেষ কথা, ভাগবত ধর্ম্মও এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। এইবার এই তত্ত্বটি মানবের জীবনগত ব্যবহারের মধ্য দিয়া আলোচনা করা যাউক।

যে ব্যক্তি লোভী ও ঔদরিক সে যাহা ভাল লাগে তাহাই খায়, যখন ভাল লাগে ঘুমায়, কোন নিয়মের ধার ধারে না। এখন হয়ত কতকগুলি মুখরুচিকর ও দুষ্পাচ্য খাবার পেট ভরিয়া খাইল তাহার পর রোগ যন্ত্রণায় অস্থির। এ ব্যক্তির চৈতন্য অন্নময় কোষেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ, এ ব্যক্তি অন্নব্রহ্মের উপাসক। অথবা যে লোক নানাবিধ উপায়ে কেবল দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যস্ত, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি তত নহে সে ব্যক্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তাহার পর আর একজন লোক আহার করিবার সময় কেবল মুখ রুচিকর খাদ্যেই তুষ্ট নহে, প্রাণ শক্তির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, সে পুষ্টিকর খাদ্য চায় কেবল ক্ষুধানাশ তাহার উদ্দেশ্য নহে সে চাহে দেহের বল ও আয়ু বৃদ্ধি। কিন্তু সবল ও সুস্থ দেহ হইলেই সে সন্তুষ্ট, এ ব্যক্তির চৈতন্য প্রাণময় কোষেই নিবদ্ধ, প্রাণময় কোষই তাহার 'লয় কেন্দ্র' এ ব্যক্তি প্রাণ ব্রহ্মের উপাসক। অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এ ব্যক্তি দেহ বা অন্নময় কোষকে উপেক্ষা করে না, তবে প্রাণশক্তির দ্বারা সে দৈহিক আকাঙ্খাগুলিকে নিয়মিত করিতেছে।

দেহ সুস্থ ও সবল হইলে এবং আয়ুবৃদ্ধি হইলেই তো আর মানব জীবনের চরিতার্থতা হইল না—সে মূর্খ, যাহার মনন শক্তির অনুশীলন হয় নাই সে সুস্থ ও সবল দেহ লইয়াই বা কি করিবে? এই জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত মানব কেবল সবল ও সুস্থ দেহ চাহে না—ইহার সঙ্গে মনোবৃত্তিরও বিকাশ চায়। "A sound mind in a sound body" এ ব্যক্তি আহার করিবার সময় রুচিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়া খাদ্যের আরও একটি গুণ চায়—সে চায় যে মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষও সাধিত হউক। এ ব্যক্তির চৈতন্য প্রধানতঃ মনোময় কোষে নিবদ্ধ বা এ ব্যক্তি মন ব্রহ্মের উপাসক।

আমাদের যে মনন শক্তি তাহা স্বভাবতঃ সংশয়াত্মিকা। যুক্তিতর্কে প্রতিপক্ষকে পরাজয় করিতেছি, নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, যেমন বাগ্মী তেমনই লেখক, লোকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছে, এই প্রকারের অবস্থায় মানুষ কিছুদিন বেশ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টি হইলে বা দৃষ্টি একটু আত্মনিষ্ঠ হইলে এই সংশয়াত্মক, বা তর্কাদি গোচর জ্ঞানে মানুষের তৃপ্তি হয় না। তখন মানব জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে জানিতে চায়, বিশ্বকে জানিতে চায়, সত্য জানিতে চায়—এই জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্য যাহা অনুকূল মানব এ অবস্থায় তাহাই পাইতে চায়। এ সময়ে মানব দেহ প্রাণ, মন, সমস্তকে রক্ষা করিতে চায় কিন্তু এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রতিষ্ঠার জন্য। এই অবস্থায় মানব বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপা[illegible]ক।

এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেই বিশ্বরহস্যের মীমাংসা হইয়া গেল, এতদিন যে অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থি মানবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা

চূর্ণ হইয়া গেল। এইখানে সকল সন্দেহের শেষ, মানব আনন্দময়ের সন্নিধানে আসিল, প্রবাসী গৃহে ফিরিল।

ব্যক্তির জীবনে ইহাই আনন্দময়ের উপাসনা। এইবার জাতীয় জীবনে, বিশেষ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে আনন্দময়ের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। আমাদের অভাবের সীমা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য নানারূপ জল্পনা কল্পনা ও চেষ্টা উদ্যম চলিতেছে। সাধু সংকল্প! সকলেই সফলকাম হউন!

একদল লোক দেশের অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। যৌথ কারবার, কৃষি শিল্পের উন্নতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি করিলেই মঙ্গল হইবে—ইহাই অন্নব্রহ্মের উপাসনা।

একদল লোক বলিতেছে এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতেই হইবে কিন্তু এই কার্য্য করিতে হইলে দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, লোকের স্বাস্থ্য নাই, লোক অল্পায়ু হইতেছে মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। এই প্রাণ ব্রহ্মের উপাসনা।

আর একদল বলিতেছেন আর্থিক অবস্থার উন্নতি চাই, স্বাস্থ্যের উন্নতিও চাই কিন্তু দেশের লোক যে মূর্খ, দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর, শিক্ষা বিস্তার না করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না, আর্থিক উন্নতিও হইবে না। ইহারা মন ব্রহ্মের উপাসক।

আর একদল বলিতেছে শিক্ষা তো বিস্তার করিবে কিন্তু শিক্ষার প্রণালী কই? পাঠাগারের নামে কারাগার করিয়া যে বিজাতীয়ভাবে শিক্ষা দান করিতেছ তাহাতে উন্নতি হইতেছে, না অবনতি হইতেছে, তাহা কি ভাবিয়াছ? আগে আমাদের জাতীয় প্রকৃতির মূল সূত্রগুলি বুঝিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে একটা নিশ্চয় করিয়া আদর্শ ও প্রণালী প্রস্তুত কর নতুবা শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা দিয়া লোকসান বৈ লাভ হইবে না। এই ভাব বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা।

ইহা ছাড়া আর একদল লোক আছেন তাঁহারা বলিতেছেন দেশে আস্তিক্য বুদ্ধি জাগ্রত কর, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম দেশবাসী নরনারীর হৃদয়ে জাগ্রত কর, শৈশব হইতে বালকবালিকাগণকে সেই উপনিষদের ঋষিগণ প্রচারিত মানব জীবনের অমরত্বের কথা শিক্ষা দাও, তাহা হইলে জাতীয় আদর্শ নিশ্চিত হইবে, শিক্ষা প্রণালী তদনুসারে স্থিরীকৃত হইবে সে শিক্ষার

আলোক দেশে ব্যাপ্ত হইলে দেশে একতা, ত্যাগশীলতা ও পরার্থপরতা জাগিয়া উঠিবে তখন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, লোকে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ ও দীর্ঘায়ু হইবে, অর্থনৈতিক সমস্যাই বল, আর রাজনৈতিক সমস্যাই বল, সমস্তের সুমীমাংসা হইবে ইহাই আনন্দব্রহ্মের উপাসনা।

আনন্দব্রহ্মের উপাসনার মর্ম্ম একটু পরিস্ফুট করিবার অন্য একটি কথার প্রবর্ত্তনা করা যাইতেছে। আমাদের শাস্ত্রে একটি নিয়ম আছে তাহার নাম "উৎসর্গ অপবাদ।" ইংরাজী ভাষায় ইহার অর্থ বলিতে হইলে এই বলিতে হয় "A higher Stage in Evolution does not negate the lower ones but fulfils them." অভিব্যক্তির বা ক্রমবিকাশের যাহা উন্নততর সোপান তাহা নিম্নতর সোপানগুলিকে উপেক্ষা, অনাদর ও অবজ্ঞা করে না, তাহাদিগকে সফল করে। আনন্দময়ের উপাসনাই সকল মতের ও সকল পথের এবং মানবীয় সাধনার সকল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়!

অধিকারী ভেদে মানবের আদর্শ ও উপায় বিভিন্ন হইবেই, জগতে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এজন্য যিনি বিরোধ করেন বা দলাদলি করেন অথবা সকলকে সমান রূপে আপনার বলিয়া উদার বক্ষে আদর করিয়া স্থান দিতে না পারেন তিনি আনন্দব্রহ্মের উপাসক নহেন। আনন্দব্রহ্মের উপাসককেই শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতোত্তম বা উত্তম ভক্ত বলা হইয়াছে। তাহার লক্ষণ এই :—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১১।২-৪৩।

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর মতে এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এই—যিনি সকল ভূতেই ব্রহ্মভাবের দ্বারা আপনার সমন্বয় দেখেন এবং ব্রহ্মরূপ যে আপনার অধিষ্ঠান তথায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন তিনিই উত্তম ভাগবত।

পূর্ণাঙ্গ মতসহিষ্ণুতা ও সকল ভাবের ও সকল সাধনার যথার্থ সমন্বয় দর্শন করা এই অবস্থার লক্ষণ। এই অবস্থাতেই মানবের কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, বিশ্ব-ব্যাপার ভগবানের লীলা বলিয়া মনে হয়, সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মদর্শন ঘটে। শ্রীধর স্বামী পূর্ব্বের শ্লোকের টীকায় মশকেও নিয়ন্তা রূপে ও অন্তর্যামী রূপে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের অনুবর্ত্তনে লিখিয়াছেন

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মুর্ত্তি
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্ট দেব স্ফুর্ত্তি ॥”

এইবার পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে—একখানি গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর বাক্যের সমাবেশ হইয়াছে, বেশ গুণ ও অলঙ্কারযুক্ত গ্রন্থ; কিন্তু এই গ্রন্থ যদ্যপি জগৎপবিত্রকারক হরির যশঃ না প্রকাশ করে তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই গ্রন্থের আদর করেন না। সেই গ্রন্থ কাকতীর্থ। রন্ধনশালার নিকট ক্ষুদ্র গহ্বরে উচ্ছিষ্টাদি সঞ্চিত হইয়া থাকে কাকগুলি সেই উচ্ছিষ্ট খুব আনন্দোৎসবের সহিত ভোজন করিয়া থাকে। এই স্থানকে কাকতীর্থ বলে। যে গ্রন্থ কেবল শব্দ ও অলঙ্কারের বাহ্যপরিপাট্যে খুব সুন্দর কিন্তু আমাদের চিত্ত সেই গ্রন্থালোচনার দ্বারা ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিয়া সেই অসীম পরমতত্বের জন্য আকুল হইয়া না উঠে তাহা কাকতীর্থ স্বরূপ অর্থাৎ (কাকতুল্যানাং কামিনাং রতিস্থানং) কাকতুল্য কামিব্যক্তিগণের রতিস্থান। যাঁহারা হংস তাঁহারা তাহার আদর করেন না। হংসেরা বিহার স্থান মানস সরোবরে—তাঁহারা উশিক্ক্ষয়া অর্থাৎ (উশিক্ কমনীয় ব্রহ্মক্ষয়ো নিবাসো যেষাং তে) কমনীয় ব্রহ্মবস্তুতেই তাঁহাদের বাস।

এইবার এই শ্লোকটির মর্ম্ম অবধারণ করা যাউক—সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি মানবীয় সাধনার অতীব মূল্যবান বিভাগ। ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম জীবনের সহিত এই বিভাগগুলির সম্বন্ধ কি, তাহাই ভাবিতে হইবে। এ সকলের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়জ সামান্য আনন্দ হয় সাধারণ লোকে এই আনন্দের জন্য ইহাদের অনুশীলন করিয়া থাকে। অনেক ধর্ম্ম এ সমস্তের বিরোধী। কিন্তু ভাগবত এ সমস্তের পুরোদেশে যাহা যথার্থ আদর্শ তাহাই প্রদান করিলেন, বলিলেন, বেশ! সৌন্দর্য্যের সমাবেশ খুবই ভাল কথা; কিন্তু যাহা বিশ্বজনীন বা যাহা পরমার্থ এই সাহিত্য যদি সেখানে মানুষের চিত্তকে লইয়া না যায় তাহা হইলে সে সাহিত্য উচ্চ সাহিত্য নহে।

পরবর্ত্তী শ্লোকে এই কথা আরও ভাল করিয়া বলিতেছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থ এই, কোনও বাক্যবিন্যাসে বা শাব্দিক রচনায় যদ্যপি অপশব্দের প্রয়োগও থাকে কিন্তু তাহার প্রত্যেক শ্লোক যদ্যপি অনন্ত ভগবানের নাম ও যশের প্রকাশক হয় তাহা হইলে সাধুগণ আদর পূর্ব্বক সেই সমস্ত নাম শ্রবণ করেন ও স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকটির অর্থের সহিত বর্ত্তমান কালের উচ্চতম চিন্তার বেশ সুন্দর

সামঞ্জস্য আছে। জার্ম্মান দার্শনিক সুপ্রসিদ্ধ হেগেল কাব্য বা শিল্পের অভিব্যক্তিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। Oriental, Classical ও Romantic; এই তিনটির ঠিক বাঙ্গলা নাম দেওয়া কঠিন। তাহার ভাবটা আমরা বুঝাইতেছি। দুটি জিনিস, দেহ আর প্রাণ, একাঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কাব্যে ও শিল্পেও তাহাই। কাব্যেরও একটি দেহ আছে একটি প্রাণ আছে। প্রথম যুগে কাব্যে এই দেহেরই আড়ম্বর, খুব ছন্দ নৈপুন্য, খুব অলঙ্কারের ছটা ও অনুপ্রাসের ঘটা, কিন্তু ভাবের দিকে ঐশ্বর্য্য কম অর্থাৎ দেহ যেমন সুন্দর, প্রাণ বা ভাব তেমন নহে। ইহাই প্রথম যুগ, ইহার নাম Oriental; দ্বিতীয় যুগে দেহ ও প্রাণের মধ্যে বা ভাষা ও ভাবের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। যেমন ভাব তেমনি ভাষা এই স্তরের নাম Classical, তাহার পর তৃতীয় যুগ এখানে দেহ পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে দেহ গৌণ হইয়া পড়িয়াছে প্রাণ বা ভাবই এখানে মুখ্য। ভাগবত পূর্ব্বের শ্লোকে এই তৃতীয় যুগেরই আভাস দিলেন এবং এই জন্যই ভাগবতের অধিকারীর নাম ভাবুক। এখানে মুখ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঞ্জনারই মূল্য অধিক—একথা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ গোস্বামী গণ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজীতে বলে "Beauty lies not in what it expresses but in what it suggests.

এই গেল কাব্য শিল্প প্রভৃতির কথা—the feeling aspect of man—ভগবদনুভূতির দ্বারা আমাদিগকে আমাদের এই দিকের অনুশীলন করিতে হইবে। আমাদের যাবতীয় সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যেন নশ্বর ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া না থাকে, সেই অতীন্দ্রিয় পরমার্থ সুন্দরের সহিত আমাদের পরিচয় সংঘটন করাই যাবতীয় সাহিত্য সাধনার, শিল্প ও দেবজন বিদ্যা বা ললিত কলার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্মের দ্বারা মানবীয় সাধনার এই বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে হইবে।

এইবার পরবর্ত্তী শ্লোকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম খুব ভাল জিনিস কিন্তু তাহা যদি অচ্যুতভাব বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ কর্ম্ম যদি ভক্তিহীন হয় তাহা হইলে তাহা সফল নহে। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই, সর্ব্বোপাধি নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। অতএব এই ভাগবত ধর্ম্মে কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও পরিপূর্ণতা। অদ্য এইখানেই থাকুক এ সমস্ত বিষয় পরে আরও বিস্তৃততররূপে আলোচনা করা যাইবে।

বিবেকানন্দের আদর্শ।

আজ প্রায় পনর বৎসর হইল, যখন মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময়ে কলিকাতা সহরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"অধিকাংশ মানবের জন্যই ব্যক্তিবিশেষকে (গুরু বা অবতার) আদর্শরূপে গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকারের কোনও আদর্শ পুরুষের পতাকা নিম্নে সমবেত না হইতে পারিলে কোনও জাতির উত্থান হয় না, কোনও জাতি বড় হয় না, অধিক কি কোনও জাতি কার্য্য করিতেই পারে না। রাজনীতিক জীবনের আদর্শ, সামাজিক বা ব্যবসায়িক জীবনের আদর্শ পুরুষের দ্বারা ভারতবর্ষে কিছু হইবে না। আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ পুরুষের প্রয়োজন, আমরা ভক্তি ও উল্লাসের সহিত এই প্রকারের মহাপুরুষের নামের চারিদিকে একতাবদ্ধ হইতে চাই। আমাদের দেশে যিনি যথার্থ বীর হইবেন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক জীবনে মহীয়ান্ হইতে হইবে, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য দিয়া আমরা এই প্রকারের মহাপুরুষ পাইয়াছি। এই জাতি যদি উঠিতে চায়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই জাতিকে এই মহাপুরুষের নামের চারিদিকে ভক্তি ও উল্লাসের সহিত সমবেত হইতে হইবে। আর এক কথা আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, পরমহংস দেবের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, এমনটি আপনারা কখন পড়েনও নাই, দেখা ত দূরের কথা। তাঁহার তিরোভাবের পর দশ বৎসরের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা আপনারা দেখিতেই পাইতেছেন। সুতরাং আমাদের জাতির ও আমাদের ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য, কর্ত্তব্য বুদ্ধির বাধ্যকতায় আমি এই মহৎ আদর্শ পুরুষকে আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।" *

* It is absolutely necessary for the vast majority of human beings to have a personal ideal; and no nation can rise, can become great, can work at all, without enthusiastically coming under the banner of one of these great ideals in life. Political ideals, personages representing political ideals, even social ideals, Commercial ideals, would have no power in India. We want spiritual

পাশ্চাত্য ভাব সমূহের সমাগম বশতঃ আমাদের দেশের চিন্তায় ও কর্ম্মে এক ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই গোলোযোগের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সর্ব্বত্রই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে কেন্দ্রস্থলে আসিয়া এই সমস্ত বিরোধী ভাবের মিলনের প্রতি স্বামীজি অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেই স্থানেই এই মহা সমন্বয় হইবে কি না তাহার মীমাংসা কালের হস্তে, এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের যাহা বক্তব্য তাহা তিনি সাধারণ ভাবে সমস্ত পৃথিবীর নিকট ও বিশেষভাবে তাঁহার দেশের নিকট বলিয়া গিয়াছেন—তিনি তাঁহার এই বক্তব্য তাঁহার গুরুদেবের নিকট পাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে যে মহত্বের বীজ নিহিত ছিল তাহা পরমহংসদেবই ধরিতে পারিয়াছিলেন—এখন সেই বীজ তিন দিকে অঙ্কুরিত অবস্থায় দেখা যাইতেছে। অক্লান্ত কর্ম্ম ও উন্নত আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব্ব মিলন সম্পন্ন একটি জীবনের আদর্শ ইহার প্রথম কথা অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আমরা একটি খুব বড় আদর্শ পাইয়াছি, তিনি যেমন ধর্ম্মবীর তেমনি কর্ম্মবীর। তাঁহার জীবনের বিষয় চিন্তা করিলে আমরাও মহৎ হইতে পারি। ইহাই স্বামীজির প্রথম দান। এই ত্যাগের দেশে তিনি যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার দ্বিতীয় দান। তাঁহার তৃতীয় দান 'রামকৃষ্ণমিশন'—মানবজাতির মঙ্গলের জন্য আমাদের দেশের কর্ম্ম ও চিন্তা যে শক্তি প্রভাবে সংযত, নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত হইবে 'রামকৃষ্ণ মিশন' সেই শক্তির উৎস।

ভাবটি যেমন গভীর ভিত্তিও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে প্রাচীন-কাল হইতে যত প্রকার আধ্যাত্মিক চেষ্টা ও আন্দোলন হইয়াছে তাহার সমস্তগুলিই এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক সাধনার সমন্বয় পরমহংসদেবের জীবনে অতীব সুন্দররূপেই

ideals before us. We want enthusiastically to gather round grand spiritual names. But heroes must be spiritual, such a hero has been given to us in the person of Ramkrishna Paramhansa. If this nation wants to rise take my word for it, it will have to rally enthusiastically round this name. * * * Before you is the fact that it is the most morvellous manifestation of soul power that you can read of, much less expect to see. Within ten years of his passing away, this power las encircld the globe; that fact is before you. In duty bound, therefore, for the good of our race, for the good of our riligion, I place this great spiritual ideal before you."

সাধিত হইয়াছে। উন্নতিশীল মানবচিত্ত প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠানে যখন অসন্তুষ্ট সেই সময়ে সেই চিত্তের উপযোগী প্রতিষ্ঠানের তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই নূতন সমন্বয়-পন্থী ও উন্নতিশীল সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করেন তাঁহারা এই সমস্ত মঠে বাস করেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলুড় মঠই এই সমস্তের কেন্দ্র। বাঙ্গালোর, কাশী, প্রয়াগ ও মায়াবতীতে ইহার শাখা আছে।

এই সমস্ত মঠ সন্ন্যাসীদিগের জন্য, কাজেই লোকালয়ের কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত। মঠবাসীদের অবশ্য অন্তর্মুখী হওয়া প্রয়োজন। ইহা ছাড়া জগতের সেবাও মঠবাসীগণ বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। "আত্মনো মোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায়চ" ইহাই এই সমস্ত মঠের উদ্দেশ্য।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই সমস্ত মঠের সভাপতি। স্বামী সারদানন্দ ইহার সম্পাদক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন মতে এই মঠ যথারীতি আইন অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এই মঠবাসীগণ মানবের সেবা তিন দিক হইতে করেন। ইহারা যে ভাবের প্রেরণায় মানবের সেবা করেন তাহা সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে মানবের অভাব সমূহের মধ্য হইতে ভগবান আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এই সমস্ত অভাব দূর করাই ভগবানের পূজা। স্বামীজি বলিতেন * যখন একটি ক্ষুধিত কুকুরকে একমুষ্টি অন্ন দাও তখন সেই কুকুরকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিও। সেই কুকুরের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন। আমাদের তাঁহার পূজা করিবার অধিকার আছে। সমস্ত বিশ্বের নিকট ভক্তির সহিত দণ্ডায়মান হও। কার্য্য করিবার ইহাই যথার্থ ভাব। ইহাই কর্ম্মযোগের শিক্ষা। আমি দেখিতেছি অনেক দরিদ্র লোক রহিয়াছে, ইহারা আমার মুক্তির জন্য। আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা

* When you give a morsel of food to the dog, worship the dog as God, God is in the dog. He is all and in all. We are allowed to worship him. Stand in that reverent attitude to the whole universe- * * * This is the proper attitude of work. This is the secret taught by karma yoga.

"I see there are some poor, because it is for my salvation. I will go and worship them. God is there. Some here are miserable; for your and my salvation, so that we may serve the Lord, coming in the shape of the diseased, coming in the shape of the lunatic, the leper and the sinner."

করিব। ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। অনেক লোক বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ইহারাও আমার ও আপনাদের মুক্তির জন্য। ব্যাধিগ্রস্তের মধ্য দিয়া, উন্মাদ রোগগ্রস্তের মধ্যদিয়া, কুষ্ঠরোগীর মধ্য দিয়া, পাপীর মধ্য দিয়া ঈশ্বরই আমাদের নিকট পূজা লইবার জন্য আসিতেছেন।" লোক হিতার্থে যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সমস্তের মধ্যে এই ভাবটি প্রতিষ্ঠা করা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য। মানবের অভাব ত্রিবিধ এবং তদনুসারে ইঁহাদের কার্য্য ও তিনভাগে বিভক্ত সেবা, শিক্ষাদান, ও ধর্ম্মপ্রচার।

কাশী, হরিদ্বার, এলাহবাদ ও বৃন্দাবন হিন্দুদিগের এই চারিটি প্রধান তীর্থস্থানে এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থায়ী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক ভাড়ার বাড়ীতে কাশীতে সর্ব্বপ্রথম সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেবাশ্রমে যে সমস্ত রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয় তাহাদের সংখ্যা খুব বাড়িতে থাকায় একখানি গৃহনির্ম্মাণ করার প্রয়োজন অনুভূত হইলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গৃহনির্ম্মাণার্থ অর্থসংগ্রহ আরম্ভ হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গৃহনির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে গৃহস্থিত (Indoor) রোগীর সংখ্যা প্রায় ছয়শত। বাহির হইতে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার লোক বার্ষিক ঔষধ ও চিকিৎসা পাইয়া থাকে। কাজ এত বাড়িতেছে যে জঙ্গমবাড়ী নামক স্থানে জীর্ণ রোগীদের জন্য এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! সংক্রামক রোগগ্রস্তদিগের জন্য একটি বিভাগ (ward) খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে।

হরিদ্বারের নিকট কনখলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এক ভাড়ার বাড়ীতে প্রথম সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্যের জন্য ১৫ বিঘা ভূমি ক্রয় করা হয় এবং কয়েকখানি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকখানি পাকাঘর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এখানেও কাজ প্রত্যহ বাড়িয়া যাইতেছে—সংক্রামক রোগের জন্যও এখানে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। যক্ষ্মারোগের জন্য এখানে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইয়াছে। গত বৎসরের কার্য্য বিবরণীতে দেখা যায় এই আশ্রমে গত বৎসর ১১২ গৃহস্থিত রোগী ও নয় হাজারের উপর বাহিরের রোগী হইয়াছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লালাবাবুর কুঞ্জের এক অংশে বৃন্দাবনের সেবাশ্রম উন্মুক্ত হয়। এই গৃহে ১২ জনের অধিক গৃহস্থিত রোগী থাকিতে পারে না। এখানে একটি পৃথক ও বৃহৎ গৃহনির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা হইতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে

এই সেবাশ্রমে গৃহস্থিত রোগীর সংখ্যা ১৭৪ ও ১৭ হাজারের অধিক বাহিরের রোগী হইয়াছিল।

এই দুই বৎসর হইল প্রয়াগে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের যত্নে এখানে একখানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী মঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। বরিশালে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র আছে। বেলুড় হইতেও দরিদ্রদিগকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। ইহা ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কিত ভদ্রলোকগণের চেষ্টায় অনেক গ্রামে ও সহরে এই প্রকারের সেবাশ্রম হইয়াছে। স্থায়ীরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করা ব্যতীত দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সংক্রামক ব্যাধি, অগ্নিদাহ প্রভৃতির সময়ে ইহারা খুব তৎপরতার সহিত কার্য্য করনে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ বিশেষে দুর্ভিক্ষের সাহায্যদান কার্য্য প্রথম আরব্ধ হয়। ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার দুর্ভিক্ষে কিশেনগড় ও খান্দোয়া নানক স্থানদ্বয়ে কেন্দ্র করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ বিপুল উৎসাহে কার্য্য করেন। এই সময়ে কিশেনগড়ে একটি অনাথাশ্রম খোলা হইয়াছিল, তাহাতে চারিশতের উপর অনাথ বালকবালিকার জীবন রক্ষা ও সেবা হইয়াছিল। খান্দোয়ার প্রায় চৌদ্দহাজার লোককে সাহায্য করা হইয়াছিল। এই সাহায্য ছাড়া বেলুড় মঠ হইতেও অনেক সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জেলায় দুইটি ও নোয়াখালি জেলায় দুইটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্ভিক্ষে সাহায্য করা হয়। ত্রিপুরায় ৩২টি পরিবারকে সাহায্য দ্বারা রক্ষা করা হইয়াছিল। নোয়াখালিতে প্রায় ৭ হাজার শ্রীহট্ট ৪ হাজার, ডায়মণ্ডহারবারে প্রায় দেড়হাজার লোক সাহায্য পাইয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুরি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহায্য করা হইয়াছিল, যথাক্রমে দশহাজার ও তিনহাজারের উপর লোক সাহায্য পাইয়াছিল।

ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ঘোগায় ও মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় বন্যায় সাহায্য করা হইয়াছিল।

১৯১০খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অগ্নিদাহে অসংখ্য লোকের সর্ব্বনাশ হয়, এই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন ৫৫৮ খানি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, প্রায় একহাজার খণ্ড বস্ত্র বিতরণ করেন, অর্থ ও চাউল দিয়া ৬২টি পরিবারকে রক্ষা করেন।

১৮৯৯ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভয়ানক প্লেগ হয়। এই প্লেগের সময় রামকৃষ্ণ মিশন একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেন। কলিকাতায় ১, ২, ও ৩নং ওয়ার্ডে ইহারা অনেক কাজ করিয়াছিলেন। ১৯০৪, ১৯০৫ ও ১৯১২ এই তিন বৎসর ভাগলপুরে প্লেগের সময় রামকৃষ্ণ মিশন এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গঙ্গাসাগর মেলায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক সাগরদ্বীপে পীড়িত ও অসহায় যাত্রীদিগের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। কনখল সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীগণ কুম্ভমেলার সময়, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে হৃষীকেশে ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে সাহায্যশিবির (Relief camp) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাঙ্গারা উপত্যকায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর মায়াবতীর সন্ন্যাসীগণ স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এখনও অনেকের স্মরণ আছে। কালিফর্ণিয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্র আছে, স্বামী ত্রিগুণাতীত এক্ষণে তথায় থাকেন। পূর্ব্বে যখন তিনি উদ্বোধনের সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে উত্তর বঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে কয়েকবার বিশেষরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শিক্ষাদান রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় কার্য্য। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কালেই এই উদ্দেশ্যে দুইটি কার্য্য আরম্ভ হয়। একটি ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের জন্য, আর একটি সাধারণ লোকের জন্য। ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী খ্রীষ্টিনা প্রথম কার্য্যটির ও স্বামী অখণ্ডানন্দ দ্বিতীয় কার্য্যটির ভার গ্রহণ করেন। প্রথম বিদ্যালয়টি বাগবাজারে ১৭ নং বসুপাড়া গলিতে অবস্থিত। ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কলিকাতা টাউনহলে যে সভা হয় সেই সভায় স্থির হইয়াছে যে ভগিনী নিবেদিতার এই বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করাই তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান করা।

স্বামী অখণ্ডানন্দ বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী ভাবদা নামক স্থান স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রাম্য লোকের সহিত গ্রাম্যভাবে থাকিয়া তিনি যেরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা যথার্থই বিস্ময়কর। এখানে তাঁহার বহুদিন হইতে একটি অনাথাশ্রম আছে, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটি ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যালয় আছে। এই পূর্ণ পনর বৎসর কাল কার্য্য করার পর তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য ৫০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই স্থানের লোকশিক্ষার ব্যবস্থা অতীব সুন্দর।

গত ছয় সাত বৎসর কাল ধরিয়া দেশে একটা কথা উঠিয়াছে যে

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি জাতীয়ভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এখন ধর্ম্মহীন ও জাতীয় ভাব বিবর্জ্জিত যে শিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে তাহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী, একথা আমরা প্রত্যহই বুঝিতে পারিতেছি। শিক্ষাকে জাতীয় ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু এই জাতীয় ভাবটি যে কি তাহা আমরা সম্যকরূপে জানিনা। ভগিনী নিবেদিতা বলেন যে ভারতের যাহা জাতীয় ভাব তাহা স্বামী বিবেকানন্দই যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার আদর্শ আমরা সম্পূর্ণরূপে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব।

এইবার রামকৃষ্ণ মিশনের তৃতীয় কার্য্য—ধর্ম্মপ্রচার। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃকই এই কার্য্য সর্ব্বপ্রথম আরব্ধ হয়। পরমহংসদেব বলিতেন যে বিবেকা-নন্দের চাপরাস আছে অর্থাৎ প্রচারের ভার দিয়াই ভগবান তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়াছেন। চিকাগো সহরের মহাধর্ম্ম সম্মিলনে তিনি প্রথম যেদিন বক্তৃতা করেন সেই দিনই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের অধিকার প্রতিপন্ন হয়। নিউইয়র্ক, সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো, পিট্‌স্‌বর্গ, বোষ্টন্ ও ওয়াশিংটন সহরে বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র রহিয়াছে, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীগণ নিয়মিত ভাবে তথায় যাইয়া শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন। ইউরোপের মধ্যেও শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এখন উপযুক্ত প্রচারক যাইয়া তথায় কার্য্য আরম্ভ করিলে প্রভূত কার্য্য হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ভারতের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপর বিবেকানন্দ যে ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন সেই ভার যথার্থরূপে পালন করিতে পারিলেই একদিকে এই প্রাচীন জাতির মুক্তি আর অপর দিকে মানবজাতির ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারতবর্ষে যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বামী রাম-কৃষ্ণানন্দের তিরোভাবের পর স্বামী সর্ব্বানন্দ সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দক্ষিণ দেশেই প্রচার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ হইতেছে।

বাঙ্গালোরের রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী নির্ম্মলানন্দ থাকেন, তিনি বক্তৃতা করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে প্রত্যহই নূতন নূতন লোক এই নূতন আদর্শে দীক্ষিত হইতেছে। মায়াবতী মঠ হইতে প্রবুদ্ধ ভারত নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র বাহির হয়, এই পত্রে পরমহংসদেবের শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক মত প্রভৃতি বিষয়ে

নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মায়াবতী হইতে গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়। বেলুড়, কাশী ও প্রয়াগের মঠ হইতেও প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। উদ্বোধন নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রও বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ।

কবিতা।
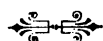
বিপুলা এ নগরীর চঞ্চলতা মাঝে,
তেমনি করিয়া কেন পাই না তোমারে ?—
কি অতৃপ্তি অপূর্ণতা সদা যেন বাজে,
বিচ্ছিন্ন করিয়া যেন রেখেছে দোঁহারে।
সন্ধ্যার ছায়ার সাথে মলিন বিষাদ
তোমার নয়ন হ'তে যেন নেমে আসে,
তোমার মিলনে সখি, মিটেনাক সাধ,—
মিলনে বিরহ যেন কোথা হ'তে ভাসে।
তাই বলি চল প্রিয়ে, পল্লির ছায়ায়,
আবার নাবিয়া এস জ্যোছনা আবেশে,
ঢেকে দাও দেহ মন তোমার মায়ায়,
সরলা চপলা পল্লিবালিকার বেশে।
দোঁহে দোঁহা বুঝি নিব চকিত লোচনে
ঝিল্লি মুখরিত স্নিগ্ধ নিবিড় বিজনে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

"দুর্গম পথ"
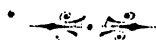
ঋষিগণ বলিয়াছেন পরমাত্মা সকল ভূতের মধু। তাঁহারা বলিয়াছেন তিনি অমৃতসিক্ত অমৃত; তিনি আনন্দস্বরূপ, অমৃতের প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা আবার বলিয়াছেন তিনি দুর্লভ, তাঁহাকে পাওয়ার পথ বড়ই দুর্গম; সেই পথ সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুরতিক্রমনীয়। ঋষিদিগের বাক্য শুনিয়া একদিকে আমাদের মন যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে, অমৃত লাভের জন্য চকিত ও চঞ্চল হইয়া উঠে, অপর দিকে আবার যখন শুনি তাঁহাকে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তিনি অপার ও অগম্য, বাক্য ও মনের অগোচর, তখন আমাদের চিত্ত বড়ই ক্ষিন্ন হইয়া যায়, আমাদের আশাভরসা যেন আকাশে মিশিয়া যায়।

আমরা জানি আমাদের কোনই সাধনা নাই। অপর দশ জনের মতন আমরা আহার বিহার করি, সংসারের পিচ্ছিল পথে চলি। প্রলোভনের পথে চলি, কতবার গন্তব্য পথ চ্যুত হই, পথ ভুলিয়া যাই; কতবার উঠি কতবার পড়ি। সময় সময় আমরা দেখি আমাদের প্রাণে এক মহা শূন্যতা বিরাজমান; আশা ভরসা আমাদের একেবারে নির্ম্মূল। আমরা তখন ভাবি আমাদের উপায় কি হইবে? এই চিন্তা আমাদিগকে অভিভূত করে, আমরা চারিদিক অন্ধকারাবৃত দেখি; আমাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা নিরাশার অতল সলিলে ডুবিয়া যাই। এই পৃথিবী তখন আমাদের নিকট মরুভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শুষ্কতা, চিরশুষ্কতা আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে আশা ও আনন্দের দ্বার রুদ্ধ হইলে মানুষ কি বাঁচিতে পারে? তাহার পক্ষে তখন জীবনধারণ করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। জীবনের সেই চিত্রপট লইয়া আজ আমরা বন্ধুদিগের নিকট উপনীত হইতেছি; আমাদের আজ লজ্জা ভয় সরম কিছুই নাই; এই প্রলাপোক্তি চিত্তকে শান্তি প্রদান করুক আজ এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

নিরাশা—নিরাশা, কেবল নিরাশা, যখন আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আমাদের শরীর মন, সব অবশ হইয়া যায়, আমাদের চিত্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন আবার মনে ভাবি এখনও ত সম্মুখে দীর্ঘপথ রহিয়াছে, হায়, কবে এই নিরাশার, এই মহাশূন্যতার অবসান হইবে! আমাদের জীবনের কি তবে কোনই সার্থকতা নাই? এই মহাশূন্যতা কি আর এই জীবনে

অপসারিত হইবে না! এই ভাবেই কি দুর্লভ মনুষ্যজীবন চলিয়া যাইবে? কোন্ মহৎ অনর্থের এই কর্ম্মফল ভোগ? কেন এই মহাশূন্যতা? আবার মনে হয় ইহা কি তবে স্বপ্ন? আমরা কোথায়? আমাদের জীবন কিসের জন্য? এই সব চিন্তালহরী আমাদিগকে একেবারে আকুল করিয়া তুলে।

আবার ভাবি এই শূন্যতা ক্ষণিক। বিশ্বপতির নিয়ম চিরশৃঙ্খলিত, অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে নিয়মিত। মানব সেই রহস্য উদ্ভিন্ন করিতে চির অসমর্থ হইলেও মানবজীবন নিরর্থক নহে। এই মহাশূন্যতার সার্থকতা আছে, ইহা অমৃতের সোপান। এই চিন্তা তখন আমাদের মনে অমৃত সিঞ্চন করে। আমরা চকিত হইয়া জাগিয়া উঠি, উঠিয়া বসি, বসিয়া আবার দাঁড়াই। তখন এক দুরশ্রুত অস্ফুট ধ্বনি আমাদের প্রাণের মধ্যে আশার বাণী বহন করিয়া আনে। তিনি অমৃত, তিনি অমৃত, তিনি অমৃত! তিনি এই মহাশূন্যতার মধ্য দিয়া এই নিরাশার মধ্য দিয়া, বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া, আমাদিগকে অমৃতের অনুসন্ধান, সেই অজানা দেশের ঠিকানা বলিয়া দেন। তিনি আমাদিগকে জীবনের এমন স্তরে উন্নীত করেন যে দেশে শোক, মোহ, জরা মৃত্যু, বিয়োগ, বিচ্ছেদ মানবাত্মাকে ভীত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না। তখন ভাবি সেই দেশে যাওয়ার পথ কি? এই চিন্তায় আমাদের চিত্ত ভীত, ত্রস্ত ও আলোড়িত হইয়া উঠে। আমরা জানি শত বাঁধনে আমরা জড়িত, মোহান্ধকারে নিমজ্জিত, আমাদের চিত্তবৃত্তি অসমাহিত, চিরচঞ্চল, সেই পথের উপযুক্ত পাথেয় কড়ি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবুও যেন আমরা একটা আকর্ষণ বোধ করিয়া থাকি। জীবনের এই সন্ধ্যার সময় কে আমাদিগকে ডাকিতেছে, আমাদিগকে সজোরে টানিতেছে,—উঠ, উঠ, জাগ্রত হও, বসিয়া থাকিও না, সময় উপস্থিত এই তোমার মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত, এই তোমার শুভ লগ্ন, এই তোমার অমৃত যোগ উপস্থিত; দাঁড়াও, একবার ঝাঁপ দিয়া পড়, টলিও না, চঞ্চল হইও না, হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমাদের শুভ যাত্রার সময় উপস্থিত। আমরা ত আমরাই। কতবার এ আকুল আহ্বান অবহেলা করিয়াছি। কতবার শুনিয়াও শুনি নাই! কতবার বলিয়াছি, আমরা ঐ ডাক শুনিতে পারিব না; আমরা সংসার ছাড়িয়া ছুটিব না; আমরা সুখসমৃদ্ধি ছাড়িয়া যাইব না। দেখ না, আমরা কেমন সুখের ঘর বান্ধিয়াছি! দেখ না আমরা সংসারকে কেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি! আমাদের যে ঐ ডাক শোনার সময় নাই; আমরা যে অনবসর, বড় ব্যস্ত। এই বলিয়া কতবার আমরা ঐ

আহ্বান অবহেলা করিয়াছি। কিন্তু Hamlet এর প্রেতাত্মার মত ঐ ডাক আবার আসিতেছে বলিতেছে—There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in your Philosophy. আবার আমাদিগকে সাড়া দিতেছে, সময় ত চলিয়া গেল! উঠ, শীঘ্র উঠ, সত্বর হও, কোন দিকে তাকাইও না। আমি তোমাদের মহাশূন্যতা অমৃত সিঞ্চনে পরিপূর্ণ করিব। আবার সময় সময় আমরা সন্দেহ করি এই যে আশার বাণী ইহা বুঝি আমাদের কল্পনা প্রসূত। আমরা হতভাগ্য, হৃত সর্ব্বস্ব। আমাদের আবার কি সুকৃতি আছে যে আমরা অমৃতধামের যাত্রী হইব? এই সংশয় আমাদিগকে উদ্বিগ্ন ও আকুল করে, আমাদের চিত্তকে তমসাচ্ছন্ন করে। মনে হয় ইহা বুঝি চিত্তবিক্ষিপ্ততা অথবা মস্তিষ্কের বিকৃতি। কিন্তু আবার দেখি আমাদের সন্দেহ ভিত্তিহীন, এই বিচিকিৎসা মোহবিজড়িত। আবার ঐ আহ্বান নিশিদিন আমাদিগকে উদাস ও চঞ্চল করিতেছে। সময় নাই, অসময় নাই, সেই আকুল আহ্বান আমাদের প্রাণের মধ্যে স্ফুরিত হইতেছে, সজোরে বলিতেছে আমাদের চিত্তের মহাশূন্যতা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। সময় আসিবে, আবার তথায় চির বসন্ত বিরাজ করিবে।

নক্ষত্র খচিত আকাশ ঐ আহ্বানের সহায়তা করিতেছে। বিহগের কাকলি, শিশুগণের মুখচ্ছবি, সাধুগণের প্রেম ভক্তি, সতীনারীর পবিত্র প্রেম, নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি, বিটপীর শ্যামলচ্ছায়া, চিরচঞ্চল সমীরণের শীতলস্পর্শ ঐ আহ্বানের সহায়তা করিতেছে। আমরা দেখিতে পাই যেন পৃথিবীর বালুকণা হইতে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহতারা ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বস্তু দুর্ব্বাদলাগ্রভাগস্থিত জলশিকর হইতে সুনীল বারিধি ঐ আহ্বানের সহায়তা করিতেছে। আমরা দেখিয়া আকুল ও স্তম্ভিত হই, দেখি যেখানে মহা শ্মশান, সেখানেই নন্দন-কানন; যেখানেই মহাশূন্যতা সেখানেই অমৃত পারাবার; যেখানে শোকতাপ সেখানেই অমৃত ও আনন্দপ্রবাহ। এই লীলা, এই রহস্য কে বুঝিবে? বিশ্বনিয়ন্তার এই অপরিসীম জটিল সমস্যা কে ভেদ করিবে?

এই আলো ও ছায়া, এই শীতাতপ আমরা যখন অনুভব করি তখন মন বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া যায়। তখন বুঝি "তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" তাহাকে জানিতে পারিলেই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে; শান্তি লাভের অন্য উপায় নাই। যেন এই আশার বাণী আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলে। যখন উপলব্ধি করি সেই পথে

আমাদের চলিতেই হইবে। ঋষিদিগের শেষ মীমাংসাই এই, তাঁহাকে না জানাই মৃত্যু। নিরাশা, শোক, তাপ, দুঃখ, বিয়োগ, বিচ্ছেদ অনুভব ততক্ষণ যতক্ষণ আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি। যদি আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়ি, আমরা নির্ভীক হই এবং উপলব্ধি করি তিনিই ধ্রুব, নিত্য আশার আলো, অমৃতসিন্ধু, সকলের গম্যস্থান।

ঋষিগণ তাঁহাকে পাওয়ার পথকে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের মত দুরত্যয় বলিয়াছেন বলিয়া আমরা কি ভীত হইব? সেই পথ দুর্গম, অতি দুর্গম, ঋষিদিগের এই বাক্য শুনিয়াই কি আমরা পিছু হইয়া যাইব? কখনও নয়। একভাবে দেখিতে গেলে সেই পথ নিশিত ক্ষুরধারের মত দুরত্যয় বটে, কিন্তু তাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল, মানবজাতি সমূহের উত্থানপতনের ইতিহাস, সাধুভক্ত-দিগের জীবনচরিত ও মানবজাতির ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা কিছু আশান্বিত না হইয়া পারি না। আমরা দেখি সেই পথ যেমন দুর্গম তেমনি আবার সহজসাধ্য ও সুলভ। সেই পথ প্রদর্শনের জন্য কত বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র রচিত হইয়াছে। কত ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্ম ইতিহাস রচিত ও গ্রথিত হইয়াছে। নানাদেশে নানাভাবে তাঁহার মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল, মুসলমানদিগের কোরাণ, পারসীক-দিগের জিন্দাভেস্তা, বৌদ্ধদিগের ত্রিপীটক, মুসলমান তাপসদিগের হদিস রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। এখন সেই পথ কত সুলভ, কত সুগম; অমৃত নিকেতন সকলের নিকট অপাবৃত।

আমরা যেন বুঝিলাম তিনি আমাদের গম্য ও অমৃতের প্রতিষ্ঠা; তাঁহাকে না পাইলে আমাদের মানবজীবনের সার্থকতা নাই। আমরা কি ইহা বুঝিয়াও ঘুমাইয়া জীবনযাপন করিব? আমরা কি পশুর মত আহার বিহারে রত থাকিয়া দুর্লভ মনুষ্যজীবন বিনষ্ট করিব? আমরা কি চিরগম্যস্থান নিজ নিকেতন ভুলিয়া থাকিব? কতকাল এই পান্থনিবাসে বিদেশীর মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইব?

এতৎ সম্বন্ধে চিত্তোন্মাদক একটী ব্রহ্মসঙ্গীত আছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। সঙ্গীতটী এই:—

"মন, চল নিজ নিকেতনে!
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,

পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে ?
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী, শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় লইও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসিগণে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।"

বর্ত্তমনে প্রবন্ধের আলোচ্য দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হওয়ার সমস্ত উপকরণ ও উপদেশ এই সঙ্গীতটির মধ্যে উদ্দিষ্ট আছে।

সেই অমৃত নিকেতন লাভ করিবার প্রথম উপায় সত্যের অনুসরণ করা। সত্যই অনশ্বর শাস্ত্র। সত্য যে পরিত্যাগ করে তাহার অমৃত লাভের আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। আমরা জীবনে কতভাবে, কতরূপে সত্যের হতাদর করি, অনৃত আশ্রয় করি, তাই আমরা গম্যস্থানে পৌছিতে পারি না। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে কতভাবে অসত্যের প্রশ্রয় দেই এবং আত্মাকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করি ভাবিয়া চমকিয়া উঠি। সত্য অনুসরণ না করিলে, আমাদের যাত্রাই আরম্ভ হয় না। যাত্রীদিগের প্রধান সম্বলই সত্যানুসরণ করা।

দ্বিতীয় উপায় প্রেম অর্জ্জন। সার্ব্বভৌমিক প্রেম। জীবনময় ভালবাসা চাই। ভালবাসা এই যজ্ঞের আহুতি। প্রাণে প্রেম না জন্মিলে সমস্ত সাধনা নিরর্থক হয়। যিশু বলিয়াছেন—"যদি ঈশ্বর আরাধনা করিতে চাও তবে তোমার ভাইএর সঙ্গে মিল করিয়া আইস। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা একটি লোকও বিদ্বেষের চক্ষে দেখি ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার উপাসনা হয় না।" এই প্রবচনটি কত মূল্যবান।

তৃতীয় উপায় রিপু সকল বশীভূত করা। সংযতেন্দ্রিয় হওয়া সব চেয়ে বেশী আবশ্যক। চিত্তবৃত্তি সকল বশীকৃত না হলে ধর্ম্মপথে তাহার চলা বিড়ম্বনা। আত্মসংযম ও ধীরতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে, ঈশ্বরে মনোনিবেশ আকাশকুসুমবৎ প্রহেলিকা। এই সংসার যে ভীষণ পরীক্ষার স্থান। তাই কথিত আছে—বিকার হেতৌসতি বিক্রীয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, ইন্দ্রিয় চঞ্চল, সে ধর্ম্মপথের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অসমর্থ। মুসলমান তাপসগণ বলিয়া থাকেন—"সাধক যখন অমৃত অনুসন্ধানে উপাসনা মন্দিরে ছুটিয়া যায়, অসংযত ব্যক্তি তখন গাড়ু হস্তে শৌচাগারে গমন করে।"

চতুর্থ উপাদান সাধুসঙ্গ করা। সাধুসঙ্গ দ্বারা কলুষিত চিত্ত পবিত্র হয়। চৌম্বকাকর্ষণের মত সাধুসঙ্গ দ্বারা অপবিত্র চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পবিত্রীকৃত হয়। সাধুসঙ্গের মহিমা অতুলনীয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার মাধুর্য্য ও উপাদেয়তা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পঞ্চম অথবা শেষ উপাদানই সার উপদেশ। যদি ইহাতেও তুমি সেই পথ অনুসরণ করিতে বিফল মনোরথ হও, নানা প্রকার বিভীষিকা তোমাকে আক্রমণ করে, ভীত হইও না, চঞ্চল হইও না; গন্তব্য পথ হইতে চ্যুত হইও না, বাধা বিপত্তি দর্শনে পিছু হটিও না; পথ শত কণ্টকাকীর্ণ হউক ধীর পদবিক্ষেপে ক্লান্ত হইও না। যদি দেখ তোমার পরাজয় নিশ্চিত, তখন উর্দ্ধদিকে বাহু দুইটি তুলিয়া তাঁহারই দোহাই দিবে; তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, ইহাই শেষ উপায়। তিনি যদি তোমাকে ব্যাকুল চিত্ত দেখেন তিনি অবশ্যই তোমাকে সেই দুর্গম পথ উত্তীর্ণ করিয়া গৌরবমণ্ডিত সিদ্ধিস্থানে উন্নীত করিবেন।

একবার তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলেই তোমার ভয় ভাবনা, অপ্রেম অশান্তি, হিংসা বিদ্বেষ দূরে ছুটিয়া পলায়ন করিবে।

এই দুর্গম পথ পার হইয়া সংসারের কত লোক পরাশান্তি লাভ করিয়াছে। কত লোক সংসারের প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য, সুখসমৃদ্ধি বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনালেখ্য পাঠ করিলে, আমরা যেন আর অলস ও উদ্যমহীন থাকিতে পারি না।

হায়রে, এই পথের সন্ধান ত অনেকেই জানেন, আমরা ত কতভাবে কত সময় এই পথের অনুসন্ধান পাইতেছি, কিন্তু আমাদের বিমূঢ়াত্মা কেন জাগেনা, অবশ প্রাণ কেন এখনও নিদ্রিত রহিয়াছে! জাগিয়াও জাগিতেছে না?

আপনারা অনেকেই ফকির লালাবাবুর কথা অবগত আছেন। তিনি ঘোরতর সংসারী ও একজন ধনবান গৃহস্থ ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও তিনি যেন কোন প্রকার শান্তি পাইতেছিলেন না। তাহার বসত বাড়ীর নিকট একজন রজক বাস করিত। সে একদিন সন্ধ্যার

সময় তাহার কন্যাকে বলিয়াছিল, “বাসনাতে আগুন লাগাও।” কাপড় পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। সেই কথা লালাবাবুর কর্ণে অন্যভাবে পৌঁছিল। তিনি শুনিলেন—বিষয় বাসনায় আগুন লাগাও। এই প্রেমের খেলা কে বুঝিবে? তিনি দিবানিশি কতভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন, আমরা ত লক্ষ্য করি না। মৃত্যুযাতনার মধ্যেও যে তিনি, আমরা ত ধারণাই করিতে পারি না। লালাবাবু বুঝিলেন—বিষয় বাসনায় আগুন দিতে হইবে। দেখুন, অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত, কত সুখ সমৃদ্ধিতে পরিবর্দ্ধিত, কোন অভাব তাঁহার ছিল না, তিনি নগ্নপদে, একখানা ছিন্ন বস্ত্রমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন; পরিবার-পরিজন হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই আকুল আহ্বানে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অজানা দেশের উদ্দেশ্যে দুর্গম পথ অনুসরণ করিলেন। সেই একটি কাথাতে—“বাসনাতে আগুন লাগাও” তাঁহার সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার সকল সংশয়, সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত বিচিকিৎসা চিরদিনের জন্য দূরে পলায়ন করিল।

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।”

তাঁহার অনুসন্ধান পাইলে সমুদয় সংশয় ও সন্দেহ ছিন্ন হয়, মোক্ষ প্রতি-রোধক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। উপনিষদের এই উক্তির সার্থকতা দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়া যাই। বাস্তবিক যদি একবার আমাদের সংশয় ছিন্ন হয়; তিনিই যে পরাশান্তি সুখস্বরূপ, চিরসুন্দর অমৃত নিকেতন আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারি, তবেই আমরা মানব জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হই।

জীবনের প্রদোষ সময়ে ঋষিদিগের এই দুর্গম পথের কথা শুনিয়া যেন আর ভীত না হই। দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইলে যে আমাদের জন্য শাশ্বত সুখ রহিয়াছে, কত আনন্দ, কত অমৃত, কত সমৃদ্ধি, কত প্রেম, কত পুণ্য, কত সন্তোষ, কত শান্তি, কত স্নেহ, কত ভালবাসা পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, আমরা যেন তাহা স্মরণ করিয়া অগ্রসর হই। কণ্টক দেখিয়া যেন আর ভীত হই না। ঋষিরা যে এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের মত দুরত্যয় বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া যেন আমরা সেই পথ পরিহার না করি।

ঋষিগণ সেই পথকে দুর্গম পথ বলিয়াই আবার বলিয়াছেন সেই পথের যিনি অধিগম্য তাঁহাকে জানিলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসনিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তংমৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।"

যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য অরস, গন্ধহীন, এবং অনাদি অনন্ত মহতত্ব হইতে অন্যতর ও ধ্রুব, তাহাকে জানিলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।

ব্রাহ্মণশিশু নচিকেতা মৃত্যু কর্ত্তৃক এই বিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীউমাচরণ সেন।

স্বপ্ন।

কি অপূর্ব্ব রস নাথ! করিলে সঞ্চার!
ঘুচিল মোহ কু আশা জাগিল কি প্রেম-আশা
এত দিনে পরাজিত মন্মথ-বিকার॥
অই করি দরশন কালিন্দী তরঙ্গে যেন
স্বচ্ছ শুভ্র ফেন ভঙ্গচয়।
অদূরে পুলিনে তাঁর তালতরু শোভাধার
সারি সারি কি সুষমাময়॥
কিছু দূরে দেখা যায় কদম্ব পাদপ হায়!
ঘুম-ঘোর ভঙ্গ হ'ল কেন?
তার অতি সন্নিকটে দাঁড়ায়ে ত তুমি বটে
শিখি-পাখা পরশে গগন॥
কিন্তু নাথ! মরি দুঃখে বজ্রপাত হয় বুকে
চরণারবিন্দ অদর্শনে।
বুঝিলাম ভাগ্যমম নহে প্রসন্ন এখন
তাই পদ না দিলে নয়নে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তব করিলাম অনুভব
চরণের উপরে চরণ।
বেণু ধরা দুই কর লোচনে হ'ল গোচর
কিন্তু বেণু না হ'ল দর্শন॥
অথচ মুরলী রব আস্বাদি', অনর্থ সব
সিংহরবে করী সম ধায়।
সুষুপ্তি হইল ভঙ্গ জাগিল জীব-বিহঙ্গ
রঙ্গরসে রহিনু শয্যায়॥

অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু উথলিল প্রেমসিন্ধু
শয্যা হ'তে উঠিবারে নারি।
পুরুষত্ব গেল ঘুচে উপাধানে আঁখি মুছে
আজি হ'তে হইলাম নারী॥
জানিলাম শুধু তুমি রসের আকর ভূমি
লীলা কর প্রকৃতির সহ।
নিত্যরাস সিদ্ধ হ'ল এতদিনে জ্ঞান হ'ল
ব্রজ পরিকর নিত্য দেহ॥
মদন রাজার দায় বহুবার রাঙ্গা পায়
করিয়াছি আত্ম-নিবেদন।
এবে সত্যভামা-পতি দীন সত্য প্রাণপতি
করিলে সে প্রার্থনা পূরণ॥
এবে যাচি এই বর যেন মোর নিরন্তর
এই ভাব জাগে হিয়া মাঝে।
যেন স্মৃতিপট হ'তে এই চিত্র মুছে দিতে
রতি-পতি সমরে না সাজে॥
শোকে সুখে যেই ভাবে যত দিন আসি ভবে
যেন নাথ! তোমারে না ভুলি!
প্রভাতা হইল নিশি গৃহকর্ম্মে যায় দাসী
অর্প শিরে রাঙ্গা-পদ-ধূলি॥

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

নির্ভর।

হৃদয় আমার শূন্য—মরুভূ উষর,
নাহি রস, নাহি ছায়া, জলন্ত কঙ্কর!
ঊর্দ্ধে রাখিয়াছি আমি, দিবস রজনী
এক বিন্দু বারি-তরে অতৃপ্ত চাহনি;
বুক-দগ্ধ ব্যথা নিয়ে কত দিন বল,
প্রভু মোর, তব কাছে যাচি 'জল জল'!
শুষ্ককণ্ঠ, ভাষাহীন, সঙ্গীহীন আমি,
মাগি একটুকু আশা দয়াময় স্বামী!
যদি তুমি নাহি দাও, নাহি তাহে ক্ষতি—
হৃদয় পুড়িয়া যাক্, নাহি অন্য গতি!

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

দোলযাত্রার তত্ত্ব।

নির্ম্মল, নির্ম্মেঘ গগনপথে বিশাল রজতস্থালীর ন্যায় পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন; সেই স্থালী হইতে অনবরত অজস্র ধারায় কৌমুদী রাশি ধরাবক্ষকে পরিস্নাপিত করিতেছে, মলয়পবন—ধীর মন্থর বেগে তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ লতা গুল্মকে আন্দোলিত করিতেছে,—দূরে আম্র কাননে নবমুকুলিত পল্লবে কৃষ্ণদেহ গোপনে রাখিয়া পিককুল পঞ্চম তানে কুহু রব করিতেছে, আর চারিদিকে মল্লিকা, যুথী, যাঁতী, বেলা প্রভৃতি কুসুম-গন্ধে এই অপূর্ব্ব শোভাকে সৌরভময় করিয়া তুলিতেছে। বসন্তের এমন অতুল্য নিশাকালে দোল পূর্ণিমায় উৎসব হয়। এমন পুণ্যময়ী বসন্ত পূর্ণিমা! অয়ি শুভে! অয়ি জগত কল্যাণকারিণি, এস! অয়ি মঙ্গলময়ি, অয়ি কলুষনাশিনি! এস—আসিয়া ভারতের মলিন জীবের হৃদয় বিধৌত করিয়া তোমারই ন্যায় শীতল স্নিগ্ধ এবং শুভ্র করিয়া লও।

পুণ্যময়ি! ঐ দেখ তোমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রকৃতি কত আয়োজন করিয়াছে, আকাশকে শিশিরমুক্ত করিয়া তাহাতেই নূতন মনোহর নীল বর্ণের চন্দ্রাতপ শোভিত করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগমে উহাতে অসংখ্য উজ্জ্বল হীরক-ফুল বসাইয়া কেমন নয়ন-মনমোহকর শোভা প্রদান করিয়াছে। তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্ফূর্ত্তিহীন নিরানন্দ তরুগুলিকে সাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। উহারা কেহ শ্যামল, শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পের সম্ভার লইয়া তোমারই অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ সকল অভিনব সাজসজ্জা, জগৎ ভরা এ মহা সাজের মহা আয়োজন তোমারই জন্য—পুণ্যময়ি এস। কল্যাণদায়িনি! ঐ দেখ মলয়ানিল কত আবেগ-ভরা প্রাণে, কত পুলকভরা হৃদয়ে তোমারই শুভ আগমন বার্ত্তা ঘরে ঘরে বিঘোষিত করিয়া দিতেছে উহাতে আর আনন্দ ধরে না। ঐ দেখ গাছের পাশে, পাতাটীর নিকটে, ফুলটীর কানে কে যেন কি এক আনন্দ সংবাদ বলিয়া যাইতেছে, আর উহারা পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। ঐ দেখ উহার পুলক স্পর্শে শীতশীর্ণ নদনদীর বিষণ্ণ মুখে কেমন হাসির আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ

আবেগ, এ পুলক তোমারই আগমন বার্ত্তা স্মরণ করিয়া—এস আনন্দদায়িনি পৌর্ণমাসি এস।

পুণ্যদে বসন্ত পূর্ণিমে! আজ সে বহু শতাব্দীর কথা একদিন তুমি এমনই মনোহর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে ব্রজ কিশোরীগণের মন হরণ করিয়াছিলে। তাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী যুগল-রূপে দোল মঞ্চে দাঁড়াইয়া সেই নিশীথে সোহাগের আন্দোলনে সমান্দোলিত হইয়া সেই মুগ্ধা প্রেমাকুলা কিশোরীগণ লইয়া ফাগু খেলিয়া শ্যামল বৃন্দাবনকে রক্তিম করিয়া দিয়াছিলেন।

মনোহারিণী ফাল্গুনী পূর্ণিমে, সে শুভদিনের—সেই আনন্দের দিনের কথা মনে পড়ে কি? তাহা কেবলই আন্দোলন নহে; উহার সঙ্গে অনুরাগের রক্তিম বিকাশ আছে- হোলি খেলা আছে, আবিরের বাহার আছে, প্রীতি কুঙ্কুমের আদান প্রদান আছে, আদি রসের সম্যক বিকাশ আছে। তাই একদিন মহাকালী পাঠশালায় বসিয়া আমাদের স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী বলিয়াছিলেন ইহাই তখনকার মদনোৎসব, ইহাই দোল পূর্ণিমা, ইহাই ভারতের হোলি। তাই ভক্ত কবি বলিয়া গিয়াছেন,—সেই :—

"শ্যামল বিপিন স্থল, শ্যামল যমুনা জল
শ্যাম তরু লতা কিশলয়।
শ্যাম শিখী ভৃঙ্গ পিক, শ্যামময় দশদিক
আবির কুঙ্কুম রাঙ্গা হয়॥
রাঙ্গা তমালের গাছে রাঙ্গা মধু খেয়ে বুলে
শ্যাম ঘুচে রাঙ্গা হল সব॥
আপনি সে শ্যামরায়, রাঙ্গা বাস রাঙ্গা কায়
রাঙ্গা ধড়া রাঙ্গা চূড়া বাঁশী।
রাঙ্গা মণি রাঙ্গা আলো, গলে রাঙ্গা বনমাল
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা সে তুলসী॥"

বসন্ত পূর্ণিমে! মনে পড়ে কি? সেই দিন হইতে, সেই পবিত্র তিথি হইতে তুমি দোল পূর্ণিমা নাম ধারণ করিয়া জগৎবাসীকে মহা আনন্দ দান করিয়া আসিতেছ; সেই দিন হইতে তোমার পুণ্য কাহিনী স্মরণ করিয়া কত আবীর, কত কুঙ্কুম জল স্থল অন্তরীক্ষ রাঙ্গা করিয়া আসিতেছে। ঐ যে তুমি সেই দিন শ্যামরায়ের শ্যাম অঙ্গ ঘুচাইয়া রাঙ্গা মূর্ত্তিটী গড়িয়াছিলে;—ভুবনপাবন,

প্রেম ভক্তি প্রদাতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব যে দিন ব্রজধামে দোললীলা করেন সেই শুভদিনের পুণ্য স্মৃতি এখনও প্রতি বর্ষেই সমগ্র ভারতের ভক্তগণের হৃদয়ে জাগরুক আছে।

কেন এমন উৎসব? কেন এরূপ আবির খেলা? কেন এরূপ আন্দোলন। গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে আজ কয়েক বৎসর হইল মহাকালী পাঠশালায় বসিয়া পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টি বিকাশের এক একটী স্তর আমাদের এক একটা উৎসবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া সৃষ্টি। পুরুষ অবস্থান মাত্র, অস্তিত্বদ্যোতক অজ্ঞেয় প্রভাবের ব্যঞ্জনা মাত্র; প্রকৃতি গতি ও শক্তি। এই দুয়ের সমবায়ে সৃষ্টির বিকাশ। "আমি আছি" বলিয়া পুরুষ প্রথমে স্বীয় অস্তিত্বের ঘোষণা করেন; পরে "এক আমি বহু হইব বলিয়া" সেই অস্তিত্বের সার্থকতা সম্পাদন জন্য চেষ্টার অভি-ব্যঞ্জনা করেন। সেই অপূর্ব্ব অভিব্যঞ্জনার প্রভাবে শক্তির বা প্রকৃতির উন্মেষ হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি পুরুষহৃদ্‌বিলাসিনী হইয়া মায়ার বিস্তার ও সৃষ্টির বিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। এ বিকাশ, কম্পন,—স্পন্দন আন্দোলন জন্য। এই কম্পন প্রকৃতির পুরুষ প্রতি নিধ্রুবণ মাত্র—ইহাই সৃষ্টির আদি লীলা। ইহাই আমাদের দোলযাত্রা।

মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী আরও বলিয়াছেন যে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, অণু পরমাণুতে, জড় পদার্থে ও জড় শক্তিতে, গগনে পবনে, জ্যোতিতে ও অন্ধকারে—সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবয়বে, সর্ব্ববিষয়ে পুরুষ প্রকৃতির এই স্পন্দন বা নিধ্রুবন চলিতেছে। এই নিত্য স্পন্দনে অনুরাগ বিকাশ আছে, আর প্রকৃতির প্রতি পুরুষের মর্ম্মভেদী আহ্বান আছে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বংশী রব। যেখানে এই পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা সেইখানেই বংশীধ্বনি—মধুর রাধানামের দ্যোতনা। ভগবৎ ভক্তগণ! চাহিয়া দেখ, সৃষ্টি জগতের ভিতরে ও বাহিরে, গুপ্তে ও ব্যক্তে, এই লীলাই চলিতেছে। এই স্পন্দন ও কম্পন, এই আহ্বান ও অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের দোল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, মুরলীধর, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন। জ্যোতিঃরেখার সর্ব্ববর্ণের সমন্বয় শ্যামেই হইয়া থাকে, তাই তিনি শ্যামসুন্দর। অজ্ঞেয়, অনন্ত বলিয়া তিনি শ্যাম, অপরিবর্ত্তনশীল পূর্ণ-স্বরূপ বলিয়া তিনি শ্যাম। হরিত, পীত, কপিশ, পাটল, রক্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের সদাই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; সুতরাং উহারা খণ্ড বর্ণ—অংশরূপ বলিয়া

উহাদের বিকাশ দামিনী-দীপ্তির ন্যায়—এই আছে এই নাই। কিন্তু শ্যাম নিত্য সিদ্ধবর্ণ। গগনের শ্যাম নিত্য, অনন্ত বারিধিবক্ষের শ্যাম নিত্য। সংসারের যে দুইটী অনন্তের অনুমেয়, বহুকাল স্থায়ী বলিয়া অপরিবর্ত্তন-শীল, সেই দুইটিই আকাশ ও সমুদ্র—শ্যাম-শোভায় নিত্য বিরাজিত। জগন্নাথে শ্যামরূপের আভা পাই অতএব ইহারা উভয়েই নিত্য শ্যামায়মান। তাই ঠাকুর আমাদের শ্যামসুন্দর নব-নীরদ-নিন্দিত-কান্তিধর। সেইজন্য তিনি মদনমোহন। যে শক্তি সৃষ্টির আদি—সৃষ্টির মূল—যাহার প্রভাবে অণু অণুতে সংলগ্ন, স্তরে স্তরে প্রস্তর সাজাইয়া গিরিরাজের সৃষ্টি, যাহার আকর্ষণে পৃথিবী তরল বক্ষের উদ্বেল চাঞ্চল্যে চন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়, সূর্য্যমণ্ডলস্থ গ্রহ উপগ্রহাদি কেবল বিবস্বান্‌কে প্রদক্ষিণ করিতেছে—সেই মার শক্তির মোহনকারী, তিনি শ্যামসুন্দর। কেন না তিনি পুরুষ, আব্রহ্মতৃণ-স্তম্ব পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, অনন্ত অনাদি, অজ্ঞেয় ও অপরিমেয়, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান ধাতা, পাতা, রক্ষকর্ত্তা—তাঁহাতেই মনন শক্তির বিকাশ পর্য্যবসান হয়। তিনি ব্যতীত সংসার নাই—বিশ্ব বিকাশ নাই, তাই তাঁহাকে ছাড়িয়া মদনের বিকাশ অবলম্বন নাই। এইহেতু তিনি মদনমোহন। পুরুষপ্রধান তিনি, মদন তাঁহাতেই দগ্ধ, তাঁহাতেই প্রকট এবং তাঁহাতেই বিলীন থাকে। তিনি দ্বিভুজ, সৃষ্টির বাম ও দক্ষিণ, বিরহ ও মিলন,—বিক্ষেপ ও বিন্যাস,—আলিঙ্গন ও প্রত্যাখ্যান—বিস্তার ও সঙ্কোচ—পজিটিভ ও নেগেটিভ, এই দুই শক্তি সম্পন্ন। আর এই দ্বিভুজের উপর সোহাগের আহ্বানের মুরলী বংশী বিরাজ করিতেছে। ধাতার সৃষ্টি যে শক্তির উপচয়ে রক্ষিত হয়, বংশী অনবরত সেই রাধা শক্তির আহ্বান করিবেছে।

দেহগত ষট্‌চক্রের আজ্ঞাপুরে ও অনাহতে অনবরত বংশীর এই অশরীরী বাণী ধ্বনিত হইতেছে, সৃষ্টির ষট্‌চক্রে অনাহতে সে ধ্বনির বজ্র গম্ভীর নিনাদ হইতেছে, আর গুপ্ত বৃন্দাবনের, সৃষ্টির সূক্ষ্ম অনুরাগ ক্ষেত্রের—হৃদয়ের ভাবমেদুর গুপ্ত কেন্দ্রের দোলমঞ্চে এই বংশীরব অনবরত হইতেছে। সাধক শুনিতে চাহেন যদি, সামর্থ্যে কুলায় যদি—তবে এই নিত্য গুপ্তধ্বনি শুনিয়া জন্ম সার্থক করুন।

আ, মরি, মরি—কি জগন্মোহন রূপ! শ্যামসুন্দর মদনমোহনের পার্শ্বে শক্তিরূপিনী শ্রীমতীর অবস্থান—যেন তড়িল্লতাবলম্বিত নবনীরদ, যেন ভাস্কর ময়ূখমালা-বিজড়িত নীল আকাশ, যেন প্রভাত কিরণে সমুদ্র-জলতরঙ্গ,

যেন পুষ্পিত কাঞ্চন তরু। শ্রীমতী রাই বিকাশময়ী, তাই কনকরূপিনী, হেমাঙ্গিনী। ঘোর তামসায় আকাশ ভরা মেঘের বিকাশ যেমন ঘন ঘন দামিনী দীপ্তিতে ঘটিয়া থাকে, তেমনি ঘোর অজ্ঞেয়তায় শ্যামসুন্দর রূপ, সৃষ্টি চাতুরীর গতি-শক্তি-বল্লরী বিস্তারে শ্রীমতীর ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠামে প্রকট হইয়াছে। আকাশের বিদ্যুৎ অতি চঞ্চল, ক্ষণপ্রভাযুক্ত। কিন্তু যুগলরূপের শক্তির বিকাশ ঠিক যেন স্থির দামিনীদপ্তি, নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা। দুই বাঁকা—শ্যামও বাঁকা রাধাও বাঁকা। আকাশের নবনীরদ নানা বক্র-রেখায় বিস্তীর্ণ আর বিদ্যুদ্বিকাশও নানা বক্ররেখায় প্রদীপ্ত। সৃষ্টি চাতুরীর তিন মোড়ে তিনভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠাম হইয়াছে। "আমি আছি" বলাতেই প্রকৃতির প্রথম বিস্ফুরণ, "এক আমি বহু হইব" বলাতেই প্রকৃতির প্রথম আলিঙ্গন. "সেই আমি আর তুমি উভয়ে আছি" এই কথাতে প্রকৃতি পুরুষের নিত্য মিলন; স্পন্দন, আলিঙ্গন, স্ফুরণ,—আর অনুরাগ, নিক্কণ ও সম্মিলন,—পুরুষ ও প্রকৃতির শ্রীরাধাকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গের এই তিন অবস্থান। ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শক্তির প্রকারান্তর মাত্র—সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের তিনটী অবস্থান মাত্র।

কেবলই কি জড়জগতে দোলের প্রভাব পরিব্যাপ্ত? প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে দোল, সমাজে দোল, নরনারীর মধ্যে দোল। প্রেমে এই দোলের বিকাশ, সমাজের উন্নতি ও বিস্তৃতিতে এই দোলের অভিব্যক্তি, নরনারীর প্রণয়ে এই দোলের পর্য্যবসান হয়। নাম, রূপ ও রস—এই তিন লইয়া দোলের উৎসব। শ্যামসুন্দর মদনমোহনের নাম আছে, আর সেই নাম জন্য ভক্তকল্পিত রূপ, আর আছে রস—যাহার সাহায্যে ভক্ত ইষ্ট সাক্ষাৎকার করিতে পারে। কে তুমি—কেমন তুমি তাহা জানি না, তবে আমার সংসারদাবদগ্ধ হৃদয়ে সজল জলদ কায়া ধরিয়া তুমি দেখা দিলে আমার সকল জ্বালা জুড়ায়, তাই তুমি আমার জীবন-নিদাঘের নীরদবরণ। তোমার স্পর্শে, তোমার সান্নিধ্যে আমার হৃদয়ের সকল রস যেন শত ধারায় ছুটিয়া বাহির হয়, মনে হয় হৃদয়ের শোনিত ধারা প্রেমের পিচকারীতে ভরিয়া তাহার দ্বারা তোমার চরণ কমল অনুরঞ্জিত বিধৌত করিয়া দিই, তুমি দেবতার দেবতা, আমার তুষ্টি ও তৃপ্তি, আমার ইহকাল ও পরকাল,—এই স্থবির জড়ভাবাপন্ন হৃদয়ে এমন ভাবের প্রকম্পন ঘটাও—এমন দোললীলার বিস্তার কর, যাহাতে জন্ম সার্থক হয়। বুঝিনা তোমার সৃষ্টি চাতুরী—কিন্তু বুঝি

এই, যে সৃষ্টির এই রূপ-সাগরের মধ্যে থাকিয়াও প্রাণ কি যেন চায়, এই রূপ-রসগন্ধস্পর্শের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও যেন কিসের অভাবে প্রাণ উদাস হইয়া উঠে। যাহা চাই তাহা পাই না, তাই যা-তা চাহিয়া থাকি, যাহা পাইলে আর চাহিবার কিছু থাকে না, সে ত তুমি। দোলমঞ্চে, রাসমঞ্চে, কদম্বতলায় কত স্থানে কতভাবে তোমার রূপ কল্পনা করি, তবুও কিন্তু তোমাকে পাই না। পাই না বলিয়াই প্রাণের আন্দোলন ঘুচে না। তাই দোলপূর্ণিমার দিনে নিত্য বিরহবিদগ্ধ হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার উদ্বেলন হইতেছে, তাহা ত চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। চাপা যায় না—চাপা থাকে না বলিয়াই এমন অরুন্তুদ হাহাকারের নিত্য পারম্পর্য্য। ফলে নয়নময় হইয়া—বিশ্বের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্বে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা মহোৎসবটী খুব সমারোহে এখনও পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। হিন্দুর পক্ষে ইহা অতি পুণ্য দিন। শাস্ত্র বলিতেছেন "বিশেষতঃ কলৌযুগে দোলোৎসবো বিধীয়তে।" কলিকালে যে হরির নাম ভিন্ন জীবের অন্য উপায় নাই, যে দয়াল ঠাকুর জীবের পাপ তাপ হরণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন, বিপদকালে যে মধুসূদন জীবের কাণ্ডারী সেই শ্রীগোবিন্দকে দোলমঞ্চে রাসেশ্বরী রাধিকার সহিত দর্শন করিলে জীবের ভববন্ধন আর থাকে না। তাই দার্শনিক প্রবর জৈমিনী ঋষি বলিয়াছেন ;—

"ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহন মুত্তমম্
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দ লোকানুগ্রহণায় চৈ ॥
তস্মিনকালে হরিং দৃষ্টা সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

তাই এই পবিত্র ব্রজভূমি দর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু মাত্রেই বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ প্রতি বৎসর এই সময়ে ভগবানের এই লীলাভূমিতে আসিয়া থাকেন। এই ব্রজধামের পরিমান চৌরাশি ক্রোশ।

ভক্তেরা যেভাবে যে চক্ষে পবিত্র স্থান দর্শন করেন, অন্য লোকে সেই ভাবে সেই চক্ষে এ স্থান না দেখিলেও এই স্থানে তাহাদের দেখিবার উপযোগী অনেক বিষয়ই রহিয়াছে। অন্যান্য তীর্থস্থানে মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয় পদার্থ কিন্তু ব্রজধামের দর্শনীয় ব্রজবাসী, যমুনা, হরিণ, ময়ুর, বানর ও বন। এক কথায় বলিতে গেলে এখানে প্রকৃতির লীলাখেলা। যাহারা ব্রজে আসিয়া কেবলমাত্র বৃন্দাবনের সহরাংশ ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঞ্জ দেখিয়া ফিরিয়া যান তাঁহাদের শ্রীবৃন্দাবন দেখিতে আসা বিশেষ ফলদায়ী নহে।

...প্রাণে ধর্ম্মের কাব্যাংশ কিছুমাত্র আছে, তাঁহারাই যেন ব্রজধামে ... এবং নগর বৃন্দাবন দর্শন পরিবর্ত্তে তাঁহারা যেন ব্রজের গ্রামে গ্রামে ... যমুনা, হরিণ, ময়ূর, বৃক্ষ, লতা, বন, কুঞ্জ প্রভৃতি দর্শন করেন। যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহারা কখনও এ পবিত্র স্থান দর্শন আশা ত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি ভক্ত, তিনি জ্ঞান ...লিত করিয়া দেখিয়াছেন যে এই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিশ্বের কালিমা আবিরে বিনষ্ট হইয়া বিশ্ব লোহিতাভা ধারণ করিয়াছে। ভক্তিভাবে ...ক্ষু উন্মীলিত না হইলে মানব প্রকৃতি পুরুষের এই অপূর্ব্ব দোললীলা ...তে পারে না। তাই আমাদের ঠাকুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভাতুড়ী মহোদয় ...দের সর্ব্বদাই উপদেশ দেন—"একবার এই পুণ্যদিনে পূত দোলমঞ্চের ...থে দাঁড়াইয়া হৃদয় ভরিয়া সেই সর্ব্বজীবহৃদয়বিহারী হরিকে ডাক।" ... তিনি কলিকাতাতেই শ্রীবৃন্দাবন করিয়া তুলেন। প্রতি বৎসর এই সময়ে ...য় সভার এই উৎসব হয়।

আমাদের আর্য্য শাস্ত্রে কথিত আছে—আমাদের ন্যায় অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া সেই অধমতারণ পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে বলিয়াছেন ...—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

"হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়েও বাস করি না, ...ার ভক্তগণ যেখানে নাম গান করেন, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি। ... আমাদের গুরুদেব মহাত্মা ভাতুড়ী মহাশয় বলেন এই দোলমঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পতিতের সখা, কাঙ্গালের বন্ধু, অনাথের নাথ, দীনের দয়াল, ...দের কাণ্ডারী ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানকে ভক্তিভাবে ডাকিয়া জীবন ...া কর। আমাদের কাতরকণ্ঠে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ হইলে সেই ...দবারণ কাঙ্গাল শরণ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তাই ...ন কলিকাতায় তাঁহার স্থাপিত সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় মহা-সমারোহে ...ললীলা উৎসব করিয়া থাকেন। সাধনার এমন সুগম পথ থাকিতে ...াতে আমরা পরকাল ভুলিয়া পাপের পরপারে ডুবিয়া না মরি সেই জন্য ... মহাপুরুষ এ কলিকাতাতেই শ্রীবৃন্দাবনধাম করিয়া তুলেন। তাই স্বয়ং ...ানই বলিয়াছেন যে, সকল সাধনার সিদ্ধিলাভ সাধকের শক্তি সাপেক্ষ,'

কিন্তু ভক্তি সাধনায় সাধক কখনই সাফল্য লাভে বঞ্চিত হন না। ত
আমাদের গুরুদেব শ্রীমান মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয় তাঁহার শি
বর্গের মধ্যে সকলকেই ভক্তি সাধনার কথাই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন। এ
সাধনায় জ্ঞানী অজ্ঞান, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমান অধিক
এই নিমিত্তই সেই অলৌকিক প্রতিভাশালা নিখিল জনগণ মঙ্গলাকা
ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত—জীবন প্রাতঃস্মরণীয় পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ ভাদু
মহাশয়, এই সংসার দাবানলদগ্ধ জগজ্জীবের শান্তি বিধানের নিমি
কলিকাতাতেই শ্রীবৃন্দাবনধাম করিয়া তুলিয়াছেন।

সে আজ অনেক দিনের কথা কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত
হইবার পূর্ব্বে যখন মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী এখানে প্রথম আগমন করে
সেই সময়ে অনেক সাধু মহাত্মা ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, বিদ্বান ধনী দরিদ্র সকল
শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হন সেই সময়ে আমাদের
ঠাকুরও তাঁহার নিকট যাইতেন। তিনি এই মহাত্মাকে প্রথম দর্শন করিয়াই
আগ্রহের সহিত মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"এ মহাপুরুষ বাঙ্গালী
ব্রাহ্মণ! আমি জানিতাম না যে বাঙ্গালীর মধ্যে একাধারে এত গুণ-সম্পন্ন
ব্যক্তি এখনও আছেন। সেই তপস্বিনী মাতাজী এই পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত
জীবন মহাপুরুষকে দেখিয়া কিরূপ প্রীত হইয়াছিলেন তাহা এ সামান্য
লেখনী দ্বারা ব্যক্ত হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন একাধারে ভাদুড়ী মহাশয়ের
ন্যায় এরূপ যোগী ও বিদ্বান, ভক্ত ও পণ্ডিত কখনও পূর্ব্বে দর্শন
করেন নাই। আমরাও আজ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই কলিকাতা
মহানগরীর মধ্যে "সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী" নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত
করিয়া আজ সেখানে শ্রীবৃন্দাবন করিয়া তুলিয়াছেন। শুষ্ক ধর্ম্মের উত্তপ্ত
সৈকতপ্রান্তরে দয়াল ঠাকুর তাঁহার উপদেশামৃত ধারাবর্ষণে যেমন ভক্তির
স্নিগ্ধ ধারাবর্ষণ করিলেন, আর তাহা শত শত ভক্তের প্রাণকে ভাসাইয়া,
গলাইয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় শান্তিলাভে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তর তর বেগে
প্রবাহিত করিল যে ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল হয় যেখানে বিশ্বাসের
শীতল সমীর শরীর মনকে স্নিগ্ধ করে গুরুদেব, ভক্ত শিষ্যগণকে সাধনায় সেই
পথে লইয়া যান। সেই অমিয় শীতল ভক্তির প্রভাবে জীব জগতের দুঃখ
দুর্ভোগ ক্রমশঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যে নিবিড় জলদের অপার
করুণা-ধারা সম্পাতে এরূপ অভাবনীয় সুখশান্তির তরঙ্গ উঠিল সেই জলদের

[illegible] কৃষ্ণের দোললীলার বিষয়ে স্বামিজী যাহা ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শ্রবণে [illegible] অভক্ত সকলেরই মন বিমোহিত হইয়া গেল। এই প্রতিভাসম্পন্ন [illegible] মহাত্মার শিষ্য হইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইল; বস্তুতঃ আমাদের [illegible]ত ভক্ত শিষ্য হইতে পারিলে দেহাভিমান থাকে না। দেহাভিমান অপগত হইলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধিতেই জ্ঞানের প্রসারতা এবং সেই প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সচ্চিদানন্দের অংশকলা। সুতরাং জীবের স্বরূপ নিত্য ও আনন্দময়। অবিদ্যার অজ্ঞানাবরণ জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়া জীব সংসারে বন্ধন জনিত দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু জ্ঞানের অনুশীলনে মুক্তি সহজে লাভ হইতে পারে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগ সুখ সহজে পাওয়া যায় কিন্তু এরূপ সাধন সহস্র দ্বারা ও [illegible]

[illegible] সুতরাং উপাধিশূন্য। কিন্তু মুক্তি স্বতন্ত্র কামনা বিশেষ, [illegible] এতএব মুক্তি সুখ ঔপাধিক সুখ। মুক্তি ভক্তিসুখকে [illegible] ভক্তগণ ইহাকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করেন। ঠাকুরের [illegible]ামৃত শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ কর[illegible]ারে এত মজিয়া রহিয়াছি যে নিজের কিসে মঙ্গল হ[illegible]ক্তি আমাদের নাই! আমরা যদি ক্ষণকালের জন্যও [illegible]করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারি তাহা হইলে সেই দীনদয়াল পতিতপাবন অনাথের নাথ নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। তাঁহার সেই কৃপার কণামাত্র লাভ করিতে পারিলেই আমাদের দুঃখ [illegible]। অতএব হে ভাই সকল, এস আমরা এই শুভদিনে— দোল [illegible]ন পবিত্র মনে ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি। [illegible]রূপ করিয়া যদি তাঁহার মধুময় নামের তরঙ্গ তুলিতে পারি তাহা হইলে ত নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবেন। তখন আমাদিগের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা তাপিত প্রাণ শীতল করিতে সক্ষম হইব। অতএব এস ভাই এই [illegible] ভগবানের বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া মন প্রাণ ভরিয়া ডাকি—

ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে [illegible]।
[illegible]তিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তো[illegible]চ॥